CENTRAL LIBRARY

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘো

শারদীয় সংখ্যা • ১৩৬৮

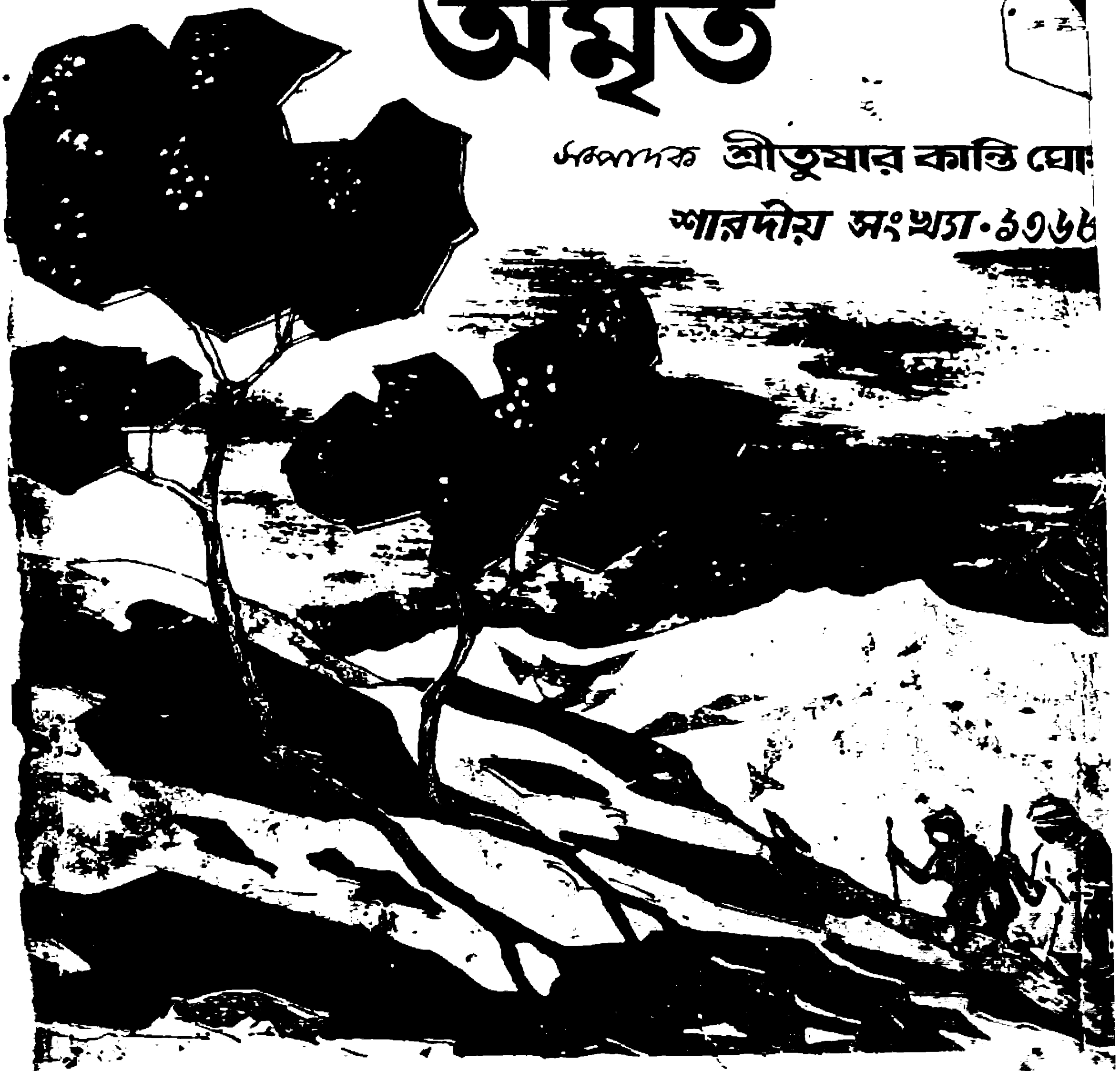

চিরস্থায়ী সৌন্দর্য্যের জন্য

বোরোলীন

ভেষজ গুণ সম্প্র
পরম প্রসাধ

ন্যানোলীন-এ সমৃদ্ধ • সুগন্ধি বোরোলীন আপনার
সৌন্দর্য্যের কোমলতা ত্বকের মলিনতা দূর করে আপনার
কোমলতা ও সজীবতা আরও বাড়িয়ে তোলে।

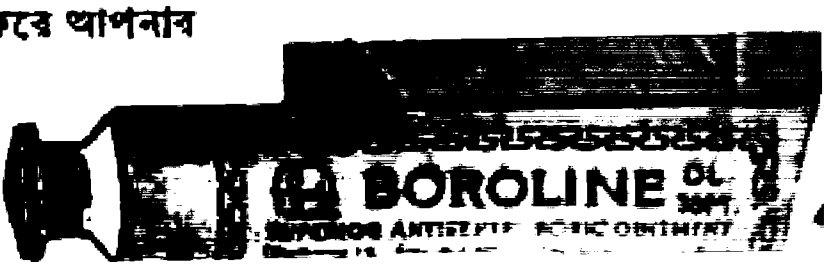

ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ ১১/১, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা-৩

১৩১ তাকে পংকের মালিন্য গ্রাস করতে পারেনি নিঃশেষে—প্রাণসূর্যের করুণাকিরণে
শুচিস্নাত হয়ে বিকশিত হয়েছে একদিন শতদলের মতোই !

শ্রেষ্ঠাংশে
সুচিত্রা
উত্তম
ছবি বিশ্বাস
পরিচালনা
অজয় কর
কাহিনী
তারাশঙ্কর
চিত্রনাট্য
বিনয় চ্যাটার্জি
সংগীত
হেমন্ত মুখার্জি

উত্তমকুমার প্রযোজিত

সপ্তপদী

আলোছায়া প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

ছায়াবাণী প্রাঃ লিমিটেড রিলিজ

রূপবাণী ঃঃ অরুণা ঃঃ ভারতী

এবং সর্বত্র

প্রদর্শন-রত

7563
001/66

কালো কেশের
কোমল
শোভা

সুন্দর কেশ তনুশ্রীকে বিশেষ
একটি মাধুর্য দান করে।
তাই রূপ-চর্চায় চিরদিন কেশের
এত আদর। কেশের স্বাস্থ্য
ও শ্রী বাড়াতে কালে
নিয়মিত ব্যবহার করুন
জুয়েল আমলা।
ইহা একটি আদর্শ ভারতীয়
ভেষজ কেশতৈল।

জুয়েল আমলা

শ্রেষ্ঠতম
ভেষজ
কেশ-তৈল

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪।

শারদীয় শুভেচ্ছা
পূর্ব রেলওয়ে

সোল এজেন্টস :

রায় কাজিন এণ্ড কোং

জুয়েলার্স ও ওয়াচমেকার্স

ওমেগা ও টিসট্ ঘড়ির অথরাইজড্
এজেন্টস্

৪, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১

শারদীয় অমৃত বিশেষ সংখ্যা ১৩৬৮

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...		...	১১
কবিতাগুচ্ছ	...	শ্রীকালিদাস রায়		১২
সাতযোগিনী (গল্প)	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত	...	১৩
হাস্য ও হ্যামলেট (ভ্রমণকাহিনী)	...	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	..	১৮
অর্গলি (গল্প)	...	শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী		২৩
কল্পতরু (গল্প)	...	শ্রীমনোজ বসু	.	২৯
রামঠাকুর (গল্প)	..	বনফুল	.	৩৭
রং বদলায় (উপন্যাস)	...	শ্রীবিমল মিত্র	.	৫২
যুগান্তর (গল্প)	...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র		১১

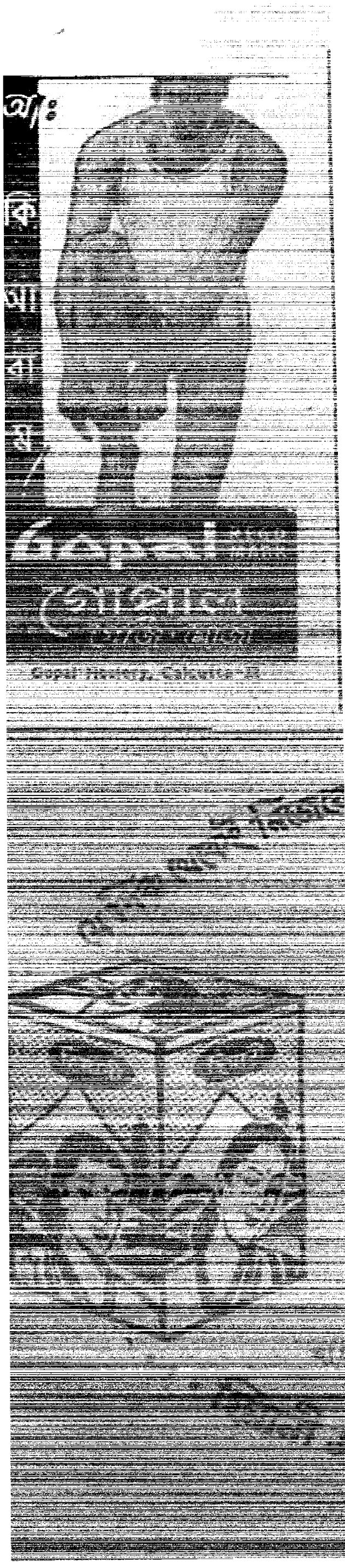

কবির কণ্ঠে নূতন করে উচ্চারিত হ'লো—

একদা এ ভারতের
কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ,
কী আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে,
'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র
যত দেবগণ দিবা অধিবাসী,
আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়, তাঁরে জেনে,
তাঁর পানে চেয়ে
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার,
অন্য পথ নাই।'

শৃণ্বন্তু বিশ্বে— অমৃতস্য পুত্রাঃ

সুদূর অতীতের এই বাণী সঞ্জীবনী এর মধ্যেই অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাব পেয়েছে মধুর। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞানের মাধ্যমেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎপত্তি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৬০ বর্ষাধিক কাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি স্থান করেছে।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

যাবতীয় কুষ্ঠ ও সর্বপ্রকার জটিল চর্মরোগ চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা—৩১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, ফোন :—৩৭-২০৫১ (পূরবী সিনেমার পাশে)

দি ফিনিস্ পেপার মিলস্ এসোসিয়েশন

হেলসিন্‌কি, ফিনল্যাণ্ড

১,৩০০,০০০ টন ফিন্‌দেশীয় কাগজের বিক্রয় প্রতিষ্ঠান

FINLAND

এজেণ্টস্ :

জেমস্ ফিনলে এণ্ড কোং লিমিটেড

বম্বে — মাদ্রাজ — কলিকাতা — নিউদিল্লী

যুগান্তকারী দেশের
যুগান্তকারী বিবরণ
ঋষি দাস প্রণীত

সোভিয়েৎ দেশের
ইতিহাস

প্রাচীনতম কাল থেকে আধুনিকতম
কাল পর্যন্ত

মূল্য সাড়ে বারো টাকা

"...এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে লেখকের প্রভূত পরিশ্রম, সম্যক তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচুর পড়াশুনার ফল। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এই গ্রন্থ একটি মূল্যবান এবং স্মরণীয় সংযোজনা।"
—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, যুগান্তর।

ক্যালকাটা
পাবলিশার্স
১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
কবিতা		শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশ্বরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীমলীন্দ্র রায়।		
শিলাবতী (গল্প)	...	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী	...	১৭২
সমর্পিতা (গল্প)	...	শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক	...	১৭৭
হোম্‌ডেস ও তাঁর প্রণয়িনী (ঐতিহাসিক কাহিনী)	...	শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়	...	১৮৪
স্বয়ংবৃতা (গল্প)	...	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	১৯১
শাহ আলমের তাবিজ (গল্প)	...	শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	১৯৭
স্ত্রীর চেয়ে বড় (গল্প)	...	শ্রীসুমথনাথ ঘোষ	...	২০৩
বাবুই (গল্প)	...	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	২০৮
অরণ্য ও আরণ্যক (প্রবন্ধ)	...	শ্রীঅমল দাশগুপ্ত	...	২১৩
ডিটেকটিভ দুর্জাবলাস ও রেসলেট (রসরচনা)	...	শ্রীপবিত্র গোস্বামী	...	২১৮
আফ্রোদিতে (গল্প)	...	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২২৩
বাঙলা চলচ্চিত্র জগতে মধ্যবিত্ত (আলোচনা)	...	শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়	...	২৩০

GRAM :"STANSEWCO" PHONE :- 33-3497

=মস্কো প্রকাশিত বাংলা বই=

রাজনীতি ও বিবিধ

ভি আই লেনিন

প্রাচ্য জনগণের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ১·১২

সোভিয়েট ইউনিয়ন : আজ ও আগামীকাল ১·১২

সোভিয়েত দেশের পরিচয় ২·২৫

গল্প ও উপন্যাস

আন্তন চেখভ

গল্প ও ছোট উপন্যাস ২·৪৯

স্টেপ্পেভূমি : ভ্রমণকাহিনী ১·২৫

ইভান তুর্গেনিভ

স্মরণীয় রোজনামচা ২·৮১

লেভ তলস্তয়

বড়ো ও ছোট গল্প ১·৭৫

কসাক ১·৫৬

মক্সিম গোর্কি

গল্প ও উপন্যাস ১·৮৭

সমুদ্রযাত্রীদের আইন : স্মৃতিকথা ৩·৩২

ইভান ইয়েফ্রেমভ

হেলার রাজা ১·১১

নারদেক : ২০২৩ : বিজয়ী ৩·৮১

চার্লস : হেলের ছেলে

১ম খণ্ড ২·০০

২য় খণ্ড ২·১২

নাজিম হিকমত

জাহাজের সমস্যকার নাবিক ১·১৬

এন-বি-এ প্রকাশনা

প্রবন্ধ ও ইতিহাস

নরহরি কবিরাজ

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা (২য় সংস্করণ) ৫·০০

প্রমোদ সেনগুপ্ত

নীল-বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ ৪·০০

সুকুমার মিত্র

১৮১৭ ও বাংলাদেশ ২·৭৫

মুজফ্ফর আহ্‌মদ

প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন ২·১০, ২·০০

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ ১০ নঃ পঃ

সৈয়দ নুরুল হুদা

ভারতীয় দর্শন ১·০০

যোগাযোগ ভাস্কর সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথ (শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন) ৫·০০

বিশ্ব-সাহিত্যের অনুবাদ

আলেকজান্দার কুপরিন

জাঙ্কিপরীক্ষা তিন খণ্ডে একত্রে ১৫·০০

ইলিয়া এরেনবুর্গ

পারীর পতন (একত্রে তিন খণ্ড) ৮·০০

নবম তরঙ্গ—১ম খণ্ড ৯·৫০

২য় খণ্ড ৬·০০

মিখাইল শলোখভ

ধীর প্রবাহিনী ডন ১·০০

সাগরে মিলায় ডন ৬·০০

আলেকজান্দার কুপরিন : রত্নবলয় ৫·৫০

সিওনির মুসোলিনের

বুখারার বীর কাহিনী ৩·০০

সদ্‌রুদ্দিন আইনী

সেকালের বুখারায় ৬·০০

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি:-১৩ ॥ নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর ৫।

রঞ্জন ফ্যান

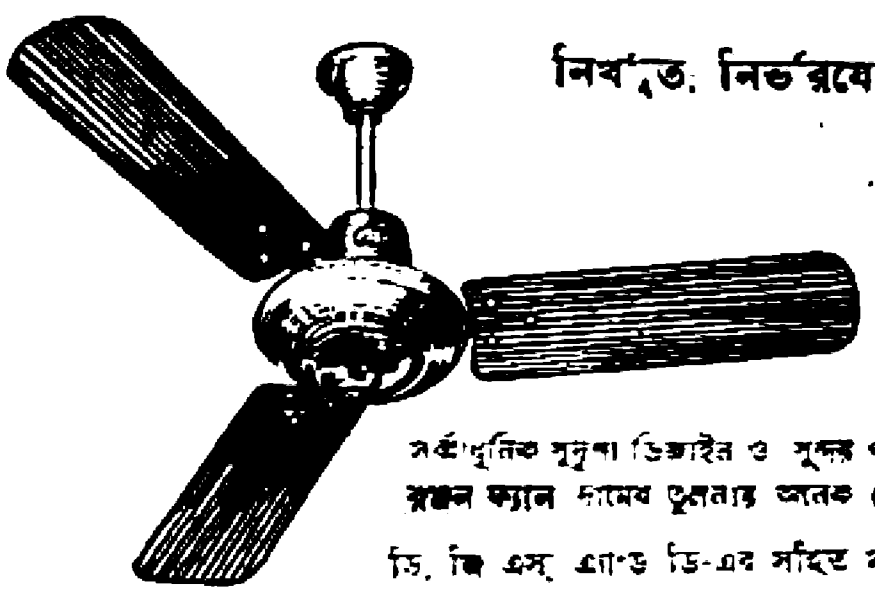

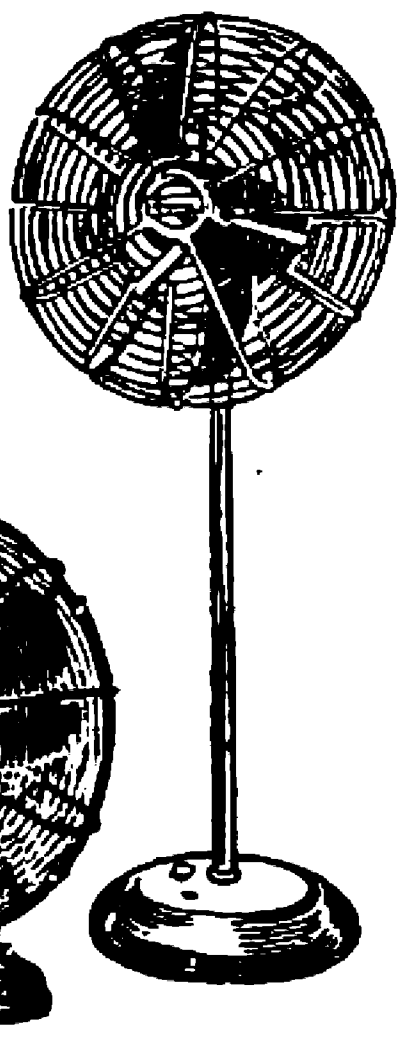

নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আরামপ্রদ

সর্বাধুনিক সুদৃশ্য ডিজাইন ও সুন্দর পরিপাটী প্রস্তুত
রঞ্জন ফ্যান দামের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাক্তনা দেয়

টি, জি এস্ এণ্ড ডি-এর সহিত মূল্যে তুলনীয়

সিলিং, • টেব্‌ল, • পেডেষ্টাল, • এয়ার সার্কুলেটার • এক্সহষ্ট্‌

প্রস্তুতকারক — জি, টি, আর কোং (প্রাইঃ) লিঃ ৩৭, নমনম রোড, কলিকাতা-৩০ ফোন :— ৫৭-২০৭৬ ৫৭-২৫৫৩

সিটি সেলস অফিস : ১২, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ ফোন—২২-১০৩৬

৮৪

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	
সুবোলার সাহস (গল্প)	...	শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু	...
মানুষ থেকো (শিকার কাহিনী)	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...
ধৈর্য্য (গল্প)	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...
নতুন পাওয়া (হাসির গল্প)	...	শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...
বিস্মৃত বিপ্লবী (প্রবন্ধ)	...	শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়	...
একটি সত্য গল্প (গল্প)	...	শ্রীবৃন্দাবনপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...

অন্যান্য : শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী, শ্রীশান্তা দেবী, শ্রীধূর্জ্জটি বসু, শ্রীধূর্জ্জটি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্রভূষণ ঘোষ, শ্রী ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুনীল গুহ, শ্রীসৌরেন্দ্র দেবী, শ্রীঅমিত ও শ্রীবীরেন বসু।

শ্রীঅতুল বসু, অংকিত রবীন্দ্রনাথ মাতৃরের প্রতিকৃতি বেগল ইমা লৌজন্যে প্রাপ্ত

দাম : আড়াই টাকা

পূজার নতুন গান

মঞ্জু গুপ্তা

আমার পরাণ কোথা যায় : কেন এলে মোর (অতুলপ্রসাদী) N 82939

সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

সেদিন বুঝিতে আমি : রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ বাজেরে (আধুনিক) N 82940

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ভুলে গেছি কবে এই : তুমি ফিরায়ে দিয়েছ (আধুনিক) N 82941

শ্যামল মিত্র

ভীরু ভীরু চোখে : নাম রেখেছি বনলতা (আধুনিক) N 82942

উৎপলা সেন

শুধু মনে পড়ে তুমি : এমন লগন যেন (আধুনিক) N 82943

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আমি ঝড়ের কাছে : মনের কোনো আঁধার (আধুনিক) GE 25065

মনোময় ভট্টাচার্য

আমি যদি চাতক হই : ওগো তব রাঙ্গাজলধারা (আধুনিক) GE 25066

লতা মঙ্গেশকর

কী যে করি সুরে যেতে : সাত ভাই চম্পা (আধুনিক) GE 25067

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

চৈতী ফুলের কী বাঁধিস : পিয়া পিয়া পিয়া (আধুনিক) GE 25068

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

মন মধুকর যা উড়ে যা : তুমি আকাশ পারে (আধুনিক) GE 25069

● সমস্ত রেকর্ড ডীলারের কাছে পাবেন ●

হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও কলম্বিয়া

আপনার অলঙ্কার আপনার রুচি ও
আভিজাত্যের পরিচায়ক।

পি·সি·চন্দ্র এণ্ড সন্স
১২৭।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি-১২
ফোন—৩৪-৪৬১৯

জুয়েলার্স্

CENTRAL LIBRARY

অমৃত

শারদীয় ১৩৬৮

এখনও আকাশ তার মেঘস্পর্শ সরিয়ে নেয়নি, এখনও সেই চিক্কণ কিরণ রেখা দেখা দেয়নি। তবু কাল রাত্রি থেকে আশ্বিনের ঝড়ের মতো বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে এবং কী যে এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম অনুভূতি আকাশে ছড়াচ্ছে জানি না। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি কে যেন বাতাসের জলকণাগুলি তার চঞ্চল কোমল হাতে মুছে নিয়ে যাচ্ছে, পাখীরা যেমন ক'রে থেকে থেকে ডানার জলরেণু রৌদ্রে ও হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে থাকে, তেমনি একটা ব্যাপার চলছে চতুর্দিকবর্তী বায়ু-আন্দোলিত সমস্ত অস্থিরতার মধ্যে। গাছের পাতাগুলি থেকে জল ঝরে ঝরে নিঃশেষ হচ্ছে। স্ফটিকের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে আকাশে দেখা দিচ্ছে এবং এই কলকাতার সহস্র গাড়ির উদ্গার, মোবিলের ধোঁয়া, ধুলোয় কাদায় সিক্ত রাজপথ, এরই মধ্যে বুঝতে পারছি তাঁর আগমন সময় আসন্ন হয়েছে।

তবু এখনও আনন্দের স্পষ্ট চিহ্ন এই নগরীর জীবনে অনুপস্থিত। কারখানায় বোনাসের দাবী উদ্যত, সংবাদপত্রে "ঘেরাও আন্দোলন" শিরোনামা ভেদ করে দেখা দিচ্ছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির নিঃশব্দ যাতনা বিধান-সভায় একবার মাত্র সামান্য স্ফুট প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু এখন সে গৃহস্থ সংসারগুলিতে বোবা মেয়ের মতো করুণ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার প্রসন্ন শস্যের সংবাদ গ্রামের খামার থেকে আসেনি। পচা পাটের বর্ণে গ্রামের ভোবাগুলি শুধু নীলবর্ণ ধারণ করেছে, বাতাস দুর্গন্ধবহ করেছে, তথাপি গঞ্জে এবং নৈহাটি-শ্রীরামপুরের জুট মিলে পাটের মূল্য নিম্নগামী। পাটকলের শ্রমিকেরা ছাঁটাইয়ের আসন্ন সম্ভাবনায় স্তব্ধ, চব্বিশ পরগণার চাষীরা বিনষ্ট আমনের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যে সময়ে তারা বর্ষার জলধারা চেয়েছিল, সে সময় প্রকৃতি স্নেহবর্ষণে বিমুখ ছিলেন। আজ শরৎ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির নিষ্করুণ বর্ষণ এখনও থামেনি। সমস্ত গ্রাম-বাংলা যেন স্তব্ধ, কর্মহীন একটি বিষণ্ণ মুখ নিয়ে দাওয়ায় বসে আছে, আর মাঝে মাঝেই তার সম্মুখের আকাশ ছেয়ে অন্ধকার নামছে বৃষ্টির নির্মম জলধারা নিয়ে।

নিজের মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি বহু জায়গায় নিরুদ্ধ অভিমানের বাষ্প পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। গত এক বৎসরের বেদনা সেখানে সারি সারি নিঃশব্দে অপেক্ষমান—সেখানে দেখতে পাচ্ছি, আসামের গৃহবিতাড়িত নারীর মুখ। কাছাড়ের অশ্রু ও রক্তসিক্ত যুবকেরা সেখানে ভিড় করে আছে। বেরুবাড়ির আসন্ন বিসর্জনের করুণ প্রস্তুতি শুনতে পাচ্ছি। তার উপরে দারিদ্র্যের সমস্ত সঞ্চিত যন্ত্রণা, বেকারীর হতাশা এবং জীবনের যত নিষ্ফল প্রত্যাশা সব স্তূপীকৃত হয়ে আছে। সেইজন্যই সে চোখ তুলে তোমার দিকে তাকাবে, মাগো সে চোখ আমার অভিমানে ভরা।

অবশ্য জানি, যে মুহূর্তে তোমার সংকেত আসবে ওদের ঐ আকাশ তার রুদ্ধ মেঘাবরণ খুলে নেবে, অকস্মাৎ রৌদ্র-সচকিত শরতের পরিপূর্ণ দিন দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। জানি, প্লাবনের জল সরে গেলে পর মৃত্তিকে অস্বীকার ক'রে চিক্কণ তৃণরেখা পুনরায় জীবনের উদ্যত অহংকার ঘোষণা করে। তাইতো এই আকাশ আবার তোমার কিরণরাশির আশীর্বাদ নিয়ে যেমনি এসে দাঁড়াবে, তখনি এই মৃত্যুর আবরণ ভেদ ক'রে প্রাণের চঞ্চল বেগ চতুর্দিক থেকে উদ্যত হয়ে উঠবে। যে জীবন অনাদৃত এবং অমৃতাভিলাষী, তার বলিষ্ঠ, প্রখর, আহ্বান শুনতে পাব। কারণ, তখন তোমার সহস্র স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত উদ্দীপ্ত আশ্চর্য মুখ নতনেত্রে সন্তানের দিকে তাকাবে। তখন আকাশ-জোড়া ঐ রৌদ্রে, জলস্নাত ঐ সতেজ শ্যামশ্রীর কম্পনে, দূরাগত ঐ বায়ুপ্রবাহে—মাগো, তোমার বাকাহীন নীরব স্নেহস্পর্শ এই ক্লান্ত হৃদয়ের উপরে বর্ষিত হবে। তখন একথা সুনিশ্চিত যে, সমস্ত হতাশা ও অবসাদ অস্বীকার ক'রে, পুঞ্জ পুঞ্জীভূত সমস্ত ক্লেদ সরিয়ে দিয়ে নূতন জীবনের আমন্ত্রণ প্রবল ঘোষণায় এসে উপস্থিত হবে।

কবিতা ১৩৬৯

অমিয়নাথ সান্যাল

শ্বেতপাথরের আতস্-ঘড়ি,
ফাট্-ধরা তার চক্কটা,—
—আংগুরী সরাবের ছোপ্ লাগানো,
পাথরে গাঁথা নক্সাকাটা চবুতরা,—
—ডাল দিয়ে ঘেরা
হেলে পড়েছে অতন একটা ভাংগনের বুকে,
রোদ হেলে এদিকটায় এবেলা ওবেলা
চাঁদ ঝলে এ পহর ও পহর॥

কাঁটায় কাঁটায় কাঁটাফুলে ভর্তি
মালঞ্চ এখন শুকিয়ে যাওয়া,
এখানে ওখানে দেখছি শুধুই
মালঞ্চের মালিকের মংলবটাই,—
শেওলা-সবুজ সানে বাঁধানো চৌরাস্তা
একটু দেখা যায় এখনো,
একটি ধারে পাতাঝরানো পারীজাত
আছে উদয় অস্ত আবোর ঘেরা একলাটি।

সময়ে অসময়ে বসন্তের স্বপ্ন দিয়ে বয় যেন
গুলরুঃ বাতাস পরীস্তানের,
হঠাৎ খুলে যেন দক্ষিণ দুয়ার শীতের রাজে
ফুলবোনা-কিংখাবের পর্দার ভাঁজ সরিয়ে
এসে পৌঁছয় বাতাস
—সোনার পিঞ্জরাতে সাণিকে গড়া খেলনা বুলবুলির কাছে,
পরীস্তানের বুলবুল সে
ঘুম জানে না নেচেই চলে
বলে অবিরত পীও পীও পীও॥

* (শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিকের সৌজন্যে)

সাত যোগিনী

অন্নদাশঙ্কর রায়

আসামে কী হয়েছিল তার বিবরণ দিতে দিতে একটু হেসে দাদা বললেন বৌদিকে, "ওগো, মনুকে সেই গল্পটা বল। সেই ভেটা শুনে এসেছি আমরা চা বাগানে।"

বৌদি দাদার দিকে চেয়ে একটু সলজ্জভাবে হাসলেন। বললেন, "কোন্ গল্পটা। সাত যোগিনীর গল্প? শুনবে, মনু? সে এক বিচিত্র গল্প।"

দাদার চোখে কৌতুকের আভা। এতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আসামের পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনার ঘনঘটা। এইবার বিজলীর ঝিলিক খেলে গেল।

মনু বলল, "কামরূপে তো কোনো দিন যাইনি। গেলে ভেড়া বনে যাবার ভয়। দূর থেকে শোনাই নিরাপদ। শুনি বৌদির মুখে।"

দাদার দিকে আড়চোখে চেয়ে বৌদি বললেন সহাস্যে, "তোমার দাদা যখন ভেড়া বনে যাননি তখন তোমারও ভেড়া বনবার বয়স নেই, মনু। তুমিও একবার আসাম ঘুরে এলে পারতে। সত্যি, আশ্চর্য দেশ!"

আশ্চর্য দেশ সে কথা বলতে! ছেলেবেলায় একদল বাজীকর এসেছিল রাজবাড়ীতে। তাদের হাতে ছিল একটা হাড়। বলে "কাউরি হাড়"। সেটা চোখে ছুঁইয়ে দিতেই তিন তিনজোড়া বাজীকরের তিন তিনজোড়া চোখের তারা সোনার গুলি হয়ে গেল। মনু ছিল সেখানে দর্শকদের সারিতে। বিশ্বাস না করে পারে! আসল একখানা কাউরি হাড় তারও চাই। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলো কাউরি হচ্ছে কামরূপী। কামরূপ হলো কুহকের দেশ। ওরা যে কেবল ভেড়া বানায় তা নয়। সোনাও বানায়।

এর পর দু'চার কথার পর বৌদি বলতে আরম্ভ করলেন—

আসামে যাবার কথা আমরাও কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু সেইসব মর্মান্তিক ঘটনার খবর শুনে চুপ করে থাকতে পারলুম না। চুপ করার উল্টোটা হলো মুখ খোলা। সেটাও আমরা করলুম না। নিঃশব্দে উপস্থিত হলুম ঘটনাস্থলে। যা দেখবার দেখলুম, যা শোনবার শুনলুম, যা করবার তা সাধ্যমতো করলুম। অবস্থা কতকটা শান্ত বলে মনে হলো। তাই স্বস্থানে ফিরেছি। জানিনে কদিনের জন্যে। শান্তিসেনার কর্মীরা সব সময় প্রস্তুত।

পদযাত্রার পথে পড়ল একটা চা বাগান। ওড়িশা থেকে আমরা এসেছি শুনে বাগানের ওড়িয়া ভাইবোনেরা আমাদের আটক করল। একটা দিন কাটাতে হলো ওদের বস্তিতে। ওদের সর্দারের ঘরে।

সর্দারের নাম বিদ্যাধর। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। কুলী বললে আমরা যা মনে করি তা নয়। আসামে বসবাস করছে দু' কুড়ি বছরের উপর। আর দেশে ফিরে যায়নি। কেন যাবে? বিষের অভাব? সোনার দেশ আসাম। জ্বরজারি এড়াতে পারলে লক্ষ্মী অচলা হয়ে বসেন। বিদ্যাধরের লক্ষ্মীমন্ত অবস্থার সাক্ষ্য চারদিকে।

লক্ষ্য করলুম ওর দুই বৌ। একটি আরেকটির চেয়ে অনেক ছোট। দু'জনে মিলে মিশে বেশ আছে। আর চার হাতে স্বামীর সেবাযত্ন করছে। বিদ্যাধরকে কিছু মুখ ফুটে চাইতে হয় না। দুই মহাবিদ্যা সব অর্পান হাজির করে দেয়। আরামে আছে বিদ্যাধর। দুই সতীনে এমন সদ্ভাব কখনো দেখিনি।

একটু পরিহাস করে বললুম, "দুই রানী নিয়ে ঘরকন্না করছ বিদ্যাধর। বাপ পিতামহর কিংবদন্তি তোমার মনে পড়বে কেন?"

বিদ্যাধর যেন বিনয়ের অবতার। হাত জোড় করে বলল, "আপনারাই আমার গর্ভধারী পিতামাতা। আপনারা বিচার করে বলুন কোন্‌খানে আমার অপরাধ হলো।"

তা শুনে উনি বললেন, "কামরূপে এলে ভেড়া বনে যায় তা কি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়, বিদ্যাধর? দু'কুড়ি বছর তুমি দেশে যাওনি। তার কারণ কি এই নয় যে, কামরূপের দুই কন্যা তোমাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে? ওরা যে কাঁটনি বিদ্যা জানে তা তো প্রত্যক্ষ দেখছি।"

এর উত্তরে বিদ্যাধর যা বলল, তার মর্ম হচ্ছে দুই বৌ দুটি অসমীয়া নয়, উৎকলীয়া। বিদ্যাধর ওদের দেশ থেকে নিয়ে আসেনি, পেয়েছে আসামেই। বহুকাল হতে ওড়িয়াদের একটি সমাজ রয়েছে বিলিয়া ও বিচ্ছিন্ন চা বাগানে। জাতের বিচার নেই। দেশে ফিরে গেলে তো আবার জাতে উঠতে হবে। এদের ও এদের ছেলেমেয়েদের কী দশা হবে! আসামের চা বাগানই সীতাকার শ্রীক্ষেত্র।

একটু একটু করে বিদ্যাধর তার আত্মকাহিনী শোনায়।

জন্ম তার কটকের দক্ষিণে এক গ্রামে। গাপ্ সচ্ছাবী। হাল-লাঙল চাষবাস।

ছেলের বয়স যখন বারো কি তেরো বছর বাপ ধরে বসল তার বিয়ে দেবে। শারিরা বলে একটি "টোকি"র সঙ্গে। বিয়েতে কন্যাপণ কম লাগে, যদি খুকীর সঙ্গে হয়। নইলে খরচ বাড়ে।

মা বলে, "বাপের কথা শোন্। বিয়ে কর শারিয়াকে।" ঠাকুমা বলে, "বাপের কথা শোন্। শারিয়াকে বিয়ে কর।" পাড়ার লোকেরও সেই পরামর্শ। কিন্তু বিদ্যাধর ওকে বিয়ে করবে না। কাউকেই বিয়ে করবে না। বাবাজী হবে। বাবাজীদের উপর তার প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁদেরি একজন না হতে পারলে জীবন বৃথা।

বারো বছর বয়সের সেই বালক এক-দিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। সে বয়সে মনে হতো অতি সুদূর। প্রায় বিদেশ বললেও চলে। কটক জেলারই উত্তরাংশে ছাতিয়া গ্রামে। সেখানকার মঠ প্রসিদ্ধ। দেখেছ কখনো? ছেলেবেলায় দেখেছ।

সেই সুদর্শন বালকটিকে ছাতিয়ার মোহন্ত মহারাজ স্নেহভরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু দীক্ষা দিলেন না। বললেন দীক্ষার বয়স হয়নি। আগে সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধি হোক। বিদ্যাধর সাধুসেবা করে। সাধুদের মুখে বড় বড় তত্ত্বকথা শোনে। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে শেখে। বই পড়তে হয় না শিক্ষার জন্যে।

চার পাঁচ বছর পরে কেন জানে না মোহন্ত মহারাজ তাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। বললেন, "বিদ্যাধর, তুমি ইন্দুমতীকে বিয়ে কর।"

হতভম্ব হলো বিদ্যাধর। সে কি কোনো অপরাধ করেছে না জেনে? কই, কখনো তো কোনো বালিকার দিকে চুরি করে তাকায়নি।

মোহন্ত মহারাজ তাকে আরো কয়েকবার এই কথা বলায় সে বিদ্রোহ করল। বলল, "বিয়ে করতে মন নেই বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি বাপ-মাকে কাঁদিয়ে। বিয়ে যদি করতে হয় তো বাড়ী ফিরে যাব না কেন?"

মহারাজ তাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারলেন না। মঠে একজন মহাস্থবির ছিলেন। তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও বললেন, "বিদ্যাধর, তুমি ইন্দুমতীকে বিয়ে কর। মহারাজের অবাধ্য হোয়ো না।"

বিদ্যাধর নত, হলো না। বলল, বাবাজী হবার জন্যেই আমি এখানে এসে-ছিলুম। সংসারী হবার জন্যে নয়। দীক্ষা না দিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে জানলে কি আসতুম আমি এখানে?

মহাস্থবির বললেন, "বিদ্যাধর, কার পক্ষে কোন্‌টা শ্রেয় সে শুধু আমরাই জানি। কাউকে দীক্ষা দিই। কারো বিবাহ দিই। তুমি আমাদের শরণ নিয়েছ। আমরা তোমার সাধনার পথ নির্দেশ করছি। অমন অনুকূল সহচরী আর পাবে না। ও তোমাকে নামাবে না। বরং তুলবে। ওই বড়।"

তখন বিদ্যাধরের কতই বা বয়স। সে বুঝতে পারল না এসব কথার মানে কী। আর ইন্দুমতী তো বয়সে আরো ছোট। কোন্ অর্থে তার চেয়ে বড়?

বিদ্যাধর তাঁকে প্রণাম করে বলল, "আমাকে অনুমতি দিতে আজ্ঞা হোক। আমি বিদায় নিয়ে চলে যাই।"

মহাস্থবির জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে তুমি? জন্মদাতার কাছে?"

বিদ্যাধর উত্তর দিল, "না মহারাজ। দীক্ষাগুরুর খোঁজে।"

সাধুবাবা রুষ্ট হয়ে বললেন, "তোকে সাত যোগিনীতে খাবে।"

বিদ্যাধর ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ কী মারাত্মক অভিশাপ দিলেন মহারাজ! এ যদি সত্যি হয় তা হলে কি সে বাঁচবে! ডাকিনী যোগিনীদের সম্বন্ধে তার আতঙ্ক ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে শুনে আসছে লোকে যার উপর দারুণ রাগ করে তাকে বলে, তোকে যোগিনীতে খাক। তোকে ডাকিনীতে খাক। পাজী হতভাগা বদমায়েস না বলে 'যোগিনী-খিয়া' বলে গালাগাল দেয়। তার বাঁকা অর্থ শ্মশানের মড়া।

"মহারাজ, এত বড় অভিশাপ আমাকে দিলেন!" বিদ্যাধর তাঁর পায়ে ধরে বলল।

মহারাজ রহস্যময় করে বললেন, "না রে, তা নয়। সে তুই পরে বুঝবি।"

বিদ্যাধরকে এর পরে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। না কটক জেলায়, না ওড়িশায়। কলকাতায় সে এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে। পাণ্ডা বলে, কামাখ্যা-দেবীর নাম শুনেছ? চল, আমি তোমাকে কামাখ্যা তীর্থে নিয়ে যাব। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখবে। সদ্‌গুরুর সন্ধান পাবে। এই জন্মেই মুক্তি লাভ করবে।

লোকটা ছিল আসলে এক আড়কাঠি। চা বাগানের জন্যে কুলী পাচারের। কামাখ্যাদেবীর মন্দির দেখিয়ে তার পরে চা বাগানে চালান দিত। বিদ্যাধর অত জানত না। মন্দির দর্শন করতে গিয়ে সে পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল, "এরা কারা?"

পাণ্ডা বলল, "অষ্টাদশ ভৈরব ও চৌষট্টি যোগিনী।"

যোগিনী শুনে বিদ্যাধর ভয়ে বিবর্ণ। চম্পট দিতে যাচ্ছিল, পাণ্ডা তাকে ফেরে ফিল না। সাথায় নিয়ে গিয়ে সিন্ধি খাইয়ে বেহোঁশ করে রাতারাতি পার করে দিল চা বাগানে। পরের দিন থেকে সে কুলী।

সেকালে সাহেব মালিকদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। একবার কুলী হয়ে ঢুকলে আর উদ্ধার নেই। তবে উন্নতি আছে। উঠতে উঠতে সর্দার হতে পারো। যতবারি খুশি বিয়ে করতে পারো। দুটি তিনটি বৌ থাকলেও ক্ষতি নেই। বরং তাতেই লাভ। ওরাও তো খাটে।

কী আর করবে বিদ্যাধর। যার অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই তো হবে। সংচাষীর ছেলে সে। গ্রহের দোষে চা-বাগানের কুলী। একেবারে তলা থেকে শুরু হলো তার নূতন জীবন। পূর্ব-পুরুষের সুকৃতের ফলে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠল। বরাতে ছিল, তাই একদিন সর্দার হলো। এর মধ্যে এলো ধর্মঘটের যুগ। বিদ্যাধর অটল। সে থাকতে ধর্মঘট হবার জো আছে? মালিকরা তাই তাকে কত সমীহ করেন। সর্দারজী বলে ডাকেন। বিস্তর উপহার, বিস্তর পুর-স্কার পেয়েছে। জমিজমা হালগরু হাঁস-মুরগী কোনো কিছুর অভাব নেই। না, মুরগী বা তার ডিম নিজে খায় না। হুজুরদের ভেট পাঠায়।

ওদিকে সাধুবাবার সেই অভিশাপ তো না ফলে যায় না। সিদ্ধপুরুষ তিনি, অবার্থ তাঁর বাক্য। হাঁ, সাত যোগিনীতে তাকে খেয়েছে। সাত সাতবার তার বিয়ে হয়েছে। সকলের বড় আর সকলের ছোট এই দুটি বৌ তাকে ছাড়েনি। আর পাঁচটি তাকে ছেড়ে যে যার পতি নিয়ে ঘর করছে। সেও বেঁচেছে। এই যে বড়টা এটা তাকে বড় ভালোবাসে। আর এই যে ছোটটা, এটাও বুড়ো হাড়ে কী যে সোয়াদ পায়! কচি হাড়ের মায়ায় মজে না। এরা তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে নিঃসত্ত করে দিয়েছে। বেঁচে আছে শুধু সে এদের জন্যেই। এদেরি ফেকাজতে।

এখন তাকে "যোগিনীখিয়া" বলে গালমন্দ দিলে তার বোধহয় মিষ্টিই লাগবে। ভেড়া বানানো হয়েছে বললেও সে বোধকরি মানহানির মামলা আনবে না। এরা কিন্তু কেউ কামরূপিণী নয়। সাতজনেই উরুবাসিনী। তা কামরূপিণী নয়ই বা কেন? কামরূপে জন্ম, কাম-রূপেই অবস্থান। এরাও কামাখ্যাদেবীর মন্দিরগাত্রের যোগিনীমূর্তি।

শেষেরটুকু বৌদির উক্তি নয়। দাদা তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সমাপ্ত করে দেন। মাঝে মাঝে কণ্ঠক্ষেপ যে না করেছেন তা নয়। রসের কথা বৌদির

মুখে বেধে যায়। দাদা তখন পাদপূরণ করেন।

মনু এতক্ষণ নীরবে শুনছিল। গল্পটা সত্যি বিচিত্র। কিন্তু কেমন যেন তার মনে হচ্ছিল কাহিনীটা তার অজানা নয়। তারই কোনো এক বন্ধুর জীবনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন মিল আছে। একটু একটু করে মনে পড়ছিল সেই বন্ধুটির জীবনকাহিনী। যতটুকু তার অবিদিত নয়।

"বৌদি", মনু বলল তারিফ করে, "খাসা গল্প! বিদ্যাধরের নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যায় কামরূপে, যাতে ত্রিকাল-দর্শী সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়। চমৎকার! অপূর্ব!"

গজলানী যেমন নিজের দইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বৌদিও তেমনি নিজের গল্পের। "এমন গল্প কেউ কখনো শোনেনি। অদ্বিতীয়।"

"না, বৌদি," সবিনয়ে নিবেদন করল মনু, "অদ্বিতীয় নয়। এর জুড়ি আছে। শুনতে চাও তো শোনাতে পারি।"

বৌদি বললেন, "অবাক করলে, মনু। সাত যোগিনীর জুড়ি আছে?"

দাদা টিপে দিলেন, "এবার সাত যোগিনী নয়, সাত ডাকিনী।"

মনু বলল, "আগে থেকে ফাঁস করছিনে। শোন সবটা।"

কলেজে একটি নতুন ছেলে এলো। মনুর নিচের ক্লাসে। কেমন করে আলাপ হয়ে যায়। মনুর কাছ থেকে কন্টিনেন্টাল উপন্যাস নিয়ে পড়ে। রোমান্টিক ভাবে ভরপুর। একদিন তো জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকে, "সাবিন! ও সাবিন!" রম্যা রঁলার উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র।

ছেলেরা তাকে ক্ষ্যাপায়, "সাবিন! ও সাবিন!" কেউ কেউ তাকে সেই নামেই ডাকতে শুরু করে দেয়, "ওহে সাবিন! কেমন আছো হে?" সে যে তাতে অখুশী তা নয়। তার স্বভাবটা ঠাণ্ডা। সে কখনো রাগে না। তার চোখ দুটি আয়ত। চোখের তারা ভাবময়। তার অর্ধেক সৌন্দর্য তার চোখে। সে যেন জেগে স্বপ্ন দেখছে। বাস করছে উপন্যাসের লোকে।

পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হলো তখন সে তার বাল্য-প্রণয়ের কাহিনী শোনাল মনুকে। মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছিল যদি বেঁচে থাকে বিয়ে করবে। কিন্তু দুরারোগ্য রোগ। জলের মতো টাকা খরচ করেও বড়লোক বাপ তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। সেই থেকে সলিলের অন্তরে-বাইরে বিষাদ। বাইরের বিষাদ কালে কমবে, অন্তরের বিষাদ অক্ষয়। সারা জীবন এ বিষাদ সে বহন করে চলবে। বিয়ে করবে না।

বছর কয়েক পরে বিলেতে আবার তার সঙ্গে দেখা। মাঝখানে অদর্শন। বলল, "বিলেত আসার খরচ জোটাতে পারছিলুম না। এক ভদ্রলোক দয়া করলেন এই শর্তে যে, তাঁর তিনটি মেয়ের থেকে একটিকে বিয়ে করতে হবে। বড়টি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, ছোটটি সবচেয়ে রূপবতী। আর মেজটি সবচেয়ে নরম স্বভাবের। সংসারে শান্তি চাইলে এমনি শান্তপ্রকৃতির বধূই শ্রেয়। কী বল, মনুদা?"

টাকার জন্যে বিয়ে করায় মনুর আন্তরিক আপত্তি ছিল। সে নীরবে প্রতিবাদ করল।

বিলেতে সলিল মাসে একবার করে প্রেমে পড়ে। সব প্রেমই নির্ভেজাল হেম নয়। গন্ধটা বন্ধুদের নাকে যায়। সলিলকে নীরবে ভর্ৎসনা করলে সে ভিক্টর বেড়ালটির মতো বলে, "আমি কী করব। ওরাই আক্রমণশীলা।" চড় মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন করুণ দুটি চোখ যার তার গালে চড় মারবে কোন্ পাষণ্ড! সম্পর্ক কাটানো উচিত ছিল, কিন্তু মনু তার বন্ধুদের কখনো ছাড়ে না। সুমতির জন্যে প্রতীক্ষা করে।

"তোমার বৌ আছে।" মনু বলে, "সে কী মনে করবে!"

"বিয়ে ত করছিনে। আমার নীতি হচ্ছে এক স্ত্রী, এক সন্তান।" সলিল উত্তর দেয় অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গে। ইংরেজীতে বলে, "ওয়ান ওয়াইফ। ওয়ান চাইল্ড।"

হাসি পায় মনুর। "এক স্ত্রী বেশ কথা। এক সন্তান কেন?"

সলিল ছেলেটি হিউমার বর্জিত। গম্ভীরভাবে বলে, "ঐ একটিই যথেষ্ট। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বড় বেশী বেড়ে গেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই শপথ নেওয়া উচিত যে একটি সন্তানেই সন্তুষ্ট হব।"

আরো বছর কয়েক অদর্শন। তার পর আকস্মিকভাবে পাশাপাশি তাঁবুতে একসঙ্গে থাকা। মনু সপরিবারে হিমালয় থেকে ফিরছিল। সলিল একটি তহশিলে ক্যাম্প করছিল। সেও সপরিবারে। শুধু স্ত্রী নয়, স্ত্রীর কোলে একটি পুত্রসন্তান। এই তো কেমন "ওয়ান ওয়াইফ ওয়ান চাইলড।"

মনু খুশী হয়ে বলে, "তুমি তোমার কথা রেখেছ, সলিল। তুমি নিশ্চয় সন্তুষ্ট। তবে তোমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হবেন কি না এখন থেকে বলা শক্ত।"

"নো মোর। নো মোর।" সলিল বলে সুতীব্র সুখে।

মনু লক্ষ্য করল যে, সলিলের স্ত্রী মোতির সঙ্গে তার বেন পারাও এসেছে ক্যাম্পে। এই সেই রূপসী ছোট বোন। মেয়েটি চুপচাপ থাকে। বড় একটা বার হয় না। এখনো বিয়ে হয়নি। পড়াশুনা করছে, কিন্তু এ সময় কলেজে হাজিরা না দিয়ে তাঁবুতে বসে আছে কেন বোঝা যায় না। ক্যাম্প তো সারা শীতকাল চলবে।

মনু এ নিয়ে কাউকে কোনো প্রশ্ন করেনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সলিলই প্রসঙ্গটা তুলল। নির্জন পথে বেড়াতে বেড়াতে। বলল "মনুদা, তোমাকে একটা বিষয়ে একটু সহায্য করতে হবে। পান্নাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চাই। এ বেশে ওর পড়াশুনা হবার নয়। জানো না বোধহয়, ওর বাবা মারা গেছেন, কিছুই রেখে যাননি। তোমাকে বলিনি যে আমাকেও তিনি ফাঁকি দিয়েছেন। বিলেতে খরচ দেননি। বন্ধুদের কাছে ধার করে চালাতে হয়েছে। এবার ধীরে ধীরে শুধছি। এ রকম হবে জানলে কি বিয়ে করতে রাজী হতুম কখনো? এ বিবাহ প্রতারণামূলক।"

মনু তাকে বলতে পারত যে টাকার জন্যে বিয়ে করতে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাতে তার সমস্যার সমাধান হতো না। বলল, "বিয়ে যখন হয়ে গেছে একবার তখন আর নতুন চড়ন নেই। মোতির কী দোষ! খোকনের কী দোষ! এদের তুমি সাজা দিতে চাও না নিশ্চয়। ভাই সলিল, এ ভুল শোধরানো যায় না। একে ঠিক-এ পরিণত করতে হবে।

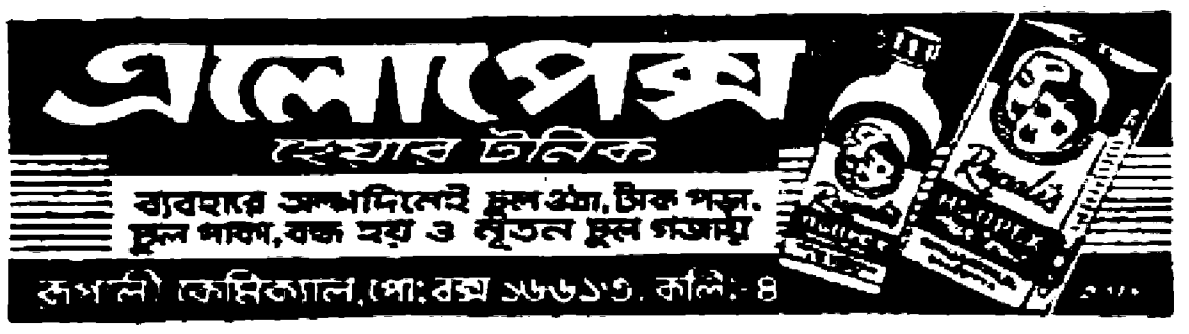

এমনভাবে জীবনটা কাটাতে হবে যাতে ভুল হয়ে যাবে ঠিক।"

সলিল মেনে নিতে নারাজ। বলল, "তা হলে প্রতারকেরই জয় হবে। ওঃ সে যে কী ভয়ংকর প্রবঞ্চক তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না, মনুদা। আমি স্বপ্নচারী মানুষ, কী করে জানব কার মনে কী আছে! লোকটা ছিল এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান। রাজার নাবালক অবস্থার সুযোগ নিয়ে বহু ধন-রত্ন সরায়। শুধু কি তাই! মৃত রাজার রানীদেরও ভোগ করে। স্ত্রী আত্ম-ঘাতিনী হন। কলকাতায় ওর প্রাসাদ আছে, তবু ওর ছোট মেয়ে পান্নাকে হতে হয় মেজদির গলগ্রহ। একেই বলে আইবুড়ো অন্ন হেঁট।"

"একটু আগেই তো বললে কিছুই রেখে যায়নি।" মনু মনে করিয়ে দিল।

"মেয়েদের জন্যে কিছুই রেখে যায়নি। কিন্তু উপপত্নীদের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করে গেছেন। আমি তখন বিলেতে। কেমন করে জানব যে তিনি তাঁর পাপের সম্পত্তি প্রায়শ্চিত্তে নিয়োগ করে যাচ্ছেন। মোতিটা এক নম্বর বোকা। জানত না, জানায়নি। জানালেই বা আমি করতুম কী ছাই। কোররার নষ্ট করে দেশে ফিরে আসতুম না নিশ্চয়। সামান্য কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ও নগদ কিছু টাকা রেখে গেছেন হীরা-পান্নার জন্যে। তা দিয়ে আজকাল একটা কেরানীর সঙ্গেও বিয়ে হয় না। এই দুই উচ্চা-ভিলাষিণীর এখন কী উপায়।"

"আপাতত পড়াশুনো। তার পর চাকরি।" ফতোয়া দিল মনু।

"হীরামি সেই চেষ্টায় আছে। ও পারবে। কিন্তু পান্নার কেবল দুঃখই সার। ওর পড়াশুনোয় চাড় আছে বলে মনে হয় না। শান্তিনিকেতনে গেলে হয়তো বিয়ের সুরাহা হবে। নাচতে গাইতে ছবি আঁকতে শিখলে ভালো বিয়ের সম্ভাবনা। আর চাকরি? ও মেয়ে কোনো দিন চাকরি করবে! ও যে দেওয়ানের মেয়ে! কলকাতায় ওদের প্রাসাদ আছে। বাঈও সেখানে প্রবেশ নেই।" সলিল বলল সখেদে।

মনু ভেবেছিল কথাবার্তা সেদিনকার মতো শেষ। তা নয়। হঠাৎ ফস্ করে বলে বসল সলিল, "মনুদা, পান্নাকে বাঁচাতে চাও তো ওকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাও।"

মনু চমকে উঠল। সে যা ভয় করেছিল তাই। সলিল স্বীকার করল যে পান্নার দিক থেকে ভাবনার কারণ আছে। ও মেয়ের চোখে মুখে কামনার শিখা জ্বলছে! তাতে পুড়ে খাক হচ্ছে ওর নিজের শরীর। মাসের অর্ধেক দিন বিছানায় শুয়ে থাকে। একটা না একটা অসুখ। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে যায়। জোর করে খাওয়ালে বমি করে দেয়। অসুখটা যে আসলে কী তা এতদিনে ধরা পড়ে গেছে। মোতি বেচারি বোনকে নিয়ে করবে কী! কাছে রেখে সোয়াস্তি নেই। দূরে পাঠালে কে জানে কী করে বসবে। আত্মীয়রা খুবই গরিব। তাদের সংসারে পান্নার মতো অভিজাতকন্যার মানাবে কেন।

মনু নির্বোধের মতো বলল, "বেশ তো। ও মেয়ে কাকে ভালোবাসে তা জেনে নিয়ে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

"ও মেয়ে কাকে ভালোবাসে তা কি তুমি টের পাওনি, মনুদা?" সলিল বলল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে কি বিয়ে দেবার জো আছে?"

মনুর চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। সে স্তম্ভিত হয়ে বলল, "বুঝেছি।"

সেদিন ছোট ভাইটিকে বিস্তর হিতোপদেশ দিল মনু। বলল, "শান্তি-নিকেতনে চিঠিপত্র লেখ। কিন্তু জুলাইয়ের আগে ওরা ভর্তি করবে না। ততদিন সাবধানে থেকো। এই কটা মাস তুমি ঠিক থাকতে পারলে হয়। বিয়ে করে যে ভুল করেছ সে ভুল একদিন ঠিক হবে। কিন্তু এ ভুল কখনো ঠিক হবে না। কাজেই তোমাকে প্রাণপণে ঠিক থাকতে হবে।"

এর দু'একদিন পরে মনু চলে গেল নিজের জায়গায়। চাকরির ধান্দায় সলিলের কথা ভুলে গেল। শান্তি-নিকেতনে খোঁজখবর নেওয়া হলো না। এক মুহূর্ত অবসর থাকলে তো!

মাস কয়েক পরে কার সঙ্গে যেন দেখা হয়ে যায় কলকাতায়। কে যেন তাকে একটা সুখবরোচক সংবাদ শোনায়। "ওহে তোমার বন্ধু সলিলের যে আবার বিয়ে হয়ে গেল। জানো না? কালীঘাটে লুকিয়ে বিয়ে। শালীর সঙ্গে। না করে নাকি উপায় ছিল না।"

তার মানে? তার মানে পরিষ্কার হলো আরো কয়েক মাস যাবে। পান্নারও একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। সলিলের ও মনুর উভয়ের বন্ধু বিমল। সেই জানায় মনুকে। সমর্থন করতে বলে তাকে। মনু বলে, "না। সমর্থন করব না। তবে করুণা করব।"

তা শুনে সলিল যায় চটে। করুণা! বন্ধুর কাছে করুণা! তা সে গ্রহণ করবে না। দুই বিয়ে কি কেউ কোনো দিন করেনি? ওটা এমন কী একটা মারাত্মক অপরাধ যে বন্ধুও বাম হবে! মনুও তাকে মনে করিয়ে দেয় না তার নিজেরই উক্তি "ওয়ান ওয়াইফ ওয়ান চাইলড।" বন্ধুমহলে ওর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শালিবাহন রাজা বলে। সলিল নানাসূত্রে ওটা শুনে থাকবে। নইলে চিঠিপত্র লেখা একদম বন্ধ করে দেবে কেন? মনুও চিঠি লেখে না। লিখতে রুচি হয় না। তার হিতোপদেশ মাঠে মারা গেছে।

বছর কয়েক পরে কানে এলো সলিল আবার বিয়ে করেছে। কাকে? বড় শালীকে? সেই বা কেন বাকী থাকে? না, তাকে নয়। সম্পূর্ণ অন্য একটি পরিবারে। এবার সবাইকে নিয়ে এক অঙ্গে থাকা নয়। শ্বশুর মশায় কড়া হাকিম। তিনি কড়ায় করিয়ে নিয়েছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষকে ঘর থেকে বিদায় করে দিতে হবে, কোনো দিনই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কোনো-কালেই ওদের কাছে যাওয়া বা ওদের সঙ্গে মেশা চলবে না। সলিল অবশ্য ওদের খোরপোষ পাঠায়। ওরা থাকে দূরে একটা শহরে একই ভাড়াটে বাড়ীতে।

শালিবাহন রাজার আজব বিচার। মনু তাজ্জব বনে। এমন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কে? কিন্তু মনু তার বন্ধুদের কখনো ত্যাগ করে না। কে জানে একদিন হয়তো সলিলের সুমতি হবে। কিন্তু সুমতি হলেই বা হবে কী? একজনকে সুখী করতে গেলে তো আর দুটিকে অসুখী করতে হবেই। তালাক দিলেই বা তারা যাচ্ছে কোথায়! দ্বিতীয় বিবাহের কতটুকু সম্ভাবনা! তার পর ওই নিরীহ শিশুগুলি?

মাকে আর বাবাকে একসঙ্গে না পেলে কি আনন্দ হয়? বাপ থাকতে বাপের কাছে যেতে পাবে না, এ কী ভয়ানক দণ্ড! সেকালের ঋষি একালে জন্মেছে। ট্র্যাজিক।

তা হলেও মনু তার বন্ধু সলিলের বিচার করবে না। একজন মানুষের বিচার আরেকজন মানুষ করতে পারে না। মানুষ কোন্ অবস্থায় পড়ে কী করে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন, বিচার করবেন তিনিই।

মনু আপনার কাজে মন দেয়। শিব ঠাকুরের তিন বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। কিংবা গম্ভীরভাবে বলে, "একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে আরেকটা ভুল করা ইতিহাসে এই প্রথম নয়। আশা করি এই শেষ। পারো তো ওর জন্যে প্রার্থনা কর।"

তাইতে সেই যে দেখা হয়েছিল তার পরে আবার দেখা হয় আট নয় বছর বাদে পাটনায়। গভর্নরের শাসন। সলিল তাঁর দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণ হস্ত

বললেও চলে। একরাশ শত্রু সৃষ্টি করেছে কংগ্রেসে ও সরকারী মহলে। সমাজেও কেউ ওর পক্ষে নয়। এমন লোকের অতিথি হতে সাধ করে কে চায়। তবু হতেই হলো অনিবার্য কারণে। একদিনের জন্যে। সপরিবারে। সলিল কিন্তু কথা শুনল না, আটক করল তিন চার দিন।

পরবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেদবুদ্ধি ঘটেছে। অমন যে সুশ্রী সুপুরুষ তার দিকে তাকাতে গেলে চোখ ধাক্কা খায়। চুল কাঁচা পাকা। বয়স ছত্রিশ সাইত্রিশ বছর বলে বিশ্বাস হয় না। ভাবপূর্ণ ওই যে দুটি চোখ ওতে উচ্চাভিলাষের সলতে জ্বলছে, আর প্রতিফলিত হচ্ছে একটি ঘোর বাস্তববাদী কাজের লোকের আত্মা। কথাবার্তায় মালুম হয় না যে ষোল সতেরো বছর আগে সে ছিল এক স্বপ্নচারী তরুণ।

বৌটিকে দেখতে তার মেয়ের মতো। কাঁচ বয়সে বিয়ে হয়েছে। মা হয়েছে। সুন্দরী। সপ্রতিভ। সামাজিক গুণ-সম্পন্ন। কোথায় যেন লাট সাহেব ওদের অতিথি হন। সাহেবকে সাহেবী কেতায় আপ্যায়ন করে। কেউ কোনো খুঁৎ ধরতে পারে না। তবে স্টেশনের মহিলারা হিংসায় নিন্দাবাদ করেন।

সলিলের পূর্বজন্মের প্রসঙ্গ সে নিজেও পাড়ে না, মনুও না। মোড়-পাল্টা এখন আর কেউ নয়। শুধু খোর-পোষের অধিকারী। পুরোনো চাকরকেও তো মনিবেরা পেন্‌সন দেন। জানতে ইচ্ছা করে ছেলে দুটোও কি কেউ নয়? শুধু আর্থিক সাহায্যের অধিকারী?

"যাক, এরা চারজনে তো সুখে আছে। জগতে ওই চারজনের সুখটাই কি চরম? এই চারজনের সুখ কিছু নয়?" মনু বলে তার গৃহিণী কেতকীকে। কেয়াকে।

"না। এরাও খুব সুখে নেই। সলিল ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে। লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে, ওর চোখে অপূরণীয় অফুরন্ত কামনা। রত্নার জন্যে ভাবনা হয়। সে কি পারবে এই হুতাশনকে তৃপ্তি দিতে? শুধু কড়া শাসনে রাখলেই কি পুরুষ বশ মানে!" কেয়ার কথাগুলো মনুকেও বিঁধল।

"ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে সেজন্যে নয়," মনু ভেবে বলে, "আর দুটি ছেলেকে দেখতে পাচ্ছে না, মানুষ করতে পারছে না বলে। রত্না যদি শাসনটা একটু শিথিল করত তা হলে এই ভাঙনটা রোধ করা যেত। কিন্তু শিথিল করবে সে কোন্ সাহসে? ও কি শুধু ছেলেদের দেখতে গিয়ে সেইখানে ক্ষান্ত হবে?"

যে সমস্যার সমাধান নেই তা নিয়ে কাঁহাতক মাথা ঘামানো যায়। মনু হাল ছেড়ে দেয়। দূরে থেকে শুভকামনা জানায়।

কংগ্রেস আবার গদি ফিরে পাবে সলিল কিংবা তার চীফ বোধহয় হিসাবের মধ্যে আনেননি। চীফ চললেন দিল্লী। সলিলও চলল তাঁর সঙ্গে। দিল্লীতেও একটা পটপরিবর্তন আসন্ন হলো। বড় বড় ইংরেজভক্তরা রাতারাতি কংগ্রেসভক্ত বনে গেলেন। অথবা লীগ-ভক্ত। বেধে গেল কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের। তখন ভক্তরাই হলেন দু'পক্ষের লেঠেল। যে যতবেশী সাম্প্রদায়িক সে ততবেশী পেয়ারের। সলিল আর যাই হোক সাম্প্রদায়িক নয়। রাতারাতি ভোল ফিরিয়ে সাম্প্রদায়িক হতে অনিচ্ছুক।

দেখতে দেখতে দেশ হয়ে গেল দু'ভাগ। আর চরমে উঠল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সলিল এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। হতভম্ব হলো।

যারা আইন ভঙ্গ করবে তারা সাজা পাবে। এই হলো তার শিক্ষা ও সংস্কার। যারা আইন ভঙ্গ করেনি তারা শুধুমাত্র মুসলমান বলেই সাজা পাবে এ কী রকম বিচার! হতে পারে তারা প্রচ্ছন্ন পাকি-স্থানী। কিন্তু আইন যতক্ষণ না তাদের মেরে তাড়িয়ে দিতে বলছে তুমি ততক্ষণ তাদের গায়ে হাত দিতে পারো না। সরল মানুষ সলিল। এই হলো তার বুদ্ধি। বুদ্ধিটা যে ধর্ম নয় অতবড় বাস্তববাদী হয়েও সে ভুলে গেল।

তামাশা দেখ। বেছে বেছে তাকে ও তার মতো কয়েকজনকে দেওয়া হলো দাঙ্গা দমনের ডিউটি। দাঙ্গা দমন বলতে সে বুঝল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। তখনকার দিনের অভিধানে কিন্তু উলটো মানে। সলিল মনে করেছিল সোজা মানে। জীবনভর যে ভুল করে এসেছে সে আবার একটা ভুল করে বসল। সশস্ত্র হিন্দু পুলিশম্যান নিরস্ত্র পথ-চারী মুসলমানকে বেধড়ক গুলী করে মারছে দেখে সে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করল লোকটার বিরুদ্ধে। তখন লোকটা করল কী, না সলিলকেই বিনাবাক্যে গুলী করল।

চার ঘন্টা কি পাঁচ ঘন্টা ধরে আহত সলিল পড়ে আছে রাজপথে। রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। একজনও তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠায় না, কিংবা খবর দেয় না তার দপ্তরে। ঐখানেই সে মরে যেত। কী ভাগ্যি একজন বাঙালী অফিসার সেই পথ দিয়ে মোটরে করে ফিরছিলেন। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন। হাসপাতালে কিন্তু না আছে ডাক্তার, না আছে নার্স। তাদের ডাকবার কথাও কারো মাথায় আসে না। সেই বাঙালী অফিসার স্বস্থানে চলে গেছেন। সলিলও কাউকে ডেকে নির্দেশ দিতে অপারগ। সেই অবস্থায় কেটে যায় আরো তিন চার ঘন্টা। রক্ত কিন্তু সমানে ঝরে চলেছে।

অবশেষে ডাক্তারও এলেন, নার্সও এলো, টেলিফোন পেয়ে রত্নাও এসে হাজির। মিনিট পনেরো দেরি করলে আর তাকে দেখতে পেত না। সেই কটি মিনিট সলিল শান্তিতে কাটায়। তখনো তার জ্ঞান ছিল। ক্ষীণকণ্ঠে কানে কানে বলে, "ডার্লিং, তোমাকে আমি বড়ই ভালোবাসি। বড়ই ভালোবাসি।"

রক্ত ক্ষতিপূরণের আয়োজন চলছিল। রত্না বলে, "ভয় কী। তুমি বাঁচবেই।"

সলিল প্রশান্তভাবে বলে, "ভয় আমার একটুও নেই। ভয় ভেঙে গেছে মরণের মোহানায় এসে। তোমাকে দেখব বলেই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছি। দেখা হলো, এবার তবে আসি। যাই যাই, ডার্লিং।"

অপূর্ব সুযোগ (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ পর্যন্ত)

মার্কনী ফ্যান

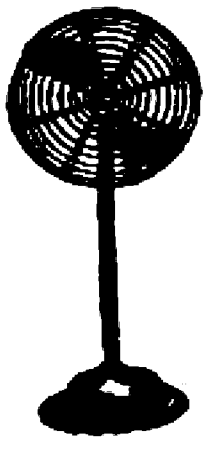

কোন বাড়তি খরচ নেই
৯টি মাসিক কিস্তিতে দিন

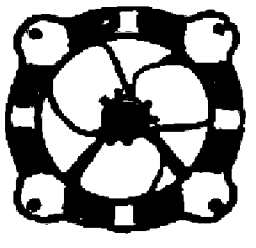

মার্কনী ইলেকট্রিক করপোঃ
(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন ঃ—৩৫-০০৪৮

হান্স ও হ্যামলেট

বুদ্ধদেব বসু

জানলার বাইরে খাল, য়োরোপের নদীর মতোই চওড়া, খালের দুই তীর বাঁধানো, উপর দিয়ে মস্ত পুল ঝুলন্ত, জলে চলেছে ফেরি-বোট, মোটর-বোট অনুনতি; আর দিনের মধ্যে আট-দশ-বার, দুই দিকে লম্বা ট্র্যাফিক লাঁড় করিয়ে দিয়ে, পুলের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, কোনো গর্বিত শুল্কগামী জাহাজকে পথ দেবার জন্য। জাহাজ চ'লে যায় সমুদ্র বা বন্দরের দিকে, পুলের দুই দিক ধীরে নেমে এসে মুখে-মুখে আটকে যায়; গতি ফিরে পায় ট্রাম, মোটর, স্কুটারের সারি, কোনো টুরিস্ট-বোঝাই সাদের তরণী ঝকঝকে কাচের দেহ নিয়ে জলে ভাসলো। বাইরে এই সব, আর ভিতরে —অনুপম পরিচ্ছন্নতা, আরামদায়ক মনোমুগ্ধকর আসবাব, বোতাম টিপলে যে-পরিচারিকা এসে দাঁড়ায় সে সুশ্রী, মনোযোগী, সেবায় ও ইংরেজি বলায় পটু, প্রাতরাশের সঙ্গে নানা ছাঁদের ও নানা স্বাদের যে-পরিমাণ রুটি এনে দেয়, তাতে আমার মতো দশজনের ক্ষুধা-নিবারণ সম্ভব। এ-ই কোপেনহেগেন, কোবেনহাভন বা বণিকবন্দর: হোটেল য়ুরোপার জানলা থেকে তার সঙ্গে চেনা ক'রে নিচ্ছি; দেখছি তার আকাশ কেমন ম্লান রোদ কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে জলের উপর শুয়ে আছে, গাছপালার সবুজ কেমন সবুজতর, আর ভাবছি কেমন ক'রে, ক্ষুদ্র আয়তন ও স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে, পরাক্রান্ত প্রতি-বেশীদের দ্বারা অনেকবার নির্জিত হ'য়েও, এই উপনিবেশহীন আত্মসম্বল দিনেমারদেশ এমন সম্পদের অধিকারী হ'লো। হয়তো এই অটুট স্বাবলম্বিতাই তার কারণ।

মহানগর নয় কোপেনহেগেন; যদি না আপনি পুরাতত্ত্বে উৎসাহী হন তাহ'লে প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি একদিনেই দেখে নিতে পারবেন। আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলে চিত্রশালা: সেখানে অবাক হ'তে হয় রদাঁর সংগ্রহ দেখে; ফরাশি ইম্প্রেশনিস্টরাও সদলে উপস্থিত: 'এডভার্ড' মুঙ্ক-এর কয়েকটা ভুল ছবি দেখতে পেয়ে আমার বহু-কালের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হ'লো। ক্ষুদ্র, কিন্তু বিশাল নয় চিত্রশালা, ঘণ্টা তিনেকে তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, আর সেই তিন ঘণ্টায় প্রতীতি জন্মে যে দিনেমারদেশ শিল্পচর্চায় পেছিয়ে নেই। আরো দশ মিনিট দূরে টিভলি পার্ক, সেটা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপারে টাউনহল, আর তার সংলগ্ন চত্বর; পায়রা, ফোয়ারা, বাহুবদ্ধ তরুণ-তরুণী রোদ পোহাচ্ছে, গৃহিণীরা সওদা ক'রে ঘরে ফিরছেন, রেলিঙে হেলান দিয়ে আড্ডা জমিয়েছে ছাত্ররা। এই খোলা চত্বর, যাকে প্যারিসে বলে প্লাস, আর রোমে পিয়াৎসা, আর ঐ দুই নগরে যার সবচেয়ে গরীয়ান রূপ দ্রষ্টব্য, তা য়োরোপের একটি নিখিলনাগরিক সামান্য লক্ষণ, আর তার দ্বারা প্রতি দেশের নগরলক্ষ্মী যে কী-পরিমাণে শ্রীমতী হয়েছেন তা কলকাতায় ব'সে কল্পনা করা অসম্ভব। তা নেই শুধু ইংলণ্ডে, অতএব তা কলকাতায় বা বম্বাইতেও নেই, যদিও আমাদের এই উষ্ণমণ্ডলে তার উপযোগিতা স্বতঃ-সিদ্ধ। কোপেনহেগেনের কেন্দ্র এই নগর-চত্বর, এর এক প্রান্তে দোকান-পাটের ভিড়, আশে-পাশে গির্জে অথবা অট্টালিকার মিনার উঠেছে আকাশের দিকে, আর এর গা ঘেঁষে যে-রাজপথটি সোজা চ'লে গেছে তার নাম এইচ, সি, আণ্ডেরসেন বুলভার: আমাদের হোটেলও এই রাস্তারই উপর।

'কুজ্ঝিং পাতিহাঁস', 'ছোট্ট জলকন্যা', 'নাইটিঙ্গেল', 'রাজার নতুন পোশাক'— এই সব অমর কাহিনী যাঁর রচনা, তাঁর স্বাদেশিক নাম 'এইচ সি আণ্ডের-সেন': কিন্তু, কোনো-এক অজ্ঞাত কারণে, ইংরেজ বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখতে হ'লে তিনি 'হান্স ক্রিশ্চান আণ্ডেরসেন' ভিন্ন অন্য কোনো স্বাক্ষর করতেন না। ফলত, ইংরেজিভাষী জগতে (আর যেহেতু আমরাও তার অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছি) তাঁর নাম দাঁড়িয়ে গেছে হান্স ক্রিশ্চান, বা সংক্ষেপে হান্স আণ্ডেরসেন। যদি কেউ জিগেস করেন, কোন দু-জন সাহিত্যিকের নাম নিখিল-ভুবনে সর্বসাধারণের সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তাহ'লে শেক্সপীয়রের পরেই এই নামটি উচ্চারণ করতে হবে আমাদের; আর যদি লোকপ্রিয়তাকে নিরিখ ব'লে মানতে হয়, তাহ'লে এমনকি এরই স্থান প্রথম হবে হয়তো। কেননা আণ্ডেরসেনের মৃত্যুর পরে এখনো পুরোপুরি একশো বছরও কাটেনি, অথচ এরই মধ্যে সকলেই মেনে নিয়েছে যে তাঁর রচনা সর্বজাতির সামান্য সম্পদ। অসংখ্য অনুবাদ, অসংখ্য সংস্করণ, নানা স্তরের শিল্পীর হাতে চিত্রণ প্রায় অন্তহীন, পাঠকসংখ্যা অনবরত বিবর্ধমান—আর তা শুধু য়োরোপীয় প্রবল ভাষাগুলোতেই নয়, এমন সব প্রাচ্য ভাষাতেও যাতে অনু-বাদের সুযোগ এখনো সংকীর্ণ। বাংলাতেই, ধরা যাক না, শেক্সপীয়র আজ পর্যন্ত অনুবাদসাপেক্ষ, তাঁর প্রতিভা বিষয়ে ধারণা পেতে হ'লে বাঙালিকে ইংরেজি (বা জর্মান) ভাষায় বুৎপন্ন হ'তে হবে; কিন্তু আমাদের পক্ষেও আণ্ডেরসেন আজ ঘরের মানুষ।

সব দেবতার দোহাই দিয়ে বলছি, কোনো পাঠক যেন আণ্ডেরসেন ভাবতে হলিউডের চলচ্চিত্রটি মনে না আনেন। সেখানে যাঁকে দেখানো হয়েছিলো, তিনি নন এক অসুখী, অকৃতী, উচ্চাভিলাষী, আত্মসচেতন ভাষাশিল্পী, তিনি শতকরা একশো পরিমাণে ড্যানি কে—আণ্ডের-সেন যা-কিছু ছিলেন না, তিনি তা-ই। গরিবের ছেলে, বাবার জীবিকা পাদুকা-নির্মাণ, মা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাপড় কাচেন; যেমন সাধারণ তার 'হান্স' নাম, তেমনি সাধারণের চেয়েও খারাপ তার চেহারা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ না-হ'তেই লড়াই-ফেরতা বাপের মৃত্যু হ'লো। মা আবার বিয়ে করলেন; মা ঠাকুমা দু-জনেই বললেন এবার তাকে কোনো-একটা হাতের কাজ শিখে নিতে—তার অবস্থার হিশেবে সেটাই সুপরামর্শ ছিলো তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু হান্স সে-কথায় কান দিলে না; স্নেহের বন্ধন, জন্ম-স্থান ওডেন্‌সে-র চেনা বাতাস—সব ছেড়ে চোদ্দ বছর বয়সে চ'লে এলো কোপেনহেগেনে। সেখানে আত্মীয়ের আশ্রয় নেই, কিন্তু রয়াল থিয়েটার আছে; জীবিকা সেখানে অনিশ্চিত, কিন্তু সম্ভাবনা বিশাল। তার মনে এক অদ্ভুত অসুখ, এক অবিশ্বাস্য আশা— সে 'বড়ো' হবে, সে বিখ্যাত হবে। পুতুল নিয়ে নাটক-নাটক খেলা করেছে ছেলে-বেলায়, গলা ছেড়ে গান গেয়েছে নদীর ধারে একলা—বাঁশিয়ে,

একেবারে থার্মমেটার চড়িয়ে দেয়। চমক দিয়েছিলো। অনেক চেষ্টায় চাকরি হলো রাজধানীর থিয়েটারে, কিন্তু টিকলো না। অপাঙ্‌ক্তেয় চেহারা, শিক্ষার অভাবে উচ্চারণ দুষ্ট,—কেমন করে সে অভিনেতা হবে? কিন্তু কোথাও কোনো একটা স্ফুলিঙ্গ ছিলো ঐ 'ঢ্যাঙা আর অদ্ভুত' ছেলেটার মধ্যে; থিয়েটারের কর্তাদের মধ্যেই একজনের তা চোখে পড়লো; তিনি তাকে নতুন করে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। 'একটু লেখাপড়া শেখো, নয়তো কিছুই হবে না তোমার।' কিন্তু ক্লাশ, সহপাঠীরা বয়সে অনেক ছোটো, পড়ায় মন বসলো না, কিংবা হয়তো বোকাসোকাই ছিলো ছেলেটা—স্কুলের পরীক্ষা পাশ করতে কিন্তর বেগ পেতে হলো। এ-রকম ছেলে বই লিখে নাম করতে পারবে, এটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে স্বাভাবিক বলে না, কিন্তু যা অসাধারণ, এমনকি যা অস্বাভাবিক, সেই প্রতিভা বস্তুটিও কাগে-ভদ্রে দেখা দেয় বইকি, আর তা কখন কার মধ্যে কী-ভাবে দেখা দেবে তা কোনো পণ্ডিত গণনা করে বলতে পারেন না। কেননা এর পর থেকেই ছাপার অক্ষরে বেরোতে লাগল এইচ, সি, অ্যান্ডারসনের লেখা : প্রথমে কবিতা, তারপর ছোটদের গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কিন্তু পাঠকও জুটলো না তা নয়। ছেলের বয়স যখন তিরিশ তখন বেরোলো ছোট্ট একটি চটিবই—'ছোটোদের জন্য গল্প'. তাতে গল্পের সংখ্যা মাত্র চার, কিন্তু তারপর থেকে প্রায়ে বছর একটি করে 'রূপকথার বই বেরোতে থাকলো।

মৃত্যুর আগে অ্যান্ডারসন কি জেনে ছিলেন যে তাঁর সেই ছোট্টো পুতুল-পাচের কুচ্ছিৎ, নিষ্কর্মা, বাসন-মাজা কিরের লাথি-খাওয়া হাঁসের বাচ্চা—গল্প নয়, বাস্তব জীবনেও বিশ্বজয়ী মহিমায় রূপান্তরিত হয়েছে? কিন্তু গল্প আর জীবন কি পৃথক? কল্পনা ও বাস্তব কি অনাত্মীয়? তাইই আত্মজীবনীর চিত্রেপ তো ঐ কাহিনী, অনাগতের স্বপ্নাপ্রসূত উচ্চারণ। এবং কল্পনার তাপে তাঁর অন্তরে যা প্রতিভাত হয়েছিলো, তাকে উত্তরজীবনে বহির্জগতেও তিনি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য ভাষায় অনুবাদকরা তাঁর আয়ুষ্কালেই আরম্ভ হলো, অনুরাগী বন্ধু পেলেন চার্লস ডিকেন্সকে, জর্মানির রাজনোরা তাঁকে আতিথেয়তা দিলেন, স্বদেশের রাজা কাছেও সম্মানিত; তাঁর সাধনার ফল ডেনমার্কের ওডেন্সুস শহরে মূর্তি-রূপে প্রত্যক্ষ হয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের পুরস্কারই তাঁর বড়ো নয়, যে-মানুষ নিজের প্রেমে পড়তে ব্যর্থ হলেন, তাকে-বিয়ের প্রস্তাবও করেও যিনি লিন্ড-এর মন যিনি পাননি, তাঁর অন্য সাধ মিটিয়ে যিনি বারবার সত্য হোরেস ডুমন প্রত্যক্ষ করেছেন নিজে, সাধক ভাবে যে জীবন তাঁ যাকে বরণ করেছেন, আর, অবশেষে—নিঃসঙ্গ, প্রতিভার স্বীকৃতিহীন, নিষ্ফল সার্থকতা নিয়ে সব সম্মান প্রতিশ্রুতি—এক বৎসর বন্ধুর গায়ে যাঁর মৃত্যু হলো, ঘরে-বাইরে সেই মানুষেরই কাছেই বারবার ফেরা হয় আমাদের, আমরা যখন তাঁর কাহিনী-পাঠে পড়ি অথবা স্মরণ করি। প্রতিভা থেকে প্রতিভাবানেরও মুক্তি নেই; যে-সব উপন্যাস ও নাটকের উপর অ্যান্ডারসনের সারা জীবনের সাধনা নিবেদিত হয়েছিলো, তাঁর সমসাময়িক অনেক তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে, আজ সেগুলো শুধু তাঁরই নামটিকে বলে ঐতিহ্যের আকারে; আর যে-সব তথাকথিত রূপকথা তিনি লিখেছিলেন কিছুটা খেলাচ্ছলে, কিছুটা

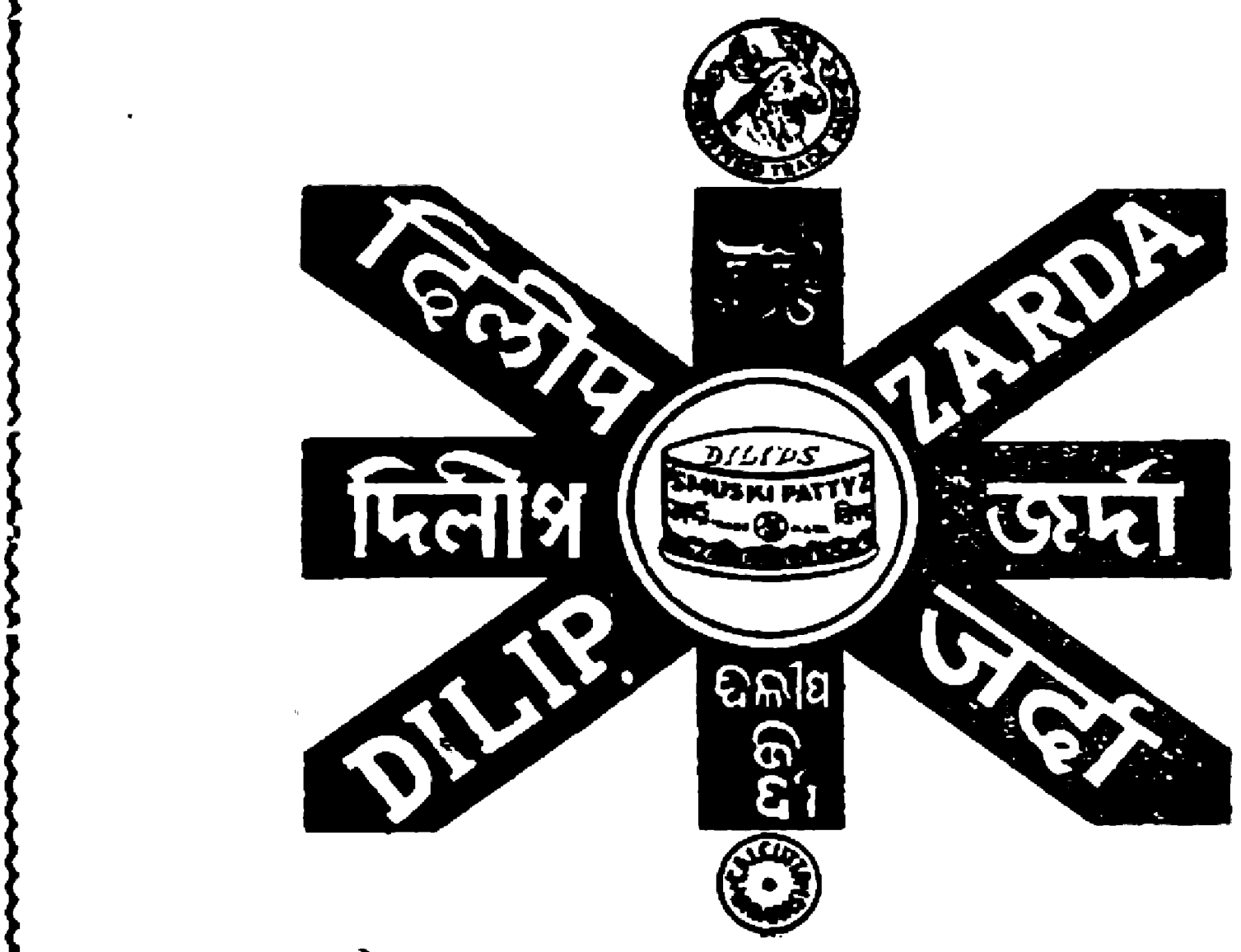

হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, তাঁর মৃত্যুর আগেই জগৎ বুঝে নিয়েছিলো যে মোদ্দালোই তাঁর অমরতার ভিত্তি।

দিনেমার সমালোচকদের একটি ভ্রান্তিহীন অভিযোগ এই যে আন্ডের-সেনের অনুবাদকেরা তাঁকে পরিণত করেছেন নেহাৎই একজন শিশুপাঠ্য লেখকে, কিংবা এক লোক-কথার সংকলন-কর্তায়। এই অভিযোগে কিছুটা সত্য নেই তা নয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য হ'লে আমরা কি তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণের তালিকায় ডিকেন্স অথবা হুইটম্যানের নাম খুঁজে পেতাম, না কি অস্কার ওয়াইল্ড তাঁরই অনুকরণে রচনা করতেন ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কাহিনী? আসল কথা, যেমন সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি, তেমনি পাঠকদের মধ্যেও শুধু 'কেউ-কেউ' এমন থাকে যারা চিনতে পারে প্রতিভার বিকিরণ, বুঝে নিতে পারে কবির সংকেত ও গূঢ় অভিপ্রায়; আর তাঁরা, কোনো কালে বা কোনো দেশেই, এই দিনেমার কবির ছদ্মবেশ দ্বারা প্রতারিত হননি। আজকের দিনে এ-কথা বোধহয় না-বললেও চলে যে আন্ডেরসনের 'গল্প ছোটোদের জন্য' লেখা হয়নি, এবং তা 'রূপকথা'ও নয়। খাঁটি রূপকথা হ'লো শ্রুতিক লোকসাহিত্য, তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে অনেক লেখক বিখ্যাত হয়েছেন; কিন্তু আন্ডেরসেন লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহক বা সম্পাদক ছিলেন না; জর্মানির গ্রিম-ভ্রাতাদের দিনেমারি প্রতিরূপ তিনি নন। তাঁর কাহিনী-সপ্তয়নের মধ্যে তিনটি—মাত্রই—তিনটি গল্প বাদ দিয়ে, সবই তাঁর আপন উদ্ভাবন, তাঁর প্রাতিস্বিক কল্পনার সৃষ্টি। আর এক লক্ষণ : খাঁটি রূপকথা কখনো শোকান্তিক হয় না, কিন্তু আন্ডেরসনের হেমলাইওয়ালি উত্তরদেশের পাখিদের মতোই শীতে মরে যায়, জলকন্যা শোণিতের মূল্যেও পায় না তার প্রিয়-তমকে, নিজেরই দেহচ্যুত ছায়ার চক্রান্তে বিদেশী পণ্ডিতের প্রাণদণ্ড ঘটে। আমরা তাই অবাক হই না যখন শুনি যে, প্রথম প্রকাশের পর, এই 'রূপকথাগুলিতে স্বদেশীয় সমালোচকেরা আবিষ্কার করে-ছিলেন অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও ধর্ম-দ্রোহ। মৌলিকতার সামনে এই হ'লো প্রথম সনাতন প্রতিক্রিয়া, তাই অবাক হই না। শুধু বিস্ময় জাগে এই কথা ভেবে যে যদিও এমন কোনো জাতি নেই যার আবহমান লৌকিক রূপকথা না আছে, পৃথিবীতে এমন লেখক একজনের বেশি জন্মালেন না যিনি পারলেন নতুন রূপকথা সৃষ্টি করতে, তার প্রাচীন প্রচ্ছদে সজ্জিত করলেন আধুনিক আত্মার স্বপ্নচেতনা। আর জন্মালেন সেই দেশেই, বাসা বাঁধলেন সেই নগরেই, বেঁচে থাকলেন সেই কালেই—যে-কাল, যে-দেশ ও যে-নগর আধুনিক অস্তিত্ব-বাদের প্রতিষ্ঠাভূমি। জগতের কাছে দিনেমার দেশের এই দু-জনই আজ প্রতিভূ : কীর্কেগড় ও হান্স আন্ডেরসেন, কিন্তু যেহেতু আমার মনে সেই চিন্তাই সহজে মেলে, যার প্রকাশের বাহন চিত্র-কল্প, তাই কোপেনহেগেনে পা দেয়ামাত্র আমার আন্ডেরসেনকেই প্রথম মনে পড়লো।

আর সত্যিও, এই নগর যেন আন্ডেরসেনের ভাবনারই প্রতিচ্ছবি—আনে, রূপ ও শৈলীর দিক থেকে তা-ই। যেমন সবই ধরা দিয়েছে তাঁর কাহিনীতে—পরিণত ও সচেতন মানুষের প্রেম ও অপ্রেম, তার আশা, চেষ্টা, বাসনা ও বাসনাজনিত যন্ত্রণা, কিন্তু ধরা দিয়েছে মৃদু হ'য়ে, মধুর হ'য়ে, একটি কোমল সকৌতুক আচ্ছাদনের মধ্যে সব বয়সের ও সব জাতির পাঠকের পক্ষে সহনীয় হ'য়ে, তেমনি কোপেনহেগেনে সবই যেন ছোটো মাপের, কোনো-কিছুরই খুব উঁচুতে তার বাসা হয়নি; অত্যন্ত বৃহৎ নয় কোনো অট্টালিকা, সরাণ বা উদ্যান; প্রমোদ নয় তীব্র; ট্রাফিক নয় অশেষ ও উত্তরোল। সব স্নিগ্ধ আকাশের আলো যেন কুয়াশায় ভেজা, মৃদু করুণাশীল। ব্যবহার ও বিলাসের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট নয় এখানে, অর্থকাম ও কর্ম যেন সহবাসী। বিকেলবেলা বন্দরের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি সেটা বন্দর না উদ্যান তা বোঝা যায় না; সমুদ্র ঘিরে আছে গোল হ'য়ে তটরেখাকে, ছোটো, শান্ত, অপরিসর সমুদ্র; জলে জাহাজ, মাটিতে আলো-ছায়া-মাখা বেঁশি, ঘাস ঘন ও তরুপল্লব প্রচুর, জলে একটি শিলার উপরে বসে আছেন আন্ডেরসেনের জল-কন্যা। শিল্পকর্ম হিশেবে হয়তো তেমন বিশিষ্ট নয় এই মূর্তি, কিন্তু যেখানে এবং যে-ভাবে তা বসানো আছে, তারই জন্য এটি দ্রষ্টব্য ও স্মরণীয়। ধোঁয়া হাওয়ায় শ্যাওলায় মূর্তিটা সবুজ হ'য়ে গেছে তার বর্ণ, যেন জলজ লতাগুল্মে জড়িত হ'য়ে এইমাত্র সমুদ্র থেকে উঠে এলো। তরুণ তার যৌবন, দেহটি ক্ষীণ, পিঠে লুটিয়ে আছে বেণী, বসেছে ভারতীয় গায়িকাদের ধরনে হাঁটু মুড়ে, তার জঙ্ঘা শেষ হয়েছে চরণে নয়, পুচ্ছে; তার দৃষ্টি নূরের দিকে নিবদ্ধ। দেখে মনে পড়ে সেই মুহূর্তটি যখন মৎস্য থেকে নাচিয়ে রাজপুত্রকে দেখে-দেখে নাস্তীর কামনায় প্রহত হ'লো এই মৎস্য-কুমারী; মৃত্যুর মূল্যেও প্রার্থনা করলো সে চরণ, মানবিক প্রেম ও আত্মার জন্য তৃষিত হলো।

বন্ধুর বাড়িকে ছেড়ে দিয়ে, আমরা মোটর-বোটে শহরে ফিরলাম। বোঝা গেলো, আমস্টার্ডামের মতো নিবিড়ভাবে না হোক, কোপেনহেগেনও জলবেষ্টিত শহর। খালের দুই দিকে সৌধশ্রেণী, মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো সাঁকো, মোড়ে-মোড়ে তরণীর ভিড়, নাবিক আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছে কোনটা পার্লামেণ্ট, কোনটা বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। লম্বা নাকিক চেহারার পুরুষ, চোখ তীক্ষ্ণ ও নীল, গায়ের রং রৌদে জলে গাঢ় হ'য়ে গেছে। আমাদের জিগেস করলে আমরা বম্বাই থেকে আসছি কিনা; উত্তরে কলকাতার নাম শুনে তার চোখে খুশির ঝিলিক লাগলো। 'Fine city—আমি অনেকবার গিয়েছি সেখানে, একটা রেস্তোরাঁয় খুব যেতাম—সেটা কি আছে এখনো?—নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—হ্যাঁ, ব্রিস্টল! আছে এখনো?'

খালের ধারে-ধারে কয়েকটা ন্যা-জাদা ও পুরোনো রেস্তোরাঁ; মাছের রান্না এগুলোর বৈশিষ্ট্য। তারই একটাতে সান্ধ্যভোজ সমাধা করা গেলো। স্ক্যান্ডিনেভীয়রা—উত্তর মেরুলোকে শুধু তারাই—রন্ধনপটু ও ভোজনবিলাসী; এদের 'স্মরগাসবড়' ভোজনে পঞ্চাশ রকম মাছ মাংস শাকসব্জি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য টেবিলে থরে-থরে সাজানো থাকে, আপনি যেটা ইচ্ছে যতটা ইচ্ছে তুলে নিতে পারেন; ভেবে দেখুন ঔদরিকের কী অপূর্ব সুযোগ, আর যাদের ক্ষুধা ক্ষুদ্র তাদেরও চোখ ও মনের পক্ষে কী-রকম তৃপ্তির সম্ভাবনা। বেঁচে থাকার জন্যই আহার, এই শীর্ণ নীতিতে আমার মন সায় দেয় না; আহার্য বিষয়ে বিকেন্দ্রিয় বাহুল্য আমার মনে হয় সভ্য-তার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং এই ব্যাপারে চীনেদের মতো সিদ্ধিলাভ যদিও অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে ঘটেনি, তবু দিনেমারদেশ অন্তত পক্ষে প্রতি-যোগীর তালিকায় নাম লেখাতে পারে; কেননা এরা উদ্ভাবন করেছে একশো-রকমের সাণ্ডুইচ, আর কত রকমের পাঁয়রা ও পেস্ট্রি, তা কেউ গুনে বলতে পারে না। এই বৈচিত্র্যের আসল অর্থ—ঔদরিকতা নয়—ব্যক্তিগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রুচি-বৈকল্যের স্বীকৃতি ও তার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা; আর, সত্য জগতে এই চেষ্টা

পূজার দিনে
লক্ষ্মী ঘি
বাংলার ঘরে ঘরে
আনন্দের
বার্তা বহন
করে আনে
LAKHMI
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘি
বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও রুচ্য
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

৺ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের পুত্রগণের সৌজন্যে প্রাপ্ত কলিকাতার প্রখ্যাত পাথুরিয়া ঘাটা ঘোষ বংশের প্রায় তিনশত বৎসরের ঐতিহামণ্ডিত শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমা।

শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার কর্তৃক পুনর্বার

অঙ্গুলি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'চাকরি ছাড়বি কেন?' ভবনাথ গর্জে উঠল : 'এ কি অন্যায় কথা!'

কৃষ্ণেন্দু চুপ করে রইল।

'চাকরি ছাড়বার কি হয়েছে?'

'চাকরিটা ছোট।'

'ছোট মানে? এত বড় ফার্মের এমন একটা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট—'

'মাইনে কম।' ম্লান রেখায় হাসল কৃষ্ণেন্দু : 'মোটে পাঁচশো।'

'পাঁচ শো কম হল?' ভবনাথ চেঁচিয়ে উঠল : 'একেবারে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মত?'

'ফোর ফিগার তো আর নয়। ফোর ফিগার না হলে কি সম্ভ্রান্ত দেখায়?'

'তা ফোর ফিগার হবে আস্তে-আস্তে।' প্রবোধের সুর আনল ভবনাথ : 'চাকরিতে উন্নতির স্কোপ তো আছে।'

'সে তো ভবিষ্যৎ। এই মুহূর্তেই তো আর হচ্ছে না। এই মুহূর্তেই তো আমার মাইনে হাজার নয়।' জানলার বাইরে অকারণে একবার তাকাল কৃষ্ণেন্দু : 'ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভবিষ্যতের কথা কে ভাবে?'

'তবে আগে একটা হাজার টাকা মাইনের চাকরি জোগাড় কর।' কণ্ঠস্বরে সংযতা রাখতে পারছে না ভবনাথ : 'তারপরে এটা ছেড়ে দে।'

'আমাকে কে দেবে হাজার টাকা?'

'না দেবে তো, তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি কেন?'

'লক্ষ্মী কি হাতে থাকে? লক্ষ্মী থাকে বাক্সে। বাক্স ভাঙা দেখে লক্ষ্মী নিজেই চলে গেছে বাবা, পায়ে ঠেলতে হয়নি।' দিব্যি হাসল কৃষ্ণেন্দু।

এমন অযৌক্তিক কেউ হতে পারে ভাবতে পারে না ভবনাথ। এমন তো ছিল না কৃষ্ণেন্দু! কী হয়েছে ছেলেটার?

অবস্থার উন্নতি করতে চাস তো ভালো কথা। তাই বলে তুই হাতের পাখি ছেড়ে দিয়ে ঝোপের পাখি ধরতে যাবি? আগে ঝোপের পাখি একটা ধর, তারপর না হয় হাতের পাখি উড়িয়ে দে। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তো কখনো শুনিনি।

যদি তোর হাজার টাকার মুরোদ নেই জানিস, তবে পাঁচশো টাকা তোর কম হল? তুই একলা মানুষ, তোর কত লাগে? আমি, তুই আর নীলা।—এই তো আমাদের সংসার। তোর মা তো কবেই পরলোকে। তা নীলারও বিয়ে হয়ে গেল গত বছর। এখন শুধু বাপ আর ছেলে—আমরা দুজনে। আমার জন্যে ভাবনা নেই। একতলা থেকে যা ভাড়া পাই তাই আমার যথেষ্ট।

একটি বউ আনিস এই আমার স্বপ্ন। তা না হলে আমাকে দেখবে-শুনবে কে? দিন-দিন আমি অথর্ব হয়ে যাচ্ছি না? আর কত দিন বাঁচব? ধূসর মরুভূমিতে ছোট্ট একটি সবুজের রেখা ছিল নীলা, গৃহান্তরে চলে গিয়েছে। ভেবেছিলাম তুই এবার এই ধূসরকে শস্যায়িত করে তুলবি। কিন্তু এ তোর কি মতিচ্ছন্ন!

নিজের বাড়ি, পাঁচশো টাকায় অক্লেশে তুই বিয়ে করতে পারিস। কিন্তু কেন যে তোর কোনো কিছুতেই মন ওঠে না বুঝে উঠতে পারি না। শুধু শুধু তুই আমাকে বিরক্ত করে মারিস। তুই আমার কত আপন, আমার মত আর জানে কে। তোর দাদারা সব অকালে মরে গেল, তুই শুধু শিবরাত্রির সলতের মত মিটমিট করছিস। তোর মা চলে গেল কিন্তু আমি তোকে প্রদীপ্ত না দেখে চোখ বুজব না। কিন্তু মানুষের ঔজ্জ্বল্য কি টাকায়? শুধু মাস-মাইনেয়?

'না, তোর চাকরি ছাড়া হবে না কিছুতেই।' হঠাৎ হুমকে উঠল ভবনাথ।

'ছাড়া হবে না কি! ছেড়ে দিয়েছি।' মুখ নিচু করল কৃষ্ণেন্দু।

'ছেড়ে দিয়েছিস?' যেন সমস্ত

শরীর ছেড়ে দিল ভবনাথ। একটা চেয়ার ধরে কোনোমতে সামলাল নিজেকে।

'ওরকম বস-এর সঙ্গে চাকরি করা যায় না। বদ, বোকা, খুলি—'

আর কারণ জেনে কী হবে! কী হবে ফিরিস্তি নিয়ে? যখন বন্দুকের থেকে গুলি একবার বেরিয়ে গিয়েছে, তখন জেনে আর কী হবে কী করে বেরুল!

তবু কৃষ্ণেন্দুর আপিসে ভবনাথ গেল খোঁজ নিতে।

কই কিছু কড়া হয়নি তো! কোনো কথা কাটাকাটিই হয়নি। আর হবেই বা কেন? কী নিয়ে?

তবে কোনো অপরাধ করেছে? দেখাইনি গাফিলতি? তহবিল তছরূপ?

তাহলে তো থানা-পুলিশ হত।

তবে কি ধর্মঘটের আওয়াজ? কোনো ইউনিয়নী কারসাজি?

তাও তো কিছু শুনিনি।

তবে?

এই দেখুন না লেটার অফ রেজিগনেশানটা। নিজের চোখেই দেখে যান। আমার এখানে পোষাচ্ছে না। উত্তমতর, উন্নততর জীবনের আশায় ছেড়ে দিচ্ছি। সঙ্কীর্ণকে ছেড়ে উন্মুক্তের সন্ধানে।

'আর কোনো কারণ নেই? চেয়ার ধরে আবার নিজেকে সামলাল ভবনাথ। তারপর অসহায় চোখে তাকাল চার দিকে: 'আচ্ছা আপনারা কেউ অনুমান করতে পারেন?'

কে একজন বললে, 'মাথা খারাপ।'

শ্মশান থেকে লোকে যেমন ফেরে তেমনি ফিরল ভবনাথ।

আশ্চর্য, চাকরি খোয়াল ছেলে, আর যত দুঃখ তার? সত্যি, তার ভাবনা কি? সে কি ছেলের তোয়াক্কা রাখে? ধার ধারে? তার বাড়ি আছে, বাড়ি ভাড়া আছে। ছেলের সে মুখাপেক্ষী নয়। তার কিসের মাথা ব্যথা?

এখন তবে কী করবি? তবু না জিগগেস করে পারল না ভবনাথ।

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'ব্যবসা করব।'

'ব্যবসা করবি?'

'হ্যাঁ, বড় লোক হব। যত বড়ই চাকরি হোক, বড় লোক হতে হলে বাণিজ্য।'

টলা পায়ে খানিক পাইচারি করল ভবনাথ। বললে, 'ব্যবসা করতে হলে তো টাকা লাগবে!'

'তা লাগবে।' সহজেই সায় দিল কৃষ্ণেন্দু।

'পাবি কোথায়?' ভীত তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ভবনাথ।

'আমার কাছে সামান্য কিছু আছে। বাকিটা তুমি দেবে।'

'আমি দেব? আমি দেব কোত্থেকে?' চিৎকারে প্রায় ফেটে পড়ল ভবনাথ।

'তোমার কাছে কি কিছুই নেই?' প্রায় ধরন মাখিয়ে জিগগেস করল কৃষ্ণেন্দু।

'তা বৎসামান্য থাকলেই বা। তা তোকে আমি দিতে যাব কেন? অস্ফুটে বুঝি একটা কটু কথাও ভবনাথের মুখে এল।

কিছু কানে তুলল না কৃষ্ণেন্দু। বললে, 'তুমি মরে গেলে ও টাকা তো আমিই পাব।'

উত্তরে, ক্ষণকালের জন্যে, ভবনাথ বোবা হয়ে গেল।

একটুকু কুয়াশা নেই, দিব্যি সরাসরি জিগগেস করল কৃষ্ণেন্দু, 'কত টাকা আছে বাবা?'

'কত আর থাকবে!' তবু সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলতে হল ভবনাথকে: 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে আর গ্র্যাচুয়িটিতে যা পেয়েছিলাম তার প্রায় সবটাই গেছে বাড়ি করতে। সামান্য একটা তলানি শুধু পড়ে আছে। বলবার মত কিছু নয়।'

'না হোক, ওটা আমাকে দাও।' দিব্যি হাত পাতল কৃষ্ণেন্দু।

'তোকে দেব?' ভবনাথ সুরে রুক্ষ বিদ্রূপ আনতে চেয়েও বুঝি পারল না আনতে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাবনা কি। নিচের তলার ভাড়া থেকেই তো সংসার চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে তোমার নিজের খরচ। তোমার ও টাকাটা মিছিমিছি তবে পচবে কেন ব্যাঙ্কে?'

'বা, আমার আপদ-বিপদের সময় কাজ দেবে।' তড়পে উঠল ভবনাথ।

'আপদ-বিপদের সময় তো আমিই আছি।' কৃষ্ণেন্দুকে অদ্ভুত শান্ত শোনাল।

ভবনাথের মনে বুঝি ভিজে হাওয়ার ছোঁয়াচ লাগল। বললে, 'বড়লোক না হলেই কি হত না? তোর বা সম্পত্তি ছিল তাতেই কি পেতাম না মা-লক্ষ্মী?'

'পেতে না, বাবা। তোমাকে ওল্ড ফুল বলত।'

হেসে উঠল ভবনাথ।

'তোমার সঙ্গে থাকতেই চাইত না। আলাদা বাড়ি করতে চাইত।'

'সে কি, আমি আর কত দিন!'

'তাই তো বলি, টাকাটা তুলে নিয়ে এস।' আবার কেমন কৃষ্ণেন্দুকে হৃদয়-হীন শোনাল: 'যা এক দিন আমার হবে তা আটকে রেখে লাভ কী? এখন হাতে পেলে কত আমার উপকার হয়। লাগতে পারি ব্যবসাতে। আর সংসারে বড়লোক হবার সিঁড়িই ব্যবসা। দেখাতে পারি আমিও উঠতে পারি সিঁড়ি বেয়ে—'

আর্ত মুখে নিজের ঘরে ফিরে গেল ভবনাথ।

তবে কি সত্যিই ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে?

নীলাকে ডাকাল ভবনাথ।

'তোর দাদার কী হয়েছে, রে, নীলা?'

'মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে?' চমকালো ভবনাথ: 'তার মানে?'

'তার মানে দাদা মদ খেতে সুরু করেছে।' ঘৃণায় নাকটা ছোট করল নীলা।

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই।'

'ঠিক নেই মানে?' ফুলসে উঠল নীলা: 'তার ঘরে গিয়ে দেখেছি বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে ঢেলে খাচ্ছে।'

'ঘরে বসে খাচ্ছে। ওটাকে খাওয়া বলে না, সিপ্ করছে।' ছেলের দোষ দেখতে চায় না ভবনাথ: 'যারা ব্যবসা করে তারা অমনি এক-আধটু সিপ্ করে।'

'ব্যবসা না হাতি। কিছু করছে না।'

'বা, অতগুলো টাকা দিয়ে সেদিন যে কি কতগুলো মেসিন-পার্টস কিনল—কোথাকার কোন ফার্মকে কি সাপ্লাই করবে বলে—'

'সব ধোঁয়া!' হাত ঘুরিয়ে ধোঁয়া দেখাল নীলা। 'সব নস্যি।' নস্যি দেখাল আঙুলে।

'সমস্ত টাকাটাই জলে গেল?' সামনেই একটা অন্ধকার গহ্বর দেখছে এমনি চোখ করল ভবনাথ।

'তাই তো বললে। বললে, আমি সর্বস্বান্ত। ইংরিজিতে বললে, 'বিদ্রূপে ঠোঁট ওল্টাল নীলা: 'আই য়াম রুইন্ড।'

'তার মানে আমার অতগুলো টাকা ও নষ্ট করল?' হায়-হায় করে উঠল ভবনাথ।

'তোমার টাকা?' নীলা কৌতূহলে কর্কশ হল: 'তোমার টাকা মানে?'

'বা, কিছু টাকা আমার ব্যাঙ্কে এখনো পড়ে ছিল না?'

আমি দেব? আমি দেব কোত্থেকে?

'ও! ছিল বুঝি? তা, সব টাকাটাই তুমি ওকে দিলে?' যেন হ্যেঁচকির ভাব করছে এমনি ভাব নীলার।

'কত কী বলল আমাকে। কত কী স্তোক দিল!' প্রায় চুল ছেঁড়ার মত অবস্থা ভবনাথের : 'বললে, ব্যবসা করে বড়লোক হবে। বড়লোক না হলে এ রাজত্বে মান নেই, স্থান নেই। তাই ভুলে গেলাম। এক বাক্যে দিয়ে দিলাম টাকাটা।'

'কিন্তু ও টাকার সবটাই তো ওর নয়।' নীলার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সহসা কঠিন হয়ে গেল।

'ওর নয়—এ আবার তুই কী বলছিস?'

'মানে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে তো মেয়েদেরও আজকাল সমান অংশ।' নীলা এগিয়ে এল এক পা : 'তাই ও টাকায় তো আমারও আট আনা।'

এত দুঃখেও হাসি পেল ভবনাথের। বললে, 'তুই নতুন আইনটার কথা বলছিস? তা আমি আগে মরি, তবে তো ওয়ারিশি পাবি।'

'ও, তাই বুঝি?' বোকা-বোকা মুখ করল নীলা।

'যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ ও টাকা তো আমারই টাকা। আমি তা দিয়ে যা খুশি করতে পারি। ইচ্ছে করলে দিতে পারি বিলিয়ে। তাতে কার কী বলবার আছে?'

'তা হলে তুমি ইচ্ছে করলে বাড়িটাও সম্পূর্ণ দাদাকে দিয়ে যেতে পার?' নীলার দুচোখে রাগ যেন ঝলসে উঠল।

একটুও ভালো লাগল না ভবনাথের। সেই একফোঁটা মেয়ে, তার মুখে এ সব কী কথা! কই এমনটি তো সে ছিল না। মোটে বছর খানেক বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে জেগেছে বিষয়বুদ্ধি?

ভবনাথ কথা বলল না।

'তা হলে পারো আমাকে বঞ্চিত করতে?'

'এত খরচ করে তোকে বিয়ে দিলাম, গয়নাগাটি জিনিসপত্র দিলাম—তোর আবার কী চাই!'

'বা, আইন যদি আমাকে অধিকার দেয় তা হলে সে অধিকার তুমি কাড়বে কেন?' প্রায় ফণা তুলল নীলা।

এই এক বছরের মধ্যে কী রকম নুয়ে গিয়েছে মেয়েটা। বিষয়ের জ্বর ধরেছে গায়ে। মাথায় শুরু হয়েছে ঘুঘুনি।

কে এমন নষ্ট করল মেয়েটাকে? বাপের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছে? আওয়াজ তুলছে? আইন দেখাচ্ছে?

ভবনাথ উত্তেজিত হল না। শান্ত-স্বরে বললে, 'যার সম্পত্তি, আইনই তাকে অধিকার দিয়েছে, যেমন খুশি সে দান বিক্রি করতে পারে। যতক্ষণ সে মালিক ততক্ষণ সব তার নিজের এক্তিয়ার। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমিই সর্বেসর্বা। মরে যাবার পর অবিশ্যি—'

নীলা কথাটা শেষ করতে দিল না। ঝামটা মেরে বললে, 'তখন যেন না দেখি যে উইল করে সর্বস্ব ঐ অপদার্থকেই দিয়ে গেছ।'

একটা যেন ছোরার ঘা খেল ভবনাথ। বললে, 'তুই তোর দাদাকে অপদার্থ বলিস?'

এতটুকু দমল না নীলা। বললে, 'অপদার্থকে অপদার্থ বলব না তো কী বলব! আসল ব্যাপারটা তো জানো না কিছু। আমি জেনেছি।'

'কী ব্যাপার?' দিশেহারার মত তাকাল ভবনাথ।

'কেন দাদার এই ছন্ন মতি। কেন দাদা চাকরি ছাড়ল। কেন মদ ধরেছে?'

নীলাটা এমনি করে বলছে, শত্রুর মত, বিপক্ষের মত। মামলার বিবাদীর মত।

'তোকে কে বলল? তুই কোত্থেকে জানলি?' তবু একবার স্থৈর্য হারাতে চাইল ভবনাথ।

'দাদাই বলেছে।'

নীলার মুখে কৃষ্ণেন্দুর নিন্দা শুনবে ভাবতেই বুকের ভিতরটা ম্লান হয়ে গেল ভবনাথের। কত ভাব ছিল দু'জনে, কত ভালোবাসা! একে অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারত। দাদা বলতে নীলা অজ্ঞান আর নীলু চাইলে কিছুই অদেয় ছিল না কৃষ্ণেন্দুর। সেই নীলা এবার গাল দেবে দাদাকে। তার তাই চুপ করে শুনবে ভবনাথ।

বিয়ে করে সমর্থ স্বামী পেয়ে কী অহংকার হয়েছে মেয়েটার।

তবু কানে যা আসে শুনে রাখা ভালো। যদি কোনো প্রতিকারের হদিস পায়।

'একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিল দাদা। ইংরেজিতে যাকে বলে ওভার হেড য়্যাণ্ড ইয়ার্স। লোকে হাবুডুবু খায়, উনি একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেন—'

ভাষাটাও কেমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছে নীলার! কেমন বর্বর! নির্বোধ!

'শেষে চাইল মেয়েটাকে বিয়ে করতে।'

'বেশ তো, করত।' প্রায় লাফিয়ে উঠল ভবনাথ : 'যে কোনো দেশের ছেলে,

যে কোনো জাতের হোক, আমি বাধা দিতাম না।'

'মেয়েটাই চাইল না বিয়ে করতে।'

'চাইল না?'

'না। মেয়েটা ঘোর বিষয়ী।'

যেন কোনো অবিষয়ী মেয়ে আছে! একটু বুঝি করুণ রেখায় হাসল ভবনাথ। বললে, 'কী বললে মেয়েটা?'

'বললে, তার পাঁচশো টাকায় পোষাবে না। অন্তত হাজার-দু হাজার চাই। ফোর ফিগার চাই। আর নিচের ঘরে ভাড়াটে, উপরে তিনখানা ঘরের মধ্যে একখানাই শ্বশুরের দখলে, আর যে শ্বশুর কিনা বুড়ো হাবড়া, সেকেলে, সে বাড়ি তার কণ্টক।'

'কেন, আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত!'

'টাকা কই?' দিব্যি আঙুল বাজাল নীলা : 'রেন্ত?'

'কী আশ্চর্য, আমাকে বললে না কেন?' মুহূর্তে আবার শান্ত হল ভবনাথ। বললে, 'তারপর কী হল?'

'মেয়েটা প্র্যাকটিক্যাল, এক দেড় হাজারী গভর্নমেন্টের অফিসারকে বিয়ে করলে। ফ্ল্যাট নিলে পার্ক স্ট্রিটে। আর উনি, কী নিষ্ঠুরের মত শোনাল নীলাকে, 'অভিমানে, বড়লোক হবার স্বপ্নে চাকরি ছেড়ে দিলেন। সোনার হরিণ ছেড়ে দিয়ে গেলেন সোনার কুমিরের সন্ধানে। নর্দমায় পড়লেন। মদের নর্দমায়।'

ছি ছি, এতটুকু কল্পনাশক্তি নেই মেয়েটার। সম্বন্ধ করে গোছগাছ করে সাজানো ঘরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই সাধ্য নেই বোঝে এই যন্ত্রণা। কল্পনাশক্তি না থাক, বাস্তব বুদ্ধিটা তো থাকবে। শ্রদ্ধা না করুক অন্তত করবে তো একটু সহানুভূতি।

'তা আমাকে বললে না কেন? ওদের এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যেতাম অন্য কোথাও!' প্রায় তন্ময়ের মত বললে ভবনাথ : 'তারপর আস্তে আস্তে ওরা ভাড়াটেদের উৎখাত করে দিত। গোটা বাড়ি নিয়ে নিত দখলে। গোটা বাড়ির মোট ভাড়া পাঁচশো টাকা কোন না হত! পাঁচশো-পাঁচশো মোট আয় সেই ফোর ফিগারই তো হত কৃষ্ণেন্দুর। আমাকে বললে না কেন? আমি দিতাম সব ব্যবস্থা করে।'

'আবার সেই কথা?' নীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

স্তব্ধ হয়ে গেল ভবনাথ।

'ষোল আনা বাড়ি সেই তবে দানছত্রকেই দিতে? কেন, আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?' চোখে জল আনবার চেষ্টা করল নীলা : 'বানের জলে ভেসে এসেছি তো আইন আমাকে আট আনা অংশ দেয় কেন?'

ভবনাথ কথাটা গায়ে মাখল না। আপন মনে বললে, 'তাছাড়া, বয়েস হয়েছে, ক'দিন আর আছি সংসারে। পড়ব আর মরব একদিন ঝপ করে। তখন তখন ওই তো, ওরাই তো—'

মুখের কথা কেড়ে নিল নীলা। বললে, 'ও রকম যাওয়াই তো আইডিয়াল। চুপচাপ চলে যাওয়া। সময় পেয়ে ভেবেচিন্তে উইল করে চলে যাওয়াটাই বিচ্ছিরি—'

'দেখি। অমিতাভকে একবার পাঠিয়ে দিস।'

অমিতাভ ঘরের বাইরেই ছিল কান পেতে।

নীলা বেরিয়ে আসতেই অমিতাভ বললে, 'এই সঙ্গে সেই কথাটাও বললে না কেন?'

'কোন কথাটা?'

'সেই যে একটা মর্টগেজ দলিল তৈরি করে তাতে বুড়োর সই নেবার জন্যে তোমার দাদা চেষ্টা করছে—'

'ও সব মর্টগেজ-ফর্টগেজ আমি বুঝি না। সে সব তুমি জামাই, তোমাকে ডেকেছেন পরামর্শে, তুমি বোলো। আমি আইনের কথাটা মোটা করে বলেছি। আইন আমার জন্যে যা ধার্য করেছে তা থেকে আমি বঞ্চিত হতে পারব না। না, কিছুতেই না।' জয়ের আনন্দে আকাশে প্রায় পাখা মেলল নীলা।

সিঁড়ির মুখেই কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা। মাতাল হয়ে টলমলে পায়ে ঘরে ঢুকছে। মুখে বোধহয় এক কলি সিনেমার গান।

'এ সব কী?' গর্জে উঠল ভবনাথ।

কৃষ্ণেন্দু পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। দেয়ালের সঙ্গে চাইল মিশে যেতে।

'বুড়ো বয়সে সইব না এ কেলেঙ্কারি। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।' ভবনাথ সর্বাঙ্গে কাঁপতে লাগল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কৃষ্ণেন্দু। বলতে লাগল, 'আমি কিন্তু আমার বুড়ো বাপকে ছাড়তে পারব না। ও যতই কেননা বলুক, ওল্ড ফুল, আমি বলেছি সেই ওল্ড ফুলই আমার আপনার লোক। যদি সংসার বলে আমার কিছু থাকে, কিছু হয়, তবে বাপকে নিয়ে, বাপকে ছেড়ে দিয়ে নয়। ও কত বলেছে বুড়োকে ছেড়ে একা বেরিয়ে এস, আমি রাজি হইনি। বলেছি, আমার ভাগ্নি সাধ তুমি আমার বাবার সেবা করো. আর যে মা-নাম সংসার থেকে উঠে গিয়েছে, বাবার মুখে তোমার উদ্দেশে আবার সেই মা-নাম শুনি।'

কিন্তু এত মদ যে খাচ্ছে, পয়সা পাচ্ছে কোত্থেকে? নগদ যা কিছু ছিল তা তো শেষ-পাই পর্যন্ত উধাও। ধার করছে? ধারই বা মিলবে কত দিন? রাহাজানি করছে? তা হলে থানা-পুলিশ বরদাস্ত করছে কেন?

অমিতাভই রহস্যোদ্ধার করে দিল।

নিচে ঘেঁষাঘেঁষি করে তিন ঘর ভাড়াটে। সস্তার-আশি করে ভাড়া। তাদের একজনের সঙ্গে দিব্যি ঘড় করেছে কৃষ্ণেন্দু। পঞ্চাশ টাকা মতন নিয়ে পুরো ভাড়ার রসিদ কাটছে। আপনার ঘরে 'ফর' দিয়ে সই করে দিচ্ছে। এক বাড়িতে থাকা ছেলে বাপের এজেন্ট নয় এ কেউ মানবে না। ঠিক উশুল দেবে আদালত।

ডেকে জিগগেস করুন ভাড়াটেকে।

ভাড়ার জন্যে তাগাদা করতেই ভাড়াটে কৃষ্ণেন্দুর দেওয়া রসিদ দেখাল। নাকা সেজে বললে, 'পুরো টাকাই নিয়েছেন আদায় করে।'

'কোনোদিন আমার ছেলেকে ভাড়া দিয়েছেন?' ধমকে উঠল ভবনাথ।

'তা আমরা কী জানি। উনি যে আপনার লোক নন তা কী করে বুঝব!'

ভবনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসল। 'কী সর্বনাশ!'

'তবু তো মোটে একজনের সঙ্গে ঘড় করেছে। আরো দু'জনকে যদি হাত করে—' বললে অমিতাভ।

'তা হলে তো না খেতে পেয়ে মারা যাব।' ভবনাথ চারদিক অন্ধকার দেখল।

'তা ছাড়া আরো একটা কুমতলব ওর আছে বলে শোনা যাচ্ছে।' অমিতাভ যোগ করল।

হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল ভবনাথ।

'বাড়িটা মর্টগেজ দেবার তালে আছে। একটা স্ট্যাম্প কাগজে দলিল চাঁদের হুরে বেড়াচ্ছে কোনো কায়দায় আপনার সই নেবে বলে।'

'কী ভয়ঙ্কর কথা! এ যে দেখি দিনে ডাকাতি!'

তবু সাহস করে কৃষ্ণেন্দুকে ডাকাল ভবনাথ। দিনের বেলায় যখন সে সাদা চোখে। আর আশ্চর্য, দুটো অভিযোগই সে স্বীকার করলে। যখন হাতে পয়সা-কড়ি নেই তখন এক-আধটা ভাড়াটে থেকে এক-আধ মাসের ভাড়া আদায় না করে উপায় কী! আর যখন সে ব্যবসাই

করবে তখন বাড়ির মর্টগেজ ছাড়া ক্যাপিটাল পাবার আশা কোথায়! প্রথম বারের ব্যবসাটা তছনছ হয়ে গিয়েছে, এবার আর শৈথিল্য হবে না, অভিজ্ঞতাই বনেদের কাজ করবে। আর, সুদিনের মুখ দেখতে এবার আর দেরি করতে হবে না, বছর খানেকের মধ্যেই বাড়িটা খালাস হতে পারবে।

'তোর ব্যবসার জন্যে তুই আমার বাড়ি মর্টগেজ দিবি?' প্রায় লাঠি ও'চাল ভবনাথ।

'আহা, আমি দেব কেন? তুমিই দেবে। আমার জন্যে দেবে। যেহেতু এ বাড়ি আমার হবে।'

'একলা তোর হবে? কেন, নীলার অংশ নেই?'

'তা নীলাকে তুমি তা দেবে কেন? তুমি উইল করে আমাকে ষোল আনা দিয়ে দেবে। বিয়ের পর মেয়ে তো পর, শত্রু, বিদেশী,—তাকে কি কেউ দেয়?'

'তোমাকে দেব, আর তুমি তা উড়িয়ে পুড়িয়ে মর্টগেজ-সেল করিয়ে শেষ করে দেবে!' হুঙ্কার ছাড়ল ভবনাথ: 'বেরো আমার বাড়ি থেকে, কে শত্রু আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না।'

'আমার জিনিস রাখলেও আমিই রাখব, পোড়ালেও আমিই পোড়াব।' অবাক হবার ভাণ করল কৃষ্ণেন্দু: 'তাতে কার কী মাথাব্যথা? আর তখন তুমি কোথায়? মানুষই থাকে না, তা তার বাড়ি-ঘর!'

ভবনাথ আর কোনো বাক্যব্যয় করল না, ডান হাতের তর্জনী দরজার দিকে তাক্ করে রাখল।

অনেক রাতে মাতাল হয়ে তবু বাড়িতেই ফিরতে এসেছিল কৃষ্ণেন্দু, ভবনাথ নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে দিল।

'এই ভালো হল,' অমিতাভ বললে 'ঈশ্বর যদি শোধরায়! ঘা না খেলে মানুষ ফেরে না।'

তারপরেই ভবনাথ পড়ল।

কিন্তু এক জোপে গেল না। কুচি কুচি হতে লাগল।

অমিতাভ স্ত্রীকে বললে, 'এবার বাপের সেবা করো। বাবার বাড়িতে গিয়েই থাকো।'

'তা আর বলতে।' নীলা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশ হাতে সেবা করতে লাগল।

ভবনাথ বললে, 'আমাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দে। তোর সেবায় আমাকে কেন চাইছিস মারতে বাঁধতে। যেতে দে তাড়াতাড়ি।'

সে কি আর শোনবার? অমিতাভ চিকিৎসার বিস্তৃত ব্যবস্থা করে। আর রাত নেই দিন নেই, শিয়রে বা পদতলে বসে আছে নীলা, মূর্তিমতী শুশ্রূষা।

'উইল কিছু করেছ বাবা?'

'না, মা।'

'তবে?'

'তুই-ই তো বলেছিলি, চুপচাপ চলে যাওয়া। তাই যাব। কোনো কিছু লেখা-পড়া করব না। যা হবার তাই হবে।'

এ কি আর এখন বলা চলে? এত পরিচর্যা, এত অর্থব্যয়ের পর? তাছাড়া, চুপচাপ গেলে, ফলটা কী দাঁড়াবে? দাদা আট আনা নীলা আট আনা পাবে। একত্র থাকা তো অসম্ভব, দুজনের দুই সংসার। তা ছাড়াই ঐ মাতাল দুশ্চরিত্রের সঙ্গে একত্রবাসও অসঙ্গত। সর্বক্ষণই গোলমাল আর বিসম্বাদের ভয়। আরো কথা, ঐ ছন্নমতি তার অংশকে নিটুট রাখবে নাকি? মদের পিপাসায় গিলে খাবে, বিক্রি করে দেবে। আর সেই নিষ্ঠুর ক্রেতা ভাগ-বাঁটোয়ারা চাইবে, তার মানে নীলাকেই ভোগ করতে দেবে না, সর্বাংশে গ্রাস করবে। বাবার ছেলে-মেয়ে কেউ এ বাড়িতে থাকতে পাবে না। আর মায়ের নামে যে বাড়ির নাম ছিল, 'সুধা সৌধ' তাই হয়ে দাঁড়াবে বাগবাজিয়া কি চামরিয়া হাউস।

কিংবা বাড়িটার হয়তো অস্তিত্বই থাকবে না। এটুকু যোগ করল অমিতাভ। ভেঙে ফেলে নতুন প্যাটার্নে তৈরি হবে।

তা ছাড়া দুশ্চরিত্র ছেলেকে বাপ ত্যাজ্য করে এ আর নতুন কী! সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যেই ত্যাজ্য করে।

'ওর কোনো খবর পাস?' ক্ষীণস্বরে জিগগেস করে ভবনাথ।

'কোনো খবর নেই বাবা।' আদর ঢেলে দরদ ঢেলে বলে নীলা। 'উনি কত খোঁজাখুঁজি করছেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তবু পাত্তা নেই।'

ক্ষীয়মান সমস্ত শক্তিকে যেন স্ফূর্তির বিন্দুতে সংহত করে ভবনাথ। এই বুঝি কোনো শব্দ শুনতে পাবে। রাত্রে থামা-থামা কড়া নাড়ার শব্দ, সিঁড়িতে ঢলঢলে শিথিল পায়ের শব্দ কিংবা সেই সিনেমার এক কলি উদ্ধত গান।

এ ভাবে রাখাটা ঠিক হবে না। সত্য কথাই সেদিন তাই বললে অমিতাভ।

'কৃষ্ণেন্দুর দেখা পেলাম।'

চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল ভবনাথ।

'ঘোড়ারোগান বস্তিতে আছে।' একটু বা বাঙ্গ মেশাতে চাইল অমিতাভ: 'জন-গণের কাজ করছে।'

ঘোলাটে চোখ চাইল বুঝি উজ্জ্বল হতে।

'বললাম আপনার অবস্থার কথা। কত আসতে বললাম। বললে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে বাড়িতে আমি যাই না।'

'শেষ দেখা দেখে যাবার কথা কত বললেন উনি।' নীলা খোদকারি করল: 'উত্তরে বললে যেখানে সব শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে আবার শেষ কী!'

বিকৃত ভঙ্গিতে ঠোঁট নড়ে উঠল ভবনাথের। গালাগাল দিলে। পাজি, পাজির পা-ঝাড়া—

ভবনাথের চেয়ে নীলা বেশি অস্থির। আর নীলার চেয়েও বেশি অস্থির অমিতাভ।

'তোকেই সব দিয়ে যাব নীলু।'

কিন্তু মুখে বললে তো হবে না। দলিল চাই।

'মুখে বললে শুধু আট আনা হবে।' বললে নীলা।

'মুখে না বললেও আট আনা হবে।' ব্যাখ্যা জুড়ল অমিতাভ।

সুতরাং দলিল চাই। আর দলিল মানে উইল নয়। কেননা এক বেলার উইল আরেক বেলায় বাতিল হতে পারে। তাই পাকা একটি দানপত্র দরকার। নির্বুঢ় হস্তান্তর।

ছেলে চরিত্রহীন, উদ্ধত, উন্মার্গ। আর মেয়েটিই বশংবদা, সেবাপরায়ণা। বাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হবে মেয়েকে দান করবার। এ দানে যোগসাজসের কিছু নেই। খুবই ন্যায্য, খুবই বৈধ।

'আর উইল করলেই বা কী। বদলাবার সময় কোথায়? শোক-শোক মুখ করল নীলা: 'ডাক্তার বলেছে আর বড় জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

অক্সিজেন চলেছে।

'একটা ষ্ট্যাম্প-কাগজে চাপানো দান-পত্রের দলিল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে অমিতাভ।

নাকের নলটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলতে চাইল ভবনাথ। চাইল পাশ ফিরতে। বললে, 'আমাকে শান্তিতে যেতে দে।'

শান্তিতে যেতে হলে দলিলটা যে সই করে দিতে হয়।

'সেই যে বলছিলে বাবা, ষোল আনাই আমাকে দেবে।' মমতার কপালে গালে হাত বুলোল নীলা: 'তা হলে

উপলক্ষ্য যা-ই হোক না কেন উৎসবে যোগ দিতে গেলে চাই প্রসাধন। আর প্রসাধনের প্রথম এবং শেষ কথাও হচ্ছে কেশবিন্যাস। ঘন, সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সযত্ন পারিপাট্যে উজ্জ্বল, আপনার লাবণ্যের, আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। কেশলাবণ্য বর্দ্ধনে সহায়ক লক্ষ্মীবিলাস শতাব্দির অভিজ্ঞতা আর ঐতিহ্য নিয়ে আপনারই সেবায় নিয়োজিত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

গুণসম্পন্ন, বিশুদ্ধ, শতাব্দির ঐতিহ্য-পুষ্ট

এম, এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ • লক্ষ্মীবিলাস হাউস, • কলিকাতা-৯

কল্পতরু

মনোজ বসু

বাস্‌ মল্লিক গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম। সে নামের উল্লেখ নিষেধ। ইদানীং পরিব্রাজক শ্রীমৎ বাসবানন্দ স্বামী। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি পায়ের নিচে। কাগজে খবর বেরোয়, পরিব্রাজক মহারাজ আজ অমুক জায়গায়, কাল তমুক জায়গায়। ভক্তদল মুকিয়ে থাকেন, কলকাতা শহরে আবার কবে পদরজ পড়বে। এবং কোন ভক্তগৃহ ধন্য করবেন এবারে।

যে পাড়ায় যার বাড়িতে পরিব্রাজক মহারাজের আস্তানা—আগেভাগে থানায় এত্তেলা দিতে হয়। মেলা জমে। ট্রাফিক পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায় মোটর চলাচলের বিধিব্যবস্থায়। বন্যা-স্রোতের মতো মানুষের স্রোত সেই মুখো। রাত থাকতে শুরু করে সন্ধ্যা অবধি। সন্ধ্যার পরে মহারাজ ধ্যানঘরে আশ্রয় নেন, তখন আর কেউ থাকতে পায় না। ফুলের দাম চড়ে গিয়ে দুনো তেদুনো হয় সেই অঞ্চলে। দু-গাছি করে মালা নিয়ে আসেন ভক্তেরা, মহারাজকে পরিয়ে দেন। মহারাজ তার মধ্যে একটি খুলে ভক্তের গলায় পরান। আশীর্বাদি মালা। ভববন্ধন মোচনের উপদেশ দেন মহারাজ। দুই কানে সেই উপদেশামৃত পানের জন্য ভক্তেরা দূর-দূরান্তর থেকে ছোটে। কী মধুর কণ্ঠস্বর, সানাই কোথায় লাগে! গীতা ও ভাগবত পাঠ হয়, শৌরি মিঞার গান তার কাছে নস্যি।

কিছুকাল থেকে পরিব্রাজক মহারাজ বরানগরে বেচু শিকদারের বাড়ি এসে উঠছেন। বেচু ইদানীং প্রধান শিষ্য। ছায়ার মতো সাথে সঙ্গে ঘোরে। উপদেশামৃত বর্ষণের মুখটায় বেচু ঝকমকে রুপোর থালা পেতে দেয় মহারাজের সামনে। মুষলধারে নোট পড়তে থাকে। মোহর পড়ে, হীরার আংটি পড়ে, মরচেন পড়ে, কাঁচা টাকাও পড়ে কিছু কিছু। এ ছাড়া বিদঘুটে মানত থাকে কারও কারও—সোনার কেয়ুর-কঙ্কন দিলেন এবারে একজনা। এক বিধবা দিলেন সোনার কাজ-করা লপেটা জুতা। মহারাজের সামনে এনে নিবেদন করেন, যদি তিনি একটুখানি স্পর্শ দেন। কী বিদঘুটে আশা বিবেচনা করুন—ঐহিক বস্তুতে আশা ঠেকাবেন মহারাজ। ভক্তেরা অগত্যা বলে, জিনিষগুলো আসনের উপর রেখে দাও বেচু, আলটপকা নজর যাতে পড়ে।

মহারাজ বিষম বেজার ভক্তদের ব্যাপারে। মাঝে মাঝে ক্ষেপে যান : এ সমস্ত কি! ঠাকুরের নাম করতে বসি, চোখের উপর তোমরা ছাই-মাটির পাহাড় করে রাখ। এমন অত্যাচার করলে হিমালয়ের গুহায় ডুব দেব। কোনদিন আর দেখতে পাবে না।

বেচু শিকদার পাকা লোক। মহারাজকে কী করে সামলাতে হয় সে জানে! সমান তেজে বেচুও বলে, ছাই বলুন মাটি বলুন, এক কাচ্চাও তো ঘরে থাকে না। সূর্য হয়ে যদি টেনে নিলেন, বৃষ্টির জলে সমস্ত ঢেলে দিয়ে অবসর। কতই তো দিয়েছে এযাবৎ ভক্তজনে, একখানা আস্ত সিকি বের করুন দিকি তাকিয়া থেকে। তবে বুঝব।

মুখের মতন জবাব পেয়ে মহারাজের আর রাগ দেখানোর উপায় থাকে না। হেসে ফেললেন : কথাই তো তাই। কিছুই যখন থাকে না, ভূতের বোঝা কেন এমন বাঁধাছাঁদা কর? খেটেখুটে কার জন্য লিস্টি করছ?

কানে কথা না নিয়ে বেচু অবিচলভাবে কাঁচা টাকা গুণে গুণে থাক দিচ্ছে। আংটি ও মোহর কতগুলো পড়ল, লিস্টি করে যাচ্ছে।

কথা শোন বেচারাম। ভক্তদের মানা করে দাও। খালি হাতে যেন সকলে আমার কাছে আসে।

বেচু মুখ তুলে প্রশ্ন করে, সকলে ফকড়হবে হবেন তখনকার উপায় কি? জন্য-লোকে থাকেন তো আপনি, কিছু ঠাহর পান না। আমাদেরই ভাবতে হয়। ভক্তাদী লোক কাঙর হয়ে এসে হাত পাতবে, কী দেবেন তাদের হাতে?

জবাব দেবার কিছু নেই। বেকুব হয়ে মহারাজ মৃদু মৃদু হাসেন।

জো পেয়ে গিন্নি বেচু শিকদার ফলাও করে বলে, ধনীরা ভক্তিভরে দিয়ে যান, দরিদ্র লাভবান হয়। আপনি নিমিত্ত হয়ে করেন, আমরা মাঝে পড়ে একটু খেটেখুটে দিই। হেন অবস্থায় কেমন করে আপনার আপত্তি মানতে পারি, বলুন।

বাসবানন্দ বলেন, বিচার করে দেখলে তাই বটে। কিন্তু কী জান, ঐশ্বর্যের ছায়ামাত্র দেখলে মন আমার কুঁকড়ে আসে। অস্বস্তি জাগে। ভাই বন্ধু সেখানে যুক্তি-বিবেচনার ঠাঁই নেই। কথা দাও তবে, যত কিছু জমা হয় ছুঁড়ে দিতেন।

কথা দিল বেচারাম শিকদারকে সেই কঠিন শপথ নিতে হয়েছে। ভক্তেরা যা নিয়ে আসছে, কাল তার তিলেকমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। সমস্ত ফকড়হবুতে চলে যাবে।

এতক্ষণের বাগবিতণ্ডায় মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহারাজ ধ্যানঘরে ঢুকে বসলেন।

মহারাজ যা-ই বলুন, ভক্তকুল বড় প্রসন্ন বেচুর উপর : তুমি আজ বেচারাম, ফকড়হবুর সমস্তটা সমস্ত হাতের কাছে ধরে দেবে তুমি। পাইপয়সার কসুর যেন থাকবে না। তুমি যদি দাঁড়ির নাও, সেই বিশ্বাসে যা-হোক করে সামলে নেব।

পরহিতের জন্য বেচারাম শিকদারকে সেই কঠিন শপথ নিতে হয়েছে। ভক্তেরা যা নিয়ে আসছে, কাল তার তিলেকমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। সমস্ত ফকড়হবুতে চলে যাবে।

এতক্ষণের বাগবিতণ্ডায় মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহারাজ ধ্যানঘরে ঢুকে বসলেন।

মহারাজ যা-ই বলুন, ভক্তকুল বড় প্রসন্ন বেচুর উপর : তুমি আজ বেচারাম, ফকড়হবুর সমস্তটা সমস্ত হাতের কাছে ধরে দেবে তুমি। পাইপয়সার কসুর যেন থাকবে না। তুমি যদি দাঁড়ির নাও, সেই বিশ্বাসে যা-হোক করে সামলে নেব।

বেচারাম বলে, দিবে হিমালয়ে পালাতেন। হিমালয়-হিমালয় করে বড্ড ঝুঁকেছেন। আমি ঠেকিয়ে আসছি। নরলোকের কল্যাণে ওঁকে ধরে রাখতেই হবে। এত যে প্রণামী দেখছ, কাল সকালে কিছুই নেই—কল্পতরু হয়ে দানসত্র করে দিয়ে ফোকডায়াম।

কল্পতরুর ব্যাপারটা সবিশেষ জানবার জন্য ভক্তরা বেচারামকে চেপে ধরে : কী রকম অবস্থা হয় তখন? কি করেন?

লক্ষণাদির যথাযথ বর্ণনা দিল বেচারাম। বলে, সেই অবস্থায় যে যা চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। এতকাল ধরে এত যে পুণ্যফল জমিয়েছেন, জোর করে চাইলে তা-ও বোধ হয় দিয়ে দেবেন।

আমাদের রাতুলকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভক্তদলের মধ্যে ঢুকে বসেছে। সে জিজ্ঞাসা করে, এইসব আংটি-মোহর যদি চেয়ে বসে, দিয়ে দেবেন?

তা-ই তো চায় যত ঐহিক মানুষ। আসল বস্তু চাইতে তো দেখলাম না কাউকে। প্রণামীর থালাখানা সেই সময় সামনে নিয়ে ধরি। যে যা চায়, মহারাজ নশার ঘোরে হরিণ লুঠের মতো হুঁড়ে ছুঁড়ে দেন।

রাতুলও সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে : যাক গে ছাইভস্ম জিনিষ। আসলের কপর্দক যাচ্ছে না—তা হলেই হল।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, সমস্ত দিয়েথুয়ে দেন, একেবারে কিছু রাখেন না?

সগর্বে বেচু শিকদার বলে, সমস্ত। নতুন আবার না পড়লে তো খোদ মহারাজকেই নিরন্ন উপোসি থাকতে হবে। হর্ষবর্ধনের সেই দান-যজ্ঞের মতো। একদিন কী হল—থালার উপরে প্রণামী পড়ে, সেই থালা অবধি দান করতে যাচ্ছেন। আন্দাজ পেয়ে আমিই প্রতিগ্রাহী হয়ে থালাখানা ভিক্ষে নিলাম। আমার জিনিষ এখন, ওঁর দানের এক্তিয়ার নেই।

রাতুলকৃষ্ণ হা-রিপ করে : খুব কায়দা করে আটকেছেন কিন্তু জিনিষটা। সত্যিই তো, ভক্তজনের প্রণামী পড়বে, জায়গা একটা চাই তার জন্যে। থালা না থাকলে কিসের উপর সবাই দেবে?

পরবর্তীকালে মহারাজের কল্পতরু হয়ে বসার কথা মুখে মুখে অনেক দূরে অবধি রটনা। নানা স্থানে এসে বেচুকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কোন সময়টা হয় বলুন দিকি?

বেচারাম ঊচাপোয় হাসি হেসে বলে, পাঁজিপুঁথি দেখে তিথিনক্ষত্র ধরে হয় না তো! স্বেদ-কম্পন ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সহ দশাপ্রাপ্ত হন হঠাৎ।, চেহারা দেখতে দেখতে ভিন্ন রকম হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, এইবার—

রাতুল পরমোৎসাহে বলে, বটে, বটে! রোজই একবার করে হয় অন্তত।

তার কোন মানে নেই। একদিনে হয়তো দু-বার—তিনবার। আবার কোনদিন হলই না।

মুশকিল তো!

বলে রাতুল তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, ধুলোমাটি জিনিষের আমি কোন পরোয়া করিনে। মহারাজের সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা একটিবার শুধু চোখে দেখবার বাঞ্ছা।

রাতুলকৃষ্ণ যে ইস্কুলে পড়েছে, বনমালী ভট্টাচার্য সেখানে সেকেণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। রিটায়ার করার পর বড় অর্থসংকটে আছেন। তার উপরে কন্যাদায়। বিয়ে ঠিকঠাক, কিন্তু খরচার জোগাড় হচ্ছে না। একদিন এসে রাতুলকে ধরলেন : তুমি একটা উপায় কর বাবা। কি করি, বলে দাও।

রাতুল বলে, আজে-বাজে জায়গায় ঘুরে কী হবে! বাসবানন্দকে গিয়ে ধরুন—কল্পতরুর সময়টা। শুনেছি, যে যা চায় পেয়ে যায়। দশ-পাঁচেক টাকাও যদি অন্তত বাগাতে পারেন—

পণ্ডিত বলেন, আমিও সেই রকম শুনেছি। চেষ্টা তো করেছি, কিন্তু সময়টা ধরতে পারছি নে। কত ভক্তজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সকলের এক গতিক। একজনে বললেন, তাঁর ফসকে গেছে অতি অল্পের জন্যে। টাটকা দশা ছেড়েছে মহারাজের—তখনও রেশ আছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। আবোল-তাবোল বকছেন, স্বাভাবিক জ্ঞান আসেনি। বেচারাম ধরে তাঁকে ধ্যানঘরে পুরে ফেলল।

বলেন, আমি হন্দ চেষ্টা করেছি বাবা। বেচারামের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রাত থাকতে গিয়ে বসেছি। দুপুর গড়িয়ে যায়। বেচা বলে, দেরি আছে পণ্ডিত মশায়। অভুক্ত আছেন আপনি, খেয়েদেয়ে আসুনগে। নাকে-মুখে গুঁজে পৌনে দুটোর মধ্যে ছুটেছি। বেচা বলে, এই যাঃ, একটু দেরি হয়ে গেল!

ইতস্তত করে পণ্ডিত মশায় বলেন, মহাপুরুষের ব্যাপার—বলতে নেই—কিন্তু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা আজ অবধি একজনকেও পেলাম না। পাপমনে এক-এক সময় সন্দেহ জাগে—

রাতুল হেসে ঘাড়-নাড়ে। সন্দেহের কিছু নেই। পারমার্থিক তত্ত্ব মহারাজ ঢালাও দান করে যান। কিন্তু ঐহিক বস্তু সে রকম নয়, একবারের বেশি দু-বার কাউকে দেন না। আর ঐ একবার যে পেয়ে গেল, ঈশ্বর-লাভের জন্য সে আর ঘোরাঘুরি করে না। একেবারে হাওয়া।

বনমালী পণ্ডিত রাতুলের হাত জড়িয়ে ধরলেন : তুমি ভক্তমানুষ। সর্বদা যাতায়াত তোমার ওখানে। এই কাজটা আমায় করে দাও, বড্ড ঠেকে গেছি। যা তুমি বললে—খান পাঁচেক একশ' টাকার নোট অন্তত।

রাতুল একটু ভেবে বলে, দেখা যাক কতদূর কী করা যায়। সময় ঠিক বের করে ফেলব। আপনি এখন আসুনগে পণ্ডিত মশায়।

দিন দুই কেটেছে। মিথ্যা ভরসা দেয় না রাতুল। বেচুর কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না—বেচুর বাড়িতেও নয়, এদিক-সেদিক খুব ঘোরাঘুরি করেছে, সুলুকসন্ধান নিয়েছে। দুইদিন পরে, রাত্রি নটার সময় সে ট্যাক্সি নিয়ে বনমালীর বাড়ি চলে এল : উঠে পড়ুন পণ্ডিত মশায়। এক্ষুনি।

বনমালী ভট্টাচার্য রাত্রে যৎসামান্য ছানা-চিনির ফলার করেন। সবে কেবল আচমন করে বসেছেন। রাতুল বলে, খেতে গেলে ফসকে যাবে। উঠে আসুন শিগগির। ট্যাক্সিতে উঠুন।

ট্যাক্সিতে উঠে বনমালী জিজ্ঞাসা করেন, কল্পতরু লেগে গেল বুঝি?

হুঁ—। বলে রাতুল ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়া দিচ্ছে : জোরে—খুব জোরে। এক টাকা বেশি ধরে দেব।

পণ্ডিতকে একবার বলল, বৃদ্ধ মানুষ আপনি। মহারাজের চেয়ে বয়সে বড়। তায় ব্রাহ্মণ। পা ধরতে যাবেন না, হাত জড়িয়ে ধরবেন আমি যখন ইসারা করব। পা ধরলে মহারাজ চটে যাবেন, কিছুই হবে না।

বেচারামের বাড়ির অদূরে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে টিপিটিপি দু-জনে বৈঠকখানার বড় আলমারির আড়াল হয়ে দাঁড়াল। একটি ভক্ত আর এখন নেই। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সকলের কাজকর্ম মিটিয়ে সন্ধ্যাকালে একটু ভ্রমণে বেরোন। আর একবার গঙ্গাস্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে ফেরেন। ফিরে এসে নিঃশব্দে ধ্যানঘরে ঢুকে পড়েন। আজকে এখনো

প্রত্যাগমন হয়নি, সে খোঁজ রাতুল নিয়ে এসেছে।

আহারে ভণ্ডুল ঘটেছে বনমালীর সেজন্য কিছু ক্ষোভ আছে। বললেন,

"এই যাঃ একদম ভো হয়ে গেল।"

কল্পতরু শুরু হয়েছে বলে ছুটোছুটি করে নিয়ে এলে। মহারাজেরই তো খবর নেই।

রাতুল বলে, এসে পড়বেন এক্ষুনি, সময় হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নামবেন একেবারে কল্পতরু অবস্থায়। কিন্তু ঐ যা বললাম—পা ধরবেন না কদাচ। অনেকে পা ধরে পড়ে বলে মহারাজ বিরক্ত হন। হাত ধরে ফেলবেন আপনি। বেচু শিকদার হুমকি দিতে পারে। কানে নেবেন না।

বলতে বলতেই মোটরগাড়ি এসে থামল। বেচারামের টু-সীটার গাড়ি—চালাচ্ছে বেচারাম নিজেই। মহারাজ নেমে পড়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। বনমালী চক্ষের পলকে ধ্যান-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। রাতুল তাঁর পাশে।

বাইরে থেকেই বেচু হুঙ্কার দিয়ে ওঠে : অ্যাঁ, কী চাই তোমাদের? সারাদিন ধরে এই কাণ্ড চলেছে! স্বামিজী নিজের কাজে বসবেন একটু, ধ্যানঘরে যাবেন। সেই ফাঁকটুকুও দেবে না?

ছুটে ঘরের মধ্যে এসে বলে, বেরিয়ে যান। দরকার থাকে, কাল সকালবেলা আসবেন।

হতমত খেয়ে বনমালী পণ্ডিত রাতুলের দিকে তাকান। রাতুল অবিরত ইশারা করছে। "ভেক্ষণ সমাগত। এক্ষুনি—এই মুহূর্তে হাত ধরতে হবে।

আগের শেখানো কথাগুলো বনমালী আবৃত্তি করে যান : আমি যাব না মহারাজ। মেরে ফেললেও নড়ব না।

হাত উঁচিয়ে বনমালী ভট্টাচার্য সত্যি সত্যি এগিয়ে আসেন।

বাসবানন্দ ত্বরিত বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেন, কত চাই জিজ্ঞাসা কর বেচারাম। টাকার অঙ্কে বলুন।

বনমালী শেখানো কথা বললেন, পাঁচ-শ টাকা—

দিয়ে দাও বেচারাম। আমি বলছি, শিগগির নিয়ে এস।

বনমালী আবার বলেন, আর আংটি একটা বরের জন্য।

কল্পতরু অবস্থা চলছে বাসবানন্দের। বললেন, ভাল দেখে একটি আংটিও নিয়ে এস বেচারাম।

মহারাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন তেমনি। এঁরাও ধ্যান-ঘরের দরজায়। বেচারাম ভিতর থেকে টাকা এনে গুণে গুণে পাঁচশ' মিলিয়ে দিল। তারপর ঠকাস করে আংটিটা টেবিলের উপর ঠুকে বলে, হল তো! বিদেয় হন।

আশীর্বাদ নিয়ে ভক্তদ্বয় দরজা ভেজিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দাঁত দাঁত ঘষে বেচারাম বলে, আপদ!

মহারাজ বলেন, পা ধরলে ক্ষতি ছিল না। হাত ধরবার বায়নাক্কা মাথায় কে ঢুকিয়ে দিল রে! ইল্লুর চাইলেও তো না দিয়ে উপায় ছিল না। দুয়েক এঁটে দাও বেচু, আবার এসে কেউ না জ্বালায়।

বেচারাম দরজায় খিল দিল, হুড়কো তুলে দিল। মহারাজের হাতে বিদেয়

দু-গাছি করে মালা নিয়ে আসেন ভক্তেরা...

মেয়ের বিয়ে আসন্ন। আপনাকে হাত ধরে বলছি—

বেচু শিকদার চিৎকার করে ওঠে : স্বামিজীর হাত ধরবে, এত বড় আস্পর্ধা! রামকৃপাল সিং—

কারবারি—এক বোতল হুইস্কি। পশমি শালবাসের নিচে ঢাকা। গুরু আর প্রধান শিষ্য অতঃপর ধ্যানঘরে প্রবেশ করলেন।

দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

ইস্কন

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কনস্ট্রাক্শন্ কোং লিঃ

মার্টিন বার্ণ লিঃ বি হুকেনজার্স লিঃ ব্রেথ ওয়েট এনজিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ ডেভি ম্যাকীস্ আয়রন কোম্পানি লিঃ ডেভি এবং নিউটন এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড বি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ আমোলিয়েটেড ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ব্রিটেন) লিঃ বি ব্রিটিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ বি ভেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানি লিমিটেড আমোলিয়েটেড ইলেকট্রিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ (ওভারসীজ) লিঃ ক্লার ইউনিভার্সাল এয়ার ব্রেক কোম্পানি লিঃ ইউনিভার্সাল ড্রিল আণ্ড এক্সক্যাভেটর কোম্পানি লিঃ এয়ারো এন্ড ড্রিল আণ্ড এক্সক্যাভেটর লিঃ জোসেফ পার্কস্ আণ্ড সন্স লিঃ ইস্কন হেডস্ গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

রাম ঠাকুর

বনফুল

মণিহারীঘাটের প্রায় ক্রোশখানেক পশ্চিমে খেয়াঘাট। মণিহারীঘাট হইতে যে জাহাজ ছাড়ে তাহা একেবারে সাকৃ-গলিঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের সাকৃগলি যাওয়া দরকার, কিম্বা সাকৃ-গলিতে ট্রেণ ধরিয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন তাহারাই সাধারণত জাহাজে যান। সাকৃগলিতে ঘাট-ট্রেণ ধরিয়া সাহেবগঞ্জ জংশনে যাওয়া যায় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র। জাহাজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মণিহারীতে একটি খেয়াঘাট আছে গ্রামবাসীদের দৈনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। এ পারের অনেকের জমি গঙ্গার ঠিক ওপারে আছে, তাহারা প্রত্যহ সেখানে কাজ করিতে যায়। গ্রীষ্মকালে আবার চর পড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া সোজা-পথে সাহেবগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হয় বাজার করিবার জন্য। ইহাতে তাহা-দের ভাড়া কম লাগে, সময়েরও সংক্ষেপ হয়। ভোরে বাহির হইলে সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারে। মালপত্র বহিয়া আনিবার জন্য অনেকে সঙ্গে ঘোড়াও লইয়া যায়। সুতরাং জাহাজে যাওয়া অপেক্ষা নৌকায় যাওয়াই অনেকের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। খেয়াঘাটের এপারেও বালির চর, ওপারেও তাই। বালির চরের উপরই পায়ে-হাঁটা পথ হইয়া গিয়াছে একটা। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন সে পথ লুপ্ত হইয়া যায়, নূতন পথ সৃষ্ট হয় আবার।

ওপারে খেয়াঘাটে এই পথের ধারেই রাম ঠাকুরের দোকান। তাহার গলায় এক-গাছা ময়লা পৈতা আছে, সুতরাং মনে হয় সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয়ও দেয় সে। কিন্তু সে বাঙ্গালী, কি বিহারী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দুইটি ভাষাই অনর্গল বলিতে পারে। যখন বাংলা বলে তখন তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন 'চেট' হিন্দীতে, বা 'ছেকাছেনি' ভাষায় সে কথা কহিয়া ওঠে তখন তাহাকে বিহারী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা শক্ত। রাম ঠাকুরের ঠিক পরিচয় কেহ জানে না, কাহাকেও নিজের কথা সে বলে নাই, বলিতে চায়ও না। তাহার একমাত্র পরিচয়, সে 'রাম ঠাকুর'। গঙ্গার এই ধু-ধু চরে নিজের ছোট দোকান ঘরটিতে সে একা বাস করে। বাহিরের জগতের সহিত তাহার দুইবার মাত্র দেখা হয়। যখন খেয়া পারাপার করে তখন। অনেক যাত্রী তাহার দোকানে তখন যায়। রাম ঠাকুরের দোকানটি খাবারেরই দোকান। সাধারণ খাবারই রাখে সে। চিঁড়া, মুড়ি, রাম-দানার লাড়ু, ছাতু, গুড়, নুন লঙ্কা। গুড়ে ঈষৎ বৈচিত্র্য আছে, ঝোলা গুড় আর ঢেলা গুড়।

দইও মাঝে মাঝে রাখে। দিয়রা হইতে লছমনিয়া গোয়ালিনী মাঝে মাঝে আসিয়া দই দিয়া যায়। ক্রোশ দুই দূরে চরের মধ্যে তাহাদের বাথান আছে। প্রায় শত-খানেক মহিষ আছে সেখানে। লছমনিয়ার বাবা শিউগোবিন গোয়ালা সেই বাথানের মালিক। সেখানে যে দই হয় তাহার অধিকাংশই চলিয়া যায় সাহেবগঞ্জের বাজারে। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত হইলে লছমনিয়া তাহা রাম ঠাকুরকে দিয়া যায়। নগদ দাম চায় না, বলে, 'বেচি কে দিহ'—অর্থাৎ বেচে দাম দিও। লছমনিয়া আসে হঠাৎ এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো। কবে আসিবে কিছুই ঠিক থাকে না, হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়ে। বড় ভালো লাগে রাম ঠাকুরের। যেদিন সে আসে রাম ঠাকুর অনেক আগে বুঝিতে পারে।

দূর চরের দিগন্তে তাহার লাল শাড়ি পরা মূর্তিটি দেখা যায়। আরও কাছে যখন আসে তখন দেখা যায় মাথায় ঝুড়িটি। ঝুড়িতে শুধু দুধের কেঁড়ে এবং দইয়ের মালসাই থাকে না, তাহার কাপড়-জামাও থাকে। তেলও থাকে এক শিশি, নারিয়েল তেল, নারিকেলের তেল। বাম হাতে মাথার ঝুড়িটি ধরিয়া ডান হাত দুলাইতে দুলাইতে আসে। আর একটু কাছে আসিলে তাহার হাতের মেচিয়া'ও (বল্লা) দেখা যায়। আসল সুপারি, রোদ লাগিয়া চকচক করে। মেচিয়ার ইতিহাস রাম ঠাকুর শুনিয়াছে। তাহার স্বামী বিক্রম তাহাকে লুকাইয়া কিনিয়া দিয়াছিল নগদ পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন লুকানো থাকে নাই, থাকা সম্ভবও নয়,—ইহা লইয়া তাহার শাশের (শ্বাশুড়ী) কি রাগ, ভৈসুরের (ভাসুরের) কি বকাবকি। লছমনিয়ার শুধু 'মেচিয়া'ই নাই, পৈঁছি, হাঁসুলি, নাকছাবি, মলও আছে। এ সব সে অবশ্য পাইয়াছিল বিবাহের সময়। যখন আসে তখন বক্-বক্ করিয়া অনেক গল্প করে লছমনিয়া। অধিকাংশ গল্পই শ্বশুর বাড়ীর গল্প। তাহার এখনও গওনা (দ্বিরাগমন) হয় নাই। শ্বশুর-বাড়ির লোক বার বার খবর পাঠাইতেছে, কিন্তু বাবুজি এখন তাহাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে চাহিতেছে না। লছমনিয়ার আশঙ্কা শেষে এই লইয়া একটা মারপিট না হয়। শ্বশুর, ভৈসুর দুইজনেই দাঙ্গা-বাজ লোক। ক্ষেতের সীমানা লইয়া গাঙ্গোতাদের সহিত হরদম লাঠিবাজি চলিতেছে। লছমনিয়া প্রথমেই আসিয়া হাঁক দেয়—চচা, ল, উতারো—কাকা, নাও, নামাও এটা। রাম ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া নেয়। তাহার পর শাড়ির আঁচল দিয়া মাথার ঘামটা মুছিয়া ফেলে সে। মুছিয়া বসিয়া পড়ে প্রায় হাঁটু অবধি শাড়িটা তুলিয়া। বেশ বাহারে শাড়ি পরিয়াই প্রতিবার আসে। লাল রঙই বেশী পছন্দ, লালের উপর হলুদ রঙের ফুল কাটা ছাপা শাড়ি। বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে, মাথার কাপড় খসিয়া পড়ে, গঙ্গার হাওয়ায় কানের পাশের হাল্কা চুলগুলি উড়িতে থাকে। রাম ঠাকুর তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া মালসা সুদ্ধ দইটা ওজন করিতে বসে। যাহা ওজন হয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে তাহা। কিন্তু লছমনিয়া শুনিয়াও শোনে না, গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কিছু-ক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফাইয়া ওঠে—যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়িয়া যায়। টুকরি হইতে শাড়ি গামছা, জামা এবং তেলের শিশি বাহির করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া রাম ঠাকুরের দিকে চাহিয়া হাসে একবার, তাহার পর দূরের ঝাউ-ঝোপের দিকে চলিয়া যায়। ওখানে স্নানের ঘাট আছে—একটা এবং সবচেয়ে সুবিধা কয়েকটা ঝাউয়ের ঝোপ ঘাটটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। ফেরে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। কাচা কাপড়-জামা মাথায় করিয়া লইয়া আসে। লছমনিয়া সব জিনিষই মাথায় করিয়া লইতে ভালবাসে। আসিয়াই দোকানের সামনে বসিয়া হুকুম করে—'ল, খানে দাও। রাম ঠাকুর চারটি রাম-দানার লাড়ু বাহির করিয়া আনে একটা শালপাতার ঠোঙ্গায়। তাহার পর কাঁসার একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া রাখে। লছমনিয়া কোনও কথা বলে না, নিবিষ্ট চিত্তে খায়। যখন খায় তখন রাম ঠাকুর একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার গালে কানের পাশে ছোট একটি নীল শিরা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। গৌর বর্ণের পট-ভূমিকায় সুন্দর দেখায়। ওই নীল শিরাটি লছমনিয়ার মুখের বৈশিষ্ট্য। খুব কম মেয়ের মুখে দেখা যায়। রামদানার লাড়ু চারটি শেষ করিয়া সে আলগোছে খানিকটা জল খাইয়া ফেলে। তাহার পর খানিকটা জল লইয়া 'কুল্লা' (কুলকুচা) করে। ফের আবার খানিকটা জল আলগোছে খায়। এটাও লছমনিয়ার বৈশিষ্ট্য। জল খাইতে খাইতে মাঝখানে একবার 'কুল্লা' করিয়া লয়। সব শেষ করিয়া লছমনিয়া বলে,—'চলি অব—এবার চলি। টুকরি মাথায় লইয়া চলিয়া যায়। সোজা চলিয়া যায়, একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়ও না। যতক্ষণ দেখা যায় রাম ঠাকুর দেখে। ভাবে, আবার কবে আসিবে কে জানে। বাথানে দই বেশী না হইলে তো আর আমাকে মনে পড়িবে না। রাম ঠাকুরের নিঃসঙ্গ জীবনে লছমনিয়া একটা প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু একমাত্র নয়। অন্য আকর্ষণও আছে কয়েকটি কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, তাহার দোকানে খাবারও খায় না। একটি সাপ গঙ্গা সাঁতরাইয়া ওপার হইতে এপারে আসে। মধ্যে মধ্যে এপারের চরেও তাহাকে দেখা যায়, বালির ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। সম্ভবত শিকারের সন্ধানে আসে। দিয়ার চরে ছোট ছোট পাখী অনেক। সাপটা যখন এপারে আসে রাম ঠাকুর কখনও তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে নাই। অনুসরণ করিয়াছে কি করে দেখিবার জন্য। কিন্তু একদিনও দেখিতে পায় নাই। সাপ কিছু দূরে গিয়াই মরীচিকার মতো বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় আকর্ষণ প্রকাণ্ড একটা ঘড়িয়াল। চারদিক যখন নির্জন নিস্তব্ধ হইয়া যায় তখন ঘড়িয়ালটা তাহার নাকের অগ্রভাগটুকু জলের উপর বাহির করিয়া ভাসিতে থাকে। তাহার পর প্রায় তাহার সমস্ত দেহটাই ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে জলের উপর। প্রখর রৌদ্রালোকে গঙ্গার তরঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। ঘড়িয়ালের আবির্ভাব ও তিরোভাব রাম ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলিয়া পড়িলেই রাম ঠাকুর গঙ্গার দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দৈবাৎ কোনদিন ঘড়িয়ালটার দেখা না পাইলে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার তৃতীয় আকর্ষণ কতকগুলা পাখী। দুই জাতের দুই রকম মাছ-রাঙ্গা পাখী রোজ আসে। একটার গায়ে অনেক রকম রং—নীলেরই প্রাধান্য বেশী। আর একটা সাদার উপরে কালোর মিহি কাজ। দুইটাই চমৎকার। ঝাউগাছের উপর বসিয়া থাকে গঙ্গার উপর একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া। তাহার পর ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাদার-কালার পাখীটা উড়িয়া উড়িয়াও বেড়ায়। মাঝ গঙ্গার উপর শূন্যে মাঝে মাঝে স্থির হইয়া থামিয়া যায়। পাখা দুটি তখন নাড়িতে থাকে কেবল, তাহার পর সহসা জলে ঝাঁপাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। কখনও মাছ পায়, কখনও পায় না। কিন্তু ক্লান্তি নাই। রাম ঠাকুর নিজের দোকানের কাছে গঙ্গার জলে দুই-তিনটা ছোট ছোট ডাল একটা লুকনো বাঁশ পুঁতিয়া দিয়াছিল, যদি উহারা তাহার উপর আসিয়া বসে। কিন্তু একদিনও বসে নাই। তাহার কাছে কেহ বসিতে চায় না। গাছের ডালগুলা আর বাঁশটাও মা গঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। মাছ রাঙ্গাগুলাই যদি না বসিল ও আবর্জনা থাকা না থাকা সমান। মাছরাঙ্গা ছাড়া আর এক রকম পাখী গঙ্গার উপরে ওড়ে। সর্বদা উড়িয়া বেড়ায়। এপার-ওপার করে না, গঙ্গার স্রোত ধরিয়া ওড়ে। একবার এদিকে যায় আবার ও

স্থির। মহুষ্যবাসের মতো কোথাও কখনও স্থির হইয়া উহু জলগায় বসে না। বসে চরের চড়ায় বালির উপর। অনেক সময় দল বাঁধিয়া। রাম ঠাকুর একবার তাহাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কাছাকাছি গেলেই উড়িয়া যায় এবং জলগায় উড়িতে থাকে। সহজ সরল কি সুন্দর ওড়ার ভঙ্গী। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দেখিতেও সুন্দর, সারা দেহটা ঈষৎধূসর সাদা, মাথার উপরে কালো টুপির মতো, ঠোঁট হলদে, রঙের। পা দুইটি লাল। ল্যাজটা ফিঙে পাখীর ল্যাজের মতো দ্বিধাবিভক্ত। লোকে বলে গাং চিল। কিন্তু চিলের মতো দেখিতে নয় তো। এই চরে রামু ঠাকুরকে অনামনস্ক করিয়া দেয় এই একদল পাখী। কয়েকটা কাক, শালিক, ফিঙে আর নীলকণ্ঠ। "এরা সব ওপার হইতে আসে আর সারাদিন বালির চরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। রামু ঠাকুর কাক আর শালিকগুলোর সহিত ভাব করিয়াছে। মুড়ি ছড়াইয়া দিলে উহারা আসে, কিন্তু ফিঙে আর নীলকণ্ঠ আসে না।

প্রতিদিন দুইবার খেয়া-পারাপার হয়, তখন নির্জন চর ক্ষণিকক্ষণের জন্য মুখরিত চঞ্চল হইয়া ওঠে, তাহার পর সব চুপচাপ। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই মুখচেনা আছে, কিন্তু প্রায় কাহারও সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নাই। যাত্রীদের নিকট যে লোকটি পারানি আদায় করে, সেই লোকটিই মাঝি। যাত্রীদের সহিত সে-ও যাতায়াত করে। এপারে তাহার নিজের বাড়ি, ওপারে শ্বশুরের বাড়ি। ইহারা কেহ কেহ রামু-ঠাকুরের দোকানে খায়। ইহার বেশী আর সম্পর্ক নাই।

খেয়া-পর্ব শেষ হইয়া গেলে রামু ঠাকুর কিছুক্ষণ দিগন্তবিস্তৃত বালু-রাশির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর সে যাহা করে তাহা অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয় সে। তাহার পর গঙ্গা হইতে তুলিয়া তুলিয়া সর্বাঙ্গে গঙ্গা মাটি মাখে, বিশেষ করিয়া দুই উরুর উপর ঘসিয়া ঘসিয়া মাখে। তাহার পর আসিয়া রোদে বসিয়া থাকে, আর সূর্য প্রণাম করে। গায়ের সমস্ত মাটি যখন শুকাইয়া যায় তখন গঙ্গায় নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করে। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। ইহার জন্যই সে নির্জন চরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

তাহার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ একদিন একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল।

চরে ছাপিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া হাজির হইল তাহার দোকানের সামনে। তাহার কপালে প্রকাণ্ড সিন্দুরের বিন্দু, হস্তে ত্রিশূল। রামু ঠাকুর একটু ভড়কাইয়া গেল। সন্ন্যাসী হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

"ওহে, নৌকো কখন ছাড়বে"

"সন্ধ্যের পর"

"সমস্ত দিন এখানে বসে থাকতে হবে?"

"তাছাড়া উপায় কি—"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে?"

"আছে—"

"দুই তো দেখছি ছয় লোক। সন্ন্যাসীকে ভালো করে খাওয়া হবে—"

"কি খাবেন বলুন—"

"ভাল করে মসলা দিয়ে লুচি কর। লুখরোচক করে আলুর দম ও কর খানিকটা। তারপর হয় হালুয়া, না হয়

বিজয়া-খ্যাত পরিচালক শ্রীজয়দ্রথ-এর
আর একখানি স্মরণীয় সৃষ্টি

অন্যান্য ভূমিকায় : ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, উপাসী দেবী, কল্পনা ব্যানার্জি, অমর মল্লিক, অবনীশ, শিশির বটব্যাল, অজিত চ্যাটার্জি, ধীরাজ দাস, নবাগতা কুহকুহু ও আরো অনেকে

দ্রুত সমাপ্তির পথে

গোটাকতক রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করা যাবে।"

"আমি ওসব দিতে পারব না"

"তাহলে সব্ চিড়ে, তাল পই কিছু কলা আর গোটা কয়েক পাড়া দে। ওতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে—"

"তা-ও নেই ঠাকুর। আমার দোকান খুব ছোট।"

"কি আছে তোর দোকানে—"

"কিছু শুকনো মুড়ি আছে। গুড়ও দিতে পারি একটু—"

"নেই গুড়-মুড়ি নেই খায়েঙ্গে"

ক্রোধ-ভরে সাধু চলিয়া গেল। চর ভাঁশায়া দূরের ঝাউ-বনের ওপারে অন্তর্ধান করিল। ক্ষুধার্ত সাধু এভাবে রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাওয়াতে রামু-ঠাকুর মনে মনে ভয় পাইল একটু। কিন্তু উপায়ই বা কি। সাধু যাহা চাহিতেছে তাহা যে তাহার নিকট নাই। রামুর স্নানাহ্নিক হইয়া গিয়াছিল, সাধু না আসিলে একটু ঘুমাইয়া লইত, কিন্তু সাধু আসাতে ঘুমের আমেজ কাটিয়া গেল। গঙ্গার দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল সে একাকী। ঘড়িয়ালের নাকট ধীরে ধীরে দেখা গেল। দুইটি গাংচিল স্বচ্ছন্দ লীলায় গঙ্গার উপর উড়িতেছিল, স্রোতের জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিতেছে যেন। ঘড়িয়ালটাই কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দুই জনেই একটু উপরে উড়িয়া গেল। রামু ঠাকুরের মনে পড়িল তাহার মেয়েকে। কত এখন বড় হইয়াছে? বাহ্মনিয়ার মতোই হইবে। তাহাকে এখনও মনে রাখিয়াছে কি? কে জানে। গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া চরের বালিও উড়িতে সুরু করিল। একটু পরেই চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া যাইবে। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল সে।

"এ-দোকানদার, এ-দোকানদার, উঠো—"

রামু ঠাকুর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর।

"দেও খানে দেও—"

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

"ভুখ লাগলে সে সাধু মুড়ি ভি খায়। দেও—"

গঙ্গাজলে ভিজাইয়া ঢেলা গুড়-সহযোগে সাধু প্রচুর মুড়ি খাইল। বস্তুতঃ রাম ঠাকুরের দোকানের বহু মুড়ি সব সে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—"তেরা উপর খুব প্রসন্ন হুয়া। এক পদ্মমুখী শাঁখ তেরা দেঙ্গে। কন্যাকুমারী সে লেয়া হায়। দাম লাগে কা পাঁচ রুপেয়া। মগর শ রুপেয়া খরচ করে নে সে ভি ইহ নেহি মিলে গা। হুঁ—" গেরুয়া ঝোলা হইতে রঙিন রঙের শাঁখ বাহির করিল একটি। শাঁখটির সর্বাঙ্গে গাঁট-গাঁট। ইহা ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য রামু ঠাকুরের চোখে পড়িল না।

"সাধুবাবা, পাঁচ টাকা তো আমি দিতে পারব না। অত টাকা আমার নেই, আমি গরীব মানুষ"

"কেতনা দে সকে গা—"

"আট আনার বেশী পারব না"

"আচ্ছা দে দে। তু ভক্ত হ্যয়। দে দে—"

"এ শাঁখের উপকারিতা কি সাধু-বাবা"

"ঘর মে রহ্ নে সে মঙ্গল হোগা। বিমারি হোনে সে বিমারি লুট্ যায়ে গা—"

"অসুখও সেরে যাবে?"

"জরুর—"

একটু পরেই খেয়া-ঘাটের মাঝি আসিল। অন্যান্য কয়েকটি যাত্রী, কয়েকটি ছাগল এবং দুইটি মালবাহী ঘোড়াও জুটিল। তাহাদের সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুর নৌকায় চড়িয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। রামু ঠাকুর একা পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার মেঘে তখনও রং লাগিয়া আছে, শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রামু ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া যাহা করিতে লাগিল তাহা অদ্ভুত। পদ্মমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর ঘসিতে লাগিল। দুই উরুতেই সাদা সাদা গোল গোল দাগে ভরতি। চিমটি কাটিলে লাগে না। কুষ্ঠ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে আসিতে দিও না। তোমার মেয়েকে কোলে করিও না। এ রোগে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই সহজে আক্রান্ত হয়। অনেকদিন ঔষধ খাইয়াছিল, কিছু হয় নাই। একজন

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

সাধু উপদেশ দিয়াছিলেন প্রত্যহ গায়ে গঙ্গামাটি মাখিয়া সূর্য পূজা করিবে, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিবে। নিষ্ঠাভরে যদি করিতে পার, সারিয়া যাইবে কুট। দশ বৎসর পূর্বে রামু ঠাকুর বাড়ি হইতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন চরের খেয়াঘাটে বাসা বাঁধিয়াছে। সাধুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কই? উপকার হইয়াছে কি?

পদ্মমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর প্রাণপণে ঘসিতে লাগিল। ছড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবু ছাড়িল না। ঘসিতেই লাগিল।

নূপার বই

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

চীনা মাটি

[চীনা ছোটগল্প সংকলন]

অনুবাদ : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অজিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীনদেশের আধুনিক কালের বিখ্যাত রচয়িতাদের লিখিত গল্প ও রম্যরচনার একটি সংগ্রহ আজকের দিনে বাঙ্গালী পাঠকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে চীনা সাহিত্যকে চেনবার ও তার সাহিত্য দর্শন ও শিল্পকে জানবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চীনাভবন স্থাপন করেন। সংকলন-অন্তর্গত রচনাগুলি অনুবাদন করে পাঠক চীনা আধুনিক সাহিত্যের গতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবেন। গল্প-সাহিত্য ও রম্যরচনার জগতে তখন যারা চীনা লেখকেরা কি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তা দেখে চমৎকৃত এবং তাঁদের সৃষ্ট রসে পূর্ণপাত্র আকণ্ঠ পান করে পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন। দাম : ৬.০০

অপমানিত ও লাঞ্ছিত। ডস্টয়েভস্কি

অনুবাদ : সমরেশ খাসনবিশ
সম্পাদনা : গোপাল হালদার

নায়ক আইভান। লেখক। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে নাতাশাকে। এদিকে নাতাশা বিয়ে করল এক ধনীর পুত্রকে। দুই পুরুষ ও এক নারীর ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব আর নাটকীয় সংঘাতে আবেগময় এক আখ্যানভাগ। ডস্টয়েভস্কির অধিকাংশ রচনার মত এই উপন্যাসটিতেও তাঁর ব্যক্তিজীবন অন্তরঙ্গভাবে চিহ্নিত। সাইবেরিয়া নির্বাসনের শেষ পর্যায়ে তিনি ছিলেন সেমিপালাতিনস্কে। সেখানে পরিচয় হয় মারিয়ার সঙ্গে। ডস্টয়েভস্কি, মারিয়া আর স্থানীয় পাঠশালার তরুণ শিক্ষক—এই তিনের কাহিনী পরবর্তী কালে রূপ পরিগ্রহ করে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-র মধ্যে। দাম : ৮.০০

স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ [দ্বিতীয় খণ্ড]

অনুবাদ : দীপক চৌধুরী

ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির অনাবিল প্রাণপ্রবাহ এবং সমগ্রভাবে মানব-সত্তার ঔদার্য অনুসন্ধিৎসাই জ্বোয়াইগ-এর সৃষ্টিকর্মকে মহিমান্বিত করেছে। হৃদয়ের সূক্ষ্মতার বৃত্তির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সার্থক সমন্বয়েই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। শিল্পসুষমার উৎকর্ষে চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় ও কাহিনীর মনোহারিত্বে স্তেফান জ্বোয়াইগ-এর এই গল্প-সংগ্রহের প্রতিটি রচনাই চিরকালীন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। দাম : ৫.০০

অন্যান্য গ্রন্থ

স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ [প্রথম খণ্ড] ৫.০০
অনুবাদ : দীপক চৌধুরী

ডাক্তার জিভাগো। বরিস পাস্তেরনাক ১২.৫০
অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত ও হামবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতার অনুবাদ ও গদ্যাংশ সম্পাদনা : বুদ্ধদেব বসু

এক যে ছিল রাজা। দীপক চৌধুরী ৫.০০

অনেক বসন্ত সৃষ্টি হল। চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩.৫০

জোনা লিসা।
আলেকজান্ডার লারনেট-হলেনিয়া ২.৫০
অনুবাদ : বাণী রায়

শেষ প্রশ্ন। বরিস পাস্তেরনাক ৩.০০
অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী

সুখের সন্ধানে। বারন্টাস্ত রালেস ৫.০০

নূপা

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২

CENTRAL LIBRARY

উপন্যাস

বালীর বিমল কর

বড় জটিল গল্প এটা। আমার অন্য সব গল্পের চেয়ে জটিল। জটিলও কট আবার আ লা দা ও বটে। আবার গল্প একটু জটিল না হলে পাঠকেরও ভাল লাগে না তেমন। যে গল্প যত জটিল সে গল্প লেখা তত বিপজ্জনক। যে সাপ যত বিষাক্ত, সে সাপ ধরতে সাপুড়েদের তত সতর্কতা দরকার। কিন্তু সাপই হোক আর গল্পই হোক, আসলে বিপদ না থাকলে আনন্দও যে থাকে না। গল্পের জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আনন্দের চরম পরিণতিতে পৌঁছে যখন লেখক তার পূর্ণচ্ছেদ টানে, তখন জটিলতা

CENTRAL LIBRARY

আর জটিলতা থাকে না। তখন পূর্ণ ভৃপ্তি। গায়ক যখন মালকোষে তান ধরে, তখন উদ্বিগ্ন হয় শ্রোতা। ঠিক সমে এসে পড়বে তো? পা পিছলে রসহানি ঘটবে না তো? এদিকে গলার কসরৎ, আর তানের বিস্তার যত জটিলতর হয়, ওদিকে তত উদ্বেগ বাড়ে শ্রোতার। কিন্তু সেই গানই যখন শেষ পর্যন্ত সমে এসে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তখন শ্রোতারও যত আনন্দ, গায়কেরও তত। দুর্গমকে সুগম করাই তো শিল্পীর কাজ। জটিলকে সরল।

বলেছি, জটিল গল্প এটা। সত্যিই জটিল। জানি না সমে এসে সঙ্গমে মিলতে পারবো কি না, কিন্তু এখন আর পেছোবার উপায় নেই। সামনের যবনিকা উঠে গেছে। সামনে আমার অসংখ্য শ্রোতা। এপাশে তাকিয়া, ওপাশে বালিশ। আর সামনে আমার মাইক্রোফোন। আপনারাও উদ্গ্রীব।

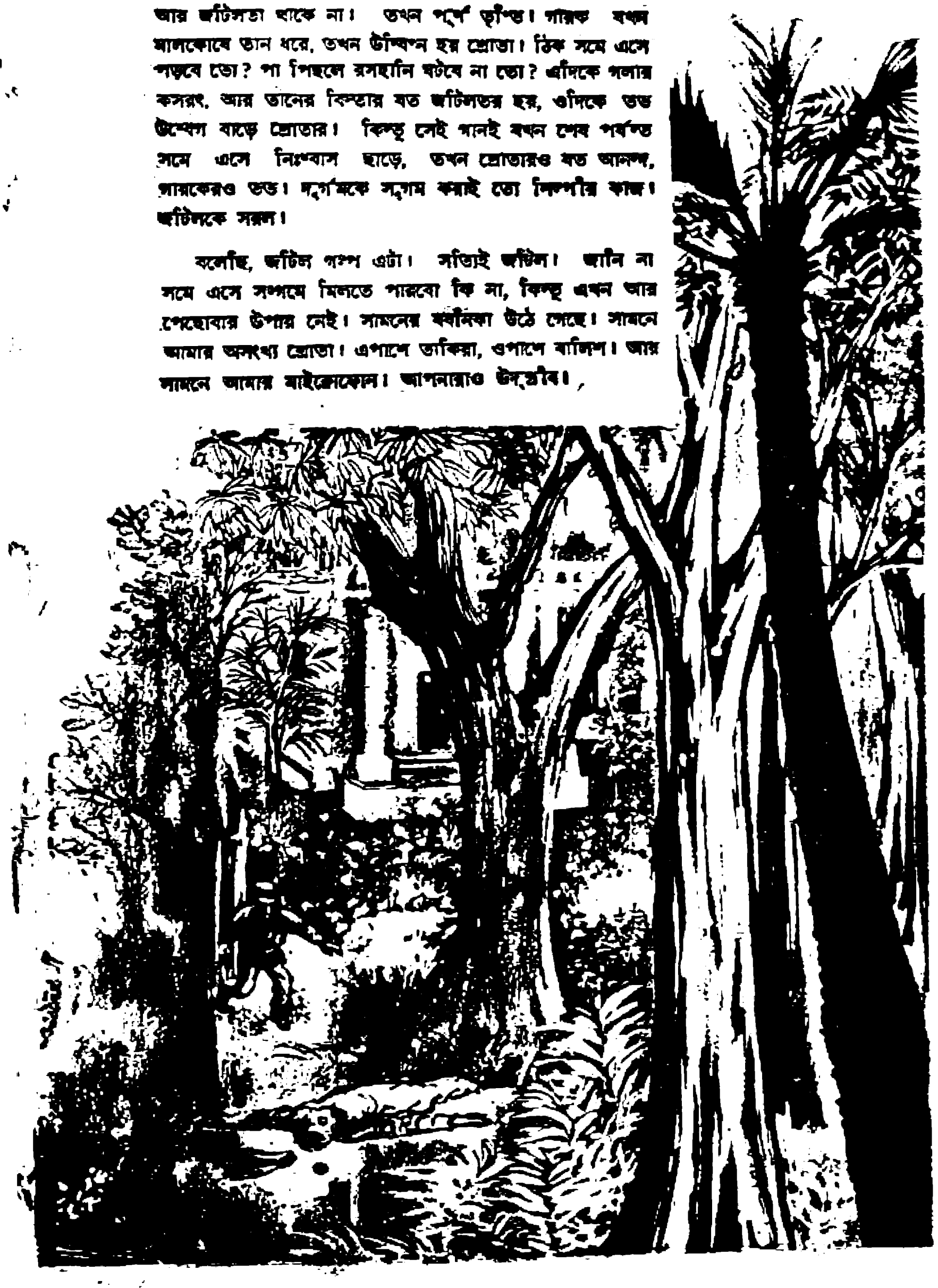

এবার আপনাদের অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করি।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমিও আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি না। চিনি আপনার লেখার মারফৎ। গল্প উপন্যাস আগে পড়িতাম। পড়িতে ভালোই লাগিত। এখন আর ভাল লাগে না। নানা কারণেই ভাল লাগে না। সে-জন্য গল্প-উপন্যাসের দোষ দিই না, দোষ দিই আমার এই মনটিকেই। যে মন একদা অপরের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পিত-কাহিনী পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে মনটিকেই আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবু আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। বিশেষ করিয়া আপনাকে। কেন, বিশেষ করিয়া আপনাকেই শ্রদ্ধা করি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। আমার অত বিদ্যা নাই। আমি নির্জন এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। নিঃসঙ্গ বরাবর ছিলাম না কিন্তু এখন নিঃসঙ্গ হইয়াছি। বাধ্য হইয়াই হইয়াছি। আর নিঃসঙ্গতা ছাড়া উপায় নাই বলিয়াও নিঃসঙ্গ হইয়াছি। সে-সব কথা পরে সাক্ষাতে হইতে পারে। আপাততঃ এই-টুকু মাত্র অনুরোধ আপনার নিকট যে আমি আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার দিনকয়েকের জন্যে আমার গৃহে পদধূলি দেন তো আমি চির-কৃতার্থ হইব। আমার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য থাকিলে আমি স্বয়ংই আপনার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিতাম, কিন্তু আমি অপারগ। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকিলে আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয়ের কথা তুলিতাম না। সে-কথা একমাত্র সাক্ষাতেই বলা চলে।

ইতি—

ভবদীয়

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

গল্পের সূত্রপাতে ছিল এই সামান্য একখানা মাত্র চিঠি। এত সামান্য চিঠি যে অর্জনকোনও সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্রও ছিল না। কিন্তু সামান্যই মাঝে-মাঝে তো অসামান্য হয়ে ওঠে। সুহাস-বাবুকে দেখেও কিন্তু তাকে অসামান্য মানুষ বলে আমার মনে হয়নি সেদিন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক। অর্থবান। কোথাও কোনও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণও দেখতে পাইনি। যেমন আর পাঁচজন সাধারণ ভদ্রলোক থাকেন তিনিও তাদের মধ্যে একজন। তবে সারাদিনই একলা থাকেন। নিজের বাড়ির ভেতর নিজেকে নিয়েই আবদ্ধ থাকেন। পৃথিবীতে যে প্রতিদিন এত ঘটনা এবং এত দুর্ঘটনা ঘটছে তার কোনও খবরই রাখেন না। কত দেশে কত রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদয় ঘটছে তার খবর রাখারও প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি মনে করেন কেবল একলা তিনিই আছেন তাঁর পৃথিবীতে এবং আছে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি সামনে বারান্দায় এসে ইজি-চেয়ারটায় বসেন। সামনে অবারিত মাঠ। সকালবেলায় সূর্যটা এসে পৌঁছেছে সবে দিগন্তরেখায়, তখন তিনি চেয়ে থাকেন সেই দিকে। তারপর সূর্যটা যখন আরো ওপরে ওঠে তখন আরো তন্ময় হয়ে যান্। নিজেকে নিয়েই তন্ময় হয়ে যান। তলিয়ে যান নিজের মনের তলায়। মনের তলায়ই বা তাঁর কী এত ভাবনা? কবে একদিন একটা কালো কুচকুচে বেরাল দেখে ভয় পেয়েছিলেন তিনি। সেই কথা। অনেক ছোটবেলার কথা। যশোরের একটা ছোট গ্রাম। গ্রামের নামটাও আজ কষ্ট করে মনে করতে হয়। নলচিটা। বেরালটা চুপি চুপি ঘরে এসেছিল দুধ খেতে। দুধের কড়া থাকত খাটের তলায় ঢাকা। সেই দুধের লোভে। বেরাল মাঝে মাঝে কালো কুচকুচে হয়। কিন্তু সেই বেরালটা সত্যিই বড় কালো ছিল। আর চোখ দুটো বড্ড ধারালো। বিষের চেয়েও ধারালো যেন।

কেন যে হঠাৎ তার কালো বেরালের কথা মনে পড়ে যায় কে জানে। কোনও কারণ নেই। এমনি। সেই নলচিটা। নলচিটার বাড়িটার সামনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। বাঁজা পেয়ারা গাছ। কস্মিন-কালেও পেয়ারা হতো না তাতে। এক-একজন মেয়ে মানুষের মত পেয়ারা গাছও যে বাঁজা হয়, তা সেই প্রথম আর শেষ দেখা তাঁর।

এত বছর পরে, প্রায় এক যুগ পরে কেন যে হঠাৎ সেই পেয়ারা গাছটার কথা মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য! সে কত বছর আগের কথা হবে? হয়ত চল্লিশ বছর আগেকার কথা। চল্লিশ বছর পরে হঠাৎ মনে পড়বার কারণটাই বা কী?

কিম্বা এক-একদিন মনে পড়ে যায় আগের রাতে দেখা স্বপ্নটার কথা। তিনি যেন কার্টনি রেল-স্টেশনের ধারে লাইনের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ সামনে দেখলেন একটা সাপ মরে পড়ে আছে। কী সাপ ওটা; মরা সাপের দিকে চেয়ে দেখতে কোনও বিপদ নেই, কিন্তু দেখলেন সাপ নয়, একটা রাঙাবী-লতার ডগা। ট্রেনের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। সেই সেটার পাশ দিয়ে চলতে আরম্ভ করবেন তখনি ফণা তুলে ধরেছে। আসলে সাপই ওটা—। সাপের ভয়ে আঁৎকে উঠে চিৎকার করে উঠতে গেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে।

আশ্চর্য! কাল রাত দুটোর সময় দেখা স্বপ্নটা এত দেরিতে কেন মনে পড়লো। আর সাপের স্বপ্ন দেখলেনই বা কেন? আসলে তিনি তো গ্রামের লোক। তাঁর তো সাপ দেখে ভয় পাবার কথা নয়। সাপ অমন অনেক দেখেছেন নলচিটায়। সাপ নিয়ে খেলা করেছেন। সাপের ভয় ছিল কাজলের। কাজল কলকাতার মেয়ে কি না!

—বাবু!

চমকে উঠে পেছন ফিরতেন সুহাসবাবু।

—কী রে?

—খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

সুহাসবাবু রেগে যেতেন। বলতেন —এই সকাল আটটার সময় খাবো কী রে, এত সকাল-সকাল আমি খাই কখনও?

—আজ্ঞে বেলা হয়েছে খুব, বেল পুইয়ে গেছে।

—কেন? কটা বেজেছে?

—আজ্ঞে, বেলা দুটো বেজে গেছে যে?

বেলা দুটো! কখন এত বেলা হলো! এই তো সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে ইজি-চেয়ারে এসে বসলেন। এই তো সূর্যটা উঠলো আকাশে। এই তো সবে চা খেয়েছেন। এই একটু আগে। কখন সূর্যটা মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, কিছুই টের পাননি তো তিনি। কখন যে বেলা হয়ে যায়, কখন যে বয়েস বাড়ে, কখন যে রাত কেটে সকাল হয়—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার পৃথিবীতে। অথচ আগে প্রত্যেকটি মিনিট, প্রত্যেকটি সেকেণ্ড, প্রত্যেকটি পল-দণ্ড পর্যন্ত পলে পলে তিনি অনুভব করেছেন।

খেতে বসেও আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান।

কানাই বলে—মাছের তরকারিটা খেলেন না?

—মাছ? মাছ রেঁধেছিস আজকে?

তারপর হঠাৎ নজরে পড়ে। মাছের বাটিটা চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ এতক্ষণ দেখতেই পাননি।

—মাছ রেঁধেছিস তা আমাকে বলিস্ নি কেন? মাছ কোথায় পেলি?

কানাই বলে—আজ্ঞে, আজ বাজারে মাছ এসেছিল—

খাওয়া-দাওয়ার পর তখন নিজের ঘরে গিয়ে বসেন সুহাসবাবু। তখন আর বারান্দায় নয়। নিজের ঘরে। কখনও নিজের খাটের ওপর। কখনও টেবিলের সামনে, চেয়ারে। আবার কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন জানালাটার সামনে। ঘরের ভেতরে অন্ধকার হয়ে আসে বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে।

—কানাই, কানাই!

দোতলার ওপর থেকে ডাক ছাড়েন সুহাসবাবু। নিচের রান্নাঘরের কোণে বসে কানাই তখন খাচ্ছে। সবে হয়ত খেতে বসেছে। হঠাৎ বাবুর গলা কানে যায়। বলে—যাই বাবু—

হাতটা মুখটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে ওপরে আসে। বাবুর ঘরের ভেতর তখন অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতরে বাবুকে স্পষ্ট দেখা যায় না। বাইরে দাঁড়িয়ে বলে —আলো জ্বালিয়ে দেব বাবু?

—না!

—তবে আমায় ডাকছিলেন কেন?

সুহাসবাবু বলেন—আমার সেই চিঠিটা কী হলো?

কী চিঠি! কীসের চিঠি, কিছুই পরিষ্কার করে বলবেন না কখনও। সব কথা ইঙ্গিতেই বুঝে নিতে হবে। স্পষ্ট করে কথা বলা স্বভাব নয় বাবুর।

—আজ্ঞে কোন্ চিঠিটার কথা বলছেন?

—সেদিন যে চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলতে দিয়েছিলুম, সেটার কী হলো?

কানাই বললে—আজ্ঞে, আমি তো সেটা তখনই ফেলে দিয়েছিলাম—

—তার উত্তর এল না কেন তবে এখনও?

এর উত্তর কিছু নেই। আর কথা বাড়ালেই তো কথা বাড়ে। কথা বলার কোনও লাভ নেই বাবুর সঙ্গে। বাবুর সঙ্গে কানাই তাই বেশি কথা বলেও না। বাবু যখন ডাকেন, বাবু যখন বকেন, তখন কানাই সব অপরাধ মাথা পেতে নেয়। প্রতিবাদ করলে এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ-চাকরি করা ছাড়া তার উপায়ও নেই আর। এতদিন বাবুর কাছে কাজ করে করে এই এত বুড়ো বয়সে আবার কোথায় যাবে সে! কোন্ চুলোয় যাবে? অন্ধকার বাড়িটাতে একলা-একলা তার সময় যেন আর কাটতে চায় না। সকাল বেলা বাবু যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন চা করে দিতে হয়। তারপর বাজার। বাজার থেকে আসে আলু, বেগুন, কুমড়ো, লাউ। কখনও কখনও মাছ। তারপর রান্না। রান্না হবার পর বাবুকে খেতে ডাকবারও অধিকার নেই তার। বাবু তখনও বসে আছেন। চুপচাপ বাইরের মাঠটার দিকে চেয়ে বসে আছেন বটে, কিন্তু যেন কোনও দিকেই চেয়ে নেই। বাইরে যেন সমস্ত কাপসা দেখছেন, সমস্ত কাপসা। বাবুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় যেন তিনি কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তখন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ডাকে—বাবু—

—কী রে?

—খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

বাবু যেন অবাক হয়ে যান। বলেন—এই সকাল আটটার সময় খাবো কি রে? এত সকাল-সকাল আমি খাই কখনও?

—আজ্ঞে, বেলা হয়েছে খুব, বেলা পুইয়ে গেছে—

—কেন? কটা বেজেছে?

—আজ্ঞে বেলা দুটো বেজে গেছে যে!

তখন বাবুর হুঁশ হয়। তখন বাবুকে উঠিয়ে ভাত খাইয়ে দিতে হয়। আর ভাত খাওয়া হলেই যে ছুটি তা নয়। সারাদিন ডাকেন না। কিন্তু কখন যে আবার বাবু ডাকবেন, তারও ঠিক নেই। এমনি করেই সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটে, এমনি করেই দিন কাটে, মাস কাটে, বছরও কাটে। এমনি করেই বাবু যেন আরো দিন দিন কেমন হয়ে যান্।

তখন দুপুর। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেছে। সুহাসবাবু বিছানায় বসে ছিলেন স্থির হয়ে। বাবু অমন বসে থাকেন মাঝে মাঝে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন অসাড় হয়ে মানুষ বসে থাকতে পারে কী করে, কে জানে! কানাই তো পারে না। তা বয়েস হলে বোধহয় এই রকমই হয় মানুষের। কানাইও হয়ত বুড়ো হলে এই রকমই হবে! আর মা মারা যাবার পর থেকেই এমনি হয়েছে বাবুর। যেন কেমন অগোছালো, যেন কেমন চুপচাপ, যেন কেমন বোবা হয়ে গেছেন।

সুহাসবাবু উঠলেন আস্তে আস্তে। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন

চেয়ারটায়। কলম নিয়ে আবার লিখতে লাগলেন।

সবিনয় নিবেদন,

মাস কয়েক আগে আপনাকে এক-খানি পত্র দিয়েছিলাম। আশা করি পাইয়াছেন। আপনার নিকট হইতে কোনও জবাব না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি। জানি, আপনাকে অনেক মূল্যবান কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সব-সময়ে সকলের পত্রের জবাব দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে-প্রয়োজনে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, তাহা নিতান্ত তুচ্ছও নয়। আমি একজন নিঃসহায় নিঃসম্বল ব্যক্তি। অর্থের দিক দিয়া নিঃসম্বল না হইলেও পরমার্থের দিক দিয়া তো বটেই। কারণ আমি মানুষের কাছে একজন মহাপাতক, ঈশ্বরের কাছেও তাই। আপনাকে আমি আর কী লিখব। আপনি আমা অপেক্ষা অনেক জ্ঞানী, অনেক গুণী। তবু নিজের কথা কিঞ্চিৎ না প্রকাশ করিলে আপনি সম্যক সমস্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আত্মা বলিয়া একটা জিনিষ আছে। দেহ বা মন অপেক্ষা আত্মার প্রয়োজনীয়তা অধিক বলিয়া স্বীকার করিবেন কিনা জানি না— কিন্তু আমি স্বীকার করি। আত্মা নাকি অবিনশ্বর। আত্মার নাকি মৃত্যু নাই। কিন্তু আমি এতই হতভাগ্য যে আমি আমার সেই আত্মা হইতেই বঞ্চিত। আমি জীবিত আছি, কিন্তু আত্মাহীন, আমার দেহ আছে মন আছে, আত্মা নাই। আপনি হয়ত শুনিয়া অবাক হইবেন যে আমি আমার সেই আত্মাকেই হত্যা করিয়াছি। আর আমি নিজেই হত্যা করিয়াছি। স্বহস্তে। এত কথা শুনিয়াও যদি আপনার এতটুকু করুণা হয় তো অনুগ্রহ করিয়া একবার আসিবেন—আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনি অনুমতি-পত্র দিলেই আমি ডাকযোগে আপনার পাথেয় পাঠাইয়া দিব। আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন এবং আমায় পুনর্জীবন দান করিবেন। ইতি—

ভবদীয়

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ওপর থেকে বাবুর ডাক পেয়েই কানাই দৌড়ে গেল। ঘরের ভেতরে তখন বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই বসে বসে বাবু কী সব করছিলেন। কাছে গিয়ে বললে—আমায় ডাকছিলেন বাবু?

—হ্যাঁ, কখন থেকে ডাকছি তোকে! কোথায় গিয়েছিলি?

—আমি তো যাইনি কোথাও, নিচেই ছিলুম।

—এই চিঠিটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে এখুনি ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে আয়— যেন ঠিক বাক্সের ভেতরে পড়ে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলবি—

এর পর থেকে রোজই ডাকেন কানাইকে। উঠতে বসতে নাইতে খেতে আর বিরাম নেই। কানাই বলে—এ এক ভারি জ্বালা হলো তো?

বাবু জিজ্ঞেস করেন—কী রে, চিঠিটা ঠিক ফেলেছিলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফেলেছিলুম ঠিক।

বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলে-ছিলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিলুম।

—তবে উত্তর আসছে না কেন?

এরপর আর কোনও উত্তর দেবার থাকে না। আর কোনও কথা না বলে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে কানাই। বাবুও তার দিকে চেয়ে থাকেন, কানাইও তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। দুজনেই যেন নিরুত্তর হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। কানাই-এর কেমন একটা দুঃখ হয় বাবুর দিকে চেয়ে। সোনার চেহারা বাবুর, কী হয়ে গেল। দেখতে দেখতে মানুষটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। যেন বাবুকে আর চেনাই যায় না এই কদিনের মধ্যে। কী যে হলো সংসারে। এই কাটনিতে এই বাড়িতে আসার পর থেকেই যেন সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল কানাই। বাবু তখনও তার দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। কানাই গিয়ে বাবুর হাতটা ধরলে। বললে—আপনি একটু ঠাণ্ডা হোন, একটু ঠাণ্ডা হোন, আপনি ভাববেন না, আমি চিঠিটা ফেলেছি ঠিক, নিশ্চয় উত্তর আসবে—দেখবেন—আপনি শুয়ে পড়ুন—

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন সুহাস-বাবু। বলেন—উত্তর আসবে, না রে? উত্তর আসবে, কী বল্?

হ্যাঁ বাবু, নিশ্চয় উত্তর আসবে। নিশ্চয়ই—

বলে সুহাসবাবুকে শুইয়ে দেয় কানাই বিছানায়। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে আসে বাইরে। আর তারপর নিচে গিয়ে নিজের ঘরখানাতে নিজেই শুয়ে পড়ে। দিন গড়িয়ে রাত হয়। রাত গড়িয়ে আবার সকালও হয়। আবার চলে সেই পুনরাবৃত্তি। এমনি চলে দুজন নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষের জীবন-যাত্রা।

সেদিন হঠাৎ খট্‌খট্ করে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সদর দরজার কড়া এমন করে নড়ে না কখনও। এই নির্বান্ধব দেশে যেদিন থেকে বাবুর সঙ্গে কানাই এসেছে, সেদিন থেকেই একেবারে নিঃশব্দে জীবন-যাত্রা চলেছে। বাজার যাবার সময়ও কানাই বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যায়। ফিরে এসে আবার তালা খুলে ভেতরে ঢোকে। গয়লা এসে দুধ দিয়ে যায় ভোরবেলা, কাঠওয়ালা কাঠ দিয়ে যায় রান্নার, তা-ও সকালবেলা। সকলকেই বলা আছে—দেরি করে এসো না বাপু তোমরা— দেরি করে এলে দরজা খুলবো না—। আমাদের বাড়িতে দরজা খুলে দেবার লোক নেই কেউ—

তারপর সারাদিনে আর কাজ কী? কোনও কাজই নেই কানাই-এর। কোনও দায়িত্বই নেই। মা যতদিন ছিল, কাজ ছিল। সে তো কলকাতায়। কলকাতার পাট তো কবেই চুকে বুকে গেছে। কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচেই গেছে একেবারে। মা যখন ছিল, তখন কতলোক আসতো। দিনরাত আসা-যাওয়া লেগেই ছিল। দিনরাতই চা-কফি-জলখাবার করতে হতো। মা-ও নেই, মা-র সঙ্গে সঙ্গে সেসব কাজকর্মও চুকে-বুকে গেছে।

মা বলতো—কানাই, চা তো আজকে ভালো হয়নি তোর—

সেদিন কানাই চা করেনি। করেছিল ঠাকুর। মা বললে—ঠাকুরকে ডাক তো একবার—

ঠাকুর এল—মা বললে—তুমি চা পর্যন্ত করতে শেখনি? তোমার জন্যে আজ সকলের সামনে কী-রকম অপদস্থ হতে হলো বলো দিকিনি।

তারপর মা বললে—যাও, তোমাকে আর কাজ করতে হবে না, যাও-তোমার মাইনে যা পাওনা আছে নিয়ে আজই সরে পড়ো—

ঠাকুর হাত-জোড় করে মিনতি করতে লাগলো। বললে—দুধে একটু ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

মা বললে—ও-সব আমি শুনবো না, আজই তোমার চাকরি খতম হয়ে গেল। কাল সকালে বাবু থাকবেন, তখন তোমার পাওনা টাকা এসে নিয়ে যেও—

তা সেইদিনই ঠাকুর বরখাস্ত হয়ে গেল। সেইদিন মা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে

ছুটি নয় অবশ্য। কিন্তু কানাই সেদিন ধরতে

কানাই বলেছিল আপনি বসুন মা, আমি তো আছি আমি থাকতে আপনাকে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে না—

—তুই রান্না করতে পারবি?

মারও যেন বিশ্বাস হয়নি যে কানাই রান্না করতে পারবে। কানাই বলেছিল—আমি তো বাবার কাছে রান্নার তোলাও নিয়ে আসছি, আর রান্না করতে পারবো না?

পরদিন কিন্তু রান্না খেয়ে মা অবাক। বললে—বাঃ কানাই তো আমার বেশ রাঁধতে পারে। তবে আর ঠাকুরের খোসামোদ করে লাভ কী' ও-ই রাঁধুক।

বাবুও বাঁচলেন একটি টেবিলে। বাবু বেশি কথা বলেন না কোনও কালেই। বললে—তা রাঁধুক—

সেই থেকেই কানাই চাপরাশিকে-চাপরাশি, ঠাকুরকে-ঠাকুর, চাকরকে-চাকর একাধারে সমস্ত। কানাই একলাই সংসারের মালিক হয়ে গেল। কেউ বাড়িতে মার সঙ্গে দেখা করতে এসে কানাই-ই এসে দরজা খুলে দিত। নাম জিজ্ঞেস করতো। একটা স্লেটের সামনে মাকে বসিয়েছিল মা সেদিন—এই স্লেটটায় নাম-ধাম লিখে নিবি, লিখে আমাকে দেখাবি, তারপর ছাড়বি কেমন—

মাকেও তখন খুব নাম-ডাক মার। মার তখন অনেক কাজ। মার তো কোনও কাজই নয়। অনবরত লোকে দেখা করতে আসে মার সঙ্গে। সঙ্গে মেয়েরা আসে। বড় বড় গাড়ি আসে বাড়ির সামনে।

কানাই এগিয়ে যায় দরজা খুলে। স্লেটটা এগিয়ে দেয় সামনে। বলে—কার সঙ্গে দেখা করতে চান?

মিসেস মুখার্জির সঙ্গে।

কানাই বলতো—এই স্লেটে আপনাদের নাম-ধাম লিখে দিন, কী কাজ, তাও লিখে দিন—

তারা নাম-ধাম লিখে দিত নিজেদের, কী কাজে তারা এসেছে তাও লিখে দিত। তারপর সেই স্লেটখানা নিয়ে গিয়ে দেখাত মাকে। মা হয়ত স্লেটের ওপরে লেখা দেখেই চমকে উঠতো। বলতো—কেরোছিস কী তুই, আরে যা যা শিগ্‌গির ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়—

মা তখন সবে পা দিয়েছে সাহেব-পাড়ায়। সবাই ঘরে তাড়াতাড়ি এসে বসবার তাড়া দেয়। একজন ভদ্রলোক আর একজন মেমসাহেব।

মেমসাহেবটা বসতে বসতেই এ আপনার কী-রকম নাম-ধাম একটা স্লেটে, রেখেছেন নাম ধাম ঠিকানার কথা।

মা বলতো- কী করবো তাই অনেক রকম লোক এসে দেখা করবে—

—তা বিলপ্ কিলপ্ করলেই পারো। থাকো সাহেব-পাড়ায় তবে যাকেতাকে করবে কেন আমাদের—

কানাই মা-ও সেদিন তক্ষুনি পাল্টে দেয়। বলতো মাকে, সাহেব পাড়ায় থাকি বলে কি সাহেবই হয়ে গেছি সব।-সাহেব—

—না না কানাই, এ স্লেটটা তোমার বদলাও— লোকে কী মনে করবে বলো তো!

—লোকে যদি মনে করে তো আমি কী করবো বলো? আচ্ছা ঠিক বলছি—

সুকোমল রেশমী কেশরাশির জন্য

ক্যাম্হারাইডিন

কেশ তৈল

কেশ বিন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে, সৌন্দর্যকামী প্রত্যেক রমণীরই একান্ত কাম্য—ক্যাম্হারাইডিন কেশ তৈল।

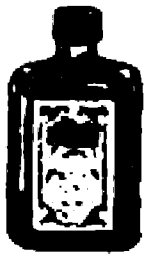

বেঙ্গল কেমিকাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

এবার থেকে তোকে আর শ্লেটে নাম লিখতে হবে না। তারপর থেকে চিনে নিয়েছিল কানাই। মা বলেছিল—হ্যাখ্ কানাই, এই তোর বাপা-মাসীমাকে চিনে রাখ্, বেবার এই মাসীমা আসবে তোর, এ'কে আর নাম লিখতে বলবি না, বুঝলি—

তা শেষ পর্যন্ত যখন সবাই আপত্তি করেছিল তখন কাউকেই আর শ্লেটে নাম লিখতে হতো না। তারপর শ্লেটটাই এক-দিন কী করে হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। চুকে গেল লাঠা। সেই থেকে নিয়ম হলো স্লিপ্। শেষে তাও উঠে গেল। বাপা-মাসীমা যখন-তখন হুট করে আসতো। যখন-তখন এসে একেবারে মা'র শোবার ঘরে ঢুকে যেত। মা থাকলেও আসতো, না থাকলেও আসতো। বাবু সাহেব-পাড়ায় বাড়ি-ভাড়া নেবার পর থেকেই এমনি উৎপাত হতে লাগলো।

শেষে একদিন যা-ঘটবার ঘটে গেল।

তখন রাত অনেক হয়েছে। সাহেব-পাড়ায় সন্ধ্যে থেকেই মাঝ-রাত হয়। কানাই তখন নিজের ঘরটাতে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। বাবু বাড়িতে নেই। বাড়ির সামনে বাগান। বড়-বড় গাছ বাগানটিতে। গেটের সামনে একটা মস্ত আলো-জ্বলতো সারা রাত। গেট থেকে লম্বা খোয়া বিছানো ঘোরানো রাস্তা। রাত তখন অনেক হয়েছে বৈ কি। রাস্তার মোড়ের বড় গীর্জাটার ঘড়িতে ঢং ঢং করে কয়েকবার বেজে গেল। একটু বোধ-হয় তন্দ্রা এসেছিল কানাইয়ের। ঘরের মধ্যেই বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। কখন মা ডাকে তার হো ঠিক নেই।

এখনও মনে পড়লে বুকটা থর থর কেঁপে ওঠে।

সেদিন আবার বিপদের ওপর বিপদ। বাড়িতে বাবুও ছিল না। আপিসের কাজে বাবুকে যেমন বাইরে যেতে হতো মফস্বল মাঝে তেমনি গিয়েছেন। সঙ্গে আর্দালী গেছে। পাঁচু আর্দালী বাবুর সঙ্গেই বাইরে যেত বরাবর। ওদিকে আবদুল রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত। বিবি তখনও শোবারঘরে বিছানা-পাতছে। অর্থাৎ বৈঠকখানায় যে কী ঘটছে তা আর কারো জানবার কথা নয় আসলে।

হঠাৎ বন্দুকের গুলির শব্দ হলো দুম্ দুম্ করে।

দুম্ দুম্ দুম্।

কানাই বন্দুকের আওয়াজটা পেয়েই চমকে উঠেছে। কে যেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। একটা বিকট চিৎকার। সমস্ত নিঃঝুম অন্ধকার সাহেব পাড়াটা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চমকে উঠলো। কানাই দৌড়ে এসেছে। আবদুল রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসেছে, বিবি ছিল শোবার ঘরে। সে-ও শব্দ শুনে দৌড়ে এসেছে। আসলে বন্দুকের আওয়াজ নয় পিস্তলের আওয়াজ। তখনও ধোঁয়া উঠছে পিস্তলের মুখ দিয়ে। সেই ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগতেই কানাই দৌড়ে বাইরে এল ঘর থেকে। এসে দেখে এক কাণ্ড.....

ঠিক বাগানের খোয়া বিছানো রাস্তার ওপরেই পড়ে আছে কোট-প্যান্ট পরা...

কানাই আর দেখতে পারলে না চোখ দিয়ে। চোখে যেন তার ধাঁধা লেগে গেছে ততক্ষণ আবদুলও এসে গেছে সেখানে, বিবিও এসে গেছে। আশে-পাশের বাড়ির আয়া-খানসামা-আর্দালী সবাই আসতে সুরু করেছে। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে-গেল একগাদা।

তারপর খবর পেয়েই পুলিশ এসে গেল থানা থেকে।

এ-ঘটনা আমি পরে জানতে পেরে-ছিলুম। কলকাতায় বসে এ-ঘটনা জানার জন্যে কোনও সুযোগই ছিল না। কারণ এ-সব কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। কলকাতার খবরের কাগজে হয়ত এ-সব বেরিয়েছিল তখন। তখনই হয়ত পড়েছিলুম। কিন্তু তারপর অন্যান্য ঘটনার গোলমালে সব মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এতদিন পরে আবার এই ঘটনার মুখোমুখি হবো—এই বা কেমন করে জানবো?

ভাবলাম একজনকে চিঠিটা দেখাবো। কিন্তু আবার মনে হলো হয়ত এই চিঠির আড়ালে কোনও গোপন কাহিনী থাকতে পারে। যে ভদ্রলোক দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার আশায় চিঠিটা লিখেছেন, তা আর পূর্ণ হবে না. কত মানুষের কত গোপন বেদনা থাকে, বাইরের সমাজের চোখ থেকে তা আড়ালে রাখতে চান। হয়ত একজন বিশেষ কাউকে না বলতে পারলে মনে শান্তি পাচ্ছেন না। এতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে অনেক অদ্ভুত চরিত্রই তো দেখলাম। এই সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও হয়ত তাদেরই মত একজন!

আর তা ছাড়া এই ঘটনার আগে পর্যন্ত আমি শুধু আমাদের নিজের সমাজকেই একটু সামান্য চিনতে পেরেছি। এই যে-সমাজে আমি মানুষ হয়েছি। যে-সমাজে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সচরাচর চলাফেরা করে। আমরা, অর্থাৎ আমাদের সমাজের লোকরা মধ্য-বিত্ত পাড়ায় থাকি। মধ্যবিত্ত সমাজের মন জানি। ট্রামে-বাসে চড়ি, কেরাণীগিরি করি বা অবসর সময়ে তাস খেলি। আর খুব বেশি সমাজ সেবা যদি করি তো সকাল-বিকেলে খবরের কাগজের রাজ-নীতি নিয়ে তর্ক করি। বাঙ্গলা দেশে এর চেয়ে মহৎ ভূমিকা আমাদের নেই।

কিন্তু সুহাসবাবু তো মধ্যবিত্ত সমাজের লোক নন্। কাজল মুখো-পাধ্যায়ও ঠিক মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলা নয়। যখন গল্প সুরু হয়েছে তখন সুহাসবাবু ক্লাশ ওয়ান গভর্ণমেণ্ট অফিসার। নিজের গাড়ি চড়েন, নিজের উর্দি পরা ড্রাইভার আছে। বাড়িতে খানশামা, বাবুর্চি, আয়া, মালী সবই আছে। বৃটিশ আমলের যা কিছু লিগেসি সবই পুরো দমে ভোগ করছেন মিস্টার আর মিসেস মুখার্জি।

মিস্টার মুখার্জির উডল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের নিরিবিলি বাড়িটাতে তখন সন্ধ্যেবেলা রোজই সোসাইটি জমায়েত হয়। কল-কাতা সহরের ক্লেজ্রা আসে সেখানে। কফি চলে, সিগ্রেট চলে অনেক সময় হাইড ড্রিঙ্কস্ও চলে। ড্রিঙ্কস্ চলতো বিশেষ বিশেষ অকেশনে। অর্থাৎ যেদিন কোনও রেসপেক্টেবল ফরেনার হাজির হতো, সেইদিন। মিস্টার আর মিসেস্ হাচিন্স এসেছিলেন একদিন। মিস্টার আর মিসেস ডাকোয়া এসেছিলেন একবার। তাছাড়া মিস্টার চৌধুরী, মিস্টার গাংগুলী, মিস্টার ব্যানার্জি'রা তো হামেশাই আসতো।

বাইরে থেকে রাস্তা দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যেত তো শুনতো, মিস্টার মুখার্জির বাড়ির বাগানের ভেতরে জমায়েতে আলোচনার সাবজেক্ট ছিল বিচিত্র। লণ্ডনের ফগ্ থেকে সুরু করে চার্চিলের চুরোট পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সেখানে কফি আর সিগ্রেটের ধোঁয়ার সঙ্গে হাওয়ায় উড়তো। আর বিচিত্র এই যে, সে-সভায় ইণ্ডিয়ার পভার্টি নিয়েও আলোচনা হতো গম্ভীর সুরে। ইণ্ডিয়ার পভার্টির জন্যে কারা দায়ী, তার কী কী প্রতিকার, তারও একটা ফতোয়া দিতেন তাঁরা। তারই মধ্যে খবরের কাগজে কোনও অনাহারে মৃত্যুর খবর পড়লে এক-একজন সমবেদনাও জানাতেন। বলতেন—পুওর সোল্—

মিস্টার হাচিন্স বলেছিলেন—ইণ্ডিয়ানরা বড় লেজি ফেলো—

মিস্টার মুখার্জি বলেছিলেন—আই কন্ফার মিস্টার হাচিন্স্—বড় লেজি—

—আর এই রেজিগনেস্-এর জন্যেই আজ স্ট্রাটফোর্ড সেলিব্রেট করছে—

মিস্টার চৌধুরী কফিতে চুমুক দিয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে বলতো—ইউ আর পারফেক্টলি রাইট মিস্টার হাচিন্স—

এর জন্যে প্রপার এডুকেশন দরকার, এডুকেশন পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে—

এরই মধ্যে মিসেস মুখার্জি মোলায়েম গলায় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতো—মোর কফি মিস্টার হাচিন্স?

মিস্টার হাচিন্স সসম্ভ্রমে বলতো—নো থ্যাঙ্কস মিসেস মুখার্জি—

মাঝে মাঝে বীণাও আসতো পার্টিতে। অর্থাৎ মিসেস সান্যাল। মিস্টার সান্যাল রেলওয়ে অফিসার। যখন কলকাতায় থাকতো, আসতো এখানে।

আর আসতো মিস্টার আচারিয়া। আচার্য। মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্যালের পুরোন জীবনের বন্ধু। মিস্টার আচারিয়াকে ডাকতে হতো না। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, একদিন এসে হাজির হতো। তার হঠাৎ আবির্ভাবে অবাক হয়ে মিস্টার মুখার্জি জিজ্ঞেস করতো—এতদিন কোথায় ছিলেন মিস্টার আচারিয়া? আফটার সিক্স এ লং টাইম—

—সিঙ্গাপুরে।

অদ্ভুত বেরিয়ার এই মিস্টার আচারিয়ার। আজ সিঙ্গাপুরে, কাল পেনাঙ, পরশু জাভা, তারপর দিন হয়ত একেবারে স্যেট্ ইউ-কে। মস্ত বড় মারওয়াড়ী ফার্ম ম্যাকলাউড কোম্পানীর ইন্টারন্যাশন্যাল কমিশন এজেন্ট। কখনও গাড়ি হাঁকিয়ে আসে, কখনও ট্যাক্সি, কখনও স্টেশন-ওয়াগনে।

—কোথা থেকে এলেন?

—গভর্ণমেন্ট হাউসে টী-পার্টি ছিল। তারপর একে একে যখন সবাই চলে যেত, উডল্যান্ড পার্কের বাইরের রাস্তা থেকে গাড়িগুলো একে একে চলে যেত, তখন যেত মিসেস সান্যাল। মিস্টার সান্যাল রেলওয়ে অফিসার। এমন কিছু কাজ নেই তাঁর বাড়িতে যে সকাল-সকাল ফিরে যেতে হবে। ছেলেটা ভাল। ভাল স্টুডেন্ট ছিল কলেজে। রীতিমত কম্পীটিটিভ্ একজামিনেশন দিয়ে পাশ করে সার্ভিস পেয়েছে। বলতে গেলে সমাজে উঠেছে। সমাজে উঠতে গেলে যা যা ডাউন্স্ সবই আয়ত্ত করেছে। প্রথম প্রথম মিস্টার সান্যাল সিগ্রেট খেত না। তারপর খেতে সুরু করলো। টপ্ক্লাবের মেম্বার হলো। তারপর সামান্য ছোট-খাটো

ঢেউয়ের মাথায় একক মানিক ফটো: সাধনকুমার বসু

ককটেল-পার্টি থেকে সুরু করে বড় বড় ডীনারে গিয়ে হুইস্কি খেতেও শিখেছে। কিন্তু তখনও ভাল করে পার্টির ম্যানার্স শিখতে পারেনি। রাত্তির হলে হাই তুলতে সুরু করে। সারাদিন রেলের অফিসে খাটুনির পর রেস্ট্ নিতে ইচ্ছে করে। মিসেস সান্যালের জন্যে তাও সম্ভব হয় না। আসলে সান্যালের জন্যেই এই সব করা। এই সিগ্রেট্ এই ককটেল, এই হুইস্কি।

—তুমি বাড়ি যাবে না?

মিসেস মুখার্জি বলতো—আপনি যান মিস্টার সান্যাল, আমরা দুই বন্ধুতে মিলে একটু গল্প করি। সত্যি, বহু দিনের বন্ধু মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্যাল। বিয়ের আগে থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। যখন সবাই চলে যায়, মিস্টার মুখার্জিও ঘুমোতে যান নিজের ঘরে, তখন দুই বন্ধুতে আলাপ হয় নিরিবিলি।

কানাই এসে দাঁড়ায়। বলে—মা—

মিসেস্ মুখার্জি বলে—তুই শুতে যা কানাই, আর তোকে দরকার নেই—আবদুলকে বল্ সেও শুয়ে পড়ুক—

এই সব নিরিবিলি আড্ডাগুলোই মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্যালের বড় প্রিয়। কত ছোটবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে খেলা খেলা করেছে। তখন কি কাজল জানতো একদিন সে মিসেস মুখার্জি হবে আর বীণাই কি জানতো যে সে হবে মিসেস সান্যাল। ডালের পেন্ডুলামের দোলায় ভাইসে-বাঁয়ে ধাক্কা খেতে খেতে কত লোক কত দিকে ভলিয়ে যায়, কত ঢেউএর তলায় চাপা পড়ে। কিন্তু এদের বেলায় তা হয়নি। কেন হয়নি সেইটেই এর কারণ।

সে বহুদিন আগেকার কথা তখনও কাজল মিসেস মুখার্জি হবার স্বপ্ন দেখেনি। বীণাও কল্পনা করেনি সে একদিন মিসেস সান্যাল হবে। তখনকার মেস-বাড়ির একটা ঘরে দুজনে থাকতো। দশ টাকা সিট্-রেন্ট্। আর কুড়ি টাকা খাওয়া খরচ। স্কুল টীচার। সকালে বেরিয়ে যেত স্কুলে, আর ফিরতো স্কুলের পর। কোনও মাসে কিছু বেশী হলে, আসার পরের মাসে তা শোধ হয়ে যেত।

রাত্রে ছাদ বিয়ে জল পড়তো এক-একদিন। বৃষ্টি হলেই দুজনে এক তক্তপোষে শুতে হতো।

কাজল বলতো—এ-জীবন আর ভাল লাগে না ভাই—

বীণা বলতো—আমারও—

এক-একদিন ছুটি হলে সিনেমায় যেত। তখনকার দিনে বেশী রাত করে রাস্তায় ঘোরা ছিল বিপজ্জনক। আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে। তারপর আবার সেই দুজনে একলা। মেসের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তত মিল ছিল না তেমন। অন্য মেয়েরা বলতো—মানিক-জোড়—

সস্তা দামের শাড়ি আর সস্তা চটি কিনে সাজিয়ে দোকানের শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াত।

কাজল বলতো—ওই শাড়িটা নেব্ ভাই,—

বীণা বলতো—ওর অনেক দাম—

অনেক স্যুটিংএর দোকানের শো-কেসগুলোর ভেতরে শাড়ি দিয়ে সাজানো

এমকেডি প্রোডাকসন্সের নিবেদন
দেহি নে ভবতি
অনুরূপা দেবী রচিত

ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা! বাবার স্নেহের শেষ ছিল না। জীবনে অর্থের অভাব আর আসেনি কখনও কাজলের। মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে বিয়ে হবার পর অর্থের অভাব মিটে গিয়েছিল তার। কিন্তু—স্নেহ? স্নেহের পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

সেই মেসের জীবনেই প্রথম আলাপ হলো বীণার সঙ্গে। বীণা এসে উঠলো তারই ঘরে। ছোট্ট বেঁটে খাটো মেয়েটি। মিসেস মুখার্জিকে দেখলে সেই সেদিনকার বীণাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই বীণাই একদিন মিস্টার আচারিয়ার নাম করেছিল প্রথম। তখনও মিসেস মুখার্জি আচারিয়াকে দেখেনি।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—তোর সঙ্গে আলাপ হলো কী করে?

বীণা বলেছিল—ট্রেণে—

ট্রেণেই আলাপ। তারপর ট্রেন থেকে ছাড়াছাড়ি হবার পর কলকাতার রাস্তায় আর একবার দেখা। সাধারণ বেকার লোক নয় মিস্টার আচারিয়া। বেরোণী নয়, ব্যবসাদার নয়। অদ্ভুত এক পেশা তার। আজ সিঙ্গাপুরে, কাল পেনাঙ্, পরশু জাভা। তারপর দিন হয়ত একেবারে স্টেট্ ইউ-কে। বীণা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই লোকের সঙ্গে পরিচয় করে। সামান্য থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে সেই সুবিধ্যাত লোক যে কী করতে উঠেছিল কে জানে! কলকাতার নামজাদা ফার্ম ম্যাক্লাউড্ এণ্ড কোম্পানীর কমিশন্ এজেন্ট্-এর ফার্স্ট ক্লাসে না চড়ে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে কী দরকার থাকতে পারে তা কল্পনা করতে পারেনি।

—আপনি বুঝি কলকাতায় যাচ্ছেন?

বীণা বলেছিল—হ্যাঁ—

মিস্টার আচারিয়া জিজ্ঞেস করেছিল—কলকাতায় আগে কখনও গিয়েছেন?

বীণা বলেছিল—না—

মিস্টার আচারিয়া তখন সাবধান করে দিয়েছিল—কলকাতায় ওঠবার জায়গা ঠিক আছে তো?

বীণা বলেছিল—হ্যাঁ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এক মেসে—

মিস্টার আচারিয়া বলেছিল—খুব সাবধানে থাকবেন কলকাতায়। মেয়েদের পক্ষে বড় ভয়ের জায়গা। সেখানে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে।

সেই কলকাতায় আসবার দিনই ভাল লেগেছিল বীণার। মিস্টার আচারিয়ার মত একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সহানুভূতি পাওয়া সহজ নাকি!

প্রথম প্রথম কাজল কিছুই জানতো না, কিছুই বলতো না বীণা। কিন্তু বহুদিন এক বাড়িতে থেকে, এক স্কুলে কাজ করেও, এক-একবার মনে হতো বীণা যেন কেমন-কেমন। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে এক এক সময়। ছাদতলায় গিয়ে গুণ্ গুণ্ করে গান গাইতো।

কাজল বলতো—কি রে, মনে বুঝি খুব আনন্দ হয়েছে তোর?

বীণা বলতো—না কাজলদি, আনন্দ আসবে কোত্থেকে বলো?

—কিন্তু এত গান কোত্থেকে আসে মনে?

এর পর আর কিছু বলতো না বীণা, মুখ টিপে টিপে হাসতো। এড়িয়ে যেত কথাগুলো। যা মাইনে পেত তাই দিয়েই সস্তা পাউডার ক্রীম কিনে আনতো, এনে টিনের আয়নাটার সামনে মুখ রেখে দেখতো নিজেকে।

কাজল জিজ্ঞেস করতো—কি হয়েছে তোর বলতো? তোর যেন কেমন পরিবর্তন দেখছি—

বীণা বলতো—পরিবর্তন আর কি হবে কাজলদি,—

—তুই প্রেমে পড়েছিস নাকি? আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে তাই—

বীণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো। বলতো—তুমি যে কি বলো কাজলদি তার ঠিক নেই, তিরিশ টাকার ইস্কুল-মাস্টারনীর আবার প্রেম কোত্থেকে জুটবে—

কথাগুলো প্রথম-প্রথম বিশ্বাস হতো কাজলের। মনে হতো বীণাও বুঝি ঠিক তারই মত। তারই মত গরীব ঘরের মেয়ে। নিজের চাকরি আর নিজের লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছে।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল।

ক'দিন থেকেই বীণা যেন ছট্‌ফট্ করছিল। কেবল বলছিল—আমার কোনও চিঠি এসেছে কাজলদি? কোনও খাম কি পোস্টকার্ড?

—কেন রে? কার চিঠি তোর চাই? কে চিঠি লিখবে তোকে? কে আছে তোর শুনি?

তা চিঠি লেখবার কি আর লোক নেই পৃথিবীতে। কাজলের মত নির্বিকার হয়ে আর কে জন্মেছে পৃথিবীতে। সংসারে বাবা ছিল। বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দেশ ছেড়ে বাবা আসতে চাইত না কখনও। অত যজমান রয়েছে দেশে। তার পাওনা-গণ্ডা আদায়-পত্র সব তো দেশেই। দেশ ছেড়ে চলে এলে কে তাকে প্রণামী পাঠাবে? কিন্তু কাজল এ-যুগের মেয়ে। বাবা বলেছিল—তোমাকে আমি বাধা দেব না মা, তোমাকে এ-যুগের সাথে তাল রেখেই চলতে হবে, তুমি যদি মনে করো লেখা-পড়া শিখলে ভালো হবে, তবে তাই করো। আমি যেমন করে পারি তোমাকে সাহায্য করবো—আমার যজমানরা আছে, তারা আমি হাত পাতলে এখনও না করতে পারবে না—

কালীঘাটের এক জানাশোনা প্রতিবেশীর বাড়িতে সেদিন বাবা এসে প্রথম তুলে দিয়ে গিয়েছিল, সেদিনও বলেছিল—তোমরা কাজলকে একটু দেখো বাবা, কলকাতায় তো আগে কখনও আসেনি ও, বিপদ-আপদে তোমরাই আছ ওর, আর কে দেখবে বলো?

বুড়ো মানুষের যা কিছু করবার, যা কিছু বলবার, তার কিছুই বাকি রাখেনি। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে প্রতি হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিত। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত কাজল। কাজল লিখতো—

পরম পূজনীয় বাবা,

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার জন্যে বেশি চিন্তা করিও না। আমি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসটাতে বেশ আরামেই আছি। খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। আশে পাশে ভদ্র-গৃহস্থদের বাড়ি। চারিদিকে ভদ্র আবহাওয়া। আমার ঘরে আর একটি আমার মতই মেয়ে আছে। আমরা দুটিতে এক সঙ্গেই কাটাই। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার শরীর কেমন আছে এখন জানাবে! ইতি সেবিকা—

কাজল—

কিন্তু সেই বাবার মৃত্যুর সময়েও কাজল কাছে হাজির থাকতে পারেনি। বাবা যে এত শিগগির চলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। কি চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল বাবার। বাবা একটা জান্ত কাঁঠাল একলা খেতে পারতো। ছ' ফুট লম্বা চেহারার মানুষ। লম্বা অজানুলম্বিত বাহু যাকে বলে। গ্রামের লোক বলতো—পণ্ডিত মশাই—

সেই পণ্ডিত মশাই-এর মেয়েই এই কলকাতা সহরে এসে একদিন স্কুলের টিচারি করবে, সে-কথা সেদিন গ্রামের কোনও লোকই বিশ্বাস করতে পারেনি। কাজল নিজেও অবাক হয়ে যেত। কাজল যে এই কলকাতা সহরের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একদিন নিজের জন্য

নিয়ে লড়াই করতে পারবে, এ-কথা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারেনি এতদিন।

বাবার মৃত্যুর পর বীণা যেন আরো আপনার হয়ে গিয়েছিল। আরো কাছে এসে গিয়েছিল কাজলের।

সে-রাত্রে দুজনেই ঘুমোয়নি।

বীণা বলেছিল—তাতে কি হয়েছে কাজলদি, বাবা কি কারো চিরকাল থাকে?

সত্যি, বীণারও কেউ ছিল না। কলকাতা সহরের অগণিত অসংখ্য মানুষের ভিড়ে কত কাজল কত বীণা ছড়িয়ে আছে, কে তার হিসেব রাখে। বাঁচার প্রতিযোগিতায় কত ছেলে কত মেয়ে গলে পচে পিষে ঘেঁতলে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে, তারও হিসেব থাকে না কর্পোরেশনের রেকর্ড সেকশানের খতিয়ানে। কত বাড়ি গড়ে, কত ভাঙে, কত গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যায়, আবার কত গজিয়ে ওঠে, বীণা আর কাজলের মত কত বাবার মেয়ে এখানে এসে মাথা তুলে বাঁচতে চায়, তার রেকর্ড কেউ জানতেও চায় না। স্রোতের পর স্রোত আসে মানুষের, সে-স্রোত সহরের সমুদ্রে এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ, মফস্বলের মানুষ, বিদেশের মানুষ—মানুষে-মানুষে আসলে তখন কোনও পার্থক্য থাকে না আর। তখন সব মানুষ মিলে রূপান্তর হয় জনতায়। সেই জনতার ভিড়েই কাজল আর বীণা এসে একদিন মিশেছিল। তারপর তারা একাকার হয়ে গিয়েছিল সহরের আত্মার সঙ্গে।

এই রকম যখন অবস্থা, তখনই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল মিস্টার আচারিয়ার সঙ্গে।

মিস্টার আচারিয়া, নামটা শুনে কে আর বাঙালী বলে ভুল করবে?

বীণা জানতো, বীণা দেখেছিল, বীণার সঙ্গে গোয়ালন্দর ট্রেণে আলাপ হয়েছিল, তাই বীণা জানতো।

কাজল বলেছিল—তা কোথা থেকে এত চিঠি লেখে সে তোকে?

বীণা বলেছিল—এখন এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে।

সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের নাম কাজলদীঘা পড়েছে ভূগোলের পাতায়। আর শুধু সিঙ্গাপুরেই নয়, পেনাং, জাভা, ইউ-কে, সব জায়গায় যেতে হয় মিস্টার আচারিয়াকে। ম্যাকলাউড এণ্ড কোম্পানীর ইন্টারন্যাশনাল কমিশন এজেন্ট।

কাজল জিজ্ঞেস করলে—কি রকম দেখতে? কত বয়েস?

বীণার কাছে তখন মিস্টার আচারিয়া ছিল গড। কিম্বা গডের চেয়েও বড় যদি কিছু থাকে, তাই।

বীণা বলতো—তুমি বিশ্বাস করবে না কাজলদি, আচারিয়া তিন হাজার টাকা মাইনে পায়—

—তিন হাজার?

কাজল তখন মাইনের অঙ্কটা শুনে চমকে যেত। কোথায় তিরিশ আর কোথায় তিন হাজার।

—হ্যাঁ রে, মাসে না বছরে?

বীণা বলতো—বছরে কি কাজলদি, মাসে। আমাকে সেদিন একটা ব্রোকেডের শাড়ি কিনে দিতে চেয়েছিল দোকান থেকে, কিন্তু আমি নিই নি কাজলদি, আমার যেন কেমন ভয় করছিল।

কাজল বলেছিল—না, নিসনি, না-নেওয়াই ভালো। কলকাতা সহরে এ-রকম অনেক লোক আছে। তারা মেয়েদের জিনিষ পত্তোর দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায়। বাবা আমাকে গোড়াতেই বারণ করে গিয়েছিল—

বীণা বলতো—না কাজলদি, আচারিয়া সে-রকম নয়, সে-রকম লোক হলে আমি এতদিনে ধরতে পারতুম না?

এত দিন এক সঙ্গে কতো ঘুরেছি, কত রেস্টুরেন্টে গিয়েছি, কত সিনেমায় গিয়েছি, কিন্তু বলতে নেই, কোনও দিন কোনও অভদ্র আচরণ করেনি—

—কিন্তু তোর সঙ্গে এত মেলা-মেশা করবার আসল মতলবটা কি?

বীণা মুখ টিপে হাসতো। বলতো—কি আর, এমনি—

—এমনি মানে?

—বারে, এমনি বেটাছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে না? বেটাছেলেরা তো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চাইবেই।—

কাজল বলতো—তা হয়ত চাইবেই, কিন্তু ওটা বড় রিস্কি, যদি কিছু র‍্যাক্‌সিডেন্ট্ ঘটে যায়, তখন?

—যাঃ, কি যে বলো তুমি কাজলদি! আমি কি সেই রকম? আমাকে কি তুমি সেই রকম ভাবো নাকি? আমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই একটা? এবার সিঙ্গাপুর থেকে এলেই আমি আচারিয়ার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, দেখবে কি পারফেক্ট্ জেন্টেলম্যান, এত ভালো ম্যানার্স জানো, তোমাকে কি বলবো। আচারিয়ার সঙ্গে তুমি চৌরঙ্গীর বড় বড় হোটেলে গিয়ে ঢুকেছি, জানো। আমার একটুও ভয় করে না ওর সঙ্গে—

কাজল বলতো—কিন্তু ওখানে তো মদ খেতে দেয়, শুনেছি—

বীণা বলতো—না কাজলদি, তুমি কি বলছো? আমি কি মদ খেতে পারি? আমার আচারিয়া কত বলেছে, আমি কিছুতে খাইনি। আচারিয়া বলে—মদ খেলে কোনও দোষ নেই, সাহেব-মেমসাহেবরা সবাইকে বসে বসে মদ খেতে দেখি, কিন্তু আমি কিছুতেই খাই না কাজলদি, আমার কেমন ঘেন্না-ঘেন্না করে—

সব শুনে-টুনে কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—তা কোথায় আলাপ হয়েছিল তোর ওর সঙ্গে প্রথম?

—ট্রেণে কাজলদি, অর্থাৎ যখন আমি কলকাতায় আসছিলাম নতুন।

সব শুনে কাজল সাবধান করে দিয়েছিল বীণাকে। বলেছিল—কিন্তু খুব সাবধান ভাই, এ-রকম মেলামেশা বড় ডেঞ্জারাস, আজকাল শুনেছি বহু মেয়ের এই রকম করে সর্বনাশ হয়ে গেছে—

বীণা তবু মানতে চাইতো না। বলতো—এবার সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে আমি ঠিক তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব কাজলদি, দেখবে কত ভালো লোক আচারিয়া। আর তাছাড়া, তোমার সঙ্গেও আলাপ করতে চায় সে—

আমার সঙ্গে?

কাজল অবাক হয়ে যেত।

—আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় কেন? তুই আমার কথা বলেছিস নাকি?

বীণা অবাক হয়ে যেত। বলতো—বা রে, তোমার কথা আমি বলবো না? তোমার কথা তো আমি সবাইকে বলি কাজলদি, তুমি যে আমার ইন্টিমেট্ ফ্রেন্ড, এ সবাই জানে—

সব শুনে কাজল বলতো—না ভাই, আমি আলাপ করবো না, ও-সব লোকের সাথে আমার আলাপ করতে ভয় করে, শেষকালে কি থেকে কি হবে!

কিন্তু আলাপ শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। হয়েছিল একটা হোটেলে। বীণা ছাড়েনি কিছুতেই। জোর করে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বীণা, বলেছিল—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি কাজলদি, তোমার কিছুই ভয় নেই—আচারিয়া সে-রকম ছেলে নয়—

তা সত্যিই 'সে-রকম' ছেলে নয় আচারিয়া। হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল আচারিয়া। লম্বা টাই, ট্রপিকাল

সুট পরনে। দূর থেকেই বীণা দেখতে পেয়েছে আচারিয়াকে।

বীণা বললে—ওই দেখ কাজলদি, আচারিয়া দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে—

কাজলও চেয়ে দেখলে। সত্যিই সুন্দর দেখতে আচারিয়াকে। কাছে যেতেই মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে আচারিয়া।

বললে—আপনিই তো বীণার কাজলদি? আমি ঠিক ধরেছি—

বীণা বললে—জানো, কাজলদি মোটে আসতে চায় না, আমি জোর করে ধরে এনেছি কিন্তু। কাজলদিকে একটু বেশি করে খাতির কোর কিন্তু—

আচারিয়া বললে—তোমার কাজলদি, তাহলে তো আমারও কাজলদি—

বীণা বললে—এই কাজলদি ছিল বলেই আমি তবু বেঁচে আছি আচারিয়া, কাজলদি না থাকলে আমাকে আবার দেশে ফিরে যেতে হতো!

আচারিয়া বললে—দেশে? দেশে কী করতে যাবে তুমি?

তারপর কাজলের দিকে ফিরে বললে—আচ্ছা কাজলদি, আপনিই বলুন তো, বীণা কেবল বলে দেশে ফিরে যাবে। দেশে গিয়ে কোথায় যাবে বলুন তো! কে এমন আছে দেশে যে কেবল দেশে যাবার নাম করে—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজল যেন একেবারে আত্মীয় হয়ে উঠলো আচারিয়ার। আচারিয়ার কথা, আচারিয়ার পোষাক, আচারিয়ার ব্যবহার, আচারিয়ার চাকরি, সব তার জানাই ছিল যেন। এতদিন তাকে না-দেখেও যেন দেখা হয়ে গিয়েছিল। আচারিয়ার অদ্ভুত গুণ ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে। এক মিনিটের মধ্যে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ।

আচারিয়া বললে—আচ্ছা কাজলদি, আপনিই বলুন তো, আমি যদি বীণাকে একটা ব্রোকেডের শাড়ি কিনে দিই তো কিছু অন্যায় হয়? আপনিই বলুন?

বীণা বললে—আচ্ছা কাজলদি, তুমিই বলো, আমি কেন শাড়ি নিতে যাবো? আমার কি শাড়ি নেই?

আচারিয়া বললে—সে তো অর্ডিনারি শাড়ি। তোমার পোষাকী শাড়ি কই? নিজের বাবা মা কি ভাই থাকলে তো তারাই দিত? তখন নিতে না?

বীণা বললে—তাবলে, তোমার কাছ থেকে কি নেওয়া যায়?

আচারিয়া বললে—কেন নেওয়া যায় না? আমি তোমার কী এমন পর যে আমার কাছ থেকে কিছু নেওয়া যায় না? এ-রকম পর-পর মনে করলে কি কারো ভালো লাগে, আপনিই বলুন তো কাজলদি?

বীণা বললে—না না, সে বড় খারাপ দেখাবে। আর কাজলদি যদি বলে তবে নিতে পারি—

আচারিয়া বললে—কাজলদি, আপনি বীণাকে বলুন তো একটা শাড়ি নিতে—

কাজল বললে—আপনিই বা শাড়ি

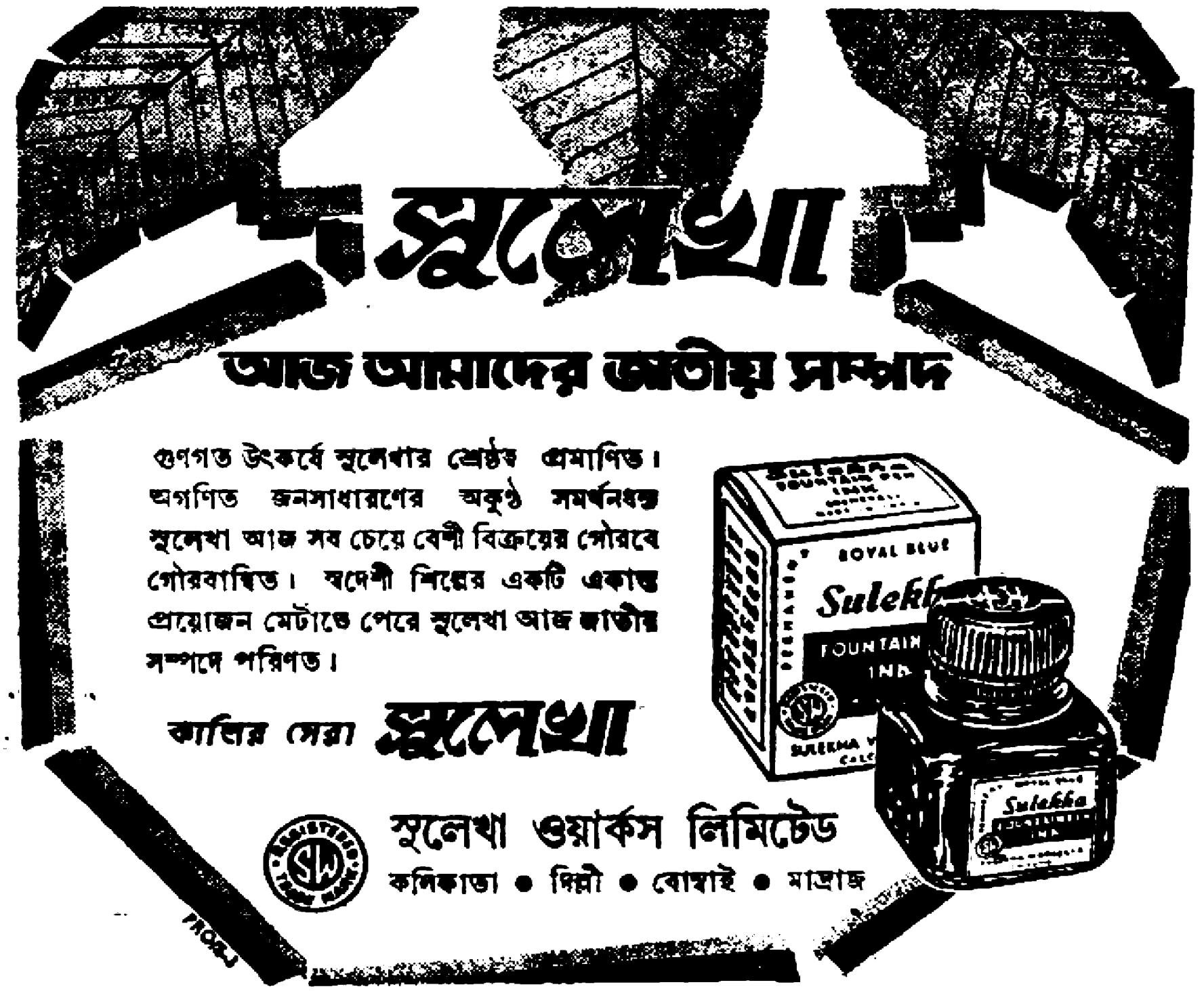

তে অত পাড়াপাঁড়ি করছেন কেন ষ্টার আচারিয়া? না-ই বা নিলে ও।

আচারিয়া বললে—কিন্তু, নিলে কি ষ! প্রেজেন্টেশন্ তো লোকে দেবেই—

চারদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কাজল দিন অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এত বড় টেলের ভেতর এত বড় হল্। চার-কে কেবল চেয়ার টেবিল ছড়ানো। কটা করে ছোট টেবল্ আর চারপাশে ৪টে চেয়ার। সাহেব মেমসাহেবদের ড়ই বেশি। মেমসাহেবদের সতিই লজ্জা নেই। পিঠটা আগাগোড়া খোলা. কবসা ধপ্ধপে টুকটুকে পিঠ। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে গল্প করে চলেছে সিগারেট খাচ্ছে। কোন লজ্জা-সরমের বালাই নেই। ওপাশে একজন মেমসাহেব উঁচু প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে পেল্লায় ত গলায় এক নাগাড়ে গান গেয়ে চলেছে। পাঁচ ছ'জন লোক কত রকম বাজনা বাজাচ্ছে। খানশামা বয় বাবুর্চিরা ঘুরে ঘুরে খাবার দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ এক অদ্ভুত জগৎ সত্যি! এতদিন বাইরে থেকে

ঠোঁয়ে কয় সাংঘাতী। তোমার সাথে ইয়ার্কি করবার ইচ্ছে আমার।

সরকার জিজ্ঞেস করেছিল—চিঠি কী লেখো?

বীণা বলেছিল—কী আবার, আমার কথা দিন-রাত মনে পড়ে, এই সব—

—তোকে নিয়ে পারা যায় না!

বীণা বলেছে—তা কেমনতরো লিখব বলো—। কোনো লেখা হলেই আমাকে সাড়ি-গয়না এই সব কিনে দিতে চায়—

—তা সেই কথাই তো লিখতে পারো। শুধু শুধু মিথ্যে কথা লিখে কী হবে। আর এ-রকম তোমার মিথ্যে বলাও তো ভাল নয় তোমার। আমাকে যদি কোনও বিপদ ঘটে যায় তখন? তখন তোমার মিথ্যের মধ্যে থেকে কি তুমি পালিয়ে যাবে—

বীণা বলেছে—ছি ছি, তুমি যে কী বলো না! আচ্ছা তুমি কি সেই রকম ছেলে! আচ্ছা তোমাকে কেউ কি তোমার তাই মনে হয়?

অবশ্য, আচ্ছা সে-রকম ছেলে নয় সে আসলে সুপাত্র পেয়েছিল। কিন্তু তবু কিছু, বলা যায় না। সরকারের সঙ্গে কত মেয়ে কী ঘরকন্না করে ছুটে বেড়াচ্ছে বলা হয় না। কার মনে কী আছে কে জানে! এই, সাবধান হওয়া ভাল।

সরকার বলেছিল—এই, সবখানে হয়ে চাঁদমুখ তুলে—

বীণা বলেছিল আর খুব সাবধানেই গাড়ি চালাবে—

তুই ওকে জিজ্ঞেস করিস তোকে বিয়ে করবে কি না?

বীণা বলেছিল—তাই কি কখনও জিজ্ঞেস করা যায়?

—তা জিজ্ঞেস করতে দোষ কী?

বীণা বলেছিল—না, না, ছি, সে কত লজ্জার কথা, ভেবেছিলুম কি তাই জিজ্ঞেস করতে পারে নাকি কখনও?

কথায় কথায় নিশ্চয় অনেকটা এগিয়ে গেছে। মনের আগল তিল তিল করে খুলে গেল। কিন্তু মনের ভাব কি মুখ ফুটে বলা যায়? সে কী লজ্জা! তবু ইঙ্গিতে কিছু কিছু বলেছিল। মেয়েরা চিঠিতে কালো কালিতে লেখে। সরকার তাকে সাদা খামে একটি চিঠি এনেছে কিনা, এবার জিজ্ঞেস করে, তার জিজ্ঞেস করে।

সরকার বলেছে—আচ্ছা সরকার এখনও চিঠি লিখে না বলে মনে হয়?

সরকার বলে—এই কিছু দিন এই, বড়বাড়ি: মেয়েটা কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছুর কাজ-কর্ম করবে না তোকে চিঠি লেখে।

কিন্তু সরকারের মুখের ওপর না বলে দেয়, কিছু পোস্টাই চিঠি লেখে।

সরকার যখন বীণার কাছে তার হয়েছে এসেই বোধ হয় পুরো কাজ এই রকম ছটফটানি এই চিঠির জন্য মনে ধরা ধরা ভাবটা তার কাছে যখন শেষ হয়ে গেছে। সরকার যাতে মনে নেই। এখন যে সময় ছটফটানি পড়ছে। মনে মনে তাই সেজন্যই সরকার বীণা যাবে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখছে।

মায়েদের চির আদরের
ধীরেন ও গৌরী
মার্কা কড়াই ব্যবহার করুন
ডি,এন,সিংহ এ্যাণ্ড কোং
১৬১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭ ফোন: ৩৩-৬৮২৬
প্লাম্বিং এবং স্যানিটারী বিভাগ ও শো-রুম—
৩৮, ৩৯/১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৪-৪৭৫৭
১৪৪ কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন: ৪৬-৪৬৫৩
- হেড অফিস -
৬৪, সীতানাথ বসু লেন, সালকীয়া, হাওড়া। ফোন: ৬৬-২৩৪৮ 3 ৬৬-৩৫৭৭

কাজল বলতো—কী রে, ঘুমোসনি তুই?

বীণা বলতো—ঘুম আসছে না যে কাজলদি—

কাজল বলতো—কিন্তু এ-রকম করলে বাঁচবি কী করে তুই?

বীণা বলতো—বেঁচে আর কী লাভ কাজলদি—আমার মরে যাওয়াই ভালো—

এমনি এক-একবার আচারিয়া কলকাতার বাইরে যেত, আর বীণা ছট্‌ফট্ করতো। সে-সব দিনগুলোতে বীণা ভাল করে কথা বলতো না, শুধু কাঁদতো। তারপর যেদিন চিঠি আসতো, সেদিন আবার হাসি ফুটতো বীণার মুখে। আবার ভাল করে ঘুমোত, ভাল করে কথা বলতো, ভাল করে খেত, আর ভাল করে ক্লাশে মেয়েদের পড়াতো। আর সে কী বড় বড় চিঠি সব! কত কথা সে সব লিখতো তাতে আচারিয়া। ওদিক থেকে আচারিয়া লিখতো আর এদিক থেকে লিখতো বীণা। বীণাও বড় বড় চিঠি লিখতো। সেই চিঠিগুলো আবার সিল্কের ফিতে দিয়ে জড়িয়ে বন্ধ করে সাজিয়ে রাখতো ট্রাঙ্কের ভেতরে। সেই চিঠি জমে-জমেই বাক্সের মধ্যে পাহাড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। আর আশ্চর্য মানুষের মনের ভুলে যাবার ক্ষমতা!

আচারিয়া বীণাকেই বিয়ে করবে, বীণাকে নিয়েই সংসার পাতবে এই রকম সব ঠিকঠাক। কিন্তু সব উল্টে গেল একদিন।

আজকের বীণা আর আজকের কাজলের কাছে সেকালের সেইসব দিন-গুলোর কথা যেন হাসির খোরাক হয়ে আছে।

যখন মিসেস মুখার্জির বাড়িতে পার্টি হয়, যখন সবাই এসে জোটে সে-পার্টিতে তখন মিসেস সান্যালও আসে মিস্টার সান্যালও আসে। কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেলে সবাই যখন চলে যায়, তখন দুই বন্ধুতে আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে যায় দুজনের।

কাজল বলে—মনে আছে বীণা, তখন কী-রকম পাগলামী ছিল তোর? আচারিয়ার চিঠি না পেলে কী-রকম ছট্‌ফট্ করতিস?

বীণা বলতো—তবে মনে আছে কাজলদি, বলতে গেলে তুইই সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিলে আমাকে—

কাজল বলতো—তখন তুই আচারিয়ার জন্যে যে-রকম পাগল হয়ে গিয়েছিলি তাতে আমারই ভয় হয়েছিল ভাই—

সত্যি বলতে গেলে কাজলই বাঁচিয়ে দিয়েছিল। ম্যাক্‌লাউড্ এন্ড্ কোম্পানীর ইন্টারন্যাশনাল কমিশন্ এজেন্ট্ মিস্টার আচারিয়ার কথা অবিশ্বাস করবার তো কথা নয় কারো। দু'হাতে টাকা খরচ করে, মদ খায় না, নিজের সংসার নেই, বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ নেই, এ-রকম লোককে গোড়াতেই তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম কাজলও সন্দেহ করেনি। দেখতো—এত ভদ্র আচারিয়া।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আপনি আচারিয়া লেখেন কেন নামের শেষে? আচার্য লিখলেই পারেন?

আচারিয়া বলেছিল—আপনি তো বেশ কথা বললেন কাজলদি, আচার্য বললে ফরেনে কেউ বুঝবে? তাছাড়া আছে উচ্চারণ। আচারিয়াটা শুনতে, উচ্চারণ করতে, কত সহজ!

কাজল আরো জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি বীণাকে বিয়ে করে কোথায় তুলবেন? বাড়ি ভাড়া করতে হবে তো?

আচারিয়া বলেছিল—তা তো করতে হবেই—আমি এখন হোটেলে থাকি, কারণ আমার কেউ নেই বলে। বিয়ে করলে তো আর হোটেলে থাকা চলবে না?

কাজল আবার জিজ্ঞেস করেছিল—আর একটা কথা, আপনি যে-বাইরে বাইরে ঘুরবেন, বছরের মধ্যে ছ'মাস ইণ্ডিয়ার বাইরে থাকবেন, তখন বীণা একলা কী করে থাকবে এখানে?

আচারিয়া বলেছিল—কেন? বীণাও ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যাবে—

এর পর আর কাজলের আপত্তি হয়নি।

কাজল বলেছিল—তুই বিয়ে করে সুখী হোস্, এটা আমিও চাই ভাই, তোর ভালোর জন্যেই তো আমি এত কথা জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, তোর মামারা যদি এ-সব ব্যাপারে ভার নিত তাহলে আর আমাকে এ-কাজ করতে হতো না—

বীণা মামাদের নাম শুনেই রেগে যেত। বলতো—না কাজলদি, মামারা আমার কেউ নয়, দেখছো না, এতদিন এখানে আছি, একটা খোঁজ-খবরও নেয় না কেউ? মামারা যখন আমার কথা ভাবে না, তখন আমিই বা তাদের কথা ভাববো কেন?

তা সেই মেসের মধ্যে বসেই দুই বন্ধুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতো তারা। কেমন করে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে, চিরকাল তো আর স্কুল-মাস্টারি করা চলবে না। চিরকাল এই মেয়ে ঠেঙিয়ে আর তিরিশ টাকা মাইনে মাসকাবারি নিয়ে জীবন তো কৃতার্থ হবে না। ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে।

বীণা জিজ্ঞেস করতো—আচ্ছা, তুমি কী করবে কাজলদি? তুমি বিয়ে-থা করে সংসার পাতবে না?

কাজল বলতো—দূর, আমার আবার ভবিষ্যৎ, আমার আবার সংসার—আমার এই রকম মেয়ে ঠেঙিয়েই দিন কেটে যাবে—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়ে-ঠেঙিয়েই কাজলের দিন সত্যি সত্যি কাটলো না। কাজলের জীবনেও একদিন এল একজন। এল সুহাস। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তখন বি-এস-সি পাশ করেছে। এম-এস-সি ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরির চেষ্টা করছে। সে-যুগে চাকরি পাওয়া অত সহজ ছিল না। চাকরি পেতে গেলে দিনের পর দিন দরখাস্ত করতে হতো চারদিকে। কত রকমের কম্‌পিটি-টিভ্ পরীক্ষা দিতে হতো। যুদ্ধের আগেকার দিনে চাকরি পাওয়া আর ভগবান পাওয়ার মধ্যে কোনও তফাৎ ছিল না।

বীণা সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল সুহাসকে দেখে। জিজ্ঞেস করেছিল—ও কে কাজলদি?

কাজল বলেছিল—কে? কার কথা বলছিস্?

—বা রে, ওই যে তোমাকে মেস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে এসেছিল? ও কে? বেশ চেহারা কিন্তু ভদ্রলোকের।

কাজল বলেছিল—ওকে তুই চিনবি না, ও সুহাস—

বীণা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—তা আমাকে তো বলোনি কিছু ওর কথা? তুমিও বুঝি প্রেমে পড়েছ?

—চুপ্ কর। কী যে বলিস্ তার ঠিক নেই। আমি তোর মত নই, অত সহজে আমি টলি না তোর মত?

বীণা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু ও কে? কী করে?

কাজল বলেছিল—করবে আবার কী?

—তবু চাকরি-বাকরি তো একটা কিছু করে?

কাজল বলেছিল—চাকরি করে কি না তা জানি না। আর আমার অত জানবার দরকার কী? চাকরিই করুক আর বেকারই থাক, তাতে আমার কী এসে যায়?

আসলে সুহাস এসেছিল স্কুলে। তখন চিনতো না, জানতোও না তাকে।

পূজোর সেরা উপহার—তাঁতের কাপড়

আনন্দোৎসবের দিনগুলিকে সার্থক ক'রে তুলুন। এখন আপনি পূজোর বাজারের সমস্ত কেনা-কাটা একই দোকানে করতে পারবেন। সারা ভারতের প্রতিটি অংশ থেকে বাছাই ক'রে সংগ্রহ করা মন ভোলানো রঙের তাঁতের কাপড় এখানে পাবেন। এগুলির দামও বেশী নয়। তাছাড়া, আপনার প্রিয়-পরিজনেরাও মনের মতো উপহার পেয়ে খুশী হবেন। বিভিন্ন ধরনের শাড়ি ও সিল্কের শাড়ি, বেডশীট, বুশ-শার্ট, শার্টিং এবং ধুতির জন্যে আমাদের কাছে আসুন—

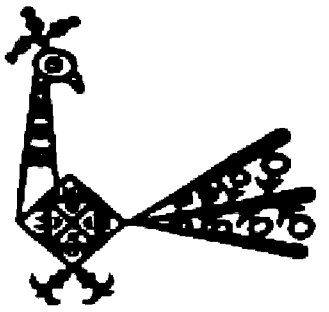

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
২২১, ডি, এন, রোড, বোম্বাই-১
৯, ব্রডওয়ে, মাদ্রাজ-১
১৫, কনট প্লেস, নিউ দিল্লী-১

দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম হ্যাবিটেক্স মার্কেটিং কো-অপ. সোসাইটি লিঃ, লক্ষ্মীনারায়ণ চেম্বার্স, ফোর্ট স্ট্রীট, বোম্বাই-১

কোন্ একটা রবের কী একটা ফাংশান্ হবে। চ্যারিটির ব্যাপার। বন্যাপীড়িত-দের জন্যে একটা গান-বাজনার আয়োজন হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্‌স্‌-এ, তারই টিকেট বিক্রীর ব্যাপার।

স্কুল তখন ছুটি হয়ে গেছে। কাজলও তখন বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করছে। সবে স্কুল কম্পাউন্ড্ পার হবে এমন সময় সুহাস এসে বলেছিল—আচ্ছা, আপনাদের স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস আছেন?

হঠাৎ এক অচেনা ছেলের মুখোমুখি হওয়াতে কাজল প্রথম ঘাবড়ে উঠেছিল। তারপরেই একটু সোজা হয়ে বলেছিল—স্কুল তো ছুটি হয়ে গিয়েছে, আপনি কাল সকাল বেলা আসবেন—

তারপর সুহাস বলেছিল—কাল কখন আসবো?

কাজল বলেছিল—এই ধরুন সকাল-ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে!

তারপরেই উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার করে খুলে বলেছিল সুহাস। ফরিদপুরে বুঝি বন্যা হচ্ছিল সে-সময়ে। স্যার পি, সি, রায় একটা সম্কট-ত্রাণ সমিতি করেছেন, দেখেছেন বোধ হয়। সেই জন্যেই সকলের কাছ থেকে-চাঁদা তুলছি আমরা। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যার যথাসাধ্য সংগ্রহ করছি। আর এই সঙ্গে একটা গান-বাজনার বৈঠক হচ্ছে, এর যদি টিকিট্ কেনেন আপনারা তো বহু লোকের উপকার হয়।

উপলক্ষটা এই রকম সামান্যই।

প্রথমে সব ব্যাপারেরই উপলক্ষটা সামান্য থাকে। সেই চাঁদা তোলার ব্যাপারেই কাজল একটু সাহায্য করেছিল সুহাসকে।

স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্‌কে বলে প্রত্যেক ছাত্রীর কাছ থেকে কিছু-কিছু চাঁদা আদায় হয়েছিল। যেটুকু হয়েছিল তা শুধু কাজলের জন্যেই বলতে পারা যায়।

সুহাস বলেছিল—বাইরে আর কোথাও কি আপনার সোর্স্ আছে? আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ?

কাজল বলেছিল—আমি তো থাকি মেসে, আমার কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় নেই—। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি নিজেও আলাদা একটা কিনবে থাকি—

—আপনার মেসে কেউ কিনবে না?

কাজল হেসে ফেলেছিল। বলেছিল—আমাদের মেসে সকলের আমার মতো অবস্থা, ধার করে করে মেস চালাতে হয়, তাদের কষ্ট দিতে চাই না—

তবু কাজল সুহাসের টিকিট কিনেছিল শুধু সুহাসের জন্যে।

সুহাস বলেছিল—আপনার খুব কষ্ট করে দিলাম তো? আপনার বোধহয় টানাটানি করতে হবে—

কাজল বলেছিল—এ আমাদের প্রত্যেক মাসেই টানাটানি করে চালাতে হয়—একটা মাস না হয় সংকাজের জন্যে টানাটানি করলাম—

তা ফাংশান্‌টা ভালোই লেগেছিল কাজলের। কে, সি, দে গান গেয়েছিলেন। কিন্তু কী গলা। আর কী দরদ।

কে, সি, দে, নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকার—যে-সব লোকের গানই শুনেছে এতদিন, চেহারা দেখেনি, সেই সবাই এসেছিল। যখন আসর শেষ হলো, সুহাস এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি একলা বাড়ি যেতে পারবেন তো?

কাজল বলেছিল—অনেক রাত হয়ে গেছে, না?

সুহাস বলেছিল—চলুন আপনাকে পৌঁছিয়ে দিই—

কাজল বলেছিল—কিন্তু আপনি চলে গেলে এখানে অসুবিধে হবে না তো?

—না না, অসুবিধে আর কী, আপ-নার জন্যে অনেক উপকার হয়েছে আমাদের, আপনি অনেক টাকার চাঁদা তুলে দিয়েছেন।

তা শেষ পর্যন্ত সুহাস শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে বাঁণা দরজা খুলে দিয়েছিল ঘরের। বাঁণা বলেছিল—ওমা, তুমি একলা এলে নাকি এত রাত্তিরে?

কাজল বলেছিল—না, একজন পৌঁছে দিয়ে গেল—

—কে, কাজলদি?

কাজল বলেছিল—ওই ওদের সমিতির একজন মেম্বর—

কিন্তু ফাংশান শেষ হয়ে গিয়েও মলা-মেশা শেষ হয়ে যায়নি। নানা ব্যাপারে দেখা হয়ে যেত রাস্তায় যেতে আসতে।

কাজল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—অনেক দিন যে দেখিনি আপনাকে?

সুহাস বলেছিল—চাকরির খোঁজ করছি,—খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে চারদিকে—

—তবে যে বলেছিলেন ব্যবসা করবেন?

সুহাস বলছিল—ব্যবসা করতেই তো স্যার বলেন, কিন্তু ব্যবসা করি কী করে বলুন তো! স্যার বলেছেন ব্যবসা করলে ক্যাপিটাল দেবেন আমাকে। বলেছেন—যে-কোনও ব্যবসা করতে, একটা পান-বিড়ির দোকান করে বেহারীরা কত টাকা রোজকার করছে, আর বাঙ্গালীরা চাকরি বলতে অজ্ঞান—

তা একটা পান-বিড়ির দোকানই করুন না!

সুহাস তখন খুব ছেলেমানুষ ছিল। সুহাস হেসে ফেলেছিল।

কাজল বলেছিল—আপনি পান-বিড়ির দোকান করলে আমাকে খদ্দের পেতে পারেন।

—আপনি বিড়ি খাবেন নাকি?

কথাটায় সুহাসও হেসেছিল, কাজলও হেসেছিল। হাসতেই হাসতেই তাদের আলাপ এগিয়ে চলেছিল। সুহাস একদিন বলেছিল—শেষকালে পুলিশের চাকরিতে একটা দরখাস্ত করে দিয়েছি, জানেন—

কাজল বলেছিল—শেষকালে এত চাকরি থাকতে, পুলিশ?

সুহাস বলেছিল—কিন্তু কী করবো বলুন, আর যে কোথাও পাচ্ছি না। মার্চেন্ট অফিসের চাকরি হয়ত খুঁজলে একটা পাওয়া যায়, কিন্তু কেরাণীর চাকরি আর ভাল লাগে না।

—কিন্তু কোনদিন যদি স্বদেশীরা আপনাকে খুন করে ফেলে?

সুহাস বলতো—করবে, করবে! আর করলেই বা কী করছি! কিছু-না-করার চেয়ে কিছু করা ভাল! আর তা ছাড়া আমি খুন হলে আমার জন্যে কেউ অনাথা হবার ভয় নেই—

কাজল বলতো—ওমা, এখন না-হয় বিয়ে করেননি, কিন্তু একদিন তো বিয়ে করবেনই—

সুহাস বলতো—বিয়ে আমি করবো না!

—কেন? বিয়ের ওপর এত বিরাগ কেন?

সুহাস বলতো—আমার নিজের বিরাগ না থাকলেও, অন্য মেয়েদের তো আমাকে বিয়ে করায় বিরাগ থাকতে পারে? পুলিশকে বিয়ে করতে কে আর চাইবে বলুন?

কাজল বলতো—মেয়েরা না চাক্, মেয়েদের অভিভাবকরা চাইতে পারে।

—কিন্তু কোন্ মেয়ের বাপের প্রাণ এত পাষাণ যে তোমার মতন ছেলে জেনে শুনে মেয়ের বৈধব্য কামনা করবে?

কাজল বলতো—তাহলে এমন মেয়ে খুঁজে বার করুন না যার কোনও বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

সুহাস বলতো—তেমন কোনও মেয়ে যদি কোথাও জানা থাকে আপনার তো খবর দিন না, একটু চেষ্টা করে দেখি!

কাজল বলতো—বা রে, বিয়ের ঘটকালি করা আমার কাজ নাকি?

হঠাৎ সুহাস বলেছিল—আচ্ছা শুনেছিলাম আপনারও তো কোনও অভিভাবক নেই, আপনিই তো বলেছিলেন—

কাজল এর পরে আর দাঁড়ায়নি সেখানে। বলেছিল—আপনি দেখছি ভদ্রতার সীমা রাখতেও জানেন না—

কিন্তু সুহাস তাতেও পেছপাও হয়নি। তাড়াতাড়ি পেছনে গিয়ে বলেছিল—শুনুন—

সত্যিই রাগ হয়ে গিয়েছিল কাজলের। স্কুলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল।

সুহাসের ডাকে একবার পেছন ফিরলো।

সুহাস বললে—দেখুন, আপনি যদি পুলিশের চাকরি অপছন্দ করেন তো পুলিশের চাকরি করবো না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—

এর পরে আর কয়েকদিন দেখাই নেই। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বার-বার এদিক-ওদিক চেয়েও কোনও হদিস মিলতো না সুহাসের। কাজল যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

বীণা বলতো—কাজলদি, কী হলো তোমার?

কাজল বলতো—কই, কিছু হয়নি তো—

—তাহলে তুমি কিছু খেলে না যে?

কাজল বলতো—আজকে শরীরটা ভালো নেই আমার—

বীণা বলতো—কিন্তু তোমাকে তো এত অন্যমনস্ক দেখিনি কখনও আগে?

কাজল বলতো—বা রে, তা বলে শরীর খারাপও হবে না মানুষের!

বীণা বলতো—কিন্তু কদিন থেকে দেখছি তুমি আমাকে না নিয়েই একলা-একলা বেরিয়ে যাচ্ছো, একলা-একলা ইস্কুল থেকে চলে আসছো, বেবানি বলছিল তুমি নাকি ভালো করে ক্লাশে পড়াচ্ছো না—তোমার হলো কী কাজলদি?

কাজল বলতো—কই, কিছু হয়নি তো—

বীণা বলতো—কিন্তু আমার মাথা ধরেছে—

বীণা বলতো—মাথা যদি ধরে থাকে তো ওষুধ নিয়ে আসছি, খেয়ে নাও না—

কাজল বলতো—আমার মাথা ধরার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ওষুধ আনিয়ে নেব, তুই যা—

বীণা শেষ পর্যন্ত চলে গেল। কিন্তু সেদিন কাজলও বেশিক্ষণ চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে পারেনি, স্কুল নেই, তাই সমস্ত কিছুই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে প্রোপোশাল মল্লিক লেন থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তাই-ই ঠিক ছিল না। তারপর মুজাপুর স্ট্রীটে, তারপর কলেজ স্কোয়ার, তারপর ইনস্টিটিউশনের সামনে গিয়েও খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেছিল। তারপর আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে সাহস হয়নি। দুপুর-বেলার কলকাতা সহরের রাস্তায় চেহারাটা দেখা তো অভ্যেস নেই। তাই কেমন নতুন লেগেছিল সব। এদিক-

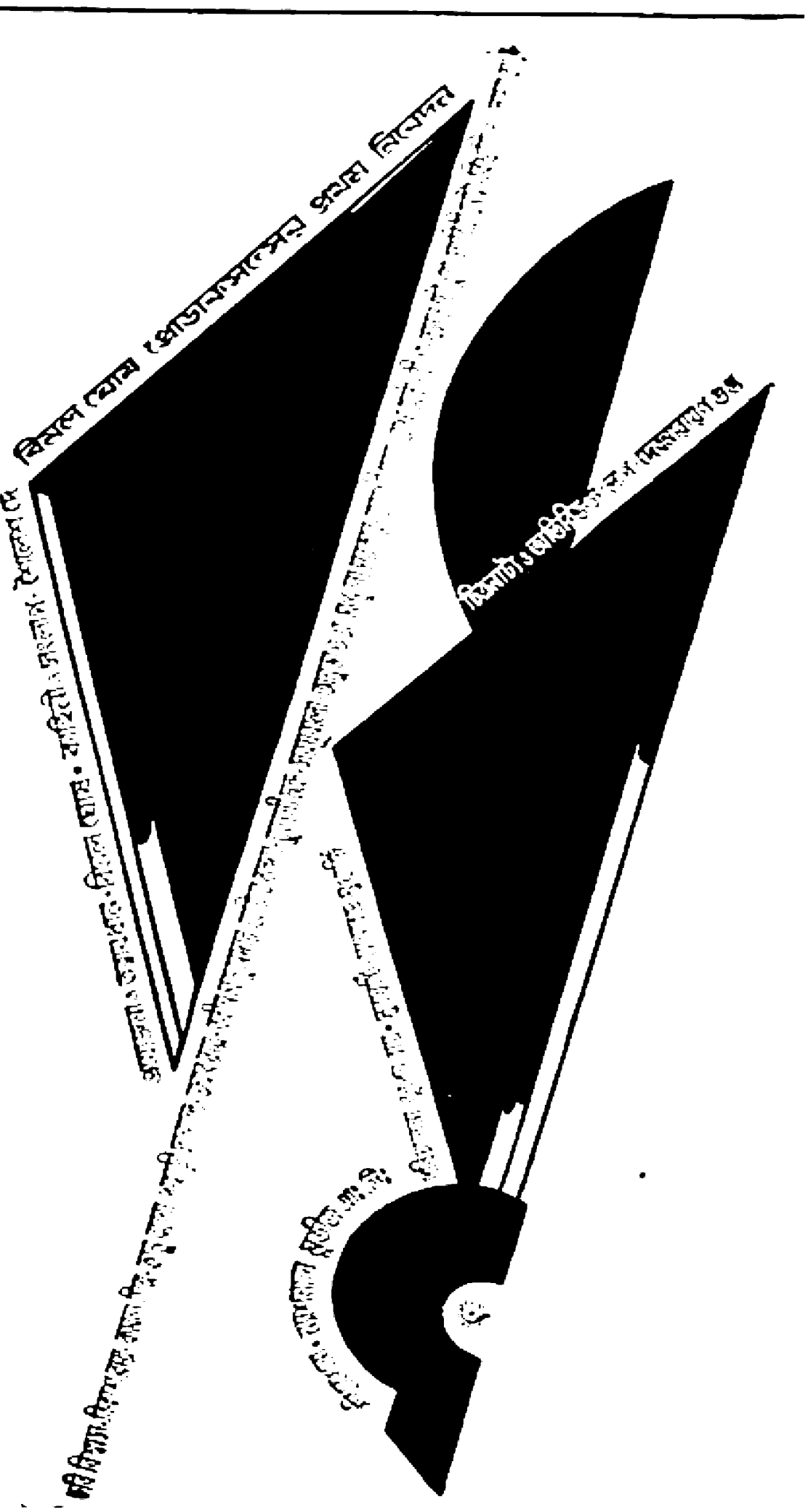

ওদিক চাইতে চাইতে মনে হয়েছিল—ওই বুঝি সুহাস। ওই বুঝি সুহাস আসছে।

কিন্তু কোথায় কে? সুহাস হয়ত ততক্ষণ তার নিজের হোস্টেলে বসে তাস খেলছে কিম্বা ঘুমোচ্ছে। সুহাস জানতেও পারছে না যে কাজল সারাদিন স্কুলেই গেল না তার জন্যে। সুহাসের জন্যেই কাজল রাস্তায় বেরিয়েছে অকারণে। কিন্তু কলকাতা সহরের ভিতরে কোথায় পাওয়া যাবে সুহাসকে।

বীণা বিকেলবেলা এসেই জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো কাজলদি?

কাজল কথাও বললে না, মাথাও তুললে না।

বীণা কাজলের কপালে ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে—কই, জ্বর-টর তো হয়নি দেখছি, সেদিন অনেক রাত করেছিলে সেই জন্যেই হয়ত—

সেদিন অবাক কাণ্ড! সত্যিই অবাক হবার মত ঘটনা ঘটালে সুহাস।

ঠিক স্কুলে যাবার পথে একটা রাস্তার বাঁকের মুখে নিরিবিলি দাঁড়িয়ে ছিল সুহাস একলা। কাজলের হাতে একগাদা সেলাই-এর কাপড় আর পরীক্ষার খাতা। চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নেবার কথা ভাবছিল কাজল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী বলবে ভেবে পেলে না।

সুহাস বললে—আমার ওপর রাগ করেছেন জানি, কিন্তু কলকাতা থেকে চলে যাবার আগে আপনাকে বলে না-যাওয়াটা ঠিক নয়, তাই বলতে এলাম—

—কলকাতা থেকে চলে যাবেন?

সুহাস বললে—হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছি—

কাজলের মুখটা বোধহয় একটু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—কোথায় পেলেন? কলকাতা থেকে দূরে?

সুহাস বললে—হ্যাঁ, অনেক দূরে—

কাজল জিজ্ঞেস করলে—স্যারের মত আছে?

সুহাস বললে—স্যারকে বলিনি। স্যারকে বললে তিনি চাকরি নিতেই দিবেন না। তিনি নিজে আট শো টাকা মাইনে পান, হাতে চল্লিশ টাকা রেখে আর সব দিয়ে দেন, তাঁর কথা আলাদা। তিনি তো বলেন, বাঙালীরা চাকরি করে করেই সব গেল—

—তাহলে?

সুহাস বললে—তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, আমার মত অনেক ছাত্রই তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তাই তাঁর জন্যে আমার তত ভাবনা নয়, যত ভাবনা আপনার জন্যে—

—আমার জন্যে ভাবনা?

কাজল অবাক হয়ে গেল।

সুহাস বললে—শুধু ভাবনা নয়, ভয়ও বটে—

—ভয়? আমাকে আবার আপনার ভয় কীসের?

সুহাস বললে—পুলিশের চাকরি আপনি ঘেন্না করেন যে!

কাজল বললে—আমার ঘেন্নায় আপনার কী আসে যায়!

সুহাস বললে—আসে যায় বলেই তো যাবার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম। আপনি তো পুলিশের চাকরি নিতে বারণ করেছিলেন!

কাজল হেসে ফেললে এবার। বললে—জানি আপনার কে যে আমার বারণ আপনি শুনবেন—

সুহাস বললে—তা জানি না, তবে মনে হলো এতে আপনার সায় নেই। আর আজকাল তো পুলিশের চাকরিতে তেমন সম্মান নেই! কিন্তু বিশ্বাস করুন, একদিন আমিই স্যারের কথায় নিজের হাতে চরকা কেটে জামা-কাপড় তৈরী করিয়ে পরেছি। কিন্তু জীবন-যুদ্ধে আর পারছিলাম না—

কাজল বললে—কিন্তু আপনি তো সংসারে একলা, একলার জন্যে আবার জীবন-যুদ্ধটা কী।

—বা রে, একলা বলে বুঝি তার জীবন-যুদ্ধ থাকে না! আপনি নিজেও তো একলা, আপনাকেও তো জীবিকার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দিনরাত?

কাজল বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন—

—কেন, আপনার কথা ছাড়বোই বা কেন? আপনিও তো এই সহরের একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ। আপনাকেও তো আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়—

কাজল বললে—আমার আবার ভবিষ্যৎ, স্কুল মাস্টারনীর আবার ভবিষ্যতের ভাবনা—

সুহাস বললে—আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা আপনাকে বলবো।

কাজলের বুকটা ধর ধর করে কেঁপে উঠলো। ভয়ে ভয়ে বললে—কী কথা?

সুহাস যেন সেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তি হতে চেয়েছিল। বলেছিল—আমার অনেক দিন থেকেই বলার ইচ্ছে, কিন্তু বলতে সাহস হয় না...

এর পর আর দাঁড়াবার সাহস হয়নি কাজলের। বললে—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি—

বলে কাজল আর দাঁড়ায় নি। সুহাসও আর ভয়ে তার অনুসরণ করেনি। কাজল যেন সেদিন তাদের স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে বেঁচেছিল।

এর পরে আর ব্যাপারটা চাপা থাকেনি। এর পরই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল কাজল। একেবারে বিয়ের আগের দিন বীণা জানতে পারলে। ভেবে যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—সে কি কাজলদি? তোমার বিয়ে? কাল? কখন হলো? কার সঙ্গে? আমি তো কিছুই টের পাইনি!

বীণার কথায় কাজল সেদিন মনে মনে হেসেছিল। যেন কাজল নিজেই জানতো! যেন জীবনে আগে থেকে সব জানা সম্ভব! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-বিচিত্র নক্সা পাতা আছে, তার বাঁকপথ গলি-ঘুপচি সব যদি জানতেই পারবে মানুষ তো জীবন এত জটিল হয় কখনও? জীবনে রং কখন ধরে আর কখন বদলায় কেউ কি আগে থেকে জানতে পারে? কাজলও জানতে পারেনি। আর জানতে পারেনি বলেই আজ আমাকে এই গল্প লিখতে হচ্ছে—

এ শুধু কাজলের গল্পই নয়, সুহাস-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়েরও গল্প। আর শুধু দুজনেরই বা কেন? আচার্যিরা, বীণা, তাদের গল্পও বটে। উনিশ শো তিরিশ-একত্রিশ-বত্রিশ যারা জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, যারা যুদ্ধের আগের আদর্শ সামনে রেখে জীবন-যুদ্ধে নেমেছিল তাদেরও গল্প। সেই সব দিন, যখন ছেলেরা চাকরি পায় না, মেয়েরা বিয়ে করতে বর পায় না, চার টাকা মণ চালের যুগেও যারা আধা উপোষ করে, যুগ বদলের পরে সেই সব মানুষের নিগ্রহ আর নির্বাচনের গল্প।

কোথায় গেলেন সেই সার পি সি রায়। সুহাস রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সেই স্যার। যিনি বাঙালীর ভবিষ্যৎ দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বার বার সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করতেন। কোথায়ই বা গেল সেই পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা আর কুস্তীর আখড়া। কোথায় গেল সেই সব স্কুলের শিক্ষক, পাড়ার অভিভাবকরা। শুভানুধ্যায়ী মানুষেরা একে একে সব কোথায় অন্তর্ধান করলেন।

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সেই যুগের ছেলে। সেই যুগের প্রতিনিধি। ছোটবেলায় দেশে বিধবা মাকে রেখে স্যার পি-সি-রায়ের দাতব্যের ওপর নির্ভর করে কলকাতায় এসেছিল। এসে স্কুলে পড়েছে। কুস্তীর ক্লাবে কুস্তী শিখেছে, ইউনি-ভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গিয়ে বক্তৃতা শুনেছে। বন্যার সময় কাঁধে কম্বল আর মাথায় চালের বস্তা নিয়ে সেবারত করেছে, শরীর ঠিক রেখেছে, মন ঠিক রেখেছে, স্বামী বিবেকানন্দর "ব্রহ্মচর্য" বই পড়েছে, নারীকে মা বলে জ্ঞান করেছে। সি-আর-দাস, গান্ধী আর সুভাষ বোস, জে-এন-সেনগুপ্তের বক্তৃতা পড়েছে খবরের কাগজে। দেহে মনে পবিত্রতার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শেষকালে সেই ছেলেই কিনা আধার জীবন-যুদ্ধে অপারগ হয়ে পুলিশের চাকরি নিয়েছে।

প্রথম প্রথম মনে কষ্ট হয়েছিল সুহাসের। যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে স্যারের কাছে যেন পুলিশের চাকরি নিয়ে সে সমস্ত বাঙালীর মুখে চুণ-কালি লেপে দিয়েছে।

সুহাস বলতো—জানো কাজল, আজ সুভাষ বোস এখানে এসেছিলেন মীটিং-এ, আর আমারই ডিউটি পড়েছিল—

সান্ত্বনা দিল কাজল। বলতো—তাতে কী হয়েছে, অত লজ্জা করবার কী আছে? তোমার মত আরো অনেক লোকই তো পুলিশের চাকরি করছে—

সুহাস বলতো—কিন্তু তারা তো কেউ আমার মত স্বদেশ পরেনি এক-বারে—

প্রথম প্রথম সুহাসকে সান্ত্বনা দিয়ে চাঙ্গা করে রেখেছিল বলেই চাকরিতে তার উন্নতি হয়েছিল তাড়াতাড়ি। কত স্বদেশীদের লাঠি মারতে হয়েছে, জেলে পুরতে হয়েছে। নুনের সত্যাগ্রহের সময় নিরীহ গোবেচারী সত্যাগ্রহীদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় পুরেছে। সে-সব দিনে সুহাস মাঝে মাঝে বড় মুষড়ে পড়তো। রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে একমনে চুপ করে থাকতো। মফঃস্বলের সদরে তখন চাকরি করছে সুহাস। চারদিকে স্বদেশীরা বোমা-গুলী-বারুদ নিয়ে আন্দোলন জুড়ে দিয়েছে। সেই সব দিনে পুলিশের চাকরি করা যে কী বিপজ্জনক, তা আজকালকার পুলিশরা কল্পনাও করতে পারে না। ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়েছে। গয়লা দুধ পর্যন্ত দিতে আসে না—পুলিশের কোয়ার্টারে। একলা বউ তখন বাড়ির মধ্যে। আর বুড়ি বিধবা শাশুড়ি।

শাশুড়ির তখন খুব বয়েস হয়েছে। শাশুড়ি বলতো—বৌমা, খোকা আজ এখনও বাড়ি আসেনি?

সুহাসকে এক-একদিন সমস্ত দিন সমস্ত রাত বাড়ির বাইরে থাকতে হতো ডিউটিতে, দুটো কনেস্টবল আর একটা রিভলবার ভরসা। সুহাসকে হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসীদের সামনে এগিয়ে যেতে হতো বুক ফুলিয়ে। এরই নাম পুলিশের চাকরি, এরই নাম পুলিশের ডিউটি। কেমন আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগলো তখন। বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে হতো।

আর কাজল সেই নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে একমাত্র বুড়ি শাশুড়িকে নিয়ে দিন কাটিয়েছে। সুহাসকে বুঝতেই দেয়নি তার নিজের মনের কথা। সুহাস যখনই সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে এসেছে, কাজল হাসি মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুহাস বলেছে—ভয় করছে না তো তোমার?

কাজল বলেছে—না, না, ভয় করবে কেন? তুমি তো আছো?

সুহাস বলেছে—আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, এ-চাকরি আমার পোষাবে না, বিবেকের বিরুদ্ধে আর কত যুদ্ধ করবো?

কাজল বলেছে—না না, তুমি অত ভেবো না, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও—কখনও অন্যায় কিছু না করলেই তো হলো!

সুহাস বলেছে—কিন্তু এও তো অন্যায়, এই কংগ্রেসীদের ধরে ধরে জেলে পোরা। তারা তো দেশের স্বাধীনতার জন্যেই প্রাণ দিচ্ছে—

এর পর কাজলের আর কিছু বলবার থাকতো না। এর পর সুহাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না!

বিয়ের দিন কেউই তো আসেনি। আসলে কে-ই বা ছিল সুহাসের যে আসবে। এসেছিল সুহাসের দু'চারজন বন্ধু। যারা একসঙ্গে হোস্টেলে থাকতো। মা দেশে ছিল, তাকে খবরটাই দেওয়া হয়েছিল শুধু, কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসবার সময়ও ছিল না, লোকও ছিল না। কারণ তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলেই চাকরিতে গিয়ে জয়েন করতে হবে মফঃস্বলে।

বাঁধার জন্যেই দুঃখ হয়েছিল কাজলের।

ফিলিপস উচ্চশক্তিসম্পন্ন ট্রানজিস্টার দ্বারা নির্মিত রেডিও সেট
৫টি ট্রানজিস্টার পোর্টেবল রেডিও আর্থ এরিয়ালবিহীন ক, খ বাক্সে ১৪৯৲—১১৫৲।
৪ ট্রানজিস্টার রেডিও ক, খ বাক্সে ৯০৲—১২০৲।
৪টি টর্চের ব্যাটারীতে চলে। ভাল রেডিওর মত স্পষ্ট ও জোরে বাজে। বাজারে অন্য স্থানে কেনার আগে আসিয়া শুনুন।
রেডিও ইলেকট্রো কোং
৪০-এ স্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা।

দত্ত এণ্ড পাইন
বাদার্স
জুয়েলার্স
৯১/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
ফোন ৩৪-৩৩০৪
কলিকাতা-১২

পূজায়
ঢাকাই বেনারসী
তাঁত ও সিল্কের
শাড়ী
এবং তৈয়ারী
পোষাক
ঈশ্বরচন্দ্র পাল
গঙ্গাপ্রসাদপাল এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
বড়বাজার-কলিকাতা-৭
আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ নাই

বাঁদুর
জুতা
সুন্দর ও
মজবুত
বাঁদু এণ্ড কোং
৭৫/এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

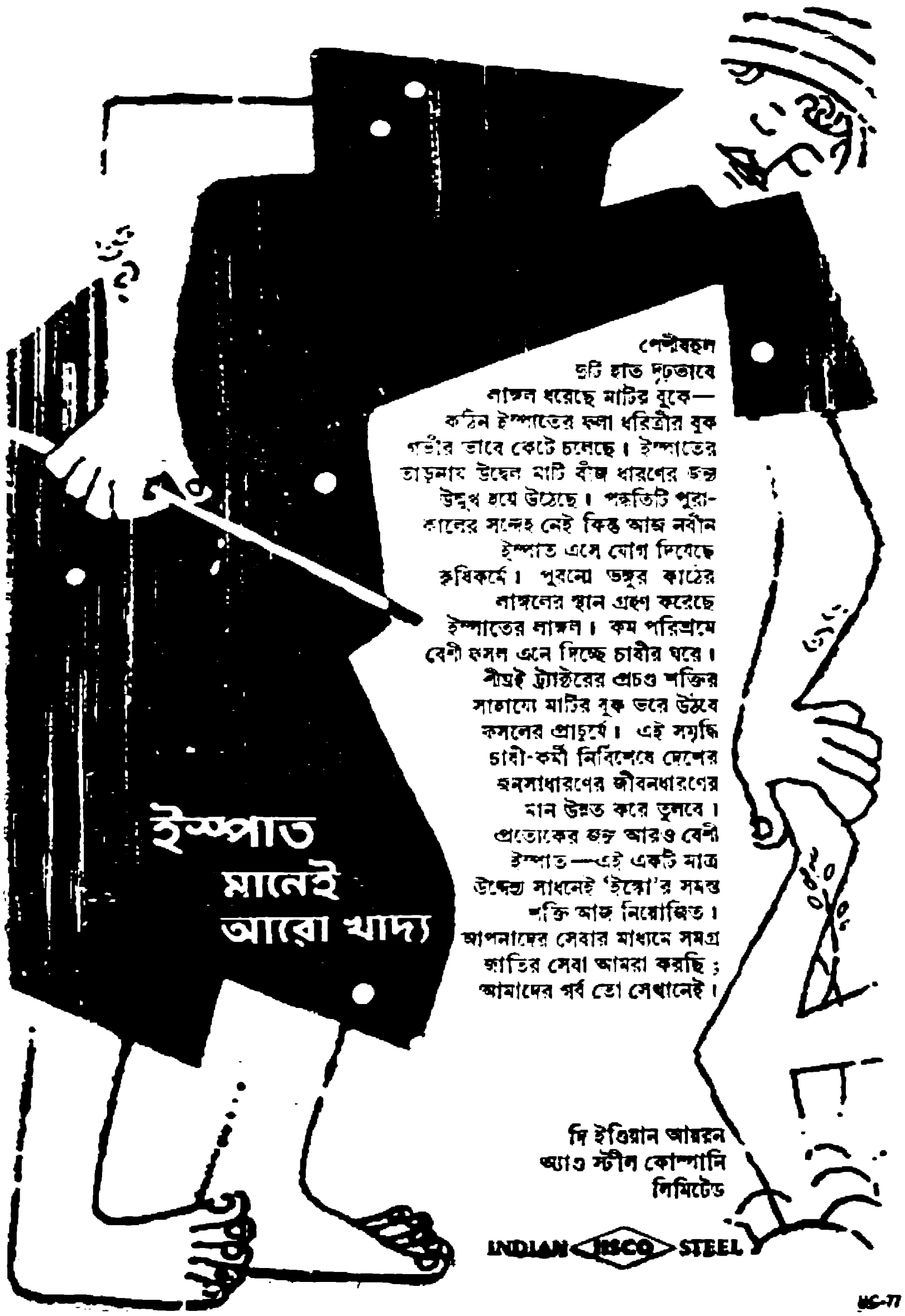
ইস্পাত
মানেই
আরো খাদ্য
শেষ বহন
দুটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধারণের জন্য
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL

বীণা বলেছিল—তুমি ছিলে কাজলদি তবু কাটতো এক রকম করে। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে কী করে কাটাবো!

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তোর আচারিয়ার খবর কী?

—সে তো পেনাঙ্-এ।

—ওমা, এই তো সেদিন শুনলাম ইউ-কেতে, আবার কবে পেনাঙ্-এ গেল!

বীণা বললে—আজকাল বড্ড কাজ পড়েছে ওর অফিসের। খুব খাটিয়ে খাটিয়ে মারছে—

—কিন্তু তোদের বিয়ের কী হলো শেষ পর্যন্ত?

বীণার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কী জানি কাজলদি, কথা তুললেই কেবল বলে—এবার ঘুরে এসেই একটা কিছু ঠিক করে ফেলবো!

বিয়ের আগে যতদিন কাজল কলকাতায় ছিল ততদিন বীণার মুখটা কেমন শুকনো শুকনো দেখাতো। সেই শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল কাজলের বিয়ের পর। সামান্য কয়েকজন লোকের নেমন্তন্ন হয়েছিল, কিন্তু বীণার মুখখানার দিকে চেয়েই কাজল নিজের বিয়েটা ভালো করে উপভোগ করতে পারেনি। ছোট একটা বাড়ির দু'খানা ঘর ভাড়া করে আরো ছোট একটা বিয়ের উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। সবাই যখন খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায় নিয়ে যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল, তখন বীণা এসেছিল কাছে। একান্তে কাজলের পাশে বসে বলেছিল—আমাকে যেন ভুলে যেও না কাজলদি—

কাজল বীণাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুই কী বলছিস্ মুখপুড়ী, তোকে আমি ভুলে যেতে পারি?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে সুরু করেছিল।

বলেছিল—আমার আর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কাজলদি! রাত্তিরে একলা-একলা আমার ঘুমই আসবে না—আমি কী করে যে থাকবো সেখানে—

কাজল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তুই কিছু ভাবিসনি ভাই, আমি সেখান থেকে তোকে প্রায়ই চিঠি লিখবো—

বীণা বলেছিল—কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে আমার কী হবে কাজলদি, তোমাকে তো আর পাবো না—

কাজল বলেছিল—এখন তুই তাই বলছিস বটে কিন্তু দেখবি তোর বিয়ে হয়ে গেলে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবি—

বীণা বলেছিল—না কাজলদি, তুমি দেখো, আমি কিছুতেই অন্যরকম হয়ে যাবো না—

কাজল বলেছিল—যখন আচারিয়ার সঙ্গে ইউ-কে আর সিঙ্গাপুরে আর পেনাঙ ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, তখন আমার কথাটা ভাবিস্ একবার—

—নিশ্চয় ভাববো কাজলদি, নিশ্চয় ভাববো, আমাকে তুমি তেমন পাওনি।

রাত্রে সুহাস বলেছিল—এই বুঝি তোমার বন্ধু বীণা?

কাজল বলেছিল—হ্যাঁ, ওর কথাই তোমাকে বলেছিলুম, আমাকে বড্ড ভালবাসে, আজকে একেবারে কেঁদে ভাসাচ্ছিল—আজ থেকে বেচারী একেবারে একলা হয়ে যাবে। আমার মত ও-ও একলা সংসারে। আমার কেউ-ই নেই, কিন্তু ওর সবাই থেকেও কেউ নেই—? ওর আপন মামারা ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, একটা খবরও কেউ নেয় না, ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে—

—ও বিয়ে করবে না?

কাজল বলেছিল—সবাই কি আমার মত ভাগ্যবতী?

সত্যিই কাজল মনে করতো সে বড় ভাগ্যবতী! সুহাসের সঙ্গে কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে প্রথম সংসার করতে গিয়ে বার বার নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিল সে। কেমন গুছিয়ে কেমন গানিয়ে-গুছিয়ে সংসার পেতেছিল কাজল। তা সুহাসের আজো মনে আছে। কী অশান্তির দিন সে-সব। থাক্ যুদ্ধের বাজনা দেশ। ঘরে ঘরে স্বদেশী, ঘরে ঘরে বিলিতি-বয়কট, ঘরে-ঘরে 'বন্দে-মাতরম'। ঘরে ঘরে বোমা, পিস্তল, বন্দুক। বাঙলা দেশের মেয়েরা পর্যন্ত নেমেছিল সেদিন দেশের কাজে। গান্ধীজীর ডাকে সভা-সমিতিতে মেয়েরা হাসিমুখে সোনার চুড়ি খুলে দিয়েছে। আর পুলিশের চাকরি নিয়ে সুহাস বিবেকের গলা টিপে নিজের দালভ-ভাত মোচন করেছে। পৃথিবীর কোথাও যখন সান্ত্বনার রেখাটুকুও দেখা যায়নি, অফিসের কর্তাদের কাছেও যখন সহানুভূতির শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে, তখন ঘরের কোনে তার জন্যে ছিল অপার মমতা, অসীম সান্ত্বনা।

কাজল বলতো—মন দিয়ে চাকরি করাও তো একরকমের পুণ্য। যারা তোমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করাটা কি তোমার উচিত?

সুহাস বলতো—এক-একবার ভাবি এ-চাকরি ছেড়ে দেব, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেও যে পার নেই, আমার পেছনে স্পাই লাগবে, আমার জীবন নিয়েই তখন টানাটানি—

কাজল বলতো—অত অধৈর্য হচ্ছো কেন, চিরকাল এ-রকম থাকবে না এক-দিন তো স্বরাজ হবেই দেশে—

—সে কবে হবে তার কি ঠিক আছে?

কিন্তু এই রকম দোটানার মধ্যেই একদিন যুদ্ধ থেমে গেল পৃথিবীতে। এতদিনের ধ্যান-ধারণা, এতদিনের তপ-তপস্যা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে পিষে থেতলে গেল। নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল্ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত স্তরে বিপর্যয় বেধে গেল রাতারাতি। স্যার পি সি রায়ের এতদিনের তপশ্চর্যার সমাধি হয়ে গেল রাতারাতি। যারা অসাধু তারা অসাধু হয়ে গেল, যারা সাধু তারাও আর সাধু রইল না। রাতারাতি রং বদলে গেল মানুষের, আর রং বদলে মানুষের মনের আর মানুষের চেহারার।

আর ঠিক এই ডামাডোলের মধ্যে সুহাস বদলি হয়ে এল কলকাতায়।

আর শুধু বদলি নয়, একেবারে প্রমোশন নিয়ে চলে এল কলকাতা শহরে। আবার সেই আগেকার কলকাতা। যে-কলকাতায় একদিন ছাত্রজীবন কেটেছে, যে-কলকাতায় একদিন সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি করেছে। এই কলকাতার পথে পথেই একদিন বন্যার্তদের জন্যে চাঁদা আদায় করে বেড়িয়েছে। আর এই কলকাতার রাস্তাতেই একদিন কাজলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। শুধু মা'ই দেখতে পেলে না ছেলের এই উন্নতি। যশোরের কোন্ এক অজ সাব-ডিভিশন সেটা। মুড়াগাছা। নামেও যা, কাজেও তাই। সেই মুড়াগাছার ছোট পুলিশ-কোয়ার্টারে ফিরে প্রথম কাজলও মুষড়ে পড়েছিল আর মা-ও মুষড়ে পড়েছিল।

মা বলেছিল—এ কোথায় নিয়ে এলি বাবা আমাকে?

সুহাস বলেছিল—চিরকাল কি আর এখানে থাকতে হবে মা, দু'এক বছর পরেই বদলি হয়ে যাবো অন্য কোথাও—

কাজলও প্রথম মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলতো না। মুখে বলতো—কই, আমার তো কোনও কষ্ট হচ্ছে না,

আমার তো ভাল লাগছে, আমার তো বেশ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে এখানে।

মায়ের বলতো—কলকাতাতে সেই ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, এখন এখানে এসে একটু সোঁচোই—

সুহাস প্রথম-প্রথম মন খারাপ করলে কাজলই বোঝাতো।

বলতো—আমরা কত সুখে আছি বলো তো? অন্য সব লোকদের কথা ভাবো, যারা মাসে-মাসে নিয়ম করে মাইনে পায় না, যারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না। তাদের তুলনায় আমরা কত সুখী বলো তো?

কিছুদিন থাকতে থাকতে মা'রও সহ্য হয়ে গিয়েছিল। মা'র শরীরটাও ভাল হয়ে গিয়েছিল। শীতকালের দিনে মা রোদে বসে রোদ পোয়াতো। বাড়ির সামনে সুহাস ফুলের বাগান করেছিল। লাউগাছ পুঁইগাছ পুঁতেছিল। কী মিষ্টিই যে লেগেছিল সেই-সব তরকারী। সারাদিন বাড়ির বাইরে থেকে মনটা যখন বিবেকের মাঝে লড়াই করে করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আসতো, তখন বাড়ি ফিরে এসে সংসারের আনন্দের মধ্যে আবার মনে হলো সে সুখী হয়েছে। হয়ত একদিন যে শিক্ষার মানুষ হয়েছিল সুহাস, সে-শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেনি। হয়ত স্যার পি-সি-রায়ের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল সে, কিন্তু সংসারের চার-দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে এসে তা আর তার মনে থাকতো না। সত্যিই মনে হতো সে সুখী। সাংসারিক লোক যাকে সুখী হওয়া বলে, সে-সুখ সে পেয়েছে।

কিন্তু দুঃখ থেকে গিয়েছিল মা'র জন্যে!

মা'র স্বাস্থ্য ভালোই হচ্ছিল মুড়া-গাছাতে। দেশ থেকে আসার পর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল, মন ভালো হয়েছিল। ছেলের চাকরি হয়েছে, ছেলের বউ মনের মত হয়েছে, বুড়ো মানুষের জীবনে আর কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

মাঝে-মাঝে মা বলতো—বৌমা, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না—

কাজল বলতো—আপনি ও-কথা বলবেন না,—ওতে আমাদের অকল্যাণ হয়—

—কিন্তু তোমার একটা ছেলে হলো না, সেই-ই আমার দুঃখু,—আমি এখান-কার মঙ্গলচণ্ডী তলায় গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি; জানো—

এমনি আবোল-তাবোল বুড়ো মানুষের কথা সব। কাজলকে সবই শুনতে হতো। কিন্তু বুড়ো মানুষ শেষ পর্যন্ত মনের সাধ অপূর্ণ রেখেই চলে গেল। মৃত্যুর আগের দিনে বলছিল—বৌমা, খোকাকে বোল, সে যেন ডাক্তার-টাক্তার দেখায়—

কিন্তু তারপরেই যুদ্ধ বেধেছিল। আর তারপরেই কলকাতায় বদলি হওয়া।

বীণা প্রায়ই চিঠি লিখতো। লিখতো—আমি এখনও সেই মেসটায় আছি কাজলদি, তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি একলাই আছি সেই ঘরটাতে। একটু বেশি খরচ হচ্ছে—কিন্তু কী করবো? কাউকেই আর ভালো লাগে না। একলা-একলা সারাদিন কাটাই। তুমি কবে কলকাতায় আসবে?

কাজলও সান্ত্বনা দিত চিঠিতে।

লিখতো—আমি যাবো শিগ্‌গির, কিন্তু শাশুড়িকে একলা ফেলে যেতে পারছি না। বুড়ো মানুষ, ভাল করে চোখে দেখতে পান না, সব সময় কাছে-কাছে থাকতে হয় আমাকে—

তারপর যখন যুদ্ধ বাধলো, তখন বীণা লিখলে—যুদ্ধ বেধেছে, তুমি বেশ

মুক্তি আসন্ন!

ভারত সরকার কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত ছবি

—: একমাত্র পরিবেশক :—

ইন্টার্ণ ফিল্ম ক্রাফট্‌স ৩সি, মাডান ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

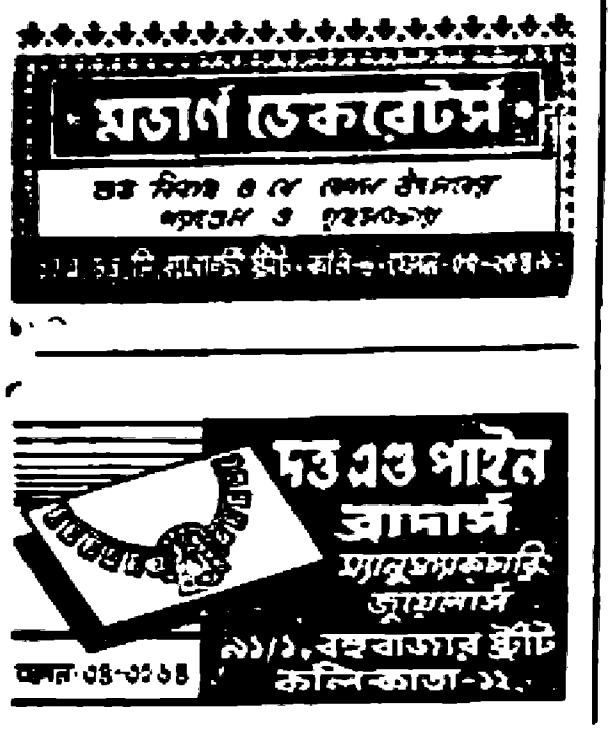

ঘরখানা আছে কাজলদি, আমি কোথায় যাবো বুঝতে পারছি না—

কাজল লিখলে—তুই চলে আয় এখানে, আমার কোনও অসুবিধে হবে না—

কিন্তু বীণা লিখেছিল—না, কাজলদি, এখন তো আমার ছুটি নেই। আর তা ছাড়া সময় কাটাবার জন্যে দু'একটা টুইশানি নিয়েছি, তাদের ছেড়ে যাই-ই বা কী করে?

কাজল লিখেছিল—যেদিন তোর খুশী চলে আসবি, আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির থাকবো—

কিন্তু তবু বীণা সময় করে উঠতে পারেনি। কিম্বা হয়ত যেতে সংকোচ হয়েছে। কাজলদি সুখে আছে, তার মধ্যে আবার কেন সে গিয়ে ব্যাঘাত করবে।

কাজল লিখেছিল—কই, অনেক দিন তোর খবর পাইনি, তুই আসবি বলেছিলি তার কী হলো? আর আচারিয়ার বা খবর কী? সে এখন কোথায়?

আচারিয়ার কথা একবারও লিখতো না বীণা। কাজল তখনই একটু সন্দিগ্ধ হয়েছিল। এত ঘনিষ্ঠতা তাদের এত পরিচয়। একদিন চিঠি না পেলে যে-মেয়ে অত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো, সেই মেয়ে একবার আচারিয়ার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে না।

কাজল পরের বার জোর তাগাদা দিয়ে লিখলে—বার বার করে তোকে আচারিয়ার খবর জানাতে লিখছি, তবু কেন লিখিস না? তার খবর কী? কোথায় সে? তার সঙ্গে কি দেখা হয় না? এর জবাব নিশ্চয়ই দিবি।

উত্তরে বীণা লিখলে—আচারিয়ার খবর জানতে চেয়েছ, কিন্তু সে-কথা চিঠিতে লেখা যায় না। যদি কোনওদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তোমাকে সব জানাবো।

এই চিঠিটা পেয়ে কাজল একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। নইলে বীণা তো এমন চিঠি লেখবার মেয়ে নয়!

এমনি করে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল। আসল খবরটা জানা যায়নি। আর তা ছাড়া কাজলেরও তো সংসারের কাজকর্ম আছে। তাকেও তো বুড়ো শাশুড়ি স্বামী—সবাইকে নিয়ে সংসার করতে হয়। সুতরাং কাজলও আগেকার মত আর ঘন-ঘন চিঠি লিখতে পারতো না। যা-ও লিখতো তা-ও ছোট-ছোট। কাজল কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল বলতে গেলে। তার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মনেও কিছু রং বদলেছিল। রং তো সকলেরই বদ্‌লায়। মন থাকলেই মনের রং বদলায়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছোট ছোট চিঠি পেয়ে কিম্বা দেরিতে চিঠি পেয়ে বীণা কিছু মনে করা ছেড়ে দিয়েছিল। বীণা জানতো তার কাজলদি বিয়ের পর বদলে যাবে। বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। বদলে না গেলেই বরং বুঝতে হবে বেঁচে নেই মানুষ। এই বদল, এই পরিবর্তন—এই-ই তো মানুষের জীবন।

এর পরেই বর্দাল হবার খবর এল।

কাজল লিখলে—তুই বোধহয় শুনে সুখী হবি, কলকাতায় আমরা বর্দাল হয়ে যাচ্ছি শিগ্‌গির—

বীণা লিখলে—কাজলদি, তুমি কল্যাণীতে আসছো শুনে কী খুশী যে হয়েছি কী বলবো! আবার যে তোমার সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি এলে সব বলবো তোমাকে, অনেক কথা জমে আছে মনে। তোমাকে না-বলতে পেরে আমার ঘুম হচ্ছে না। তুমি কবে আসবে লেখোনি কেন? কবে আসবে, নিশ্চয় পরের চিঠিতে জানাবে।

সুহাসের মনে আছে সেই দিনটার কথা। সেই প্রথম দিন। যেদিন বর্ষাণ গ্রামে এল কলকাতায়। ট্রেনটা এসে 'শেয়ালদা' ষ্টেশনে পৌঁছেছিল সকাল সাড়ে দশটায়।

তখন সবে যুদ্ধ বেধেছে। সে-'শেয়ালদা' ষ্টেশন যেন আর নেই। সে চেহারা যেন আমূল বদলে গিয়েছে, খাকি পোষাকে ভরা চারিদিক। পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকে-লোকারণ্য। মাত্র ক'বছরের ব্যবধান। তারই মধ্যে আরব্য উপন্যাসের মত সমস্ত ব্যাপারটার যেন রূপান্তর ঘটে গেছে।

ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালের কাছাকাছি আসতেই মুখ বাড়িয়ে দেখলে কাজল। আর কিছুক্ষণ। আর একটু পরেই দেখতে পাবে।

সুহাসও দেখছিল। বললে—আবার যে এখানে আসতে পারবো তা ভাবতে পারিনি—

কাজল বললে—জানো, বড় ভাল লাগছে আমার—

সুহাস বলেছিল—আমারও ভাল লাগছে—

কাজল বলেছিল—আমার ভাল লাগছে অন্য কারণে—

—কী কারণে?

সুহাস বললে—কারণ এখানে ভাল কোয়ার্টার পাবো, সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট বাড়ির মধ্যে তোমাকে বন্ধ থাকতে হবে না, এখানে কত কী আছে! কলকাতা সহর লাইফকে একঘেয়ে লাগতে দেয় না—

—কই, আমার তো একঘেয়ে লাগতো না সেখানে!

সুহাস বললে—মুখে না বললেও, আমি বুঝতে পারতুম তো। তাই অনেক চেষ্টা করে এখানে বদলি হয়েছি। কাজল বললে—কিন্তু তোমার ধারণা মিথ্যে, আমার সেখানে মোটে খারাপ লাগতো না। তুমি যেখানে থাকবে সেখানেই আমার ভাল লাগবে। তোমার ভাল লাগলে সব জায়গায় যেতে রাজি আছি—

বলতে বলতে প্ল্যাটফরমে এসে পৌঁছোল ট্রেনটা। মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা কুলীর দল মাল নেবে দাঁড়িয়ে আছে। লোক গিস্‌ গিস্‌ করছে প্ল্যাট-ফরমের ওপর। একটা অদ্ভুত গুম গুম আওয়াজ করতে করতে ট্রেনটা ঢুকলো।

জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নামতে একটু সময় লাগলো।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—তোমার সব নিয়েছ তো? কিছু ফেলে যাওনি তো?

কিন্তু কাজল তখন প্ল্যাটফরমের ওপর বীণাকে দেখে একেবারে দৌড়ে কাছে গিয়েছে।

বললে—এ কী চেহারা হয়েছে তোর ভাই?

বীণা বললে—কাজলদি, তুমি! আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই—

এদিকে সুহাসের অর্ডার্লি কানাই তখন এসে গেছে। যে গার্ড ট্রেনে ছিল সেও আরো পুলিশ কনস্টেবল ছিল তারাও এসে গেল। মালপত্র নামাতে কোনও অসুবিধে হলো না।

দি

ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিঃ

মিলস্ :
আহ্‌মদপুর, জিলা বীরভূম,
পশ্চিমবংগ

রেজিঃ অফিস :
১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, কলিঃ—১৩
ফোন :—২০-২১৭৭

অগ্রগতির পরিচয়ঃ—

	১৯৫৯—৬০ (পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র কয়েকদিনের জন্য)	১৯৬০—৬১ (প্রথম মরশুমে)
আখ মাড়াইয়ের মোট পরিমাণ	৯৭,০০০ মণ	৮ লক্ষ ১৭ হাজার মণ
চিনি উৎপাদন	৮,১০৪ মণ	৭৯০০০ মণ
মাড়াই হইতে চিনি উৎপাদনের শতকরা গড়পড়তা হার	৮·৭১%	৯·৮৫%

আগামী নভেম্বর মাস (১৯৬১) পরবর্তী মরশুম সুরু হইবে

এম, এন, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

দীপা বললে—কাজলদি, তুমি আরো সুন্দর হয়ে গেছো, সত্যি—

কাজল বললে—তোকে আর খোসামোদ করতে হবে না, বিয়ে হলে তুইও সুন্দর হয়ে যাবি—

আজ এতদিন পরে সেই সব দিনগুলোর কথা যেন নতুন করে ভাবতে ভাল লাগে সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। আজকের সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—তখন লোকে বলতো মিস্টার মুখার্জি, পুলিশের চাকরিতে মিস্টার মুখার্জির আগে আর কেউ এমন প্রমোশন নাকি পায়নি। গ্রেড কমপ্লিট না হতেই আর একটা গ্রেডে প্রমোশন পাওয়া। লোকে বলে চাকরিতে প্রমোশন পেতে গেলে ভাগ্যটা বড় কথা নয়, ফ্যাক্টারিটাই আসল। অর্থাৎ খোসামোদ না করলে কারিতে উন্নতি নাকি হয় না কারো।

তা বটে, মিস্টার মুখার্জির মনে পড়ে কবে কাকে খোসামোদ করেছে।

কমিশনার ছিল তখন গার্লিক। মিস্টার গার্লিক।

মিস্টার গার্লিক বলতো—আর ইউ দীপ মুখার্জি?

মিস্টার মুখার্জি বলতো—ইয়েস স্যার—

ওয়ারের সময়, তখন ক্রাইমের সংখ্যা বেড়ে গেছে সহরে। এখানে চুরি, ওখানে ডাকাতি। সমস্ত কলকাতা পাগল তখন টাকা নিয়ে। দুহাতে টাকা লুটতে হবে। পৃথিবীতে যত টাকা আছে সব টাকা চাই আমার। আমার যদি টাকা না থাকে তো কারোর টাকা থাকা চলবে না। তোমার যদি টাকা থাকে তো আমাকে তার ভাগ দিতে হবে। নইলে তোমাকেও আমার মত নিঃস্ব হতে হবে। আর শুধু টাকা নয়, তোমার স্ত্রীর মত আমারও নারী চাই। তোমার গাড়ির মত আমারও গাড়ি চাই। তোমার বাড়ির মতও আমার বাড়ি চাই। সব চাই আমার। তোমার যা আছে, আমারও তাই চাই।

মিস্টার গার্লিক বললে—মুখার্জি, দিস্ মাস্ট বি স্টপড্—এ আর টলারেট করা যায় না, এ কাজ করতেই হবে—

ঠিক হলো মিস্টার মুখার্জিকে স্পেশ্যাল পাওয়ার দেওয়া হবে। থানার ইন্‌চার্জ নয়। সমস্ত বেঙ্গলের থানার ইন্‌চার্জ। পোস্টটাও স্পেশ্যাল। মিস্টার মুখার্জির অবাধ ক্ষমতা। শুধু ওয়ার-পিরিয়ডের জন্যে এ পোস্টটা তৈরি হলো। সিমলা থেকে কনফিডেন্সিয়াল অর্ডার এসেছে। হোল ইণ্ডিয়ার পুলিস অর্গানিজেসনের মধ্যে থেকে লোক বাছাই করে পোস্ট করতে হবে। কোন সিলেক্‌শন নয়, কোনও ইন্টারভিউ নয়, একেবারে ঝাড়াই বাছাইয়ের ব্যাপার।

কলকাতাতে সুহাসের ওপর প্রীতি নজর পড়লো মিস্টার গার্লিকের।

বললে—সার্ভিসিজ সেকশনের কাজে আই সাটিস্‌ফায়েড মুখার্জি, আই নমিনেট ইউ—তোমার কিছু আপত্তি আছে?

রাত্রে কাজলকে বলতেই কাজল জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি কী বললে তুমি রাজি হয়েছ তো?

সুহাস বললে—না রাজি হইনি তোমাকে জিজ্ঞেস না করে রাজি হই কী করে?

কাজল বললে—বা রে, তোমার চাকরির ব্যাপারে আমি কী বুঝি তোমার যাতে উন্নতি হবে তাতেই মত দেওয়া উচিত—

—তবু তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কি আমি রাজি হতে পারি? সব কাজ তো তোমাকে জিজ্ঞেস করে তবে করি

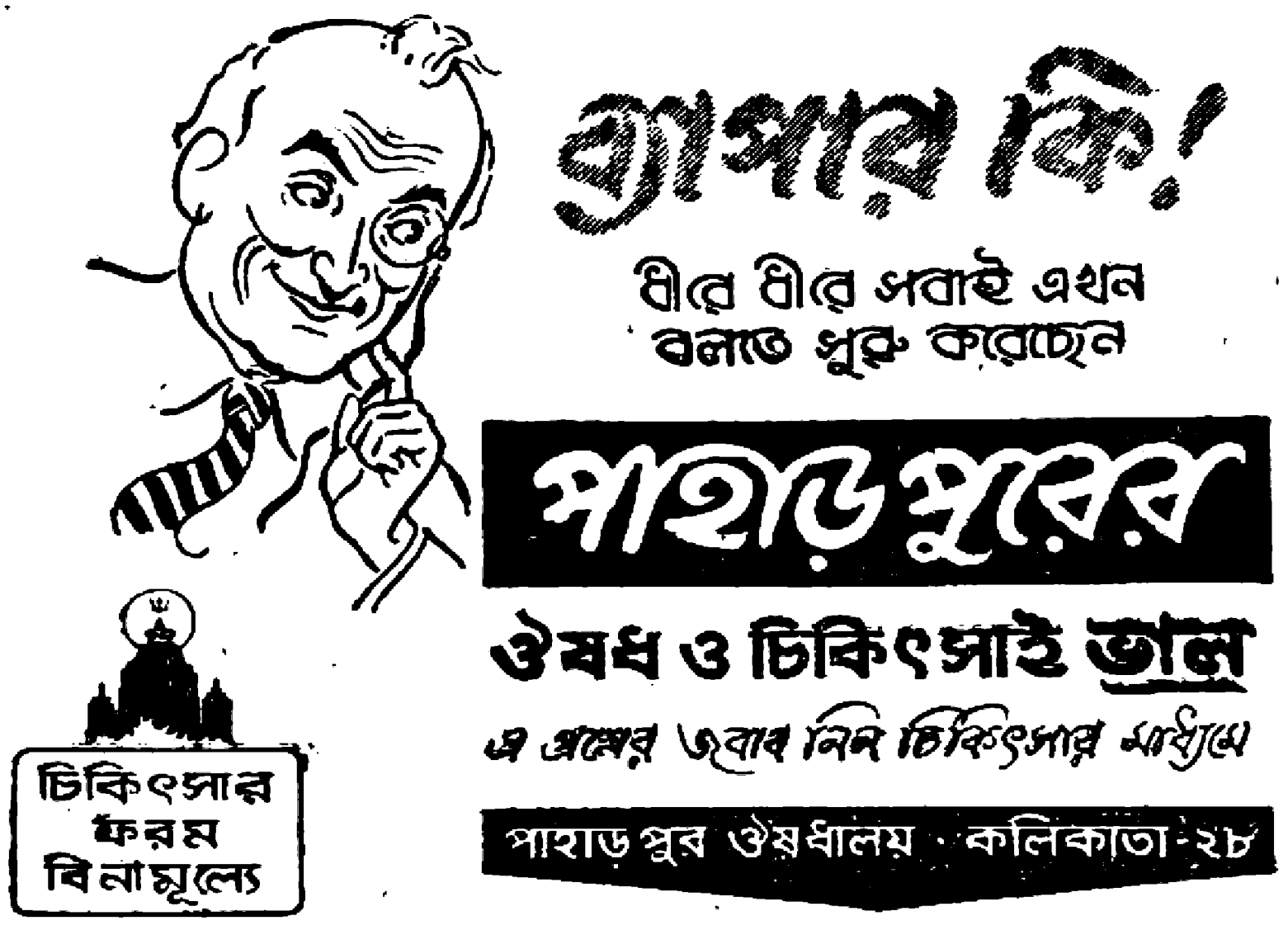

আমি দু'দিন সময় নিয়েছি মিস্টার গার্লিকের কাছে—

কাজল বলেছিল—মাইনে বাড়বে তো?

সুহাস বলেছিল—মাইনে তো বাড়বেই কিন্তু মাইনেটাই তো সব নয়—আরো অনেক ব্যাপারই তো ভাবতে হবে!

—আর কী ব্যাপার?

সুহাস বললে—মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হতে পারে—

কাজল বললে—তা যাবে!

—কিন্তু তুমি বাড়িতে একলা কী করে থাকবে?

কাজল বলেছিল—বা রে, আমি একলা থাকতে পারবো না। কলকাতা সহরে একলা থাকার অসুবিধে কী? মুড়াগাছায় সেই বন-জঙ্গলের মধ্যে একলা থেকেছি আর কলকাতা সহরে থাকতে পারবো না? এমন চাকরি কি কেউ হাত-ছাড়া করে?

—তাহলে নেব বলছো?

—নিশ্চয়ই নেবে! এ আবার জিজ্ঞেস করছো? এ-সুযোগ কজন পায়?

বাইরে সুহাস ছিল ইউনিফর্ম পরা ক্রস-বেল্ট্ আঁটা অফিসার। খাকি পোষাকে বাইরে থেকে দেখলে ভয় হতো, শ্রদ্ধা হতো, মাথা নিচু করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু আসলে কাজলের কাছে এলেই কেমন অন্য মানুষ। শিশুর মত কোমল, মেয়ে-মানুষের মত নরম।

কাজল বলতো—আচ্ছা, তোমাকে ভয় করে তোমার স্টাফ্রা?

—কেন, এ-কথা বলছো কেন?

—তোমাকে দেখলে তো মনেই হয় না, কেউ ভয় পায়। কেউ মানে তোমাকে?

সুহাস বলতো—বা রে, তাহলে আমার প্রমোশন এই রকম? না ঘাঁচলে কাজ চালাচ্ছি কী করে?

—আমার তো ভয় করে না।

সুহাস হাসতো, বলতো— তোমার কাছে কি আমি পুলিশ যে তোমার ভয় পাবে? তোমার কাছে তো আমি সুহাস?

সত্যিই সুহাস এক একদিন বাড়ি থেকে কোথায় চলে যেত। কখনও ময়-মনসিং, কখনও ঢাকা, আবার কখনও বর্ধমান। আবার কখনও চব্বিশ পরগণা। সঙ্গে থাকতো কনেস্টবল, সঙ্গে থাকতো অন্য সব সরঞ্জাম। যুদ্ধের সময় তখন। একলা-একলা বাড়িতে থাকতে একটু ভয় ভয় করতো। বাড়িটা ছিল সাহেব-পাড়ার মধ্যে। বাড়ির মধ্যে কেউ খুন করে গেলেও কারো টের পাবার কথা নয়।

উৎসবের আনন্দ পূর্ণ ক'রতে
আমাদের সাহায্য ক'রতে দিন

শারদীয়া উৎসবে সহজ কিস্তিতে

মাত্র ৪০৲ টাকায় চার ট্রানজিস্টার

- মার্ফি, এইচ, জি, ই, সি, নিপ্পন এবং সকল ধরণের ট্রানজিস্টার রেডিও মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা হারে।
- বিবিধ ডিজাইনের ট্রানজিস্টার টেপ সেল ব্যাটারী চালিত কিস্টোন সেট) লোকাল রেডিও মাসিক ৭৲ টাকা হারে।
- বিবিধ ডিজাইনের এসি/ডিসি ব্যাটারী লোকাল সেট মাসিক ৬৲ টাকা হারে।
- উষা সেলাই কল মাসিক ১০৲ টাকা হারে।
- জোয়ার্কিন এবং রেণল্ডের কাদাকেহ।
- কেবার লিউবা, রোলেক্স, ওফেন্ট এন্ড, এ্যাংলো সুইসের ঘড়ি।
- সকল প্রকার আসবাবপত্র, পাম্প, মোটর, প্রেসার কুকার, টাইপ-রাইটার এবং বহুপ্রকার অন্যান্য দ্রব্যাদি।
- উষা, ক্যাসেলস, ভবিষ্যৎ, ইন্ডিয়া এবং জি, ই, সি পাখার নূতন সম্ভার।

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী

শো-রুম সকাল ৯-৩০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা
২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস (দ্বিতীয় তল)
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ-র উপরে
ফোন নং : ২২-৩০১৬, ২২-৩১৩৮। কলিকাতা—১
বিনামূল্যে সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার

বড় বড় গাছ চারদিকে। মাঝে কোয়ার্টার, ওপাশে কলাই থাকতো অটো হাউসে। অরুন্ধতীও থাকতো অটো-হাউসে। বিনতে আসল রোজ নিজে নিজের শোবার ঘরের পাশে। বাগানে অনেকটা গুলমোহর আছে। অনেকটা পাম্। আর বড় বড় অনেকটা অশথ।

দিনের বেলা জায়গাটা ছায়া-ছায়া, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলো পড়লে তারি ভাল লাগতো। একলা-একলা ওইখানে বেড়াতে ভাল লাগতো। অনেক দিন গল্প করতো বিবির সঙ্গে।

একদিন বলেছিল সুনিল মিত্তির :
এই কলকাতাতেই আগে ছিলুম—

বিবি কপালটা কোঁচ্কালো—
আগে কলকাতা দেখিনি মাইজী-
প্রথম দেখলুম—

কাজল জিজ্ঞেস করতো—
কলকাতা ভিনে গেলি তো?

—হ্যাঁ মাইজী কলকাতা আমার
হয়ে গেল!

কাজল জিজ্ঞেস করতো—এ
আরো একটা বড় কলকাতা আ
জানিস?

—কোথায় মাইজী?

কাজল বলতো—সে জায়গার
বউবাজার। সে এ-রকম ভাইগা
সেখানে বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেষি। স
বেলা ধোঁয়ার জ্বালায় টেঁকা দায়
সেখানে। সেখানে রাস্তায় মানুষ
পাহাড় হয়ে থাকে। সেখানে এত
নেই—তুই যে-রকম ভাড়া-হুড়ুমে থাকি
ওই রকম বড়লোকের বাবু-বিবিরা ছো
মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করে—সে
মেস আছে। মেসের মধ্যে থেকে ও
ইস্কুলের যারা মাষ্টারণী তারা সে
খুব কষ্টে দিন চালায়—জানিস?

ছল। একদিনেই ঘরটা সাজিয়ে
ছে।

রেবাদি বললে—তুমি যে আমাদের
খেছ তাতেই আমরা কৃতার্থ ভাই,
তো ভাই প্রথমে ঢুকতেই সাহস
ন—

জকাদি, মলিনাদি তারাও সবাই সেই
কথাই বলেছিল।

কাজল বলেছিল—আপনারা কিন্তু
যেন রেবাদি মাঝে-মাঝে, আপনারা
আমি সত্যিই খুব খুশী হবো—
তো নতুন এসেছি কাল, আপনাদের
; খাতির করতে পারলাম না ভালো
—

ঙ্কাদি বলেছিল—তুমিও যেও
; ভাই—

—নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

পরের দিন বীণা আবার এসেছিল।
ল—সবাই খুব খুশী কাজলদি
বে ওপর, বলছিল তোমার ভাগ্যটা
ভালো, কিন্তু বলছিল তোমার
া-মেয়ে কিছু হয়নি কেন—

—ও কথা থাক্—আচারিয়ার কথা
—আচারিয়ার কথা বলছিস না কেন
?

বীণা বলেছিল—আমার কি-রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে কাজলদি, আচারিয়া যেন অন্যরকম হয়ে গেছে—

—অন্যরকম হয়ে গেছে মানে?

বীণা বললে—কী জানি, সে-রকম যেন আর নেই।

—কেন? তার চাকরি আর নেই?

—না, তা আছে, কিন্তু আগে তুমি যেমন দেখেছিলে তেমন যেন আর নেই। তেমন করে যেন আর অন্যদের মত ভালবাসে না আমাকে। একটুখানি দেখা

সদ্য প্রকাশিত—তিন সঙ্গী প্রকাশনীর সুবৃহৎ স্মরণীয় গ্রন্থ।
একালের এক আশ্চর্য জীবন বেদ!

ক্রৌঞ্চ-নিষাদ

অজিত দাশ

(৬.০০)

যা সত্য তা যতই অসুন্দর হোক তার নির্ভীক স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠায়, সুন্দর আনন্দময় জীবনে উত্তরণের পথ নির্দেশের প্রতিশ্রুতি ও জীবনবোধের সুতীব্র অনুভূতিতে সমৃদ্ধ এই উপন্যাস বর্তমান বাংলার দর্পণ। এমন বলিষ্ঠ উপন্যাস রচনার জন্য যে গভীর প্রত্যয়ের প্রয়োজন তা এই লেখকের আছে বলেই উপন্যাসটি আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে এনেছে বিচিত্র স্বাদ ও সমালোচকদের নিয়েছে বিতর্কের অবকাশ.....জীবনের এক নতুন দিক-নির্ণয়!

॥ প্রকাশের অপেক্ষায় ॥

অসিত গুপ্ত-র

এইসব আলো প্রেম

আধুনিক কালের রহস্য উপন্যাস

প্রকাশক : তিন সঙ্গী প্রকাশনী—৫পি-৭৬, শ্যামপুকুর-২, কলিঃ-৪

পরিবেশক : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিঃ-৭৩

করেই চলে যায়। বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। বলে—কাজ আছে—

কাজল জিজ্ঞেস করলে—বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলে?

ও কথা তুলতেই দেয় না, তুললেই অন্য কথা এনে ফেলে। তোমাকে এ-সব কথা চিঠিতে লিখতেও আমার খারাপ লাগতো কাজলদি, আগে কত ঘন-ঘন চিঠি দিত, এখন আমি দু'তিন খানা চিঠি দেবার পর একখানা দেয়—

—চিঠিতে কী লেখে?

বীণা বললে—লেখে আমি কেমন আছি, এই সব। আসল কথাটা একবারও লেখে না। কেবল এড়িয়ে যায়।

কাজল খানিকক্ষণ ভেবেছিল। তারপরে ভেবে বলেছিল—কিন্তু কেন বিয়ে করতে চায় না, বল্‌তো? তুই কিছু আন্দাজ করতে পারিস?

বীণা বলেছিল—না, কাজলদি, আমি কিছুই বুঝতে পারি না, আমার মনে হয়, আচার্যিরা বলেছে, আচার্যিরার কাছে আমি পুরোন হয়ে গেছি। আর মানুষ হয়ে বার বার নিজের মুখে নিজের কথা বলাতেই কি পারা যায়?

কাজল বললে—আচ্ছা, তুই এক কাজ কর তুই একবার আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দে—

বীণা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বলেছিল—তুমি দেখা করবে কাজলদি, সত্যিই তুমি দেখা করবে?

—নিশ্চয়ই দেখা করবো। তোর জন্যে আমি সব করতে পারি বীণা। তুই বোকা, তাই তুই আচার্যিরাকে এখনও জব্দ করতে পারলি না। আমি হলে ওকে এতদিনে কবে স্বীকার করিয়ে ছাড়তুম। নিশ্চয় ওর কোনও বদ্ মতলব আছে—

বীণা অতটা ভাবতে পারেনি। কিম্বা অতটা ভাববার সাহসই হয়নি তার। বললে—না কাজলদি, তুমি ঠিক বুঝছো না, আচার্যিরা অত খারাপ নয়, কিছুতেই অত খারাপ হতে পারে না—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, আমি এত বছর ধরে ওকে দেখে আসছি—ও কত বড় চাকরি করে, কত কাজে ব্যস্ত থাকে—

—কিন্তু তোকে বিয়ে করবে কি করবে না, সেটা তো খুলে বলবে?

—না কাজলদি তুমি ওর ওপর রাগ কোর না, সত্যিই ও সময় পাচ্ছে না। এত কাজ ওর যে আমার কথা ইচ্ছে থাকলেও ভাবতে পারছে না। বিয়ে করতেও যে সময় লাগবে, সেই সময়ই নেই যে ওর সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরতে হচ্ছে ওকে, মোটে সময়ই পাচ্ছে না—

কাজল বললে—কিন্তু এখন তো যুদ্ধ চলছে। এখন কোথায় যাচ্ছে ও?

—কিন্তু অফিস ওকে যে এখনও খাটাচ্ছে, এখনও বাইরে পাঠাচ্ছে ওরে চাকরি ওর প্রাণ বার করে দিচ্ছে কাজলদি, চাকরিটা ছাড়তেও পারছে না তিন হাজার টাকা মাইনের চাকরি এ হট্ করে ছাড়া যায়, তুমিই বলো?

—কিন্তু বিয়ে করেও তো ও-চাকরি করা যায়। সবাই-ই তো তাই করে সুহাসও তো করছে। দেখছিস না কী খাটুনি খাটতে হচ্ছে সারা দিন-রাত কতদিন বাড়িতে আসতে পারে না—তার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক?

বীণা বললে—না কাজলদি আচার্যিরা তো মিথ্যে কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বলবার লোক নয় ও, নিশ্চয় ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে—

কাজল বললে—তুই আর ওকে সাপোর্ট করিসনি বীণা, আমার কী রকম

বাসব দত্তা বিরচিত **গৃহস্থ বধূর ডায়েরী** দাম সাত টাকা

কবি মোহিতলাল মজুমদার
কাব্য-মঞ্জুষা (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ) ১০·০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানা
অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ) ৮·০০

নারায়ণ সান্যাল (Executive Engineer,)
বাস্তু-বিজ্ঞান (২য় সংস্করণ) ১০·০০
(Building Construction and Materials)

যোগেশচন্দ্র বাগল
মুক্তির সন্ধানে ভারত (৩য় সংস্করণ) ১০·০০

মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত
মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ৬·০০
পরমারাধ্যা শ্রীমা (৩য় সংস্করণ) ২·৫০

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং
বাণীকুমার ভট্টাচার্য সংশোধিত ও পরিবর্ধিত
হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস ৬·০০
(৪র্থ সংস্করণ)
কথা-কথালী ২·০০

নারায়ণচন্দ্র চন্দ
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ৭·০০

সুখময় মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক, শান্তিনিকেতন
রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ ১০·০০

Prof. W. T. Webb
Everybody's Letter-writer 5.00
(Revised 27th. Edition; contains about 500 letters)

ভারতী বুক ষ্টল
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন—০৪ ৫১৭৮;
গ্রাম— Granthlaya
পোঃ বক্স—১০৮০১।

CENTRAL LIBRARY

দ্রুত সমাপ্তির পথে !

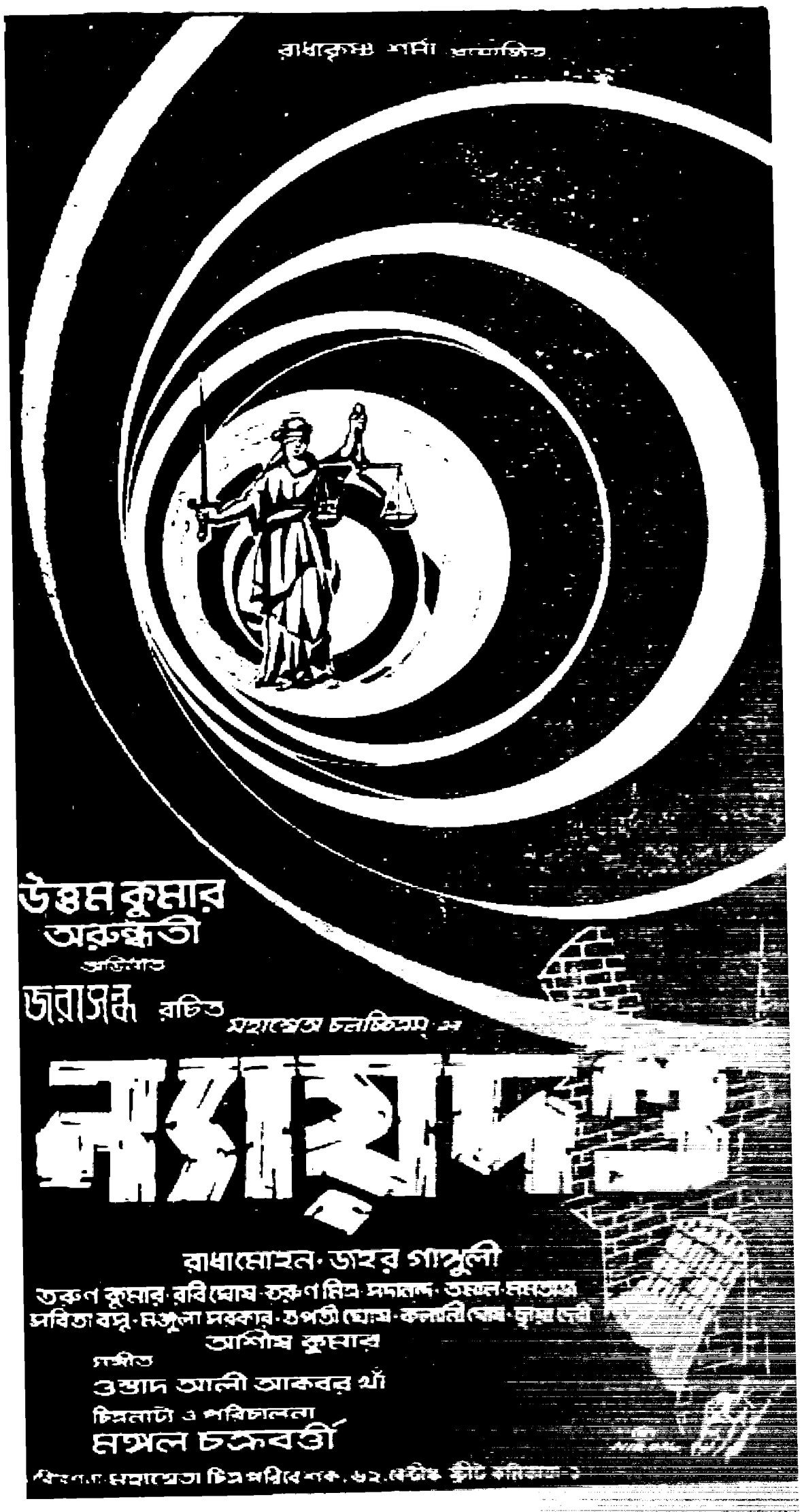

কাজল বলতো—নারে বিবি, দুনিয়ায় আমার কেউ নেই পৃথিবীতে—ওরা সব আমার বন্ধু, ওদের সঙ্গে আমি একসঙ্গে চাকরি করেছি—

বিবিও অবাক হয়ে যেত শুনে। বলতো—মাইজী, আপনার কাছ ছেড়ে আমি কোনওদিন অন্য জায়গায় যাবো না—

—কেন রে? অন্য জায়গায় যদি বেশি মাইনে পাস?

—তবুও যাবো না মাইজী। আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন আপনার কাছে কাজ করবো।

আশ্চর্য মানুষের মন। আশ্চর্য মানুষের মায়া-মমতা করবার ক্ষমতা। কেন যে মানুষ একজনকে এমন করে ভালবাসতে পারে, আবার কেনই বা এত ঘৃণা করতে পারে। যে-মানুষ আকর্ষণ করে, সেই মানুষই আবার দূরে ঠেলেও ফেলে। সুহাস এতদিন চাকরি করেছে, এত অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, তবু মনে হয়েছে এতদিনের শেখা যেন তার সব মিথ্যে। এতদিনের জানা যেন তার সব ভেজাল। মানুষকে যদি চিনতেই পারবে, তবে গল্প এত উপন্যাস লেখা হলো কেন পৃথিবীতে। অথচ সেই কাজল উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিল একদিন।

সুহাস একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কী করে সময় কাটাও তুমি?

—কী করে আর কাটাবো? তোমার কথা ভেবে ভেবে সময় কাটাই—

সুহাস হেসেছিল কথাটা শুনে। কাজলও হেসেছিল। আসলে কথাটা যে সত্যি তা দু'জনেই জানতো। সুহাস যেখানেই থাকুক কাজলের কথা মন থেকে কি দূর করতে পারতো। কাজলও যখন একা-একা ব্যালকনিতে চেয়ারটা এনে বসতো—বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো, তখনও সুহাসের কথা ভাবতো।

একদিন হঠাৎ দুপুরবেলাই সুহাস এসে পড়েছিল বাড়িতে। সামনের ব্যালকনির একটা টেবিলে লেখার কাগজ-পত্র। অনেক কিছু লেখা রয়েছে কাগজ-গুলোতে। এক বান্ডিল কাগজ। কাগজগুলো দেখে কিছুই বুঝতে পারেনি সুহাস। কাউকে চিঠি লেখছে নাকি এত বড়-বড়?

কাজল এসে পড়তেই সুহাস বললে—এগুলো কী গো? চিঠি?

—ওমা, তুমি কখন এলে?

—এই তো এখনি। কিন্তু এগুলো কী লিখছো গো?

কাজল বলেছিল—ও কিছু না, ও-সব তুমি দেখো না—

বলে কাগজগুলো গুটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুহাস ছাড়েনি। বললে—এত বড় চিঠি লিখছো কাকে তুমি?

শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়েছিল। কাজল বলেছিল—গল্প—

সুহাস অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—গল্প লিখছো তুমি? এত বড় গল্প?

কাজল বলেছিল—বসে থাকি তো সারাদিন, কোনও কাজই থাকে না দুপুরবেলা, তাই.....

—তুমি গল্প লিখতে নাকি কোন কালে?

কাজল বলেছিল—লিখি না, তবে গল্পের বই তো পড়েছি, সেই রকম করে লেখবার চেষ্টা করছি—

—কী নিয়ে লিখছো?

কাজল বলেছিল—আমার এক বন্ধুর জীবন নিয়ে—

—কোন্ বন্ধুর?

কাজল বলেছিল—সে তুমি চিনবে না—

সুহাস যখন আসতো সে-কদিন আর কোনও ভাবনা ছিল না কাজলের। কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত, টের পেত না কেউ। কাজের কি শেষ আছে! সমস্ত দিন ধরে গল্প করেও ফুরতো না—আবদুল বিবি কানাই—ওরাও যেন কেমন খুশী হয়ে উঠতো সে-কদিন। কিন্তু যুদ্ধ যত বাড়তে লাগলো, সুহাসের কাজ যেন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগলো। সারা পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে যেন সারা পৃথিবীর মানুষই যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

গার্লিক সাহেব বলতো—মুখার্জি, আরো স্টাফ বাড়াতে হবে, আমাদের স্টাকের সর্টেজ হচ্ছে—

যুদ্ধের যারা বিপক্ষে তাদেরই শায়েস্তা করা কাজ স্পেশ্যাল স্কোয়াডের। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে জাল পেতে ফেলেছিল গার্লিক সাহেবের ডিপার্টমেন্ট। র‍্যাপ্টি স্পেশ্যাল এলিমেন্ট কোথাও দেখলেই তাদের ধরে চালান দিতে হবে। তারপর যখন সময় হবে, তখন বিচার হবে, কিম্বা বিচার হবে না। কিন্তু যুদ্ধের কাজে বাধা দেওয়া চলবে না। ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজে সাহায্য করে যাবে এই পুলিশের স্পেশ্যাল পুলিশ স্কোয়াড্।

যখন সুহাস অনেক দিন পরে বাড়ি আসতো, কাজল আনন্দ দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে তার সব ক্লান্তি দূর করতে চেষ্টা করতো। তারপর আবার একদিন বাইরে যাবার নির্দেশ আসতো। আবার একদিন ব্যাগ-ব্যাগেজ গুটিয়ে নিয়ে অর্ডার্লি কনেস্টবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো সুহাস। কখনও সাত দিন, কখনও পনেরো দিন। বাঙলা দেশে কোনও জেলা, কোনও গ্রাম দেখতে আর বাকি থাকেনি সুহাসের।

কাজল জিজ্ঞাসা করতো—আর কত-দিন চলবে তোমার এই রকম ঘোরা-ঘুরি?

সুহাস বলতো—যুদ্ধ যতদিন চলবে—

—আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?

সুহাস বলতো—যুদ্ধ চলে গেলে আমার এই স্পেশ্যাল চাকরিও তো চলে যাবে—আবার যে-কে-সে—

হয়ত ভালোই হয়েছে। সুহাসের মনে হতো হয়ত এ ভালোই হয়েছে। এ না হলে তো আবার তাকে সেই সাব-ডিভিসনের চার্জ নিয়ে গ্রামে যেতে হবে। সেখানে কোথায় থাকবে এই কোয়ার্টার, কোথায় থাকবে কাজলের এই মানসিক আরাম। যে-ক'বছর কলকাতায় আছে, সেই ক'বছরই তবু কাজল আবার তার পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প করতে পারবে। কাজলের সুখটাই তো বড় কথা। কাজলের আনন্দই তো তার আনন্দ।

বীণা এলেই কাজল জিজ্ঞেস করতো—কী রে, এল আচারিয়া?

বীণা বলতো—না কাজলদি, কী যে করবো বুঝতে পারছি না—চিঠিও পাচ্ছি না বহুদিন ধরে—

—কিন্তু বর্মায় তো যুদ্ধ চলছে! এ-সময়ে সেখানে গেল কেন?

—আর কেন কাজলদি, চাকরির জন্যে?

—কিন্তু চাকরিটা বড় না জীবন বড়ো?

বীণা বলতো—যখন গিয়েছিল সেখানে, তখন তো যুদ্ধ বাধেনি, এখন এমন হবে কে জানতো?

—এখন হয়ত সেখানে আটকে গেছে, তাই আসতে পারছে না। আর সেইজন্যেই হয়ত চিঠিও লিখতে পারছে না!

বীণা বলতো—তাই হবে হয়তো—

কাজল বলতো—তা সে যাই হোক, এখানে এলে একবার তুই নিশ্চয় নিয়ে আসবি আমার কাছে, আমি সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নেব—কী চায় সে—

CENTRAL LIBRARY

জিজ্ঞেস করতে পারলে না কেউ। দুইভাই দাঁড় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজল আর বীণা দুজনেই তাতে উঠে চলে গেল।

আবদুল কানাইকে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গেল মাইজী?

কানাই বললে—আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি তার কী জানি? মাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?

কিন্তু মা'তো এমন করে বেরোয় না কোনওদিন। কোনওদিন এমন করে দরজা বন্ধ করে কারোর সঙ্গে কথাও বলে না। কলকাতায় আসার পর সেই-ই বোধহয় প্রথম মা একলা একলা বেরোল। আগে কখনও বেরোয় নি তা নয়। নতুন বাড়িতে এসে জিনিস-পত্র কেনা-কাটা নিয়ে কত-দিন বেরিয়েছে সাহেবের সঙ্গে। আবার একসঙ্গে দুজনে বাড়ি ফিরে এসেছে। ফিরে এসে কোনওদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রেডিও শুনেছে, গল্প করেছে। তখন আবদুল, বিবি, কানাই যে-যার ঘরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত সাহেবের ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছে। তারপর কখন আলো নিভে গেছে, কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ খোঁজ-খবর রাখেনি।

যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক্-আউটের রাতে বাইরে থেকে আলো দেখা যেত না। সেই তখনও কানাই অনেক রাত পর্যন্ত বাবু আর মার গলা শুনতে পেতো। বোঝা যেত ভেতরে দুজনের খুব জোর জোরে কথা হচ্ছে। বাইরে থেকে শুনে মনে হতো যেন ঝগড়া করছে বাবু আর মা। কিন্তু সকালবেলা বোঝা যেত কিছুই।

কাজল বলতো—আর এক কাপ দেব তোমাকে?

সুহাস বলতো—না, আর নয়, দুকাপ তো খেয়ে ফেলেছি এরই মধ্যে—

সেদিন হঠাৎ সুহাস এসে পড়ে মফঃস্বল থেকে। অভাবনীয়, কনেস্টেবল সবাই মিলে হুট্ করে এসে পড়ে। কানাই ছিল নিজের ঘরে। গেট খোলার শব্দ হতেই একটু দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে। কে? কে এল মা নাকি?

আবদুলও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবে নিজের বিছানাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল সবে। হঠাৎ বাইরের শব্দ শুনে বুঝলে মাইজী এল।

বিবিও কিমোচ্ছিল। শব্দ পেয়ে ধড়-ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। মাইজী এসে গেছে। মাইজী এসে খাওয়া-দাওয়া করে

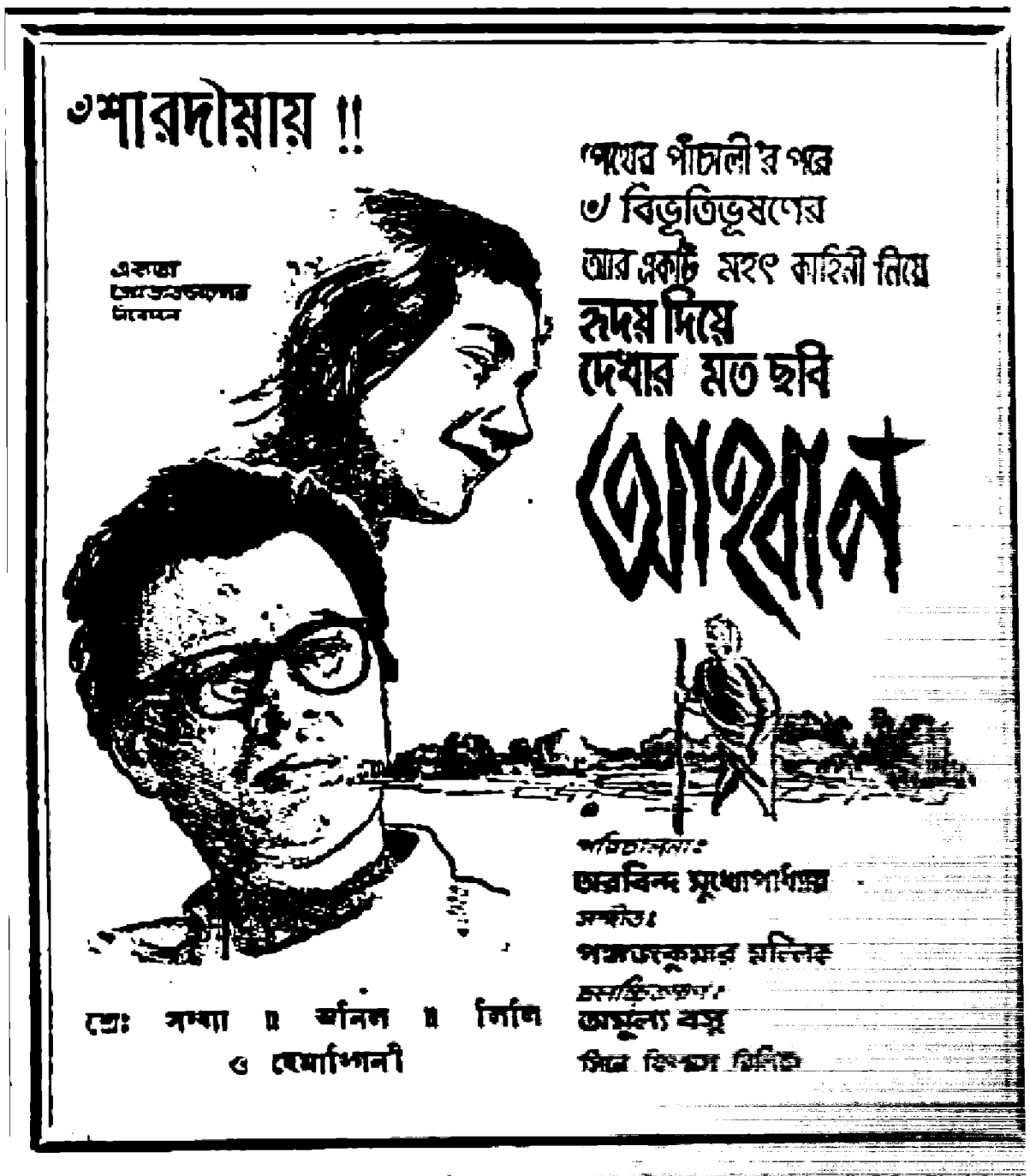

তবে তার কাজ শেষ। তবে সে গিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে পারবে।

কিন্তু সাহেবের গলার শব্দ পেয়েই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

কানাইকে সামনে পেয়েই বাবু জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় রে কানাই? বাড়ি নেই?

কানাই আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—না, বাড়ি নেই—

—বাড়ি নেই তো কোথায় গেছেন?

কানাই বললে—আজ্ঞে, তা তো বলে যান নি—

—কখন বেরিয়েছেন?

—সেই সন্ধেবেলা!

সন্ধেবেলা! সন্ধেবেলা থেকে বেরিয়েছে। সন্ধেবেলা থেকে এই এত-ক্ষণ! সুহাস ঘড়িটা দেখলে একবার। এতক্ষণ ধরে কোথায় আছে কাজল!

আবার জিজ্ঞেস করলে—কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?

—আজ্ঞে না তো!

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বিবিকে জিজ্ঞেস করতো—

কানাই বিবিকে জিজ্ঞেস করে এল। সেও জানে না। আবদুলকে জিজ্ঞেস করে এল, সে-ও জানে না। এমন তো কখনও হয়নি। কলকাতায় এতদিন হলো এসেছে। কখনও হয়নি। তা ছাড়া এই ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে কোথায় গেল সে!

নতুন করে আবার রান্না করলে আবদুল। খেয়ে-দেয়ে নিলে। তারপর চুপ-চাপ বসে রইল হাঁড়ি-চেহারে হেলান দিয়ে। হেলান দিয়ে ক্লান্তিতে কোথায় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ কাজলের গলার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

—ওমা, তুমি কখন এলে?

সুহাস চোখ খুলতেই দেখলে কাজল সেজে-গুজে ঘরে ঢুকেছে। গায়ে সেন্টের গন্ধ। কপালে একটা টিপ্ পরেছে। ঠোঁট দুটোতে যেন পান খেয়ে রাঙা করা।

কাজল বসে পড়লো একেবারে পাশ ঘেঁষে। বললে—আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি আজকেই আসবে!

—এমনি কাজটা মিটে গেল আর এসে পড়লুম।

কাজল বললে—তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?

সুহাস মৃদু বললে—হ্যাঁ—

কাজল একটু হেসে আরো কাছে সরে এল। বললে—কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না আমি কোথায় গিয়ে-ছিলুম?

সুহাস বললে সত্যি, কোথায় গিয়ে-ছিলে এত রাত পর্যন্ত?

কাজল বললে—বলো তো কোথায়?

—তোমার সেই সব পুরোন বন্ধুদের কাছে বুঝি? সত্যি, একলা-একলা তোমার থাকতে ভালোই বা লাগবে কেন? আমি না-হয় কাজে ব্যস্ত থাকি, আমার সময় এক-রকম করে কেটে যায়। তোমারই অসুবিধে। তুমি তো এখনও খাওনি?

কাজল বললে—না, বিকেল বেলা তো অনেক পেট ভরে খেয়ে গিয়েছিলুম, তাই আর খিদে ছিল না।

—কিন্তু এত রাত করলে কেন? ব্ল্যাক-আউটের রাতে এতক্ষণ কি বাইরে থাকা ভাল?

তারপর খাওয়া-দাওয়ার শেষে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাবু আর মা অনেকক্ষণ ধরে কথা-বার্তা বলেছে। কানাই আবার গিয়ে আউট-হাউসের ভেতর শুয়ে পড়েছে। আবদুলও শুয়েছে, বিবিও ঘুমের ঘোরে ঢুলছিল, সেও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। মাঝরাত্রে কানাই একবার ঘুম থেকে উঠেছিল। দেখলে জানালার ভেতর দিয়ে তখনও ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। তখনও যেন বাবু আর মার কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব জোরে-জোরে কথা বলছে। বাইরে থেকে কান পেতে শুনলে মনে হয় যেন দুজনে ঝগড়া করছে।

কিন্তু সকাল বেলা মুখ দেখে আর কিছু বোঝবার উপায় নেই।

কাজল চা-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললে—আর এক কাপ চা দেব তোমাকে?

সুহাস বললে—না, আর নয়, দু'কাপ তো খেয়ে ফেলেছি এর মধ্যে—আর খাবো না—

সে-কথা বলার যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল। কানাই-এর কাছে যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। বাবু কোথায় কোথায় বেরিয়ে যেত, আর হুট্ করে একদিন চলে আসতো। সাহেব-পাড়ার সেই নিরিবিলি বাড়িটাতে কানাই-এর বলতে গেলে কোনও কাজই ছিল না।

বীণা সেদিন আবার এল হঠাৎ।

বললে—কাজলদি, আচারিয়া কলকাতায়—

—কলকাতায়? বলিস্ কী রে? সে বর্মায় ছিল বলেছিলি?

বীণা হেসে ফেললে। বললে—আমি তাকে চৌরঙ্গী রাস্তায় দেখলুম আজ—

—রাস্তায়? তাহলে কবে এল সে?

বীণা আর কথা বলতে পারলে না খানিকক্ষণ। তারপর বললে—আর এক জন মেয়ের সাথে দেখলুম তাকে আজ—

—মেয়ে? মেয়েটা কে? কোথাকার মেয়ে? চিনিস্ তুই?

বীণা বললে—না কাজলদি, দেখে মনে হলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আমাকে দেখতে পায়নি। আমি ট্রাইশ্যাম্‌ নেমে ফিরছি হঠাৎ বাস থেকে দেখতে পেলুম বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে—

কাজল বললে—তাহলে বর্মায় যায়নি? এখানেই ছিল এতদিন?

—তা জানিনা কাজলদি, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে!

কাজল বললে—তা তুই তখুনি বাস থেকে নেমে কথা বলিস নি কেন?

বীণা বললে—আমার কেমন ভয় করতে লাগলো কাজলদি, আমি সোজা বাস থেকে নেমে উল্টো দিকের বাস ধরে তোমার এখানে চলে এলাম—

—তা এখন কী করবি? তুই আচারিয়ার বাড়ি চিনিস? কোন্ হোটেলে থাকে জানিস?

বীণা বললে—জানলেও সেখানে আমি একলা যেতে পারবো না, সেইজন্যেই তোমার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম, কী করি বলো দিকিনি?

কাজল বললে—চল্, আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে—

—তুমি যাবে?

তারপর বিবিকে ডাকলে কাজল। বিবি এল। নতুন ধোয়ানো শাড়ি-ব্লাউজ্ বার করে দিলে। আবার গাড়ি বেরোল। যাবার সময় বলে গেল—ফিরতে দেরি হবে, আবদুল কানাই সবাই যেন খেয়ে নেয়—

মাইজী বেরিয়ে যাবার পর আবদুল জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গেল রে মাইজী?

কানাই বললে—আমি কী জানি? আমাকে কি বলে গেছে?

বাবু হঠাৎ সেদিন রাত দশটার সময় হাজির হলো। সঙ্গে তার আড়াই কন্‌স্টেবল সবাই। গেট খোলার শব্দ পেয়েই কানাই দৌড়ে গেছে।

বাবু জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় রে কানাই?

—আজ্ঞে মা তো বেরিয়েছেন।

—কোথায় বেরিয়েছেন?

কানাই বললে—তা তো জানি না বাবু! আমাকে কিছু বলে যান্ নি।

—আবদুল জানে? বিবি? বিবি কিছু জানে?

তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে এসে কানাই বললে—আজ্ঞে না বাবু, ওরাও কেউ জানে না—

সেদিনও খাওয়া-দাওয়া সেরে ইজি চেয়ারটায় হেলান্ দিয়ে বসেছিল সুহাস। কানাই চলে গেছে। আবদুলও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সুহাসেরও ক'দিনের ক্লান্তির পর একটু বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ কাজলের গলার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল—

—ওমা, তুমি? তুমি কখন এলে? তোমার তো হঠাৎ আসার কথা ছিল না? খাওয়া হয়েছে তোমার?

সুহাস বললে—হ্যাঁ—

কাজল বললে—তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না, আমি কোথায় গিয়েছিলুম?

সুহাস বললে—সত্যি, কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত?

—বলো তো কোথায়?

সুহাস বললে—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বুঝি? সত্যি, একলা-একলা তোমার বাড়িতে থাকতেই বা ভালো লাগবে কেন? ভালোই হয়েছে একটু বেড়িয়ে এসেছো—

তারপর কানাই মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে একবার দেখেছে তখনও আলো জ্বলছে বাবুর ঘরে। বাবু আর মা দুজনের কথা শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে। জানালার পাশে গিয়ে শুনেছে কানাই বাবু আর মা দুজনে যেন ঝগড়া করছে। কথাগুলো বেশ জোরে জোরে বলছে দুজনে। তারপর আবার কানাই শুতে গেছে।

কিন্তু সকাল বেলা আর কিছু বোঝা যায় না। আবার দুজনের বেশ হাসি-হাসি মুখ। আবার দুজনে এক-সঙ্গে চা খেতে বসেছে বারান্দাতে।

এই বাড়িতেই একদিন হঠাৎ উৎসবের আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। বেশ রীতিমত জোরদার উৎসব। বর এল বরযাত্রী এল। কানাইও খেটেছিল। আবদুল সেদিন বেশ মোগলাই সাজে সেজেছিল। কানাইও তাই। বিবিও নতুন সাড়ি পেয়েছিল।

প্রথমে কিছুই জানতো না কানাই।

মা বলেছিল—কানাই, বিয়ে হবে বাবা-দিদিমণির, জানিস তো? খাটা-খাটুনি করতে হবে তোকে, পারবি তো তুই? অনেক লোক-জন খাবে, অনেক বরযাত্রী আসবে—

আগে সেই সাহেব পাড়ায় কখনও এমন করে ডিশটী দিয়ে হয়নি। মটর-গাড়িটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতরে বর এসেছিল। ব্রাইড আউটএর জন্যে আলোর বাহার হয়নি বেশি। চারদিক ঢাকা সুহাসের নিজের অনেক বন্ধু-বান্ধব এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। পরিবেশন করতে করতে হিম্-শিম্ খেয়ে গিয়েছিল কানাই। আর কানাই তো একলা নয়। আরো অনেক ভাড়া করা লোক এসেছিল। কানাই-এর সঙ্গে গম্-গম্ করছে তখন সমস্ত সাহেব-পাড়াটা।

তখন সরোজ এসে পৌঁছোয়নি। সরোজ নিজে বর, সরোজের সঙ্গেই বরযাত্রীর দল আসবার কথা।

কাজলের শোবার ঘরে মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে। তারই নিচে বসে কাজল নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল বীণাকে। ভ্যানিটি ব্যাগ দিয়ে বীণার মাথার বেণীটা জড়িয়ে দিয়েছিল। কুমকুমের টিপ্ পরিয়ে দিয়েছিল কপালে। মুখে পাউডার-স্নো-মাখিয়ে দিয়েছিল।

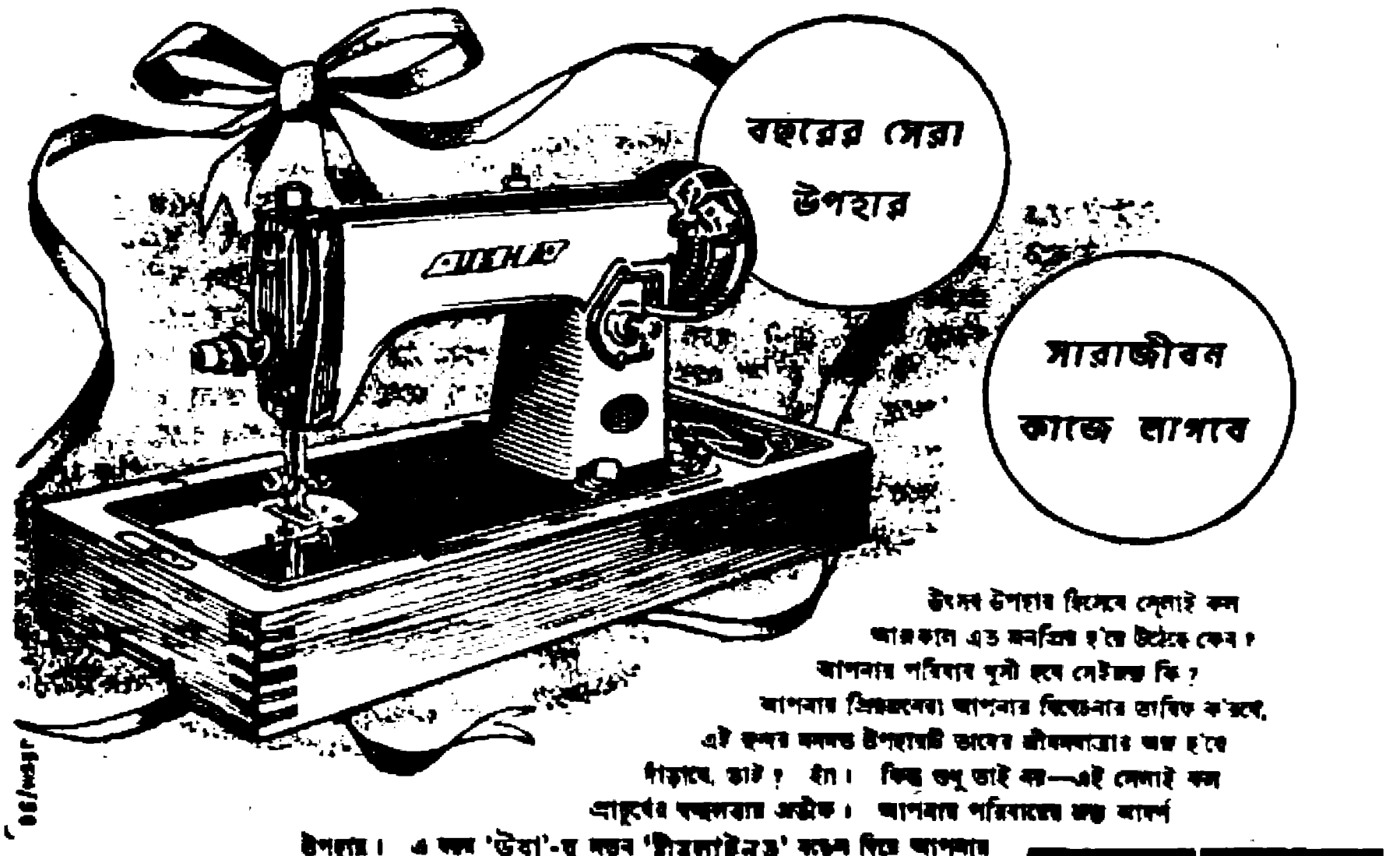

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল
আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন?
আপনার পরিবার খুশী হবে সেইজন্য কি?
আপনার প্রিয়জনেরা আপনার বিবেচনার তারিফ ক'রবে,
এই সুন্দর সমস্ত উপহারটি তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে
দাঁড়াবে, তাই? হাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল
প্রাচুর্যের স্বচ্ছলতায় অদ্বিতীয়। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ
উপহার। এ কল 'উষা'-র নতুন 'স্ট্রীমলাইন্ড' মডেল দিয়ে আপনার
পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন
আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত
—এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হলো।

উষা
সেলাই কল

এস ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, কলিকাতা-২০

কাজল বলেছিল—এবার তোকে চমৎকার দেখাচ্ছে ভাই—

বীণা চুপি চুপি বলেছিল—আমার বড় ভয় করছে কাজলদি—

—ও-সব কথা মোটে আর ভাবিসনি!

বীণার তবু ভয় যায়নি। যত ঘামছিল, তত থর থর করে, কাঁপছিল। একটা অপ্রকাশ্য আতঙ্কে সমস্ত শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। যদি জানতে পারে। যদি সে...

কাজল বলেছিল—তুই কিচ্ছু ভাবিস নি। সমস্ত দায়িত্ব আমার, আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিবি। যদি কিছু বলে তো বলবি, কাজলদি সব করেছে—

—কিন্তু তুমি তো জানো কাজলদি, আমার কোন দোষ নেই, আমি তো সুখী হতেই চেয়েছিলুম! আমি তো সব অপমান নিজের মাথাতেই তুলে নিতে চেয়েছিলুম। তবু কেন সে এমন করলে?

কাজল বীণার চোখ মুছিয়ে দিয়েছিল নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে। বলেছিল—ছিঃ, আজকের দিনে অমন কথা বলতে নেই অমন কথা মনে আনাও পাপ—

বীণা বলেছিল—কিন্তু কাজলদি, সত্যি বলো তো তুমি আমার কোনও দোষ ছিল?

কাজল বলেছিল—আবার ওই সব বলছিস্? সরোজ যদি শোনে, কী ভাববে বল্ তো?

বীণা বলেছিল—আমিও তো তাই ভাবি কাজলদি, সরোজ যদি জানতে পারে এ-সব, কী ভাববে সে?

—খবরদার যেন এ-সব কথা বলিসনি তুই!

—আমি তো বলবো না, কিন্তু যদি কখনো জানতে পারে?

তারপর ঘরের মধ্যে অনেক লোক-জন ঢুকে পড়েছিল, আর কিছু কথা হয়নি। আর কোনও কথা হবার সুযোগ হয়নি। তখন সরোজ এসে গেছে। চার-দিকে বরযাত্রীর ভিড়। বরকে বসাবার জন্যে সুহাস বাগানের মধ্যে ভালো ব্যবস্থাই করেছিল। একটা বিরাট সিংহাসন। সিংহাসনের উপর ভেলভেটের চাদর। পেছনে টবের ওপর কয়েকটা পাম। সামনের ফুলদানিতে ফুলের তোড়া আর সুধু তাই-ই বরযাত্রীদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে বেলফুলের মোড়ক মালা। গোলাপফুল আর গোলাপ জলের ছড়াছড়ি। চৌরঙ্গীর হোটেল থেকে খাবারের কনট্রাক্ট দিয়ে আনিয়ে-ছিল মিষ্টি।

বীণা বলেছিল—আমার জন্যে এত খরচ করতে গেলে কেন কাজলদি?

কাজল বলেছিল—ও-সব আমার জন্যে নয় ভাই, তোর জামাইবাবুর সখ্।

সত্যিই, সুহাসই নিজের ঘাড়ে সমস্ত খরচটা নিয়েছিল। গাঙ্গুলি সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল পনেরো দিনের। অনেকের বাড়িতে অনেক রকম উৎসবেই খেয়ে আসে সুহাস। এতদিনে এই উপলক্ষে সকলকে নিজের বাড়িতে ডেকে খাওয়ানো ভালো! সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—উপলক্ষ্যটা কীসের?

সুহাস বলেছিল—উপলক্ষ্যটা একটা বিয়ে?

সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার আবার কার বিয়ে মিস্টার মুখার্জি। আপনার তো ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। ভাইবোনও নেই শুনেছি—

সুহাস বলেছিল—আমার স্ত্রীর এক বন্ধুর বিয়ে—

স্ত্রীর বন্ধুর বিয়ে! তা জিনিষটা এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। আজ-কাল এ-রকম হয়েই থাকে। স্ত্রীর বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, তাই সব বন্দোবস্তটা মিসেস মুখার্জিকেই করতে হচ্ছে।

কিন্তু আসল প্রশ্নটা তা-ও নয়। সরোজ আসলে সুহাসেরই ছোট বয়সের বন্ধু! সরোজ সান্যাল স্কুলে একসঙ্গে পড়ছে। সে-ও ছিল পি-সি-রায়ের ছাত্র। তবে মফঃস্বলে ডিউটি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই বারো তেরো বছর পরে দেখা। সুহাসকে দেখেই চিনতে পেরেছিল কিন্তু।

বলেছিল—তুমি?

সুহাসও বলেছিল—তুমি?

দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে দেখা। তারপরে ফেরবার সময় কলকাতার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এসেছিল সুহাস। সেই সূত্র ধরে একদিন সরোজ কলকাতার বাড়িতে এসেছিল। এসে দুজনে অনেক গল্প হয়েছিল ছোট বেলার। কোথাকার আদর্শ কেমন করে সব বদলে যায়, তারই কাহিনী দুজনের আর শেষ হতে চায় না।

কাজল বলেছিল—আপনি বিয়ে করেন নি কেন মিস্টার সান্যাল?

সরোজ বলেছিল—হয়ে ওঠেনি আর কি?

কাজল বলেছিল—এইবার একটা বিয়ে করে ফেলুন—

সরোজ হাসতে হাসতে বলেছিল—বিয়ে করলেই তো হলো না মিসেস মুখার্জি, মেয়ে কোথায়?

কাজল বলেছিল—মেয়ের অভাব? বলছেন কী? খুব ভালো মেয়ে আছে বিয়ে করবেন?

সরোজ বলেছিল—আপনি যদি রেকমেণ্ড্ করেন, নিশ্চয়ই করবো—

তারপর সবই সহজ হয়ে গিয়েছিল। বীণাকে এনে দেখিয়ে দিয়েছিল কাজল। ব্যাপারটা বীণা আগে শোনেনি। এসেছিল বরাবরীতি বেড়াতে। আর সেই থেকেই সূত্রপাত।

সুহাস বলেছিল—মিসেস মুখার্জির একেবারে ছোটবেলার বন্ধু, এক সঙ্গে একই স্কুলে চাকরি করতো—কে জানে কেন, মিস্টার সান্যালের সেই প্রথম দিনেই পছন্দ হয়ে গেল।

কাজল বলেছিল—আমি দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার মিস্টার সান্যাল, আমরা একসঙ্গে এক ঘরে এক ছাদের তলায় বহুদিন কাটিয়েছি, আমি বলছি আপনারা সুখী হবেন—বীণা সুখী হলে আমিও সুখী হবো—

কোথায় কে ছিল আচারিয়া, কোথায় ইউ-কে, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, আর যার্মা ঘুরে বেড়াবে, তা নয় সরোজ সান্যালের সঙ্গে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়ান। সরোজ এসেছিল বেড়াতে, একে-বারে বউ নিয়ে ফিরে গেল। আর বদলির চাকরী যখন, তখন চিরকালই যে মফঃস্বলে থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। আবার হয়ত ঘটনা-চক্রে সুহাসের মত কলকাতাতেও চলে আসতে পারে। তখন আবার দুই-বন্ধুতে ঘন-ঘন দেখাও হবে, আবার দুজনে ঘরের ভেতর পাশাপাশি বসে গল্প করতেও পারবে।

কাজলও তাই বলেছিল—তুই ভাবিসনি কিছু, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে—জীবনে সবই সহা হয়ে যায়—

—কিন্তু কাজলদি, দেখো, কিছু যেন জানাজানি না হয়ে যায়?

কাজল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—খবরদার যেন সরোজকে তুই কিছু বলিস্ নি এ-সম্বন্ধে—

বীণা বলেছিল—না কাজলদি, আমি কেন বলতে যাবো মিছিমিছি—

—না, ভালবেসে ফেললে তখন তো আর কারো মাথার ঠিক থাকে না!

বীণার বিয়ের সময়েও রেবাদি, কণকদি, মলিনাদি এসেছিল। তারাও খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি যাবার আগে কাজলের কাছে এসে বলেছিল—আসি ভাই তাহলে?

কাজল বলেছিল—তোমাদের পেটভরে খাওয়া হয়েছে তো রেবাদি, আমি তো কিছুই দেখতে পারলাম না—

রেবাদি বলেছিল—তুমি যা করলে ভাই এ কোনও মেয়ের জন্যে কোনও মেয়ে করে না—

সত্যিই সবাই অবাক হয়ে গেছে। নইলে কী আর এমন সম্পর্ক। সামান্য কটা বছরের মাত্র আলাপ। এক ঘরে এক ছাদের তলায় একসঙ্গে কয়েকটা বছর কাটিয়েছে। একসঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দু'জনের সুখ-দুঃখের আলোচনা করেছে। শো'কেসের সামনে দাঁড়িয়ে দু'জনেই শাড়ি আর ব্লাউজের দাম নিয়ে হা-হুতাশ করেছে। সেই দুজনেই আবার সেই শাড়ি কিনে পরেছে, সেই ব্লাউজ কিনে গায়ে দিয়েছে।

কলকাতা চলে যাবার দিন বীণা আনন্দে একবারে কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে কাজলকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুমি আমার জন্যে যা করলে কাজলদি, তা পৃথিবীতে কেউ কারোর জন্যে করে না—

কাজল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল—বেনারসীটা তোর পছন্দ হয়েছে রে?

বীণা বলেছিলো—তোমার সব মনে ছিল কাজলদি?

—মনে থাকবে না? একদিন এই শাড়ি কেনবার জন্যে তোর কত লোভ হয়েছিল মনে আছে? আমি সুহাসকে বলে তাই এই শাড়িই কিনে আনালাম—

যা-যা বীণা ভালবাসতো তাই-ই কাজল দিয়েছিল বীণার বিয়েতে। কাজলের নিজের বিয়ে যখন হয়েছিল তখন কারোরই টাকা ছিল না। না কাজলের না সুহাসের। তাই কোনও উৎসবই হয়নি বলতে গেলে। এমন করে লোক খাওয়ানো হয়নি, এমন করে বর সেজেও আসেনি সুহাস, এমন করে কনে সেজে বেনারসীও পরেনি কাজল। বীণার বিয়েতে কাজলেরই যেন নতুন করে বিয়ে হলো। নতুন করে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে চলে গেল।

কানাইয়ের মনে আছে সেইদিনের কথা। বীণা দিদিমণি তারপর থেকে আর আসতো না। কিন্তু সে-বাড়িতে আরো অনা লোকের আনাগোনা চলতে লাগলো। কত বন্ধু, বাবুর বন্ধু, মার বন্ধু আসতো। এলেই আবদুলকে চা করতে হতো, খাবার করতে হতো। আসলে কানাই-এর চা-ই মা বেশি পছন্দ করতো।

মা বলতো—এ চা কে করেছে রে কানাই? তুই, না আবদুল?

কানাই বলতো—আমি মা—

—বাঃ, তুই তো বেশ চা করতে শিখেছিস? এবার থেকে তুই-ই আমায় চা করবি—

তারপর থেকে মা কেবল কানাই-এর হাতেই চা খেত। বলতো—তুই ভাত রুটি তরকারী করাটা শিখে নে, এবার থেকে তোর রান্নাই খাবো—

সত্যি, তখন থেকে আবদুল রাঁধতো বিলিতি রান্নাগুলো। আবদুল চপ করতে পারতো, কাটলেট করতে পারতো, কোর্মা কালিয়া করতে পারতো। বাইরে থেকে সাহেব মেমরা এলে আবদুলই তাদের খাবার তৈরি করে খাওয়াতো। একসঙ্গে দশ-বারোজনের রান্না করে খাওয়াতে পারতো আবদুল। আবদুল জানতো হাজার রকম রান্না। এককালে আবদুলের বাবা ছিল কোন্ হোটেলের হেড কুক। তার বাবার কাছে থেকেই এসব শিখেছিল সে। কানাই জীবনে কখনও ভাত-ডাল ছাড়া রাঁধেনি কিছু। কিন্তু তবু দেখে দেখে হাত পুড়িয়ে পুড়িয়ে যে-সব রান্না শিখেছিল তারই তারিফ পেয়েছিল। এই শুক্তুনি, ঘন্ট, ডালনা—এ-সব খেয়ে মা প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বাবুকে বলতো—দেখো, কানাই-এর রান্না খেয়ে দেখো—

বাবু বলতো—সত্যিই তো, এবার থেকে কানাই-ই রাঁধুক—

তা রান্নাঘরের কাজ নিয়ে থাকলে তো কানাই-এর চলতো না। অত বড় বাড়ি, অত ঘর। বিবি তো কেবল দিনরাত পটের বিবি সেজে মা'র পাশে পাশে ঘুরতো। আর আবদুল? আবদুল তো রান্না ছাড়া জানতোই না কিছু। বাকী যা কিছু কাজ তো সব কানাইকেই করতে হতো! সেই অতগুলো ঘর, ঝাঁট দেয় কে? বাগানে না-হয় মালী আছে, কিন্তু সে কাজ করছে কিনা তা কে দেখে? সারা বাড়িটাতে এতগুলো লোক, তারা কে কেমন কাজ করছে তা-ও তো দেখা দরকার! কানাই ছাড়া সে-সব আর কে দেখবে?

তারপরে বাবুর কাজ কী কিছু কম? বাবু বাড়িতে থাকুক, আর না-থাকুক, বাবুর কাজ তো করতেই হবে। বাবুর জামা-কাপড় কোট-প্যান্ট, তার হিসেব রাখাই তো একটা মস্ত কাজ। বাবু তো বাড়ি এসেই বলবে—কানাই এটা দে, কানাই ওটা দে! তখন যদি হাতের সামনে হাজির করতে না পারে তো তখন কে দায়ী হবে?

মা বলতো—বাবুর সব জিনিষ-পত্তোর ঠিক আছে তো কানাই?

কানাই বলতো—আমাকে আর তা বলতে হবে না মা, আমার কাছে খুঁত পাবেন না আপনি—

মা বলতো—দেখো কানাই, শেষে যেন আবার বকাবকি না-শুনতে হয়—

মা বলতো—বাবুর বন্দুক, রিভলবার, গুলীর বাক্স? চাবি সব আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মা, সে-চাবি আপনাকে তো আমি দিয়েছি, আপনি যে আমার হাত থেকে নিলেন আজ্ঞে—

ওটি কানাই-এর কাছ থেকে পাবে না। কেউ যে বলবে কানাই-এর সব ভাল, কিন্তু কাজে বড় গাফিলতি, সেটি হবে না। বাবু যেই বাড়ি থেকে বেরোবেন, কানাই আগে বন্দুক-রিভলবারের বাক্সটিতে চাবি বন্ধ করে মা'র হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। বাবুর ছাড়া জামা-কাপড় সব ধোপার বাড়িতে দিয়ে তবে কানাই বসবে, তার আগে নয়। বাবু চাইতে-না-চাইতে হাতের কাছে জিনিষ পেয়ে যাবে, তাকেই তো বলে চাকর।

মা বলে—হ্যাঁ রে কানাই, আমার কোনও চিঠি আছে?

বীণা দিদিমণির বিয়ে হয়ে চলে যাবার পর থেকেই চিঠির জন্যে বসে থাকতো মা। আর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে নিয়ে আসতো মা'কে। চিঠিটা পেয়েই মা উঠে বসতো।

কানাই জিজ্ঞেস করতো—কার চিঠি মা?

চিঠি পড়তে মা তখন ব্যস্ত। বলতো—তোর অত খবরে দরকার কী বল্ তো? তুই কাজ করগে যা—

বীণার চিঠি পেলেই কাজল খুলে পড়তো মন দিয়ে।

বীণা লিখতো—

কাজলদি,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কী খুশী হলুম, তা লিখে জানাতে পারবো না। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তা নিজের মায়ের পেটের বোনও কখনও করে না। জীবনে যদি কোনও দিন কারো কাছে নিজের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তো সে একলা তুমি কাজলদি, আর কেউ নয়। তুমি জানে বোধহয় সুখী হবে যে সরোজ শিগ্গি

বদলি হয়ে কলকাতাতে যাচ্ছে—গেলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে রোজ—ইতি—

এমনি একখানা চিঠি নয়। এক-একদিন দুটো চিঠি এসে হাজির হয়।

চিঠিগুলো পড়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয় কাজল। তারপর কাগজের টুকরোগুলো গুলী পাকিয়ে আবদুলকে দেয় উনুনে পোড়াবার জন্যে।

আবদুল বলে—এগুলো সবই উনুনে দেব মাইজী?

কাজল বলে—হ্যাঁ, একটাও যেন বাইরে পড়ে না থাকে—

সুহাস এসে বলে—কই, তোমার সেই উপন্যাসটা কতদূর হলো? শেষ হয়ে গেছে?

কাজল লজ্জায় পড়ে, বলে—ও কিছু না, সময় কাটে না, তাই লিখতুম—

সুহাস তবু উৎসাহ দেয়। বলে—লেখো না, শেষকালে হয়ত লিখতে লিখতে লেখিকা হয়ে উঠতে পারো—

কাজল হাসে। বলে—লেখিকা হয়ে আমার লাভ কি! পুলিশের বউ হয়ে আমার তার চেয়ে অনেক লাভ হয়েছে?

সুহাস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। বলে—সত্যি বলছো লাভ হয়েছে?

কলে আরো ঘনিষ্ঠ হতে আসে। কিন্তু কাজল তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। বলে ছাড়ো, ছাড়ো, কী যে করো, ওই বিবি রয়েছে ওখানে—

শেষ পর্যন্ত সরোজ বদলি হয়ে এল। বীণাও এল সঙ্গে। কিন্তু কলকাতায় নয়, করাচীতে।

সুহাস বললে—একেবারে সেই করাচীতে? অত দূরে?

কাজল চেয়ে চেয়ে দেখলে। বড় খুশী মনে হলো ওদের। আড়ালে বীণাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—কিরে, তার মনের মত হয়েছে তো?

বীণা বললে—সত্যি কাজলদি, এর চেয়ে বেশী সুখ কাকে বলে আমি জানি না—

কাজল বললে—ওদের একদিন নেমন্তন্ন করলে কেমন হয় গো?

সুহাস বললে—তা নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দাও না, আমারও তো সময় রয়েছে—

কাজল বললে—ওদের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে বলো না—অনেকদিন তো কাউকেই খাওয়ানো হয়নি—

অধেকের বাড়িতেই পার্টিতে খেয়ে খেয়ে এসেছে। এবার এই সুযোগে আবার সকলকে পাল্টা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তা সুহাসেরই উৎসাহটা যেন বেশী. সুহাসই এক এলাহি কাণ্ড করে বসলো। বাজারের সেরা সেরা জিনিষ আনিয়ে নিজে নিজের পছন্দ মত। আবার যেন বিয়ে বাড়ি হয়ে উঠলো। লিস্ট দেখে দেখে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এলো দুজনে মিলে। সুহাসের বিয়েতে বলতে গেলে কিছুই হয়নি। বীণার বিয়েতে অবশ্য সবাই এসেছিল। কিন্তু গার্লিক সাহেব তখন কলকাতায় ছিল না। আসতে পারেনি।

গার্লিক সাহেব অবাক হয়ে গেল মুখার্জিকে দেখে। বললে—অকেশনটা কী?

কাজল বললে—কোনও অকেশন নয়, এমনি—

শুধু গার্লিক সাহেব নয়, মিসেস গার্লিককেও বললে কাজল। অপূর্ব স্বামী-স্ত্রী খুব হাসি-খুশী মানুষ।

গার্লিক সাহেব বললে—আমি ইণ্ডিয়ান ডিশ খাবো কিন্তু মিসেস মুখার্জি—

কাজল বললে—তাহলে আমি নিজে রান্না করবো মিস্টার গার্লিক—

সত্যি নিজে রান্না করলে কাজল সারাদিন ধরে। কানাই আর নিজে। আর আবদুল রক্ষা করেছিল অন্যগুলো। বীণা আর সরোজ সকাল-সকালই এসে পড়লো। বীণা একেবারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে।

—ওমা, তুমি নিজে রান্না করছো কাজলদি?

কাজল বললে—কানাই-এর হাতে সব ভার ছেড়ে দিতে সাহস হলো না ভাই—

—কিন্তু এত এলাহি কাণ্ড করতে গেলে কেন মিছিমিছি?

কাজল বললে—আমাকে বলে কি হবে, তুই ওকে বল—

সুহাসও দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। হাসতে লাগলো কথা শুনে। বললে—নুন খাইয়ে দিচ্ছি, নইলে সরোজ আবার আমার গুণ গাইবে না—

বীণা বললে—আপনি তো জানেন না সুহাসবাবু, রোজ সকালে আপনাদের গুণ না গেয়ে জল গ্রহণ করি না আমরা—তা জানেন?

সুহাস বললে—ওই শোন কাজল, তোমার বন্ধু কী বলছেন শোন—

কাজল বললে—ওর কথা ছেড়ে দাও, ও আমার কোনও দোষই দেখতে পায় না—

বীণা বললে—আচ্ছা বলুন তো সুহাসবাবু, কোনও দোষ থাকলে তো দেখবো? কাজলদির দোষ যে বার করতে পারবে সে এখনও জন্মায়নি পৃথিবীতে—

কাজল হাসলো। সুহাসও হেসে উঠলো। কাজল বললে—সরোজের কাছে থেকে থেকে দেখছি বীণাটা কথা শিখেছে খুব আজকাল—

সরোজও শেষ পর্যন্ত এসে পড়লো রান্নাঘরে। বললে—বাঃ বৌদি আপনি নিজেই হাতা-খুন্তি ধরেছেন?

কাজল বললে—না ধরে কি আর উপায় আছে ভাই, শেষকালে যদি তোমরা নিন্দে করো?

সরোজ বললে—নিন্দে তো করবোই, আপনারা আমাদের এত উপকার করবেন আর আমরা আপনার একটু নিন্দেও করতে পারবো না? এত অধম আমরা?

কাজল বললে—তা নিন্দে করুন, করাচীতে বসে বসে যত ইচ্ছে নিন্দে করুন, আমরা শুনতে যাচ্ছি না—

বীণা বললে—সত্যি কাজলদি, কত আশা করেছিলুম কলকাতায় থাকতে পারবো, তা না কোথায় ঠেলে পাঠিয়ে দিলে সাত সমুদ্র তের নদী পারে—

কাজল বললে—ভালোই তো, তবু একটা বেড়াবার জায়গা হলো, নেমন্তন্ন করলেই চলে যাবো, তখন আমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে দিস—

সত্যি তুমি যাবে কাজলদি? সত্যি বলছো, যাবে?

কাজল বললে—তা যাবো না কেন? কিন্তু আমাকে একলা নেমন্তন্ন করলে চলবে না, ওকেও নেমন্তন্ন করতে হবে, দুজনে গিয়ে একসঙ্গে তোদের অন্ন-ধ্বংস করে আসবো—

রাত্রে সবাই এসে হাজির হলো একে-একে। মিস্টার হাচিন্স, মিসেস হাচিন্স। সুহাসের অন্য দুচারজন বন্ধু-বান্ধব সস্ত্রীক। শেষকালে এলেন মিস্টার আর মিসেস গার্লিক।

মিঃ গার্লিক এসেই বললেন—কই মিসেস মুখার্জি, আপনার ইণ্ডিয়ান ডিশ রেডি তো!

আর এসে হাজির হলো মিস্টার আচারিয়া। মিস্টার আচারিয়া আসতেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো বীণা। কিন্তু কাজল এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থাটা সামলে নিয়েছে।

—কাজল এগিয়ে গেল। হাসতে হাসতে সাদর অভ্যর্থনা করে বললে—আসুন, আসুন মিস্টার আচারিয়া—

মিস্টার আচারিয়াও অপ্রস্তুত হবার লোক নয়। বললে—আমার একটু দেরি হয়ে গেল মিসেস মুখার্জি।

সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কাজলই। সুহাস চিনতো না। হ্যান্ড শেক করলে মিস্টার আচারিয়ার সঙ্গে।

কাজল বললে—আমার বন্ধু মিস্টার আচারিয়া—

আচারিয়া নিজেই নিজের যোগ্যতার পরিচয় সূত্রটা ধরিয়ে দিলে—আমি হচ্ছি ম্যাকলাউড কোম্পানীর ইস্টার্ন ন্যাশনাল কমিশন এজেন্ট—

—আর ইনিই মিস্টার মুখার্জি—আজকের হোস্ট্—

—খুব আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে মিস্টার মুখার্জি!

শুধু মিস্টার মুখার্জি নয়, একে একে সকলের সঙ্গেই সকলের পরিচয় হয়ে গেল। সরোজের কাছে এসে কাজল বললে—ইনি মিস্টার সান্যাল—করাচীতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন কালকেই—

আর ইনি মিসেস সান্যাল—

বীণা হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বোধহয় থর থর কাঁপছিল বীণার হাতটা। মিস্টার আচারিয়া বীণার হাতটা নিলে। সেটাকে শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলে আচারিয়া। কাজল বীণার দিকে চেয়ে সাহস দিচ্ছিল। তবু হ্যান্ড শেক্ করবার পরেই যেন বীণার শরীরটা অবশ হয়ে এল ক্লান্তিতে।

আচারিয়া বললে—আপনি অসুস্থ নাকি মিসেস সান্যাল?

বীণা সে-কথার উত্তরই দিতে পারলে না মুখ ফুটে।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার? অমন করছো কেন তুমি? কী-রকম যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

—কই না তো! বলে বীণা রুমাল দিয়ে মুখটা মোছবার ভান করলে।

হয়ত বীণার দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়তো, কিন্তু মিস্টার গার্লিক তখন জমিয়ে তুলেছেন আসর। বিলেতের কোথায় কোন সহরে একবার কোন্ ইণ্ডিয়ান ডিশ খেয়েছিলেন, তারই বর্ণনা দিচ্ছিলেন। মিস্টার গার্লিক পুলিশের বড় কর্তা হলে কী হবে, অমায়িকতায় তাঁর জুড়ী নেই।

মিস্টার হাচিন্সও যোগ দিলেন। যে-যে ছিল সবাই যোগ দিলে আলোচনায়। জমে উঠলো আসর এক মিনিটেই। আচারিয়াও গল্প জমাতে বেশ পটু। আচারিয়া পেনাঙ-এ গিয়ে কী খেয়েছিলেন তার বর্ণনা দিলে। খেতে-খেতে হাসতে-হাসতে সরগরম হয়ে উঠলো সন্ধেটা।

এক ফাঁকে বীণা উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কাজলকে ধরেছে—কাজলদি, ওকে কেন তুমি নেমন্তন্ন করলে ভাই: ওই হতভাগাটাকে?

কাজল বললে—ওমা, আমি কেন নেমন্তন্ন করতে যাবো? ও তো এমনিই এসেছে—

—তা ওকে ঢুকতে দিলে কেন? তাড়িয়ে দিতে পারছো না?

কাজল বললে—অত জোরে কথা বলিসনি, শুনতে পাবে কেউ—

—কিন্তু তুমি জানো না কাজলদি, আমার কী অবস্থা, আমি বোধহয় তখুনি অজ্ঞান হয়ে যেতাম—

কাজল বললে—ছি, ছি, তুই চোখ মুছে ফেল্—

বলে নিজেই নিজের রুমাল দিয়ে বীণার চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে। বললে—যা, ওঘরে যা, সবাই বসে আছে, তুই এতক্ষণ এ-ঘরে থাকলে সন্দেহ করবে কিছু, আর সরোজের কথাটাও ভাব দিকিনি একবার ও যদি জানতে পারে, তাহলে কী সর্বনাশটা হবে বল দিকিনি?

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার কাজল পাঠিয়ে দিলে পাশের ঘরে।

গার্লিক সাহেব তখন একমনে গল্প বলে যাচ্ছেন। সবাই তাই শুনতেই ব্যস্ত। কেউ আর লক্ষ্য করলে না কিছু।

তারপর যখন আরো রাত বাড়লো তখন একে একে চলে গেল সবাই। কাজলের হাতের ইণ্ডিয়ান ডিশ্ খেয়ে তারিফ করলেন খুব মিস্টার গার্লিক। যাবার সময় বললেন—এবারেই যেন শেষ না-হয় মিসেস মুখার্জি, আমি ভোজন-রসিক লোক, আমি আবার খেতে আসবো আপনার হাতের রান্না ইণ্ডিয়ান ডিশ্—

কিন্তু মিস্টার গার্লিক তো জানতেন না, কাজলের হাতের রান্না খাওয়ার সুযোগ তাঁর জীবনে আর আসবে না। শুধু মিস্টার গার্লিক কেন, সুহাসও জানতো না। বীণাও জানতো না, সরোজও জানতো না। এমন কি কাজল নিজেও তা জানতো না। জানতো বোধহয় কেবল সুহাস আর কাজলের ভাগ্য-বিধাতা।

অনেক রাত্রে যখন সবাই চলে গেল, তখনও রইল মিস্টার সান্যাল আর মিসেস সান্যাল। আর রইল মিস্টার আচারিয়া। আচারিয়া উঠতেই চায় না, গল্প তার আর ফুরোয়ই না। ইউ. কে, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, জাভা আর বার্মার গল্প।

সরোজের খুব ভালো লাগলো মিস্টার আচারিয়াকে।

বললে—আপনি আসবেন মিস্টার আচারিয়া, যে ক'দিন আছি, বেশ আনন্দ করা যাবে—

নিজের ঠিকানাও দিলে সরোজ। বললে—আমার ওখানেও একদিন আসুন—

আচারিয়া বললে—আমি নিশ্চয়ই যাবো মিস্টার সান্যাল আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই যাবো—

সরোজ বললে—আমি শিগ্‌গির চলে যাচ্ছি করাচিতে, তার আগেই আসুন—

কাজল কথা ঘুরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু মনে হলো সরোজের যেন বড় ভাল লেগেছে আচারিয়াকে। আর সরোজ যত আসতে বলছে আচারিয়াকে, বীণা তত কাঠ হয়ে উঠছে আতঙ্কে।

শেষ পর্যন্ত কাজলই জোর করে সরোজ আর বীণাকে উঠিয়ে দিলে। বললে—যাও, তোমাদের রাত হচ্ছে—

একেবারে শেষকালে গেল আচারিয়া। যেন যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। যেন অনেক কথা বলবার ছিল তার মিসেস মুখার্জিকে। কিন্তু সুহাসের সামনে সব কথা বলা যেন তার ইচ্ছে নয়।

অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে আচারিয়ার চেহারাটা যখন মিলিয়ে গেল, যখন গেট বন্ধ করার শব্দ হলো, তখন যেন নিশ্চিন্ত হলো কাজল।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—ও আচারিয়া কে? আগে তো দেখিনি?

কাজল বললে—ও আমার পুরোন এক বন্ধু—বহুদিন আগের—

আর কিছু কথা হলো না সেদিন।

সে-সব দিনের কথা কানাই-এর মনে আছে। বীণা-দিদিমণিরা চলে গেল এক-দিন। যাবার দিন সান্যাল সাহেব এসেছিল, বীণা-দিদিমণিও এসেছিল। বাবু সেদিন বাড়ি ছিল না। ভিউটিতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কানাই, কিকেল বেলা ঘর পরিষ্কার করেছে। বাবুর বন্ধুকের বাক্সে চাবি বন্ধ করে চাবিটা মা'র হাতে দিয়েছে। তারপর বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ধোপার বাড়ি দিয়ে এসেছে। টেবিল-চেয়ার আলমারি জানালা দরজা ঝাড়া-মোছা করেছে। বিবি তখন মার চুল বেঁধে দিচ্ছে। চুল বাঁধার পর মা কলঘরে গেল। কলঘর থেকে বেরোলে বিবি পাটভাঙ্গা সাড়ি ব্লাউজ বার করে দেবে। মা সেইসব পরে চা খেয়ে টেবিলে বসে বসে। তখন কানাই বাইরের বারান্দায় এসে একটু বেড়াবে। ফুলে গাছের চারা গুলো কেমন গজাচ্ছে দেখবে। তারপর খানিকক্ষণ বেড়ানোর পর গাড়ি-বারান্দার দেওয়াল টেবিলের সামনে দাঁড়াবে। বিবি আলো জেবলে দেবে। সেখানে বসে কাগজ

কলম নিয়ে কী সব লিখবে পাতার পর পাতা।

এমনি করেই সাধারণতঃ মা'র দিন-গুলো কাটতো। তারপর বীণা-দিদিমণি চলে যাবার পর আর কেউ বড় একটা আসতো না। কখনো সখনো একজন-দুজন এলে চা করতে হতো কানাইকে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা একজন ভদ্রলোক এলো।

লোকটাকে আগে দেখেছিল কানাই একদিন। মনে হলো যেন সেই লোক-টাই। সেই লম্বা চেহারা। লম্বা-লম্বা কোট-প্যান্ট্। এসেই একেবারে সোজা বাগানে ঢুকেছে।

কানাই এগিয়ে গেল। বললে— কাকে চাই?

ভদ্রলোক বললে—মিসেস মুখার্জিকে।

—কী নাম বলবো?

—বলো মিস্টার আচারিয়া।

তাড়াতাড়ি মাকে গিয়ে খবর দিতেই মা বললে—এখানে বাবুকে নিয়ে আয়—

মিস্টার আচারিয়া আসতেই মা বললে—আসুন মিস্টার আচারিয়া—

মিস্টার আচারিয়া বললে— আপনি আমায় দেখে অবাক হয়ে গেছেন তো?—

—না না অবাক হয়ে যাবো কেন? আসুন, বসুন এখানে। কী খবর বলুন—

তারপর মা কানাইকে চা করতে বলে আবার গল্প করতে আরম্ভ করেছে। যখন কানাই চা আর বিস্কুট এনে দিলে তখন দেখলে বেশ জোরে জোরে কথা হচ্ছে দুজনে। কানাই কাছে আসতেই গলার শব্দ একটু নামলো।

চা দিয়ে কানাই চলে গিয়েছিল বাইরে। বাইরে থেকেও দুজনের অনেক কথা হচ্ছিল। কী-সব কথা; কিছুই বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে হাসির শব্দও হচ্ছিল। মা আর আচারিয়া সাহেব কথা বলতে বলতে খুব হাসছিল। তার-পর আবার একবার কানাইকে ডাকলে মা। কানাই যেতেই মা বললে—আর এক কাপ চা কর তো কানাই—

আবার চা করে দিয়ে এল ঘরে। আবার গল্প হতে লাগলো দুজনে।

রাত সাতটা বাজলো। আটটা বাজলো। তখনও গল্প ফুরোয় না দুজনের।

তারপর রাত নটার সময় মা ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বললে। গাড়ি বেরোতে আচারিয়া সাহেব আর মা দুজনে গিয়ে উঠলো তাতে। তারপর গাড়ি চলে যেতেই দারোয়ান গেট বন্ধ করে দিয়েছিল।

এমনি পর-পর দু'তিন দিন চললো। বেরিয়ে যায় রাত আটটা-নটার সময়, আর আসে সেই দশটার সময়। কখনও-কখনও রাত এগারোটা বেজে যায়।

ততক্ষণ না খেয়ে বসে থাকে কানাই। না খেয়ে বসে থাকে আবদুল, বিবি সবাই। মা যখন আসে তখন মা পান খাচ্ছে। এক মুখ পান। এমনিতে মা পান খেত না। আচারিয়া সাহেবের সঙ্গে বেরুলেই পান খেত।

বাড়ি ফিরে এলেই বিবি বলতো—মা, টিবিল লাগাবো?

মা বললে—না রে, আমি খেয়ে এসেছি—তোরা এখনও খাস্ নি!

মা আবার বললে—তোরা দেখলি আমার দেরি হচ্ছে, খেয়ে নিলেই পারতিস্—

তারপর বিবি মা'র জামা-কাপড় বদলে দিয়েছে, বিছানার বেড-কভার তুলে দিয়েছে। মা শুয়ে পড়তেই মায়ের আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

সেদিন সুহাস এসে গেল আবার হঠাৎ। তখন সন্ধ্যে সাতটা।

কানাই দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিলে। বললে—মা, বাবু এসেছে—

সুহাস এসে ঘরে ঢুকলো। একেবারে সোজা মফস্বল থেকে। ঘরে এসে একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—মিস্টার আচারিয়া, না?

আচারিয়া উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার মিস্টার মুখার্জি—

—কতক্ষণ এসেছেন?

—এই তো আপনি আসার আধ ঘণ্টা আগে!

কাজল বললে—তুমি তৈরি হয়ে নাও; তাড়াতাড়ি, একসঙ্গে চা খাবো।

তারপর কানাইকে ডেকে গরম জল দিতে বললে। শুধু গরম জল নয়, বাবু এলেই কানাই-এর অনেক কাজ থাকে। সুটকেস, বিছানা সব গোছাতে হয়। বাবুর সঙ্গে যে-বন্দুকটা থাকে তা গাড়ি থেকে নিয়ে আবার বাক্সে পুরে ফেলতে হয়। বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ডাইং ক্লিনিং-এ দিতে আসবার জন্যে আলাদা করে রাখতে হয়। অনেক কাজ তখন কানাই-এর।

সুহাস তৈরি হয়ে এসে বসলো। বললে—এখন কোথায় আছেন মিস্টার আচারিয়া?

আচারিয়া বললে—মার্কেট বড় মিস্টার মুখার্জি আপনাদের তো জানেন ইন্টার-ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফরেন মার্কেট তো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

—তাহলে কলকাতাতেই এখন থাকতে হচ্ছে? বাইরে যাওয়া বন্ধ?

আচারিয়া বললে— অটোমেটিকেলি! আমাকে তো আর ছাড়তে পারছে না কোম্পানী, মাসে মাসে মাইনে গুণে দিতে হচ্ছে। আমার কিছু লস নেই, কোম্পানীরই লস্—

চা এসে গেল। মিস্টার আচারিয়ার দিকে কাপ এগিয়ে দিলে কাজল। বললে —নিন্ মিস্টার আচারিয়া—

চা খেতে খেতে অনেক আজে-বাজে গল্প করতে লাগলো আচারিয়া। আগে ইউ-কে'তে কী দেখেছে, আবার এখন কী দেখেছে। আমিই লণ্ডনের মেয়েদের-লম্বা ফ্রক পরতে দেখেছি এককালে, আবার সেই ফ্রকই আস্তে আস্তে ছোট হতে দেখলুম। হাই-হিল থেকে লো-হিল্। বুট থেকে শিলপার। কত চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্লডে। জিওগ্র্যাফি বদলে যাচ্ছে রাতারাতি। অত কথা কী, মানুষের মনই কত বদলে যেতে দেখলুম মিস্টার মুখার্জি। মানুষই কি কম চেঞ্জ হচ্ছে?

—অল্‌রাইট্ মিস্টার মুখার্জি, আপনি অনেকদিন পরে বাড়িতে এলেন, একটু রেস্ট্ নিন্, আমি উঠি মিসেস মুখার্জি।

আচারিয়া উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে বাগানের ঘোরা পথ দিয়ে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

—কী গো, তোমার মুখ যে অত গম্ভীর-গম্ভীর?

কাজল হাসতে হাসতে পাশে সরে এল।

—কই, গম্ভীর নয় তো। হয়ত খুব টায়ার্ড, তাই—

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। সুহাস খানিক পরে বললে—ও প্রায়ই আসে বুঝি?

কাজল বললে—না তো, সেই পার্টির দিন এসেছিল আর আজকে এল!

সুহাস বললে—লোকটাকে আমার তত সুবিধের মনে হয় না—

কাজল বললে—আমারও ভাল লাগে না, কিন্তু বাড়িতে এলে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না—

সুহাস শুধরে নেয়। বলে—না না, তাড়াবার কথা বলছি না, যা মনে হলো তাই বলছি—

আশ্চর্য, তখনও জানতো না সুহাস, আচারিয়া তার জীবনে শনি হয়েই এসে-ছিল। সুহাসের শান্তির জীবনে এক অদ্ভুত ছন্দ দিয়ে আত্মপ্রবেশ করেছিল।

বাবু বেশিরভাগ দিন দার্জিলিঙ ছিল কল-কাতায়। আবার একদিন সুটু-বহর নিয়ে

সাগু-পাগো সমেত বেরিয়ে গেল। আবার কানাই বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো কাচতে দিয়ে এল দোকানে। আবার বন্দুকের বাক্সে চাবি বন্ধ করে চাবিটা মা'র জিম্মায় দিয়ে এল। আবার ঘর-দোর-বিছানা সাফ্ করে রেখে দিলে। বিবি রোজকার মত সেদিনও মা'র চুল বেঁধে দিলে। মা কলঘরে গা ধুতে ঢুকলো। তারপর কলঘর থেকে বেরিয়ে মা'র পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ বার করে দিলে বিবি। মা সেজে-গুজে বাগানে এল। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে ফুলগাছের চারাগুলো দেখলে। তারপর কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে মাথার খোপায় গুঁজলে। তারপর গাড়ি-বারান্দার তলাটায় এসে বসলো। তারপর আলো জেবলে দিলে কানাই। মা কাগজ-কলম নিয়ে কী যেন লিখতে লাগলো পাতার পর পাতা।

আর সেই সময় আবার সেই কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক এলো। আচারিয়া সাহেব।

তখন আর নাম জিজ্ঞেস করতে হয় না। তখন রোজ রোজ এসে এসে চেনা-লোক হয়ে গিয়েছে। মা আচারিয়া সাহেবকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলো। কানাইকে ডাকলে চা দিয়ে যাবার জন্যে।

কানাই-এর মনে হলো দুজনে যেন খুব জোরে-জোরে কথা বলছে। খানিক-ক্ষণ পরে আবার হাসির শব্দও এল। কানাই চা দিতে আসতেই গলাটা যেন নিচু করলে আচারিয়া। আচারিয়াকে দেখে সেদিন ভয় করতে লাগলো কানাই-এর। আচারিয়া কি মদ খায় নাকি?

আর তারপরেই গাড়ি বার করতে বললে মা।

গাড়ি বেরোতেই দুজনে বেরিয়ে গেল।

সেদিনও যখন ফিরে এল তখন অনেক রাত। রাত প্রায় এগারোটা। মা'র মুখে পান খাওয়ার দাগ।

—কীরে, তোরা এখনও খাসনি? আমি খেয়ে এসেছি আজ—আর খাবো না—

তারপর বিবি জামা-কাপড় এগিয়ে দিলে মাকে। মা বললে—হ্যাঁ রে, আমার কোনও চিঠি আসেনি?

রাত্রে আবার চিঠি আসবে কী। মা'র যেন খেয়ালই ছিল না।

বললে—ও, তা তো বটেই—

বলে মা শুয়ে পড়লো। কিন্তু ভোর বেলা উঠেই আবার বললে—আমার নামে কোনও চিঠি এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবি। দেরি করিস নি—

কয়েক পরের দিন এল। কানাই এসে গাড়ি থেকে জিনিস-পত্র নামিয়ে নিলে। বন্দুকটা নিয়ে বন্দুকের বাক্সে পুরে রেখে দিয়ে এল। ছাড়া জামা-কাপড়গুলো একপাশে জড়ো করে রাখলে। কাচতে দিতে হবে। তারপর চা করে নিয়ে এল। আবদুল নতুন করে আবার রান্না চড়ালে। গরম জল করে দিলে।

দুজনে চা খেতে লাগলো বসে বসে।

কথায় কথায় সুহাস জিজ্ঞেস করলে—সেই আচারিয়া আর এসেছিল নাকি?

—কোন্ আচারিয়া?

যেন ভুলেই গিয়েছিল কাজল। তারপরেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে বললে—ও, সেই আচারিয়ার কথা বলছো? সে আর আসেনি। সেই তুমি যেদিন এসেছিলে সেদিন এসেছিল, তারপর আর আসেনি—

তারপর রাত্রে খেয়ে দেয়ে বাবু আর মা দুজনে শুয়েছে। আবদুলও রান্না-বান্না সেরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে গেছে নিজের ঘরে। বিবিও ঘুমিয়েছে। কানাই মাঝ-রাত্রে একবার উঠেছিল, তখনও দেখছিল ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তখনও দুজনের কথা শোনা যাচ্ছে—

তারপর আর জানে না কানাই। কানাই আবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের ঘরে।

গার্লিক সাহেব সেদিন একটা স্পেশ্যাল কাজ দিয়েছিল। কলকাতার নয়, কলকাতা থেকে একটু দূরে চব্বিশ পরগণার শেষ প্রান্তে। একেবারে ডায়মণ্ড-হারবারের গঙ্গার ধারে। স্পেশ্যাল স্কোয়াডের দলবল নিয়ে হানা দিতে হয়েছিল সুহাসকে। কাজ দুদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুদিন আগেই কলকাতায় ফিরে গার্লিক সাহেবের বাড়িতে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিল।

গার্লিক সাহেব ভারি খুশী। বললে—ওয়েল ডান্, চ্যাপ্—ভেরি ওয়েল ডান্—

তারপর সাহেবের পীড়াপীড়িতেই একটা হোটেলে গিয়ে উঠতে হয়েছিল।

সুহাস বলেছিল—আমি যাই স্যার, মিসেস মুখার্জি একলা আছেন—

—তাহলে মিসেস মুখার্জিকেও গিয়ে নিয়ে এস—

সুহাস বলেছিল—তার দরকার নেই, তারও অনেক কাজ আছে সংসারে, বাড়িতে থাকতেই মিসেস মুখার্জি বেশি ভালবাসে—

গার্লিক সাহেব বলেছিল—তুমি খুব ভালো ওয়াইফ্ পেয়েছ মুখার্জি, সী ম্যাট্ বি এ ভেরি গুড্ হাসিফ—তোমার ওয়াইফের হাতের ক্রীম্ডান ভিশ্ আমি এখনও ভুলতে পারিনি—

সারা দিনের পরিশ্রমের পর হোটেলে গিয়ে গার্লিক সাহেব একটু ড্রিঙ্ক করতে চেয়েছিল। ঠাণ্ডা বিয়ার কি সামান্য দু'এক পেগ হুইস্কি।

—তুমি কী নেবে মুখার্জি? বিয়ার না হুইস্কি?

এমনিতে এ-সব কিছুই খায় না সুহাস। এ-সব খাওয়া পছন্দও করে না।

—তাহলে বিয়ার খাও একটু, ঠাণ্ডা বিয়ার।

সাহেবের সঙ্গে বসে বসে অনেক কথা হচ্ছিল। দিল্লী থেকে কন্‌ফিডান্‌সিয়াল চিঠি এসেছে। স্কোয়াড আরো বড় করা হবে। আমি তোমাকে এস-পি করে দেব মুখার্জি, ইন্ নো টাইম্। র‍্যাপ্ট-সোশ্যাল এলিমেন্টে দেশ ছেয়ে গেছে। সবাই ভেতরে ভেতরে প্রো-জাপানীজ্। সবাই চায় জাপান আসুক দেশে। ব্রিটিশ প্রেস্টিজ্ আপ্‌হোল্ড করবার জন্যেই আমরা চাকরি নিয়েছি। এখানে যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই নির্মমভাবে র‍্যারেস্ট করতে হবে। নিজের ভাই হলেও তাকে শাস্তি দিতে হেজিটেট্ করলে চলবে না। অনেক কথা শোনাচ্ছিল মিস্টার গার্লিক, আর সারা দিনের পরি-শ্রমের পর মন দিয়ে সব শুনছিল। এক-দিন স্যার পি-সি-রায়ের ছাত্র হিসেবে দেশ-উদ্ধারের ব্রত নিয়েছিল সুহাস, আর আজ চাকরির জন্যে সেই সুহাসকেই সব উপদেশ সব বাণী হজম করতে হচ্ছিল।

—দরকার হলে তুমি তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যেতে পারবে মুখার্জি?

সুহাস বলেছিল—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, আপনি কী বলতে চাইছেন?

সাহেব বললে—ধরো জাপানীরা এল এখানে, এসে কাশ্মী অকুপাই করে নিলে, তখন আমরা কয়েকজন লিমিটেড্ ন্যাশনাল সিটিজেনই সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতি-রোধ করবো, পারবে না?

কথাগুলি শুনছিল সুহাস মন দিয়ে। হঠাৎ নজরে পড়লো একটা অদ্ভুত জিনিস।

সুহাস বার দুই নিজের চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে নিলে। ঠিক দেখছে তো সে? ভুল দেখেনি তো!

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছো? পারবে না?

কিন্তু সুহাস তখন অন্যমনস্ক। কাজলই যেন হোটেলের এক কোনে বসে-বসে কার সঙ্গে গল্প করছে। ঠিক যেন

কাজল। অনেকগুলো মানুষের মাথা পেরিয়ে অনেক দূরে ঠিক কাজলের মতই একটা রঙিন শাড়ি পরে বসে বসে কার সঙ্গে কথা বলছে। আচারিয়া না? আচারিয়ার সঙ্গে কাজল এখানে এসেছে? সামনে যেন গ্লাস রয়েছে। কয়েকটা ডিশও আছে। কী যেন খাচ্ছে চামচ দিয়ে আর গল্প করছে মশগুল হয়ে! কিন্তু সত্যিই কি কাজল? আর সত্যিই কি লোকটা আচারিয়া?

সুহাসের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কেন কাজল এখানে এল? কেন আচারিয়ার সঙ্গে এই হোটেলে এসে খাচ্ছে! তবে কি প্রায়ই আসে? প্রায়ই এখানে এসে গল্প করে?

সুহাসের মনে হলো একটা সরীসৃপ যেন তার সর্বাঙ্গে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি তার মনের চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সে কোথায় বসে আছে, সে কেন এসেছে এখানে তাও ভুলে গেল। মনে হলো কাজল কেন এল এখানে এমন করে? কই, সুহাসের সঙ্গে তো কোনও-দিন আসতে চায় না এখানে, কতবার সুহাস বলেছে—চলো, আজকে বাইরে কোনও হোটেলে খেয়ে আসি—

কিন্তু কাজল প্রত্যেকবারই এড়িয়ে গেছে। বলেছে—না না, হোটেলে খেয়ে কী হবে? বাড়ির খাওয়া কি খারাপ?

তবে? তবে কেন কাজল এল।

গার্লিক তখনও জিজ্ঞেস করছে—পারবে না মুখার্জি, পারবে না?

সুহাস কোনও উত্তর দেবার আগেই সাহেব আবার বলতে লাগলো—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে মুখার্জি, আই রিলাই আপ্-অন্ ইউ, ইণ্ডিয়াকে হাত-ছাড়া করলে চলবে না মুখার্জি, হোল্ সাউথ-ইস্ট্-এশিয়ার ভালা নির্ভর করছে এই ইণ্ডিয়ার ওপর। ইণ্ডিয়ার জিওগ্র্যাফিক্যাল পোজিশন্ বড় স্ট্র্যাটে-জিক্—এ আমরা হাত-ছাড়া করতে পারবো না—

সুহাস তখনও একদৃষ্টে চেয়ে দেখ-ছিল কাজলের দিকে। মনে হলো কাজল কেন বড় খুশী। কই, সুহাসের সঙ্গে তো এমন করে প্রাণ খুলে কখনও হাসে না! সুহাসের সঙ্গে বেরোবার সময় তো এমন করে কখনও সাজেও না!

হঠাৎ মিস্টার গার্লিকের যেন দৃষ্টি পড়লো এদিকে।

বলছেন কী মেজর মুখার্জি? আর ইউ টায়ার্ড? ইউ লুক ভেরি সিক্!

হঠাৎ যেন এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এল সুহাসের। মিস্টার গার্লিকের দিকে ফিরে বললে—কী বলছিলেন স্যার?

—তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি! ডোর আন্মাইণ্ডফুল!

—কই, না!

সাহেব বললে—তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছে, তুমি বাড়ি যেতে চাও?

সুহাস কী বলবে কিছু বুঝতে পারলে না।

—একটু ব্র্যাণ্ডি নেবে? বেশ সুস্থ হয়ে উঠবে! ইউ উইল ফীল ফ্রেশ্!

সুহাস দাঁড়িয়ে উঠলো এবার। সেই দিকে আবার চেয়ে দেখলে। কই, কোথায় গেল! কখন তারা নিঃশব্দে হোটেল থেকে চলে গেছে টেরই পায়নি সুহাস। কোথা দিয়ে গেল? কখন গেল!

—আমি আসি স্যার।

—অল্রাইট্! লেট্স্ গো—

বলে মিস্টার গার্লিকও উঠলো। বললে—তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত! মিসেস মুখার্জি বোধহয় লোন্লি ফীল করছে—তোমারও বোধহয় তার কাছে যাওয়া দরকার—আমি ওণ্ড্ ম্যান্, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, তোমাকে আর ডিটেন্ করবো না—

বলে সাহেব আবার পুরোন প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলো—এ ওয়ার আমাদের পক্ষে একটা ক্রুশিয়াল প্রব্লেম্ মুখার্জি, এ-সম্বন্ধে আমি আরো আলোচনা করবো পরে—

কিন্তু তখন আর শোনবার মতো মনের অবস্থা নয় সুহাসের।

সাহেব বললে—চলো, তোমাকে আমি লিফ্ট্ দিচ্ছি—

বাড়ির দরজার সামনে সুহাসকে নামিয়ে দিয়ে সাহেব চলে গেল গাড়ি চালিয়ে। সুহাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিজের বাড়ির গেটের সামনে যেতেই দরোয়ানটা সেলাম করলে। এতক্ষণ দরোয়ানটা চুপচাপ বসে ঝিমোচ্ছিল। সাহেবকে দেখেই য়্যাটেন্শন্ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

তারপর রাস্তাটা পেরোতে গিয়েই কানাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি। কানাইও অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাতের ব্যাগটা তাড়াতাড়ি নিয়ে দৌড়োচ্ছিল। অনেক কাজ এখন তার। সাহেবের পুরোন জামা-কাপড় গোছোতে হবে। তার-পর কন্ডুকটা রেখে দিতে হবে বাক্সের ভেতরে। তারপর বাক্সের চাবিটা দিতে হবে মার কাছে।

সুহাস ডাকলে কানাই, মা কোথায়?

—আজ্ঞে, মা তো এখ্খুনি এল—

—মা কখন বেরিয়েছিল?

কানাই বললে—সেই সন্ধেবেলা—

—কার সঙ্গে বেরিয়েছিল রে!

কানাই বললে—আচারিয়া সাহেব!

—আচারিয়া সাহেব কি রোজ আসে?

কানাই বললে—আজ্ঞে উনি তো রোজই আসেন।

—রোজ এসে কী করেন?

কানাই বললে—রোজ এসেই মাকে গাড়িতে করে নিয়ে যান্—

—আচ্ছা তুই যা।

ঘরের মধ্যে তখন কাজল ঠিক রোজ-কার মত কাগজ-কলম নিয়ে লিখছে। সুহাসকে দেখেই অবাক হয়ে গেল। বললে—ওমা, তুমি যে!

সুহাস বললে—এই এখনি এলাম!

—কাজ শেষ হয়ে গেল বুঝি?

—হ্যাঁ দুদিন আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই চলে এলাম।

কাজল তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—তোমার গরম-জল করতে বলি। চা খাবে তো?

—তুমি চা খেয়েছ?

কাজল বললে—না, একসঙ্গেই খাবো—

তারপর যথারীতি গরম-জলের ব্যবস্থা করে দিলে আবদুল। কানাই চা করতে গেল। সুহাস তৈরি হয়ে এসে বসতেই কাজল বললে—তুমি ছিলে না, বড় একলা-একলা লাগছিল, তাই লিখ-ছিলুম—

—কত দূর হলো তোমার উপন্যাস?

কাজল বললে—প্রায় অর্ধেকের বেশি হয়ে গেছে—

—কবে শেষ হবে?

কাজল বললে—ও-সব কথা থাক্, একলা-একলা থাকি তাই সময় কাটাবার জন্যে লিখি, নইলে লেখিকা হবার ইচ্ছে নেই—

—দেখি না, কতদূর লিখলে?

কাজল বললে—না না, ও-সব তোমাকে দেখাবার মত নয়—

সুহাস হঠাৎ বললে—আমি যখন থাকি না, তখন মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে বেরোও না কেন?

—বারে, আমার বুঝি সংসারের কোনও কাজ নেই? আমার বাইরে বেড়ালে চলে?

সুহাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো কাজলকে। এতদিনের চেনা কাজলকে যেন হঠাৎ তার বড় অচেনা মনে হলো। বললে—আজকে সারাদিন কী করলে?

কাজল বললে—কী আর করবো, সারাদিন বাড়িতেই কাটালুম!

—কোথাও বেরোলে না কেন?

কাজল বললে—কোথাও বেরোতে ভাল লাগে না—

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—কেউ আসেনি আজকে?

কাজল বললে—না—

তারপরেই বললে—হঠাৎ এত কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন?

—না, এমনি।

সুহাস আর কোনও কথা বললে না।

কাজল বললে—তোমাকে যেন আজকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ নাকি তোমার?

সুহাস বললে—না—

তাহলে খুব টায়ার্ড বুঝি? দেখি, জ্বর এসেছে নাকি?

বলে কাজল সুহাসের কপালে নিজের হাতটা ঠেকালে। বললে—না, গা তো গরম নয়,

তারপর আরো কাছে এসে বললে—তুমি বরং শুয়ে পড়ো, আমি তোমার মাথাটা টিপে দিই—

বলে সত্যি-সত্যিই কাজল জোর করে সুহাসকে বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর নিজেই পাশে বসে সুহাসের মাথাটা টিপে দিতে লাগলো। সুহাস চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইল। কিন্তু মনে হলো যেন শরীরের সমস্ত কোষে কোষে তার আয়ুষ্কালের শিখা বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত প্রশান্ত কাজলের মুখের চেহারা, মিথ্যে কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই। এতটুকু জড়তা নেই। তার মনে হলো তার এতদিনের সংসার করা, এতদিনের প্রীতি-আনন্দ, এতদিনের কর্ম, এত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব যেন মিথ্যে, সব যেন অভিনয়। সব যেন ছলনা। সে এতদিন শুধু স্তোক-বাক্যে ভুলে এসেছে, এতদিন শুধু চাতুরীতে প্রতারিত হয়ে এসেছে: কেন সে এই সংসার করতে নেমেছে। তাহলে সেই-ই তো তার ভাল ছিল, সেই ঘোরে ঘোরে চাঁদা তুলে বেড়াতো আর সকলে-বাদ করে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াতো। তাহলে কেন সে বিবেকের গলা টিপে এই ভার মিথ্যের ভিতের ওপর নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের আরামের সৌধ গড়ে তুলতে গেল। কী প্রয়োজন ছিল তার। সুহাস চারদিকে চেয়ে দেখলে। এই আসবাব-পত্র এই সৌখীন বিলাস-সামগ্রী, এই চাকর-আয়া-খানসামা, এই চাকরি, এ-সব কিছুই তো কিছু নয়! কেন এমন করে পরিবারিক জীবনে তাকে জড়াল। কী অপরাধ সে করেছে তার কাছে?

কাজল বললে—একটু আরাম হচ্ছে?

মনে হলো কাজল যেন হাতে চাবুক মারলে। সুহাস কোনও উত্তর দিলে না। চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেললে বন্ধুখায়। তার মনে হলো কাজলের হাতটা যেন কাঁটার মত তার কপালে বিঁধছে। তারপর বললে—হ্যাঁ, আরাম হচ্ছে—

তারপর রাত আরো বাড়লো। টেবিল তৈরি হলো। আবদুল খাবার দিলে। বিছানা করে দিলে বিবি। সুহাস নির্জীবের মত প্রত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপগুলো সব নিষ্প্রয়োজিক মারলে।

কাজল পাশে শুয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে—এখন একটু আরাম হচ্ছে?

সুহাসের মনে হলো এক প্রচণ্ড আঘাত করে কাজলকে। সারা জীবনের যত বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দেয় চূড়ান্ত একটা আঘাত দিয়ে। কিন্তু তবু কেমন দ্বিধা হলো।

কাজল বললে—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও—

সুহাস কোনও আপত্তি করলে না। কাজল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সুহাস চোখ-কান-মুখ বুজে সমস্ত অবাধ যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে লাগলো। তারপর কখন কাজলই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজলের বিলম্বিত তালের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসতে লাগলো। কাজলের হাতও থেমে গেছে এক সময়। অলস অবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কাজল।

খানিক পরে সুহাস উঠলো। উঠে আস্তে আস্তে বাথরুমের আলোটা জ্বাললে।

এবার স্পষ্ট দেখা গেল কাজলকে। বিছানার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল সুহাস। ঘুমে অচৈতন্য কাজল। মাথাটা সরে গেছে বা দিকে। ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি আলগা হয়ে ঝুলছে। যেন বলছে—আমাকে ধরতে পারবে না তুমি! আমাকে ধরা যায় না। আমি অধরা—

সুহাসও বললে—আমি তোমাকে বেঁচে থাকতে দেব না। তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ—

—কিন্তু কেমন ঠকিয়েছি তোমাকে, তুমি চিনতে পারোনি আমাকে। আমি জীবনে যা চেয়েছিলুম সব পেয়েছি—আমি সব কূল বজায় রেখেছি সকলকে খুশী করেছি, আমি সুখী হয়েছি—

ঘুমের ঘোরে কাজল যেন একবার নড়ে উঠলো। সুহাস চমকে উঠে এক-পা সরে এসেছিল। কিন্তু কাজল আবার স্থির হলো। আবার ঘুমের কোলে এলিয়ে দিলে নিজেকে।

সুহাস আর সহ্য করতে পারলে না। কাজলের আঁচল থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে সিংহলকে বিছানার বাক্সটা খুলে ফেললে। তারপর সন্তর্পণে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘোড়ে করা ছিল সেটা তারপর একদৃষ্টে কাজলকে দেখতে লাগলো। তোমাকে আমি ভালবাসি কাজল তুমি আমাকে এত বড় মিথ্যাচারে দীক্ষিত দিয়েছ, এত বড় প্রতারণার বিষের ভার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। আমার ভালবাসার অপমান করেছ তুমি...

হঠাৎ কাজল যেন একটু নড়ে উঠলো। ঘুমের ঘোরে প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। তারপরই ব্যাপার মত কী যেন সামনে নড়ে উঠলো। বললে—কে?

সুহাস বললে—আমি—

—কী করছো ওখানে?

সুহাস বললে—বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাচ্ছি—

কাজল বললে—তা আমাকে বললে না কেন? আমিই দিতে পারতুম—

সুহাস তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে রিভলবারটা রেখে চাবি বন্ধ করে আবার এসে পাশে শুলো। কাজল সুহাসের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল। বললে—তুমি অত ঘুমে কেন, আরো সরে এসো না—

সুহাস বললে—থাক্, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে—

হঠাৎ যেন কাজলের খেয়াল হলো। বললে—আমার চাবিটা কোথায় গেল? আমার আঁচলে বাঁধা ছিল যে—

হন্তদন্ত হয়ে উঠলো কাজল। উঠে আলো জ্বাললে। আলো জ্বেলে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলো। বললে—দেখ তো, শোবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটা আঁচলে বোধহয় না-বেঁধেই ঘুমিয়ে পড়েছি—

তারপর টেবিলের উপর পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি আঁচলে সেটা বেঁধে নিয়ে আবার এসে শুলো। বলছে—চাবিটা আঁচলে না-বাঁধলে আমার ঘুমই আসে না, জানো—

সুহাস কোনও কথারই একটাও উত্তর দিলে না। চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল বিছানার এক পাশে। তারপর কাজল আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ একতালে বয়ে চলেছে। সব কানে এল

সুহাসের। বাইরের পৃথিবীর, ভেতরের পৃথিবীর, অন্তরাত্মার পৃথিবীর সমস্ত সমস্ত কোলাহল স্পষ্ট শুনতে পেলে সুহাস। তার চেতনায় যেন ধনবের নুতো সুরু হয়েছে। তারপর সকাল হলো এক-সময়ে। জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা গেল। হোল ভোর। বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে কী করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে গিয়ে সব বলবে ঠিক করতে পারলে না।

—ওমা, তোমার এত সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেছে?

তাড়াতাড়ি কানাই চা দিয়ে গেল। সুহাস ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিয়েছে। তার ইউনিফর্ম পরেছে। কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাজল সুহাসকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাকি?

সুহাস বললে—কোথায়?

—সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি?

কাজল চুপ করে গেল। কাল থেকেই যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে সুহাসকে। যথারীতি বেরিয়ে গেল সুহাস। যাবার আগে অন্য দিনের মত একবার ভাল করে কথাও বলে গেল না। সুহাসের মনে হলো যেন চিরকালের মত সে চলে যাচ্ছে, আর দেখা হবে না কারো সঙ্গে।

কিন্তু রাত্রেই ফিরলো সুহাস। তখন রাত বোধহয় ন'টা। কিন্তু না ফিরলেই বোধহয় ভালো হতো। চিরকালের মত সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত সে।

অথচ কোথায় যাবারও ছিল না সুহাসের। সে দিনটা ছুটি। ভোরবেলা বেরিয়েছে। শেয়ালদা স্টেশনের সামনে গাড়িটা ছেড়ে দিলে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কবে আবার আসবো হুজুর?

—ঠিক নেই।

কথাটা বলে সুহাস প্ল্যাটফর্মের দিকেই গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল বাইরে। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার তখন চলে গেছে। রাস্তায় ট্রাম-বাস-গাড়ি চলেছে সার বেঁধে। এতদিন যেন এ-পৃথিবীটাকে দেখা হয়নি সুহাসের। সেদিন যেন সব কিছু নতুন লাগলো তার চোখে। এত বৈচিত্র্য, এত মানুষ, এত কাজ চারিদিকে। ছেঁড়া-জামা-কাপড় পরা ভিখিরি, সার্ট-পাঞ্জাবী পরা ডেলি প্যাসেঞ্জার, সকলের মুখে-চোখে ব্যস্ততা, সবাই ছুটছে, জীবিকার তাড়নায় ছুটছে পাগলের মত।

খানিকক্ষণ দাঁড়াল গিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে। অফিস-পাড়ার মানুষের চেহারা দেখে তার কেমন মনে হলো সেই একই দশা, সেই একই বৈচিত্র্য। কিছুই কেন ভালো লাগলো না। পৃথিবীতে কোথায়ও যেন আশ্রয় নেই সুহাসের। সুহাস নিরাশ্রয়ের মত ভেসে বেড়াতে লাগলো কলকাতার জন-সমুদ্রে।

একজন হঠাৎ চেনা-লোকের গলা শোনা গেল।

—এ কি স্যার, আপনি এখানে? ডিউটিতে বুঝি?

সুহাস সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরলে একটা।

—কিধার সাব?

সুহাস বললে—সিধা!

ট্যাক্সিটা সোজা চলতে লাগলো চৌরঙ্গী ধরে। আরো আরো দূরে, আরো বিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো আকাশের ওই শেষ সীমানার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলে যেন ভালো হতো। একেবারে ভাগ্যমন্ডহারবারের সমুদ্রের ধারে গিয়ে থামলো ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—আবি কিধার সাব?

আর কোথায় যাবে এখন? আর কোথায় গেলে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে। সুহাস বললে—এখানে রাখো, আমি নামবো—

সুহাস গাড়ি থেকে নেমে একেবারে সোজা জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পায়ের জুতোর ওপর জলের ঢেউ এসে লাগতে লাগলো। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল জলের তলায়। তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুহাস। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারটাও অবাক হয়ে গিয়েছিল সাহেবের কান্ড দেখে। হঠাৎ পেছনে গলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরতেই ড্রাইভারটা বললে—হুজুর, লৌটেগে নেহি?

—হাঁ, চলো—

আবার ট্যাক্সিতে উঠলো সুহাস। আবার সেই নির্জন দীর্ঘ রাস্তা। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকে। দু'পাশের জলা-জমি থেকে ব্যাঙ ডাকার শব্দ আসছে। বড় আরাম লাগলো এতক্ষণে। মনে হলো চারিদিকের এই অন্ধকারই যেন চেয়েছিল সে জীবনে। সংসার চায়নি, শান্তি চায়নি, অর্থ, গৌরব, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, কিছুই যেন সে চায়নি সারা জীবন। যা সে পেয়েছে, তা যেন সে চায়নি কখনও। চেয়েছিল শুধু অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই যেন এই পৃথিবীর এই মানুষের আদি রূপ আত্মগোপন করে আছে। এই অন্ধকারই যেন ভালো, এখান থেকে যেন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। এ অন্ধকার যেন যায় না দূর হয়, এ অন্ধকার যেন ভোর না হয়। এ অন্ধকার যেন চিরস্থায়ী হয় তার জীবনে।

কখন নিজেরই অজ্ঞাতে কলকাতা সহরের মধ্যে এসে পড়েছে সুহাসের জ্ঞান ছিল না।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে আবার—কিধার সাব?

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে এল সুহাসের। আবার সেই কলকাতা। আবার সেই কলকাতার জীবনের ধোঁয়া, কালি, গোলমাল, বিশ্বাসঘাতকতা। আবার সেই সংসার, সেই চাকরি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। আবার সেই প্রতিযোগিতা। সুহাসের সমস্ত মনটা যেন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কেন সে ফিরে এল কলকাতায়? কাজল থাক্ না তার সংসার আর সম্পত্তি নিয়ে। সুহাস চলে যাবে অনেক দূরে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তার জীবন থেকে। সেই-ই তো ভালো!

কিন্তু আবার মনে হলো—না। একবার কাজলের মুখোমুখি হওয়া ভাল। একবার জিজ্ঞেস করা ভাল—কেন এমন হলো? কার দোষে এমন ঘটলো?

কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ির সামনে আসতেই ঘটনার বিপর্যয়ে চমকে উঠলো সুহাস! এত লোক কেন তার বাড়ির সামনে? এত ভীড় কেন? এত লোক তার বাড়ির ভেতরে বাগানে ঢুকে পড়েছে। সেই ব্ল্যাক-আউটের রাতে শুধু মাথা দেখা গেল অসংখ্য! অসংখ্য লোক ভিড় করেছে তার বাগানের ভেতর। এক দিনের অনুপস্থিতির মধ্যে হঠাৎ এ কী বিপর্যয় ঘটে গেল?

বাবুকে দেখেই ভিড় একটু সরে গেল। দারোয়ান অন্ধকারে অতটা চিনতে পারেনি। সুহাস জিজ্ঞেস করলে—ক্যা হুয়া? কী হয়েছে এখানে? এত লোক কেন?

দারোয়ান যা বললে তার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা গেল না। সুহাসের রক্তের সমুদ্রে তখন তুফান চলেছে।

কানাই দৌড়ে এল বাবুকে দেখে। বললে—বাবু, খুন হয়ে গেছে একটা লোক—

—কে খুন হয়েছে?

কানাই বললে—আচারিয়া সাহেব!

আচারিয়া সাহেব! আচারিয়া সাহেব আবার এসেছিল? কখন এসেছিল? কানাই বললে—সন্ধেবেলা এসেছিল, মা'র সঙ্গে গল্প করছিল হুজুর, আমি চা করে দিয়ে বাইরে আমার ঘরে গিয়ে একটু বসেছি, হঠাৎ দুম্ দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হলো

—তারপর?

—তারপর বন্দুকের শব্দ শুনেই আমি বাইরে বাগানে ছুটে এসেছি। আবদুল, বিবি-ওরাও ছুটে এসেছে অন্ধকারের মধ্যে নজরে পড়লো আচারিয়া সাহেব দৌড়তে দৌড়তে বাইরের ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে আসছে, আসতে আসতে আরো দু'একবার শব্দ এলো বন্দুকের আর আচারিয়া সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—

সুহাস তাড়াতাড়ি ভীড় সরিয়ে দেখলে। আচারিয়া অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে—। পিঠ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা।

—কে খুন করলে, দেখছিস?

কানাই বললে—না হুজুর, কিছু দেখতে পাই নি, শুধু দেখলুম বাইরের ঘরের দরজার কাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে খুব—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

আমি এ-সব কথা কিছুই জানতাম না। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামও কখনও শুনিনি। এ-সব অনেক দিন আগের ঘটনা। আমি তখন লিখতেও শুরু করিনি। কলকাতা শহরের খবরের কাগজে অন্যান্য অনেক রাহাজানি-ডাকাতি-খুন-জখমের কাহিনীর মধ্যে এ-রকম একটা বেরিয়েছিল কি না তাও আমার মনে থাকবার কথা নয়। আর চিঠি লিখছিলেন সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কাটনী থেকে। সি-পি'র ছোট-খাটো একটা সহর কাটনী। বম্বে যাবার পথে স্টেশনটা অনেকবার দেখেছি—এই পর্যন্ত। সেই কাটনী থেকে চিঠি পেয়ে আমি প্রথমে গা করিনি। শেষকালে যখন তিনি আসা-যাওয়ার খরচ পাঠালেন তখন গেলাম।

ট্রেন থেকে নেমে ভেবেছিলাম কেউ দেখা করতে আসবে। কিন্তু কেউই আমার জন্যে স্টেশনে আসেনি দেখে একটু রাগও হয়েছিল মনে মনে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত যখন দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম, তখন ভেতর থেকে কে একজন রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে?

শেষ পর্যন্ত যখন শুনলে আমি কলকাতা থেকে এসেছি তখন দরজা খুলে দিয়েছিল।

কানাই বললে—আপনার চিঠির জন্যে বাবু এ ক'মাস খুব ভেবেছেন—

বললাম—বাবু কোথায়?

—ভেতরে। কিন্তু তাঁর খুব শরীর খারাপ হুজুর। আর উঠতে পারেন না বিছানা থেকে—

শেষ পর্যন্ত কানাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন দেখলাম। আমাকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন আনন্দে। কানাই থামিয়ে দিলে। তিনি একদাকালে সুস্বাস্থ্যবান ছিলেন, তা চেহারা দেখেই বোঝা গেল।

বললেন—আপনি আসাতে যে কী আনন্দ পেয়েছি, তা আর কী বলবো! আপনার জন্যেই বোধ হয় আমি এখনও বেঁচে আছি—

তারপর অনেক কথা হলো। ঘরের দেওয়ালে দেখলাম একটি মহিলার ছবি টাঙানো।

কানাই বললে—ওই আমার মায়ের ছবি—

তখনও কিছুই জানি না কেন আমাকে ডেকেছেন সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কে তিনি, আমার সঙ্গে কেন সম্পর্ক পাতাতে চাইছেন। খেতে বসে কানাইকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমাকে কেন ডেকেছেন, তুমি জানো কিছু?

কানাই বলেছিল—না হুজুর—

—বাবু এখানে একলা থাকেন কেন? বাবুর কেউ নেই?

কানাই বলেছিল—বাবু পুলিশের মস্ত চাকরি করতেন এককালে, তারপরে হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন। আমারও তো কেউ নেই, তাই আমিও চলে এলুম বাবুর সঙ্গে—

—তা বাবু তোমার পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন, হঠাৎ?

কানাই বললে—তা জানি নে বাবু, বাবুর কী যে মতি হলো, বাবু একদিন অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে এসে উঠলেন, সেই থেকে আমিও রয়েছি, আর আমার এই কর্মভোগ চলছে—

—কেন, কর্মভোগ কেন?

—কর্মভোগ নয় তো কী বাবু, বাবুর নিজেরও কোনও প্রতিস্থির নেই, আমাকে সময়-সময় পাগল করে ছাড়েন! নইলে দেখলেন তো বাবুর চেহারা। ইয়া চেহারা ছিল বাবুর, রাতারাতি চোখের ওপর কেন বুড়ো হয়ে গেলেন, মাথার চুলগুলো সব পেকে গেল, গায়ের চামড়া ঝুলে গেল, এখন দেখলে মনে হয় যেন সত্তর-আশী বছর বয়েস!

—কিন্তু কেন এমন হলো?

প্রথম দিন কয়েক কোনও কাজের কথাই হলো না। ডাক্তার আসে আর দেখে যায় সুহাসবাবুকে। আমিও দিন কতক বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম আশে-পাশের জায়গাগুলোতে। কখনও স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে টেন আসা-যাওয়া দেখি, কখনও বাজারের ভেতরে গিয়ে নতুন দেশের লোকজন দেখি।

সেদিন সুহাসবাবু বললেন—আপনার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি জানি, কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আমায় মার্জনা করবেন আশা করি—

বললাম—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি হাতে অনেক সময় নিয়েই এসেছি—

সুহাসবাবু বললেন—অনেক দিন থেকেই আপনার আসার প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু কে আর আমার জন্যে নিজের কাজ-কর্ম ছেড়ে এখানে আসবে বলুন! আমি প্রতিদিন আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকতুম, শেষে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল—

—কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙলোই বা কেন হঠাৎ? আপনি তো পুলিশে চাকরি করতেন!

কে বললে আপনাকে?

বললাম—কানাই। কানাই আমাকে কিছু কিছু বলেছে, আপনি নাকি হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন!

সুহাসবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—কানাই আর কতটুকু জানে, আর কতটুকুই বা সে আপনাকে বোঝাতে পারবে! একজন মানুষ কি আর একজন মানুষকে বুঝতে পারে? কোনও স্বামীই কোনও স্ত্রীকে বুঝতে পারে না! বলে তিনি চুপ করলেন হঠাৎ!

আমি বললাম—আমাকে কী জন্যে আপনি ডেকেছিলেন তা কিন্তু এখনও বলেন নি আমাকে!

—তাহলে শুনুন আপনি হয়ত শুনে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এ বলতে না পারলে আমিও শান্তি পাবো না। ওই দেখুন, দেওয়ালে আমার স্ত্রীর ছবি টাঙানো রয়েছে, আমার পরলোকগতা স্ত্রী—

দেখলাম। বললাম—কানাই আমাকে প্রথম দিনেই তা বলেছে—

—তাহলে অনেক কিছুই শুনেছেন দেখছি। জানিনা আপনি কতটুকু শুনেছেন আর কতটুকু শোনেন নি। কিন্তু এটা শুনেছেন কি না জানি না যে আমি আমার স্ত্রীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমার স্ত্রী সাধারণ একজন স্কুল-মিস্ট্রেস ছিলেন!

—তা শুনেছি!

—এটা কি শুনেছেন যে আমার বাড়িতে আচারিয়া বলে একজন ভদ্রলোক খুন হয়ে যায়?

—তাও শুনেছি!

সুহাসবাবু বললেন—কেন খুন হয় তা শুনেছেন কী?

বললাম—না—

সুহাসবাবু বললেন—আমিও তা জানতাম না। আমার সংসার, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার প্রতিপত্তি, আমার সম্মান সমস্ত কিছু সেই খুনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল—তাও শুনেছেন কি?

বললাম—না, তা শুনিনি—

—আমার স্ত্রী একটা উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিল, কিন্তু তা আর শেষ হয়নি, তা-ও শুনেছেন কি?

বললাম—শুনেছি কানাই-এর কাছে, যে আপনার স্ত্রী মাঝে-মাঝে কাগজ-কলম নিয়ে কী সব লিখতেন—

—সে উপন্যাস তিনি শেষ পর্যন্ত আর শেষ করে যেতে পারেন নি। জানি না কী-রকম সে লেখা। আমি পুলিশের লোক, ছাত্রজীবনে স্যার পি-সি--রায়ের কাছে বিজ্ঞান শিখেছি, তাঁর সঙ্গে মিলে সল্ফট-গ্রাস সমিতির কাজ করেছি, সাহিত্য-টাহিত্যের কথা কখনও ভাবিনি, তিনি কি লিখেছেন, কেন লিখেছেন তাও বুঝতে পারি না—হয়ত বেঁচে থাকলে বইটা শেষ করে যেতে পারতেন! কিন্তু আমি চাই যে আপনি সেটা শেষ করে দিন—

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি চলে যাবার আগে দেখে যেতে চাই সে বইটা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে! আর.....

কী যেন আরও বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু থেমে গেলেন।

বললাম—বইটা কোথায়?

—এই যে আমার কাছেই আছে।

বলে হাতে লেখা একটা মোটা খাতা বিছানার তলা থেকে বার করলেন। বললেন—এটা সব সময়েই কাছে রাখি, কাছে রাখলে তবু খানিকটা আমার স্ত্রীর সান্নিধ্য পাই, মনে হয় কাজল আছে, কাজল বেঁচে আছে এখনও—

জিজ্ঞেস করলাম—কী নাম দিয়েছিলেন বইটার?

সুহাসবাবু বললেন—রং বদলায়—।

তারপর একটু থেমে বললেন—কীসের রং তা জানি না। জীবনের না মনের, যৌবনের না বয়সের তাও জানি না। হয়ত সব জিনিসেরই রং বদলায়। আমরা দেখতে পাই না বাইরে থেকে, বাইরে থেকেই আমরা শুধু বিচার করি মানুষের।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—তা সে-সব কথা থাক্, আপনি বইটা পড়ুন আগে, যদি খারাপ হয়েও থাকে, তবু ছাপাবার মত করে দিন। আমি ছাপাবার সমস্ত খরচ দেব, আমার যা কিছু জমানো টাকা আছে সব দেব আপনাকে, আপনি শেষটা লিখে দিয়ে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন—

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বইটা পড়তে লাগলাম। নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা। কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা সত্য সন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। মেয়েলি হাতের গোটা-গোটা অক্ষর। মহিলাটির নিজস্ব একটা ভাবনা ছিল। সংসার সম্বন্ধে, পৃথিবী সম্বন্ধে, স্বামী সম্বন্ধে, সন্তান সম্বন্ধে, বিবাহ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, সেই প্রত্যয়ের ব্যাখ্যার জন্যেই হয়ত গল্প লিখতে সুরু করেছিলেন।

বিকেল বেলাই আবার ডেকে পাঠালেন। কানাই এসে ডাকলে। বললে—বাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন—

সামনে যেতেই সুহাসবাবু বললেন—পড়লেন?

বললাম—সবটা পড়া হয়নি। কিন্তু আমি যে বইটা শেষ করবো, তার আগে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার কতগুলো কথা জানা দরকার—

—কী কথা বলুন?

বললাম—আপনার স্ত্রীর মনোবৃত্তি-টাও আমার জানা দরকার, তাহলে আমার লিখতে সুবিধে হবে। যে-রাত্রে মিস্টার আচারিয়া খুন হন, সে-রাত্রে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন তিনি খুন করলেন আচারিয়াকে?

—হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছিলাম! কিন্তু সে-সব কথাও কি আপনার জানা দরকার?

আমি বললাম—তা না জানলে লেখার অসুবিধে হবে। লেখককে জানলে তার লেখার বিচার সোজা হয়—

কথাটা শুনে সুহাসবাবু কিছুক্ষণ অসহায়ের মত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তবে তাই বলি। কিন্তু এক মিস্টার গার্লিক ছাড়া আর কাউকে আমি বলিনি সে-কথা—শুনুন—

সেদিনকার সেই ব্ল্যাক-আউটের রাত! সুহাস যেন পাগলের মত ছট্-ফট্ করে উঠেছিল। বাগানে অত ভিড়। আচারিয়া তখনও সেইখানে পড়ে আছে। আর সারা শরীর বেয়ে ঘেমে গেছে। সুহাস তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। তখনও বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঘরে ঢুকেই খিল্ লাগিয়ে দিলে দরজায়। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল কাজল। কাজলের মুখে-চোখে অস্বাভাবিক ভীতি। সুহাস একেবারে কাছে গিয়ে কাজলের দুটো হাত ধরে ফেললে। বললে—এ কী করলে তুমি?

কাজল থর থর করে কাঁপছিল তখনও।

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন তুমি ওকে খুন করলে? কী হবে এখন?

কাজল শান্ত চোখে চাইলে সুহাসের দিকে শুধু। তারপর বললে—ও স্কাউণ্ড্রেলটা মরেছে?

সুহাস বললে—মরেছে। কিন্তু কেন মারতে গেলে ওকে অমন করে? এখনি যে পুলিশ আসবে। এখনি যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে? কী সর্বনাশ করলে তুমি বলো তো কাজল? এখন আমি কী করি?

কাজল কিছু উত্তর দিলে না।

সুহাস বললে—জবাব দাও কথার, পুলিশ যে তোমার কাছেই জবাব চাইবে?

কাজল বললে—ওর মরাই উচিত, ও অনেকদিন ধরে আমাকে জ্বালাচ্ছিল, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, আমি আর পারিনি—

—কিন্তু সন্ধ্যেবেলাই তো তোমাকে দেখেছি চৌরঙ্গীর হোটেলে ওর সঙ্গে, তুমি হাসছো, কথা বলছো!

কাজল অবাক হয়ে চাইলে সুহাসের দিকে। সুহাস বললে—বল, উত্তর দাও। শিগ্‌গির, এখনি পুলিশ আসবে—

কাজল অনেকক্ষণ পরে বললে—ও আমাকে ব্ল্যাক মেইল্ করতে চেয়েছিল—

কেন? কী জন্যে তোমাকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল? কী করেছিলে তুমি? ওর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? বলো, বলো—

কাজল বললে—ওকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি, এ ক'বছরে, ওকে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি, তবু ওর লোভ মেটেনি!

—কীসের লোভ?

টাকার!

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তোমার কাছে টাকা চাইবার সাহস ওর হলো কী করে? কী করেছিলে তুমি? বলো?

তখন অত সময় নেই আর। কাজল আর পারলে না। কাঁদতে কাঁদতে সুহাসের বুকের ওপর ঢলে পড়লো।

আর দেরি করা চলে না। তাড়াতাড়ি কাজলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সুহাস মিস্টার গার্লিককে টেলিফোন করলে।

—আমি মুখার্জি কথা বলছি স্যার। আপনি এখনি দয়া করে আমার বাড়িতে চলে আসুন। একটা ভীষণ য়্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, কথা বলবার সময় নেই আর—

সে-রাত্রে সুহাসের মনে হয়েছিল তার যেন সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। একটা অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের মুহূর্তে যেন সুহাস তার সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সংসার সব হারিয়ে ফেলেছে সুহাস।

গার্লিক সাহেব এসে জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু মিসেস মুখার্জি কেন এ-কাজ করতে গেল? আচারিয়ার সঙ্গে মিসেস মুখার্জির কি অন্য কোনও সম্পর্ক ছিল?

—আপনি জিজ্ঞেস করুন না স্যার?

কাজল তখনও কঠিন পাথরের মত গুম্ হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল।

গার্লিক সাহেব কাজলকে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন এ কাজ করতে গেলেন মিসেস মুখার্জি? কেন, নিজের হাতে আইন তুলে নিতে গেলেন? আচারিয়া কি আপনাকে অপমান করেছিল?

কাজল মুখ তোলেনি। কোনও কথাও বলেনি।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেছিল—একটা কিছু জবাব তো আপনাকে দিতেই হবে মিসেস মুখার্জি? আপনি কি নিজেকে ডিফেন্ড্ করার জন্যে মেরেছিলেন?

কাজল বললে—ও একটা স্কাউন্ড্রেল—

—কিন্তু কী করেছিল ও আপনার?

—ও ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল। আমি অনেক টাকা দিয়েছি ওকে। এ ক'বছরে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি ওকে, তবু আরো টাকা চাইত, আরো ভয় দেখাতো?

—কীসের ভয়?

—আমার অসম্মানের ভয়! আমার সংসার নষ্ট করতে চেয়েছিল ও। আমার সুখ ওর সহ্য হচ্ছিল না, আমার এই স্বামী, আমার এই ঐশ্বর্য, কিছুই সহ্য করতে পারছিল না ও—

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনাকে ভয় দেখাতো ও কোন্ সাহসে? আপনার কোনও দুর্বলতা ছিল? আপনি কখনও কোনও অন্যায় করেছিলেন? নিজের কোনও গোপন-কথা ওকে বলেছিলেন কখনও?

কাজল এ কথার কোনও উত্তর দেয়নি। হাজার প্রশ্ন করায় পরও কোনও উত্তর দেয়নি। মিস্টার গার্লিক বাইরে পাশের ঘরে সুহাসকে ডেকে এনে বলেছিল—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি আচারিয়ার আগেই পরিচয় ছিল মুখার্জি?

সুহাস বলেছিল—হ্যাঁ স্যার—

—তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই?

সুহাস বলেছিল—হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি—

মিস্টার গার্লিক সব শুনে নিলে। আগে মিসেস মুখার্জি কোন্ গার্লস্ স্কুলের মিস্ট্রেস ছিল। তখন থেকেই পরিচয় ছিল ওদের। সব শুনে সাহেব বললে—তাহলে এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে মুখার্জি—

তাহলে কী হবে স্যার?

মিস্টার গার্লিক বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে মিসেস মুখার্জি গিল্টি—

—কিন্তু তার তো কোনও প্রমাণ নেই!

—প্রমাণ না থাকলেও কোর্টে কেস উঠলেই প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে তোমাকে হেল্প্ করবো।

বললাম—তারপর?

সব মানুষের জীবনেই এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, যখন সারা জীবনের বাঁধা রুটিনেরও হঠাৎ ব্যতিক্রম হয়। সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায় রাতারাতি। সামান্য একখানা বই কারো জীবনে নতুন পরিচ্ছেদ এনে দেয়। সুহাসের জীবনেও এই ঘটনা সেই রকম। মিস্টার গার্লিক ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সব চাপা পড়ে গেল। সে সেই যুদ্ধের সময়। যখন পুলিশের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা। মিস্টার গার্লিক কাকে টেলিফোন করে দিলেন। কাজল ধরা পড়লো। দু'-একদিন লক-আপেও থাকতে হলো তাকে। অপরিসীম লজ্জা আর অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে-কদিন মুখ লুকিয়ে বেড়িয়েছে সুহাস। কখনও সারাদিন ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনও অন্ধকার রাস্তায় ছোটলোকদের ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে বেড়িয়েছে। কানাই দেখতো, কাছে আসতো। বলতো—খাবার দেব বাবু?

সুহাস বলতো—না—

এ-রকম করে না-খেয়ে থাকলে যে শরীর টিঁকবে না বাবু?

সুহাস চিৎকার করে, উঠতো। বলতো—না তুই, বেরো এখান থেকে—পালিয়ে যা—

কতদিন যে খায়নি সুহাস, কতদিন যে রাত্রে ঘুমোয়নি, তার হিসেব কোথাও লেখা নেই। কেউ জানতে পারেনি সে-ই ইতিহাস। কাজলের কলঙ্ক যে সুহাসের নিজের জীবনেরই কলঙ্ক। সুহাস যেখানে যেত, মনে হতো সবাই যেন ওর দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছে—ওই যে, ওই লোকটা—

শেষ পর্যন্ত হয়ত পাগলই হয়ে যেত সে। সারা দিনের মধ্যে বাড়ি আসবার সাহসটুকুও কেন হারিয়ে ফেলেছিল। বাড়িতে এলেই যেন দম্ আটকে মারা যাবে সে। বাড়ির আবহাওয়াতে যেন কাজলের সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতার বিষ-বাষ্প মেশান ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হলো না। খবরটা খবরের কাগজেও ছাপা হতে পারলো না। মিস্টার গার্লিক একদিন ডাকলেন মুখার্জিকে। সুহাস গিয়ে হাজির হলো সাহেবের বাড়িতে। সুহাসের চেহারা দেখেই সাহেব বললেন—এ কী হয়েছে তোমার? এ রকম মন-মরা হয়ে গেলে কেন?

সুহাস চুপ করে বসে রইল সাহেবের সামনের চেয়ারে বোবার মত।

—লাইফে এইটুকু দুঃখ সইতে পারো না? জীবনের মানে কি এই? শুধু একটানা সুখ পাওয়া?

তারপর আরো বোঝাতে লাগলো সাহেব। বললে—তোমার স্ত্রী শিগ্গিই ছাড়া পাবে।

—কিন্তু ও স্ত্রীকে নিয়ে আমি কী করবো স্যার?

সাহেব অনেক সান্ত্বনা দিলে। অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝালে। বললে—দেখ মুখার্জি, সব মানুষেরই একটা গোপন হিস্ট্রি থাকে, সে হিস্ট্রি সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। হাজব্যান্ড্ ওয়াইফের কাছে প্রকাশ করতে পারে না, ওয়াইফও হাজব্যান্ডের কাছে প্রকাশ করতে পারে না—ওটা ভুলে থাকাই ভালো—

—কিন্তু ভুলতে যে পারছি না।

সাহেব বললে—পারবে, পারবে, চেষ্টা করলেই ভুলতে পারবে! নিজের ছেলের মৃত্যু-শোক পর্যন্ত মা ভুলে যায়, আর তুমি পারবে না ভুলতে?

—কিন্তু ওই স্ত্রীর সঙ্গে এর পর একসঙ্গে বাস করবো কী করে? আমি যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতুম আমার স্ত্রীকে—

সাহেব বললে—তুমি একলা কেন? সবাই প্রাণ দিয়েই ভালবাসে নিজের স্ত্রীকে—

—কিন্তু আমার এই আন্‌চেস্ট্ স্ত্রীকে নিয়ে আমি কী করে থাকবো এক বাড়িতে?

সাহেব হঠাৎ বললে—কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের কোনও সন্তান হয়নি কেন মুখার্জি? কোনও ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

সুহাস বললে—না, সন্তান আমিই চাই নি স্যার। ভেবেছিলুম আমরা দু'জন, আমরা দু'জনেই যথেষ্ট—আমরা দু'জনেই আমাদের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট—আর কারো দরকার হবে না—

—ভুল করেছিলে মুখার্জি। আমার মনে হয় তোমার স্ত্রীর কোথায় একটা অভাব ছিল, তা তুমি জানতে চেষ্টা করো নি!

সুহাস জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু এখন আমার কী করতে বলেন আপনি? আমি কি করতে পারি?

—কিছু না। যেন কিছুই ঘটে নি। তোমার স্ত্রী দু'একদিন বাদেই ছাড়া পাবে। তুমি নিজে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কোনও কথা জিজ্ঞেস করবে না। কেন খুন করেছিল কী জন্যে খুন করেছিল, কার কোন্ দোষে খুন করেছিল, কিছু জিজ্ঞেস করবে না! যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটে নি। ঠিক আগেকার মত সহজভাবে থাকবে। তবেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা ইণ্ডিয়ান, তোমরা হিন্দু, তোমরা জানো না তোমাদের ম্যারেজ-লাইফ আমাদের চেয়ে কত সুখী। আমরা মনে মনে তোমাদের হিংসে করি, তা জানো?

তারপর হঠাৎ সুহাসের পিঠ চাপড়ে দিলে।

বললে—বাক্ আপ্ বয়, নো ফিয়ার, লাইফ ইজ্ বিটার বাট্ সুইট টু—মনে কোর না জীবনটা শুধু কষ্টের হয়—জীবনে সুখও আছে, এটা ভুলে যেও না—

সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুহাসের কেমন মনে হয়েছিল তার জীবনেও আবার সুখ আসবে। আবার সুখী হবে সে। আবার বেঁচে উঠবে, আবার সংসার করবে, আবার ভালবাসবে!

তারপর একদিন ছাড়া পেলে কাজল। জেলখানার হাজত থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরের আলোর পৃথিবীতে! দূর থেকে সুহাস দেখছিল। কাজলের চেহারাটা যেন এই ক'দিনেই রোগা হয়ে গেছে। গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। প্রথমে দেখা হলে কী কথা বলবে সেইটেই ভাবছিল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বললো—এসো—

কাজলের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—খুব কষ্ট হয়েছিল?

কাজল মুখ নিচু করে শুধু বললে—না—

তারপর পাশাপাশি এক গাড়িতে কেউ কোনো কথা বলে নি। গাড়িটা এঁকে বেঁকে অনেক রাস্তা পরিক্রমা করে এসে পৌঁছলো বাড়িতে। কানাই দৌড়ে এল। এসেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো মা'র পায়ের কাছে বসে পড়ে। কাজল কিছু কথা বললে না। নিজেই কেঁদে ফেললে। আবদুল এসে দাঁড়াল। বিবিও এল। এসে প্রতিদিনকার মত বললে—মাইজী, চুল বেঁধে দিই তোমার—

বিবি চুল বেঁধে দিলে কাজলের। কাজল গা ধুতে গেল কলঘরে। কলঘর থেকে বেরিয়ে নতুন পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরলে। তারপর ঘরে এসে বসলো।

সেদিনের কথা সব মনে আছে সুহাসের। জীবনের স্মরণীয় দিন সেটা। তারপর থেকে একই বাড়িতে, একই ছাদের তলায় দু'জনে বাস করতে লাগলো দিনের পর দিন, কিন্তু কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। এ এক অদ্ভুত সংসার।

কাজল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কই, তুমি আর কথা বলো না তো?

সুহাস শুধু বলেছিল—এবার থেকে বলবো!

সেই এবার আর আসেনি সুহাসের জীবনে। ক্ষমা বড় জিনিস, মহৎ জিনিস। ক্ষমার তুল্য বড় ধর্ম নেই সংসারে। ও-সব বইতে পড়া আছে। ও-সব বইতে লেখা থাকাই ভালো। মানুষ ওতে মহৎ হবে। জগৎ ওতে সুখের জায়গা হবে। কিন্তু মিস্টার গার্লিক যা-ই বলুক, সুখ নেই পৃথিবীতে। সুখ যাকে বলি, সে তো দুঃখেরই রকমফের। উপদেশ দেওয়া ভালো, উপদেশ শোনাও ভালো। কিন্তু উপদেশ পালন করতে যারা পারে, তারা হয় মহাপুরুষ, নয় পশু। বাস্তব জীবনে উপদেশের কোনও দাম নেই। নইলে স্যার পি-সি-রায়ের মত উপদেশে কিছুটা অন্ততঃ কাজ হতো!

মিস্টার গার্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কবে চাকরিতে রিজিউম করবে?

সুহাস বলেছিল—আরো কিছুদিন বিশ্রাম চাই স্যার, এখনও মনটাকে ঠিক করে আনতে পারি নি।

সত্যি, দিনের পর দিন কাটতো অমন এক অস্বাভাবিক দম্পতি বাস করতো একটা ছাদের তলায় অস্বাভাবিক ভাবে। একই সঙ্গে খেত, একই বিছানায় শুতো, কিন্তু একজনের কাছ থেকে আর একজন যেন শত যোজন দূরে চলে গিয়েছিল। চোখের সামনে থেকেও যেন চোরের আড়ালে থাকা। কোথায় যে সারাদিন কাটতো সুহাসের, কোথায় কোন্ নগণ্য বস্তির আশেপাশে, আবার কখনও শহরের জনারণ্যে। পা আর চলতে চাইত না। সকালবেলা পা-জোড়া চালিয়ে দিত সুহাস নিরুদ্দেশ যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কেমন করে আবার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসতো নিজের বাড়িতে। সেই বাগান ছিল, সেই মালী ছিল, সেই দরোয়ান ছিল, সেই বিবি, আবদুল, কানাই সবাই ছিল। তবু মনে হতো কিছুই যেন নেই সুহাসের। একেবারে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে সুহাস। তার মনে যেন ফুটো হয়েছে, তার মনে যেন ফাট্ ধরেছে।

এই কানাই-এর জন্যেই তখন সুহাসের বেশি কষ্ট হতো। কানাই বলতো—বাবু, আপনি আজকেও খেলেন না?

আশ্চর্য, সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেও পেত না সুহাসের। কতদিন যে খায়নি, কত রাত যে ঘুমোয়নি, তা কেউ জানতো না, কেউ দেখতোই না, কেউ ভাবতোই না।

শেষকালে সেই অবধারিত কাণ্ডটা ঘটলো।

বললাম—তারপর?

সুহাসবাবুর বেশি কথা বলতে শেষকালে কষ্ট হতো। খানিকক্ষণ কথা বলার পর একটু বিশ্রাম নিতেন। সে-কদিন ছিলাম কাটনীতে, সে-কদিন অনেক কাহিনী শুনেছি। সুহাসবাবুর কোনও সঙ্গীই ছিল না। একলা-একলাই এতদিন কাটিয়েছেন। আমি যেতে তবু একজনের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলেন যেন। কিন্তু তখন তাঁর বাঁচার মেয়াদ বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে।

খালি বলতেন—আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, আপনি নিজেও তা জানেন না।

একদিন বলেছিলেন—একদিন আমি স্যারের কথা খেলাপ করেছি, স্যার আমাকে বড় ভালবাসতেন। জীবনে আমি তাঁকে আমার মুখ দেখাতে পারিনি। যেদিন তিনি মারা গেলেন, আমি শ্মশানে গেলাম তাঁকে দেখতে। মনে হলো তিনি যেন আমাকে বকছেন। আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। বলছেন—এখন ভালো করে ভুলের খেসারৎ দে—

তাই সারা জীবনে ভুলের-খেসারতই দিয়ে গেলাম। সেই জন্যেই আপনাকে আমি ডেকেছি। আপনি কাজলের ওই বইটা শেষ করে আমাকে ভুলের খেসারত দেবার সুযোগ করে দিন দয়া করে।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার স্ত্রী কোথায়?

—ওই যে!

বলে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছবিটার দিকে দেখালেন। বললেন—ওই আমার স্ত্রী, ওই আমার ভুল।

—কেন? ভুল কেন বলছেন? আপনার অপরাধ কোথায়?

সুহাসবাবু বললেন—অপরাধটা আমারই! তবে সমস্ত ঘটনাটা শুনুন, আমি বলছি—

তারপর সুহাসবাবু একটু জল খেয়ে বলতে লাগলেন—এ-ঘটনার অনেক দিন পরে একদিন হঠাৎ আমার কী খেয়াল হলো। তখন বাগান নেই, বাগানের মালীও নেই, তখন আমার শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। আমি পাগলের মত বাড়িতে বাস করছি। রাত অনেক হয়ে গেছে। কাজল তার বিছানায় ঘুমিয়েছে। আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলুম। উঠে একবার ভাবলুম, এ-বাড়িতে আর বেশি দিন থাকলে আরো পাগল হয়ে যাবো। আমি আস্তে আস্তে কাজলের আঁচল থেকে চাবির তাড়াটা নিলাম। নিয়ে বাক্স-দেরাজ-আলমারী সব খুললাম। হঠাৎ কাজলের একটা নিজের আলমারী এগুতেই কেমন অবাক হয়ে গেলাম। সেটা কখনও আমি খুলিনি আগে। তার নিজের জিনিস-পত্তর থাকতো তাতে। আমি ও-সব কিছুই দেখতাম না কখনও। কোথায় কার কী জিনিষ থাকতো, তা-ও দেখতাম না। কাজলই সমস্ত গুছিয়ে বার করে দিত আমাকে। দেখলাম—একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো কী একটা রয়েছে তাতে। আগ্রহ হলো দেখতে। দেখলাম—এক তাড়া চিঠি। একটা নয়, দুটো নয়, একশো-দুশো চিঠি। খুব যত্ন করে তারিখ মিলিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা। চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। লেখা। কোনওটা লেখা লণ্ডন থেকে, কোনওটা সিঙ্গাপুর থেকে, কোনওটা পেনাঙ্গ থেকে, কোনওটা বর্মা থেকে।

সেই রাত্রেই একটার পর একটা সব চিঠি পড়ে গেলুম। প্রত্যেকটি কাজলের বিয়ের আগেকার চিঠি। লিখেছে আচারিয়া। পড়তে পড়তে চোখের সামনে সব কাপ্‌সা হয়ে গেল। এতদিন এ-কথা কিছুই জানতাম না আমি। এতদিন আমাকে এমন করে প্রতারণা করে এসেছে—

বিছানার কাছে এসে দেখলাম কাজল ঘুমে অচৈতন্য। তালে-তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। আমার রক্তের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপর এক কাণ্ড হলো। আমি তখন বাড়িতে। তখনও চাকরিতে রিজিউম করিনি। একদিন বীণা এল। কাজলের বন্ধু। করাচী থেকে কলকাতায় এসেছিল। সরোজ আসেনি ছুটি পায়নি বলে। বীণা এসেই ছুটে এসেছে আমাদের বাড়িতে।

এসেই জিজ্ঞেস করলে—কাজলদি? কাজলদি কোথায়?

কানাই বলেছিল—মা তো নেই—

—তাহলে জামাইবাবু? জামাইবাবু আছেন?

আমার কাছে এসে আমার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? কাজলদি কোথায়?

বললাম—আপনি শোনেন নি? কাজলদি তো নেই!

—নেই মানে?

বললাম—নেই মানে, নেই—

কী হয়েছিল, শেষকালে কোন্ ডাক্তার দেখছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলে। তারপর কাঁদতে লাগলো। তার কান্না দেখে আমার চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগলো।

বীণা বললে—অনেক দিন আমি খবর নিতে পারিনি, দু'-একখানা চিঠি লিখেছিলুম, তারও জবাব পাইনি, তাই কলকাতায় পৌঁছেই দৌড়ে এসেছি।

তারপর চলে যাবার আগে বললে—একটা কথা ছিল—

বললাম—বলুন,—

বীণা বললে—আমার নিজের অনেক-গুলো চিঠি কাজলদির কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেগুলো কোথায় আছে জানলে নিয়ে যেতাম—

বললাম—কার চিঠি?

বীণা বললে—আমারই চিঠি! বহু-দিন আগে একজন আমাকে লিখেছিল, প্রায় একশো-দুশো চিঠি। একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো ছিল, কাজলদি তার নিজের আলমারীতে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল সেগুলো—

আমার মাথার তখন রক্ত টগবগ্ করে ফুটছে—

আমি যেন ভুল শুনেছি।

বললাম—কার চিঠি বললেন?

বীণা বললে—এক ভদ্রলোক আমাকেই লিখেছিলেন চিঠিগুলো বিয়ের আগে, সেগুলো আমি কাজলদির কাছে রেখে দিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে কেউ দেখতে না পায়—আপনি এগুলো খুঁজে বের করুন না—

বললাম—তারপর?

সুহাসবাবু বলতে লাগলেন—তার-পর পরে আরো যা শুনলাম, তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল। শুনলাম বিয়ের আগে আচারিয়া বীণার চরম সর্বনাশ করেছিল—

—চরম সর্বনাশ মানে?

সুহাসবাবু বললেন—বিয়ের আগেই বীণার এক সন্তান হয়েছিল, কুমারী জীবনের চরম লজ্জায় অঘটন ঘটেছিল, সেই কলঙ্কের সুযোগ নিয়ে আচারিয়া দিনের পর দিন কাজলের কাছে এসে টাকা চাইতো, কাজলকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চাইত, শেষকালে কোনও উপায় না দেখেই কাজল এই চরম পথ বেছে নিয়েছিল—

এর পর আপনাকে আর আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি যে এখনও বেঁচে আছি, এ বোধহয় আমারই পাপের ভোগ। তাই আপনাকে বার বার চিঠি লিখেছিলাম আসতে।

আর বেশি দিন বাঁচেন নি সুহাস-বাবু। বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এতদিন টিঁকে ছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি নিজের স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত খুন করেছিলেন?

সুহাসবাবু বলেছিলেন—নিজের স্ত্রীকে নয়, আমি আসলে আমাকেই খুন করেছিলাম সেদিন—আমি আত্মহত্যাই করেছিলাম বলতে গেলে—

—কিন্তু কী করে তা সম্ভব হলো? কী করে খুন করলেন?

সুহাসবাবু বলেছিলেন—স্বদেশী যুগে যেভাবে পুলিশ টেররিস্টদের জেলে পুরে আস্তে আস্তে কষ্ট না দিয়ে, তাদের বুঝতে না দিয়ে খুন করতো, আমিও তেমনিভাবে খুন করেছিলাম। সে ঠিক খুন নয়, সেও একরকমের আত্মহত্যা! আমি সত্যিই আর বেঁচে নেই। আমার অদৃশ্য আত্মা আপনার সঙ্গে কথা বলছে শুধু,—আমি মরেই গেছি—

শেষ জীবনে সুহাসবাবুর যা কিছু সম্পত্তি ছিল সবই তিনি দিয়ে গিয়ে-ছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে। স্যার পি সি রায়ের নামে কোনও কিছু স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থার জন্যে। আসলে তার কী হয়েছে আমি খবর রাখি না। আমার কাছে এখনও সেই পাণ্ডুলিপিটা আছে। কাজল দেবীর লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—যত বদলায়। সে আর আমার শেষ করা হয়নি। বোধহয় শেষ করার মত নয়ও তা।

॥ সমাপ্ত ॥

CENTRAL LIBRARY

যুগান্তর প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

মাছুগঞ্জের বিরাট রেলকারখানার অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার অংশুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী রেবাদেবী প্রসাধনে বসেছেন।

সামনে সুদৃশ্য ড্রেসিংটেবল, তারই আয়নার দিকে প্রায় কাঁচে মুখ ঠেকিয়ে প্রসাধন চলেছে। দিনের আলো প্যাট প্যাট করছে, তা সত্ত্বেও মাথার উপর দুশ শক্তির বিজলী বাতি জ্বলছে। ঘণ্টাখানেক ধরে মুখে ছুনকাম, ঠুকুগালে ঘুরুস, অক্ষিকোটরে কালিমা ও ওষ্ঠাধরে লালিমা লেপন পর্ব শেষ করে একটা হাঁপ ছেড়ে তিনি কপালে সিঁদুরের টিপ কাটা সুরু করলেন।

রেবাদেবীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও তিনি নিত্যনিয়মিত বৈকালে প্রসাধনের সময় কপালে টিপ পরতেন। কারণ তিনি জানতেন তাঁর বিরাট ললাটের অন্তত খানিকটা জায়গা টিপ দিয়ে ঢাকতে না পারলে মুখখানা মোটেই মানানসই হয় না। ওদিকে আবার তাঁর মসীবিনিন্দিত চকচকে চামড়ার পটভূমিতে লাল সিঁদুর তেমন খোলে না। তাই সিঁদুরের সঙ্গে অভ্র, তিলকমাটি ইত্যাদি মিলিয়ে তিনি এমন একটি রঙ আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁর চামড়ার সঙ্গে বেশ খাপ খায়।

খুব মনোযোগের সঙ্গে মাথাটা প্রায় আয়নার গায়ে ঠেকিয়ে কপালে সিঁদুরের কাঠিটি সবে ছুঁইয়েছেন এমন সময়ে তাঁর মেয়ে চন্দ্রমা নাচতে নাচতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ মা, কোন ফ্রকটা আজ পরব?

আচমকা মেয়ের আওয়াজে তাঁর অন্যমনস্কতায় আঘাত লাগল, কিছু সিঁদুর কপাল থেকে ঝরে নাকের উপর পড়ল। তিনি বিরক্ত হয়ে মেয়ের দিকে চাইলেন।

চন্দ্রমার দুহাতে দুটি ফ্রক। সে দেখতে প্রায় তার মায়েরই মতো—কালো, ছিপছিপে গড়ন, চোখ দুটো কোটরগত, নাকটা বেশ লম্বা, মায়েরই মতো বিরাট

কপাল—বয়স পনেরো ষোলো। মা ফিরতেই মেয়ে বললে—তুমি যেতে দাও, নইলে—

রেবাদেবী কর্কশ কণ্ঠে বললেন—তোমাকে আর কত শেখাব বাছা! এই রকম হাল্কা রঙের ফ্রক পরে রাত্তিরের পার্টিতে যাওয়া যায় কখনও?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মুখুজ্জে পরিবারে প্রসাধনের এই রকম হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। রাত্রে তাঁদের অন্যতম প্রতিবেশী পটস্ পরিবারে ছিল তাঁদের নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ।

পটস্রা জাতিতে ফিরিঙ্গি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর গুপোমফাড়া যে সব ফিরিঙ্গি এদেশে থেকে গিয়েছিলেন, পটস্ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অংশুপ্রকাশের মতো তিনিও সেখানকার রেলকারখানায় ইঞ্জিনিয়ার। পটস্ দম্পতির অনেকগুলি সন্তান, প্রায় প্রতি-মাসেই একটি না একটি জন্মদিন লেগেই আছে। পটস্দের ওখানে খাওয়া-দাওয়া হতো চলনসই বটে কিন্তু বেলা চারটে থেকে হুড়োহুড়ি সুরু হতো—শেষ হতো রাত্রি প্রায় বারোটায়। পটস্দের অনেক বন্ধু এবং বান্ধবী এই সব উপলক্ষ্যে পুত্র-কন্যাসহ কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁদের ঘরের সফেন শম্পাঞ্চিন অনেক দুষ্কার্ত বাঙ্গিকেই আকর্ষণ করত। সন্ধ্যে থেকেই গ্রামোফোনে নাচের বাদ্যির সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় নৃত্য সুরু হতো। অনেক খাঁটি ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ এই সব নাচে যোগ দিতেন। পটস্ নিজে ছিলেন অসম্ভব রকমের মোটা আর পটস্ পত্নী ছিলেন অসম্ভব রকমের রোগা। কিন্তু উভয়েই ছিলেন নৃত্যবিলাসী। যখন তাঁরা জোড়ায় নাচতেন তখন মনে হতো যেন কোলাব্যাঙ ও গঙ্গাফড়িঙে জোট লেগে গেছে।

অংশুপ্রকাশদের অন্যতম প্রতিবেশী ছিলেন মিস্টার ওয়াটসন। আসলে তিনি ছিলেন খাঁটি চীন দেশের লোক। ওয়াট-সনের পিতা দেশে থাকতেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন; পরে কলকাতায় এসে বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি ব্যাগ ইত্যাদির ব্যবসা করে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। তিনি ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন।

মিস্টার ওয়াটসন ফিরিঙ্গি মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মৎস্য-বিলাসী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁরা ছিলেন ভোজনবিলাসী। বিশ্বের কোথায় কি ভালো খাদ্যের পাওয়া যায়, কোন জাতি কোন বস্তু ভালো রান্না করতে পারে সে সম্বন্ধে ওয়াটসনের জ্ঞান ছিল অদ্ভুত। তিনি নিজেও ছিলেন ভালো পাচক আর স্ত্রীকেও এই বিদ্যেটি ভালো করেই শিখিয়েছিলেন। অবশ্য বাড়ীতে তাঁর দু'-জন ভালো খানসামা ছিল। খাদ্য সম্বন্ধে ওয়াটসন যখন আলোচনা করতেন তখন বেশ বোঝা যেত, অন্নই যে ব্রহ্ম সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট। চর্বা চোষ্য লেহ্য পেয়ের মধ্যে যে রস লুকিয়ে আছে তাকেও যে ব্রহ্মানন্দসহোদর নাম দিতে পারা যায় তা যুক্তি-তর্ক দিয়ে তিনি যে কোনো সময় প্রমাণ করে দিতে পারতেন।

উপনিবেশের আর এক দিকে থাকতেন মিস্টার লাল—সপরিবারে। তাঁরা ছিলেন পাঞ্জাবী ও সুন্দরের বাড়। কর্তা গিন্নী দুই কন্যা ও এক পুত্র—সকলেই দেখতে খুবই সুন্দর এবং এইজন্যে তাঁরা ছিলেন বিশেষরূপে গর্বিত। লাল সাহেব স্পষ্টই বলতেন—পাঞ্জাবের তুল্য দেশ নেই, পাঞ্জাবীদের মতো ভালো রাজা ভারত-বর্ষের আর কোথাও হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। নৈবেদ্যের চূড়োর ওপরে সন্দেশের মতো লালসাহেব ছিলেন আবার বিলেতফেরত। তবে এই ধরণের গর্বপ্রকাশের মধ্যে কখনও অসৌজন্য প্রকাশ পেত না বলে উপনিবেশের সকল পরিবারের সঙ্গে তাঁদের ছিল বিশেষ হৃদ্যতা। উপনিবেশের মধ্যে আরও দু'ঘর বাঙালী ছিলেন—সেখানেও খাওয়া-দাওয়া আনন্দোৎসব কিছু কম হতো না।

সে বছর চন্দ্রমা প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। অংশুপ্রকাশের ইচ্ছে ছিল মেয়েকে কলকাতায় তাঁর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কোনো ভালো কলেজে লেখাপড়া লেখাবেন। অংশুপ্রকাশের পিতা অংশু-মৌলি বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন। তাছাড়া তাঁর পৈত্রিক ধনসম্পত্তিও প্রচুর ছিল। একটি মাত্র ছেলের সন্তান দুটিকে কাছে রেখে মানুষ করেন এই সাধ তাঁর বহুদিনের। কিন্তু রেবাদেবী ছেলে-মেয়েকে কাছ ছাড়া করতেন না।

অংশুপ্রকাশের মা ছিলেন দারুণ শুচিবাইগ্রস্ত লোক। সকাল থেকে বাড়ী-ঘর ঝাটপাট, কল-মাজা, দরজা-জানলা-চৌকাঠ গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া ইত্যাদি অতি উচ্চশ্রেণীর কাজগুলি সারতে তাঁর বেলা দুটো অবধি কেটে যেত। সন্ধ্যে অবধি বাকি সময়টা কাটত পূজা ও স্নানে। সন্ধ্যেবেলা তিনি নিজ হাতে প্রত্যেকটি কয়লা গোবরজলে ধুয়ে উনুনে আগুন দিতেন। তারপর আধসের দুধ দিয়ে এক ডাঁইখাটি চা পান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। রাত্রি আটটা নাগাদ নিজ হাতে খান কয়েক বিলুপ্ত গব্য ঘৃতে ভাজা লুচি ও একটি তরকারী রান্না করে আহার করতেন। ভাত মোটেই খেতেন না কারণ সেটা না কি ভীষণ সর্দ্দি। তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখে সকলেই মনে করতেন তিনি অচিরেই মোক্ষলাভ করবেন; কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। স্ত্রীর মোক্ষলাভ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বাড়ীরই এক কোণে আলাদা করে তাঁর নিজের খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করলেন। এতে গিন্নীর আপত্তি ছিল না; তবে বাড়ীতে মাছ ঢুকলে গিন্নী ভয়ানক গোলমাল করতেন—মাংসের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। গিন্নীর শিবু নামে একটি প্রিয় চাকর ছিল। সে গিন্নীর কথা অনুসারে দিনে চারবার স্নান করত। তাই মতো সমস্ত দিন অনাহারে থেকে রাত্রিতে গিন্নীর দেওয়া চারখানি লুচি দিয়ে উদরপূরণ করত। তার কাজের মধ্যে ছিল রোজ বিকা করে তিন কলসী গঙ্গাজল ও এক ঝুড়ি শুষ্ক গোবর আহরণ করে আনা। এই কাজে শিবুর রোজ এক টাকার ওপরে আয় হতো। শুধু তাই নয় গঙ্গাজল ও গোবর আনার ফাঁকে সে বাইরে এক জায়গায় বেশ করে আহার করে আসত।

গিন্নী মাসে মাসে একবার করে গঙ্গা-স্নান করতে যেতেন। বেলা দুটোয় সময় তিনি গাড়ীতে উঠতেন বটে কিন্তু সকাল দশটায় ট্যাক্সি এসে দরজায় দাঁড় করানো হতো। এই সময়টা মিস্টার চঞ্চল থাকত আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গিন্নীর আজ্ঞা মতো শিবু চাকর গঙ্গাজল ও গোবর দিয়ে তিনবার গাড়ীকে শোধন করে আসত।

এই সম্পর্কে একদিনের একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিন সকাল হতে না হতে গাড়ী ডাকা হয়েছিল। সিংজী দরজার কাছে গাড়ী নিয়ে বসে থেকে থেকে ঢুলতে লাগল। ঘণ্টাখানেক বাদে শিবু এসে এক-বার সিংজীর অগোচরে গাড়ী-খানাকে শোধন করে গেল। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে সিংজী রাত্রিজাগা শরীরটিকে সিটের ওপর বসিয়ে দিয়ে নাসিকা গর্জন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শিবু একটা পেতলের গামলায় গোবর ও গঙ্গাজলের মিশ্চার নিয়ে এসে হাজির। সিংজীর অগোচরে সে বেশ করে পেছনকার সিট পরিশোধন করতে আরম্ভ করেছিল; বোধহয় সেবারকার মিক্সচারটা কিছু কড়া ছিল। বিশ্রী গন্ধে সিংজীর চটকা ভেঙে যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে শোধনরত শিবুকে দেখে গাড়ী থেকে টেনে আগে তাকে বার করে দিলে। তারপর গামলা-

সুদ্ধ গোবরজল তার মাথায় ঢেলে দিয়ে গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড় লাগিয়ে দিয়ে বললে—তোমাদের সোয়ারি আমি নেব না—আমার এই তিন ঘণ্টা ওয়েটিং চার্জ আমায় দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

শিবু তো এক হাত গালে দিয়ে আর এক হাতে গামলা ধরে চীৎকার করতে করতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন সিংজীও বাড়ীর মধ্যে ঢুকে চীৎকার করতে আরম্ভ করে দিলে।

গিন্নী তখন সবেমাত্র কলঘরে ঢুকেছেন—ঘণ্টা তিনেকের দায় নিশ্চিন্ত। অংশুমৌলি দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে একটু নিদ্রার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন—শিবুর ঐ মূর্তি। তিনি আর কি করবেন—টাকা দিয়ে সিংজীকে থামিয়ে বিদেয় করে দিলেন।

এ হেন স্থানে কোনো মা-বাবা তাঁদের মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে পারেন! অংশু-প্রকাশের স্ত্রী প্রকাশ করলেন, ও জায়গায় মেয়েকে পাঠানো বা আর যমের বাড়ী পাঠানোও তা। অংশুপ্রকাশ হেসে বললেন—গিন্নী, তুমি ভুল করছ। যমের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে এমন নজীর আমাদের দেশে একাধিক পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বয়ং যম যদি মার পাল্লায় পড়েন তাহলে তাঁকে আর ফিরতে হবে না।

সে বছর অংশুপ্রকাশের ছেলেও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। স্থির করা হলো, কলকাতায় এসে কোনো হোস্টেলে থেকে সে পড়বে। চন্দ্রমাকে অবশ্য তাঁর হোস্টেলে রাখা পছন্দ করলেন না। তার বেলায় ব্যবস্থা হলো সে তাঁদেরই কাছে থেকে প্রাইভেটে ইন্টারমিডিয়েট পড়বে।

বছর দুয়েক বাদে সিতাংশুমৌলি এবং চন্দ্রমা দুজনেই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বেরিয়ে গেল। পড়াতে হলে মেয়েকে আর কাছে রাখা যায় না। চন্দ্রমাকে কোনো ভাল হোস্টেলে রেখে কলকাতাতেই পড়ানো যায় কি না তারই খোঁজ-পত্র চলছিল এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

একদিন কারখানা থেকে ফিরে এসে অংশুপ্রকাশ দেখলেন তাঁর নামে সরকারী লম্বা খামের এক চিঠি এসেছে। চিঠি পড়ে জানা গেল যে, তাঁর আশাতীত পদোন্নতি হয়েছে এবং অবিলম্বে কল-কাতায় গিয়ে সেখানকার আপিসের চার্জ বুঝে নিতে হবে।

চিঠিখানা তাঁদের পরিবারে হরিষে-বিষাদ নিয়ে এল। আশাতীত পদোন্নতিতে কারুর আপত্তি করবার কিছু ছিল না। কিন্তু কলকাতায় যাওয়া—এতকালের মাথুরগঞ্জ—পটস্, ওয়াটসন, লাল ঘোষ প্রভৃতি পরিবার—যাদের সঙ্গে প্রায় এই বিশ বৎসর কাল পরমানন্দে দিন কাটিয়েছেন—যাদের জন্যে চাকরিকে চাকরি বলে মনে হয়নি—সেই নাচ-গান হাসি-হুল্লোড় হৈ-চৈ ইত্যাদি ছেড়ে কল-কাতায় যাওয়া—কারই বা মন চায়!

তাছাড়া কলকাতায় যাবেনই বা কোথায়! সেখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে না, নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা—সে তো যমের বাড়ী যাওয়ারই সামিল। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে অংশুপ্রকাশ তাঁর বাবার কাছে এ সম্বন্ধে পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। বাবা অংশুমৌলি উত্তরে লিখলেন—তুমি কলকাতায় বদলি হয়ের এতে আমার আনন্দ হওয়ারই কথা: কিন্তু কলকাতার পরিস্থিতি যে রকম তাতে একটা নদ'মাও ভাড়া পাবার উপায় নেই। এদিকে তোমার মায়ের শুচিতা প্রায় সমস্ত বাড়ীখানিকেই আশ্রয় করেছে। তোমরা এসে যদি জোর করে খান কয়েক ঘর দখল করে বসতে পার তাহলে বাড়ীখানা অন্তত সেই সঙ্গে আমিও খানিকটা বেঁচে যাই। ঘর-দখল করার কথায় লজ্জা পাবার কিছু নেই কারণ আজকাল ভরত-দখলের দিনই পড়েছে। আগে থাকতে কোনো কথা তোমার মাকে জানানো সমীচীন নয়।

অংশুপ্রকাশ পিতার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। কদিন ধরে শুভেচ্ছা ও শুভকামনার উৎসব শেষ করে অংশুপ্রকাশ সপরিবারে মাথুরগঞ্জ পরিত্যাগ করলেন।

হঠাৎ বলা-কওয়া নেই—ছেলেকে সঙ্গোষ্ঠী উপস্থিত হতে দেখে গিন্নী তো প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। নাতি নাতনী পুত্র পুত্রবধূ—সকলকে প্রণাম করতে উদ্যত দেখে তিনি চীৎকার করে উঠলেন—থাক, থাক, আমাকে ছুঁয়ো না, তোমাদের কি কাপড় তার ঠিক নেই; আমি এইখান থেকেই তোমাদের আশীর্বাদ করছি।

প্রণাম করতে হলো না দেখে চন্দ্রমা সিতাংশু ও রেবা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। তাঁর সেই গোবরে স্নাত দেহ ছুঁতে তাদের ঘেন্নাই হচ্ছিল।

এবার গিন্নী কাঁকড়ে উঠলেন—হ্যাঁ রে প্রকাশ, তা সপরিবারে এখানে আসছ—একথা আমাদের একটু জানাতে নেই?

অংশুপ্রকাশ বললে—নিজের বাড়ীতে আসব, তা আবার জানাবো কি! আমরা এখন এইখানেই থাকব।

গিন্নী আবার ঝঙ্কার দিলেন—এখানে কোথায় থাকবে বাছা?

অংশুপ্রকাশ মায়ের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে এদিক, ওদিক ঘুরে বাড়িখানা দেখে বেড়াতে আরম্ভ করলে।

মনে পড়ল তার মায়েরই আদরে বাড়ীর লম্বা লম্বা বারান্দা ও বড় বড় ঘরগুলি প্রথম শ্রেণীর কালো ও সাদা মর্মরে মণ্ডিত হয়েছিল, আজ সেই সব মর্মরের ওপরে এক ইঞ্চি গোবরের প্রলেপ পড়েছে। তার সেই ছিম-ছিমে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুরেশা মায়ের আজ কি পরিণামই না হয়েছে!

পিতা অংশুমৌলি নির্বিকার, উদাসীন। তিনি বাড়ীর এক কোণে একখানি ছোট ঘর নিয়ে বাস করেন। সৌখিন, ভোজনবিলাসী পিতা এখন দুবেলা নিজের হাতে ইকমিক কুকারে রান্না করে খান। মাছ-মাংস যে কতদিন খাননি তার ঠিকানা নেই। বয়সের তুলনায় এককালে তিনি সুস্থ ও সবলই ছিলেন। অংশুপ্রকাশের মনে হলো—পিতা যেন আরো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

এক সময় অংশুপ্রকাশকে ডেকে তিনি বলে দিলেন—মাছ-মাংস রান্নার হাঙ্গামা আর তোমরা তোলো না। ওগুলো বাইরে থেকেই খেয়ে এসো। তারপর একটু হেসে বললেন—এই দেখ না, মাছ-মাংস না খেয়ে আমি বেশ ভালোই আছি।

অংশুপ্রকাশ হেসে বললে—ভালই যে আছেন তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। আজ থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।

অংশুমৌলি বললেন—না না, তাতে শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা আছে। ও যেমন চলছে তেমনি চলতে দাও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। অংশুপ্রকাশ শেষ পর্যন্ত সপরিবারে বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। কিন্তু কথা রইল—মাছ কিংবা মাংস রান্না করা কিংবা বাইরে থেকে এনে খাওয়াও চলবে না।

প্রথম দিনকয়েক একরকম চলল। কিন্তু চাঁনে ওয়াটসনের টেবিলে খাদ্য, কুখাদ্য, অখাদ্য ও নিষিদ্ধ সমস্ত প্রকার মাংস খাওয়াই তার পরিবারের সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এতদিন বাদে শুধু নিরামিষ তরকারী দিয়ে ভাত তাদের মুখে বেশিদিন রুচবে কেমন করে? তাই মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যের ঝোঁকে বাইরে থেকে চপটা কাটলেটটা আনা চলতে লাগল। বাড়তে বাড়তে মাংসের ঝোলও আসতে লাগল। প্রথমটা খুব সাবধানেই এই ক্রিয়া চলছিল কিন্তু ক্রমেই সাবধানতা শিথিল হয়ে এল। ফলে এক-দিন গিন্নী কি করে যে টের পেয়ে

গেলেন—বাড়ীতে রীতিমত মাংসোদ্ধ খাওয়া চলছে—।

সেদিন সকালে শ্রীমতী স্বামীকে সন্ধেবেলায় যাসবার সময় মাংস আনতে দেওয়ার জন্যে টাকা বার করছেন এমন সময় ওপর থেকে এ্যাটম বোমার নিনাদে সকলে চমকে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি সকলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন—অংশুপ্রকাশের মা—তাঁর দুই হাতে কনুই অবধি গোবর লিপ্ত—একখানি গামছা দিয়ে দেহ আবৃত করে তারস্বরে পুত্রবধূকে গালাগালি পাড়ছেন। পুত্রবধূও ছাড়বার পাত্র নয়। সে ও দোতলার বারান্দা থেকে সমান-তালে শাশুড়ির উদ্দেশে পালটা বোমা ছাড়তে লাগল। অংশুপ্রকাশ নিজের স্ত্রীকে নিরস্ত করবার দু'একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে অপারগ হয়ে নিচে নেবে গেল।

বাড়ীর কর্তা অংশুমৌলি নিজের ঘরে কি কাজ করছিলেন—হঠাৎ ওপর থেকে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন বোমার আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

গিন্নী চীৎকার করে বললেন— কি হয়েছে তা তোমার ঐ অমাবস্যে বৌকে জিজ্ঞেস কর।

পুত্রবধূ পালটা কাড়লেন—এই অমাবস্যের বাপের টাকাতে একদিন যে চার চাঁদনি দেখেছিলে—ভুলে গেছ?

অংশুমৌলির অংশু ততক্ষণ মাথা থেকে পায়ে ঢলে পড়েছে। তিনি তাড়া-তাড়ি ছেলেকে নিজের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—বৎস, যদি নিজ হিত চাও, তবে অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ কর। নচেৎ যুদ্ধের আরম্ভেই যা ব্যাপার দেখছি তাতে ভবিষ্যৎ বিশেষ সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে।

অংশুপ্রকাশ বাড়ী খুঁজতে লাগলেন। শোনা যায় তেমনভাবে খোঁজ করলে কলকাতায় ষাঁড়ের দুধ ও বাঘের ডিমও পাওয়া যায়। হলোও তাই। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ীও পাওয়া গেল। তবে যা পাওয়া গেল তাকে আর বাড়ী বলা যায় না— মাথা গোঁজবার একটুখানি জায়গা বললেই হয়।

যাক্ কলকাতার এক গলির মধ্যে মজুমদারদের বাড়ী—খুবই উচ্চ এবং অভিজাত পরিবার তাঁরা। একশ বছর আগে তাঁদের কে একজন ব্যবসা করে ধনী হয়েছিলেন এবং সেই সময় সহরের কয়েকটি বড় ঘরের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধও হয়েছিলেন। ধন নেমে এসে এখন একেবারে তলিয়ে গেছেও বংশটা কিন্তু উঁচুই রয়ে গেল। অবশ্য এ কথা অন্য লোকে না জানলেও যশোধরেরা মুক্ত কণ্ঠে সে কথা সর্বদাই জাহির করে থাকেন।

এই নতুন বাড়ীর মালিকেরা তিন-চারটি সন্তান, তারমধ্যে একজন বিবাহ করেছেন। সকলেই অল্পস্বল্প চাকরি করেন কিন্তু চাকরির অর্থে বাড়ী মেরামত করা, টাক্স দেওয়া প্রভৃতি খরচ কুলোয় না। কাজেই একতলার গুটি তিনেচার ঘর ভাড়া দিতে হচ্ছে। একসময় এই ঘর-গুলির কোনোটিতে গোরাল, কোনোটিতে খড়ের গুদোম ইত্যাদি ছিল। এখন চার-পেয়ে গরু গিয়েছে—দু-পেয়ে গরুরা পয়সা খরচ করে এই ঘর আশ্রয় করেছে। অংশুপ্রকাশ পাঁচশ টাকা সেলামি ও মাসে মাসে একশ টাকা করে তিনমাসের ভাড়া অ্যাডভান্সে দিয়ে সপরিবারে এসে এই ঘরগুলিতে আশ্রয় নিলেন।

অংশুপ্রকাশ সকালবেলায় খেয়ে দেয়ে আপিসে চলে যান। ছেলেমেয়েরাও খেয়ে-দেয়ে যে যার কলেজে চলে যায়। রেবা-দেবী থাকেন একলা পড়ে। কাজেই বাড়ীওলাদের বৌমাটিকে নিয়ে এসে গল্প-গাছা করে সময় কাটাতে হয়। কর্তারা সবাই গত হয়েছেন—এখন শুধু ছেলে-ছোকরার দল। বউটির বয়স বেশি নয়, বছর দু'তিন হলো তার বিয়ে হয়েছে—এখনও কাচ্চা-বাচ্চা এসে পৌঁছয়নি।

রেবাদেবী ঘুরে ঘুরে ঘর দেখেন। এটি তাদের ঘর, এটি তার দেওরের ঘর, এটি একটি জ্যাঠতুতো দেওরের ঘর ইত্যাদি। একটি ঘরে তালা বন্ধ দেখে রেবাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—এ ঘরে কে থাকে? সব সময়েই তালাবন্ধ দেখি?

বউটি বললে—এটি আমার এক খুড়তুতো দেওরের ঘর। সে এতদিন মামার বাড়ীতেই থাকত। কিছুকাল আগে এসে তার নিজের ঘর দখল করেছে। তাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ সকাল ন'টার সময় সে আপিসে বেরিয়ে যায়—আপিসের পর যায় মামার বাড়ী—সেখান থেকে ফেরে প্রায় রাত্তির দশটায়। তার খাবার ঢাপা দেওয়া থাকে—এসে খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে।

ঘরের বাসিন্দার ইতিহাস শুনে অংশুপ্রকাশ-গিন্নী কিছু কৌতূহল অনুভব করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটির নাম কি?

বৌমা বললেন—সুকল্যাণ।

দিন কাটতে থাকে। অংশুপ্রকাশদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই বাড়ীওয়ালা-দের বেশ ভাব জমে উঠল—তারা সকলেই ভালো লোক। খায় দায়, চাকরী করে। সুকল্যাণের সঙ্গেও তাদের আলাপ হলো—কিন্তু সে বড়ো একটা বাড়ীতে থাকে না বলে আলাপ তেমন জমে না।

একদিন—সেদিন বোধহয় রবিবার—সকালবেলাটা সুকল্যাণ বাড়ীতেই ছিল। ঘরের আসবাব-পত্র ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেলে চৌকাঠের ওধারে চন্দ্রমা দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে দেখছে। চন্দ্রমার দিকে সুকল্যাণের চোখ পড়তেই সে বললে—সোজা ভেতরে চলে এসো এখানে ঢুকতে টিকিট লাগবে না।

চন্দ্রমাও সপ্রতিভ মেয়ে, সেও সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিক চেয়ে বললে—বাঃ আপনার ঘরটিতো বেশ সাজানো।

সুকল্যাণ প্রত্যুত্তরে বললে—সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

চন্দ্রমা চমকে বললে—কেন, কি হল?

সুকল্যাণ বললে—চৌকাঠ পেরিয়ে যখন ভেতরে এসেছ, এখন আপনি আজ্ঞে পরাজ্ঞে—ওসব কবা চলবে না। আমি যেমন সহজেই তোমাকে 'তুমি' বললুম, তুমিও তেমনি সহজে আমাকে 'তুমি' বলবে।

বলা বাহুল্য সেইদিনই চন্দ্রমার সঙ্গে সুকল্যাণের ভাব জমে গেল। পরেরদিন থেকে চন্দ্রমা সময় পেলেই সুকল্যাণের ঘরে এসে গল্প করে। সুকল্যাণও ক্রমেই বাইরের আড্ডা কমিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে। সুকল্যাণের মনে হয়—কালো হলেও চন্দ্রমার মুখশ্রী সুন্দর।

সে মাঝে মাঝে চন্দ্রমার করুরেখা দেখে। এমনই চলেছে, একদিন সুকল্যাণ বলে ফেললে—চন্দ্রমা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

চন্দ্রমা চমকে উঠল। সে বললে—বিয়ে? তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—তা কি করে হবে?

সুকল্যাণ জিজ্ঞাসা করলে—কেন হবে না?

চন্দ্রমা ঢোক গিলতে গিলতে বললে তোমরা কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ। এ বিয়েতে বাবা-মা রাজী হবেন কেন?

সুকল্যাণ বললে—বাবা-মা না হোল, তুমি রাজী আছ কি না? আমরা রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করবো।

চন্দ্রমা বললে—কিন্তু জাতের গণ্ডী কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়।

সুকল্যাণ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—বল কি চন্দ্রমা! গ্যাগারিণ পৃথিবীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল আর তুমি জাতের গণ্ডীর কথা বলছ?

গ্যাগারিণ যদি ভিন্ন জাতের মেয়ে বিয়ে করত তাহলে তাকে ঐ পৃথিবীর

ওন্ডীর চারিদিকেই ঘুরতে হতো—আর দেশে ফিরতে হতো না।

কথাটা বলেই চন্দ্রমা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রমা ঐ রকম করে বেরিয়ে যেতে সুকল্যাণ ভড়কে গেল। তার মনে হতে লাগল—চন্দ্রমা এখন যদি গিয়ে তার বাপ-মাকে এই কথা জানায়—ব্যাপারটা যে কতদূরে গড়াতে পারে—তা ভাবতে ভাবতে সুকল্যাণ দস্তুরমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে উঠে তাড়াতাড়ি জামা গায় দিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে চুপি চুপি খেয়ে দেয়ে সুকল্যাণ শুয়ে পড়ল। পরের দিন সকালবেলা নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রমা তার ঘরে এল না দেখে সুকল্যাণের মনে হল চন্দ্রমা তার ওপর রাগ করেছে। একবার দূর থেকে চোখাচোখি হয়েছিল কিন্তু তার মনে হল যেন চন্দ্রমা মুখটা ফিরিয়ে নিলে। সুকল্যাণ ভাবলে যাক গে, চন্দ্রমা বাড়ীর কাউকে জানায়নি, নইলে এতক্ষণ হাঙ্গামা বেড়ে যেত।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রমা সুকল্যাণের ঘরে দেখা দিলেই সুকল্যাণ জিজ্ঞাসা করলে—কি গো রাগ পড়েছে?

চন্দ্রমা অবাক হয়ে বললে—রাগ? কিসের রাগ।

সুকল্যাণ বললে—আমি ভাবছিলুম আমার কথায় বুঝি রাগ করেছ।

চন্দ্রমা বললে,—না, তোমার কথাটা নিয়েই ভাবছিলুম। সামনেই পরীক্ষা তার একটা ভাবনা আছে, তার ওপর তুমি একটা ভাবনা চাপিয়ে দিয়েছ।

সুকল্যাণ বললে—এত ভাবনার কি আছে?

চন্দ্রমা বললে,—না, আমাকে কিছুদিন ভাবতে দাও।

চন্দ্রমা ভাবতে লাগল। আর সুকল্যাণ আশায় দিন গুনতে লাগল।

একদিন ভোর পাঁচটার সময় সুকল্যাণের দরজায় ঘা পড়তেই সে ধড়-মড় করে উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখল—চন্দ্রমা দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্রমা একরকম ছুটেই ঘরে ঢুকে বললে—আমি স্থির করে দেখেছি। বিয়ে করব। তুমি আজই নোটিস দিয়ে দাও।

সুকল্যাণ উৎফুল্ল হয়ে চন্দ্রমার একটা হাত ধরে বললে,—আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে চন্দ্রমা।

সে দেখলে চন্দ্রমার দুই চোখ জল-জ্বল করছে আর ঠোঁট দুটো স্ফুরিত হচ্ছে।

সুকল্যাণ বললে—তুমি বোসো একটু, ততক্ষণ চা তৈরী করি।

চন্দ্রমা বললে—না, আজ আমার পরীক্ষা আরম্ভ হবে, আমি যাই।—বলে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুকল্যাণ স্টোভ পাম্প করতে করতে গুনগুনিয়ে গান ধরলে—

নয়নে তার এ কোন ভাষা,
অধরে তার এ কোন গীতি
আজ ভোরে মোর ঘুম ভাঙায়ে
অজানা সে কোন অতিথি।

যথা সময়ে চন্দ্রমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। নোটিসের নির্দিষ্ট কাল অতীত হবার পরেই সুকল্যাণ ও সে একদিন রেজিস্ট্রারের ওখানে গিয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলো। রেজিস্ট্রারের আপিস থেকে বেরিয়ে সুকল্যাণ বললে—কেমন দিব্যি বিয়ের কল বানিয়েছে বলত—ঢুকলুম অবিবাহিত, আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরোলুম বিবাহিত হয়ে।

তারা উভয়েই ঠিক করলে—ব্যাপারটা এখন খুবই গোপনে রাখা হবে। তারপর সময় ও সুবিধা বুঝে আস্তে আস্তে প্রকাশ করলেই হবে।

গোপন তথ্য কিংবা গোপন বিষয়ের মধ্যে ফাঁস হয়ে যাবার বীজ লুকিয়ে থাকে। সুকল্যাণ ও চন্দ্রমার বিয়ের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেল। একদিন সকালবেলায় চন্দ্রমার ভাই সীতাংশু সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে কোথা থেকে সংবাদটি শুনে এসে বাড়ীতে প্রকাশ করে দিলে।

সুসংবাদটি শোনা মাত্রই রেবাদেবী উগ্রচন্ডী মূর্তিতে ডাক দিলেন—চন্দ্রমা—কি শুনছি সব! এ কি সত্যি?

চন্দ্রমা জানালে—সব সত্যি।

তারপরে একতরফা যা বলতে লাগল সে আর তাবার প্রকাশ করা যায় না। রেবাদেবী শেষকালে বললেন—বেরোও আমাদের বাড়ী থেকে।

চন্দ্রমা আস্তে আস্তে সুকল্যাণের ঘরে গিয়ে সব কথা বললে। সুকল্যাণ বললে—আমাকে কিছুই বলতে হবে না, আমি সব কথা শুনেছি।

যার আগেই গুছানো ছিল, সেটি তুলে নিয়ে ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

রেবাদেবী সারাদিন কান্নাকাটি করলেন—অবিশ্যি নীরবে কারণ চোরের মার চেঁচিয়ে কাঁদবার উপায় নেই।

সীতাংশু না খেয়েই সিনেমা দেখতে চলে গেল। অংশুপ্রকাশ ছুটলেন বাপের কাছে সবকথা বলতে। অংশুপ্রকাশের বাবা সব শুনে বললেন—আমার নাতনী শেষকালে একটা কেরাণীকে বিয়ে করলে!

সেদিনে অংশুপ্রকাশদের বাড়ী বাড়া না হলেও পরদিন আবার উনুনে আগুন পড়ল। অংশুপ্রকাশ নিয়মিত আপিসে বেরিয়ে গেলেন, সীতাংশু কলেজে চলে গেল। সারাদিন দরজা বন্ধ করে রেবা-দেবী কাঁদতে লাগলেন।

দিন দুয়েক বাদে বাড়ীওলাদের বড় ছেলে জানালে—ব্যাপারটা তো অনেকদিন থেকেই চলছিল—চন্দ্রমাকে দিনরাতই তো সুকল্যাণের ঘরে দেখা যেত। কৈ, আপনারা বারণ করেননি তো? আমরা মনে করেছিলুম—এতে আপনাদের সম্মতিই আছে।

অংশুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন—তারা কোথায় আছে?

—তারা এখন সুকল্যাণের এক বন্ধুর বাড়ীতে আছে। আপনারা এখান থেকে না গেলে তারা আসতে পারছে না।

অংশুপ্রকাশ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তা হলে?

হ্যাঁ, আপনারা অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

পরের দিন থেকে অংশুপ্রকাশ আবার বাড়ী দেখতে সুরু করলেন। দিন দুয়েক পরে সকালের দিকে অংশুপ্রকাশ একখানি সরকারী চিঠি পেলেন তাতে লেখা রয়েছে দু'দিনের মধ্যে তিনি ম্যাথুগঞ্জের কারখানার ভার যেন গ্রহণ করেন। তাঁকে সেখানকার কারখানার সর্বময় কর্তা অর্থাৎ চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে।

চিঠিখানা হাতে করে অংশুপ্রকাশের দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। রেবাদেবী সে দৃশ্য দেখে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্রি গো, কি হয়েছে?

চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তিনি চোখ মুছতে লাগলেন।

রেবাদেবী বললেন, কোন মুখ নিয়ে সেখানে যাবো? পরের দিন সন্ধ্যেবেলা মজুমদারদের দরজায় একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অংশুপ্রকাশ ও রেবাদেবী গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সীতাংশু আগেই কলেজ হোস্টেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন প্রত্যুষে মজুমদারদের দরজায় আর একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। দেখা গেল—চন্দ্রমা ও সুকল্যাণ হাসতে হাসতে গাড়ী থেকে নামছে। নবারুণ আলোকসজ্জাতে তাদের বদন উদ্ভাসিত।

GENERAL LIBRARY

কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট

বিনয় ঘোষ

বাংলাদেশের জনজীবনের সঙ্গে 'গ্র্যান্ট' উপাধিধারী একাধিক ইংরেজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ ছিল—চার্লস গ্র্যান্ট, জেম্‌স গ্র্যান্ট, জন পিটার গ্র্যান্ট প্রভৃতি—কিন্তু শিল্পী কোল্‌স-ওয়ার্দি গ্র্যান্টের মতন জনপ্রীতিধন্য আর কেউ হতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁর এক বড় ভাই ছিলেন, নাম জর্জ গ্র্যান্ট, খুব ভাল ঘড়ির কাজ জানতেন। তখন ঘড়িরও কদর ছিল খুব, বিদেশ থেকে আমদানি ঘড়ি দেখার জন্যে বড়লোকদের ঘরে লোকের ভিড় হত। ঘড়ির ভাগ্যবান মালিকদের মতন, ঘড়ির বিদেশী কারিগররাও দর্শনীয় জীব ছিলেন। স্বনামধন্য ইংরেজদের মধ্যে মানবদরদী শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঘড়ি-ব্যবসায়ী। জর্জ গ্র্যান্ট স্বনামধন্য না হলেও, সেকালের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মহলে তাঁর বেশ খানিকটা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং সেটা তিনি নিজের প্রতিভাবলে অর্জন করেছিলেন। গ্র্যান্টের পিতাও একজন সেকালের দক্ষ কারিগর ছিলেন, এবং স্বদেশে ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে তাঁর বেশ সুনাম হয়েছিল। অবশ্য যন্ত্রের নীরস কাজে মনঃসংযোগ করা তাঁর পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হয়নি। যন্ত্রপাতি ছেড়ে অবশেষে অভিনয়ের দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন। ইংলণ্ডে তখন থিয়েটারের স্বর্ণযুগ, কাজেই অভিনয়ের নেশাকে সহজেই তিনি পেশাতে পরিণত করলেন। অল্প-দিনের মধ্যে কৌতুকাভিনয়ে সুরসিক শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার, বিশেষ করে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর তালিম দেওয়ার ভার পড়ল তাঁর উপর। এবিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা দেখে চারি-দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

পিতার প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে দুই ভাই-ই পেয়েছিলেন এবং দুদিকে দুরকমভাবে তার বিকাশ হয়েছিল। জর্জ গ্র্যান্ট সর্বদিক দিয়েই ছিলেন পিতার প্রতিকৃতি। একদিকে ঘড়ির মতন যন্ত্রের সূক্ষ্ম কলকব্জা নাড়াচাড়ার দক্ষতা যেমন তাঁর ছিল, অন্যদিকে কণ্ঠস্বরের লীলাকৌশলেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। শোনা যায়, হরবোলার মতন নানাকণ্ঠের বিচিত্র বুলি শুনিয়ে তিনি তাঁর কলকাতার ক্লায়েন্টদের বশ করে ফেলতেন। কেবল ঘড়ির জন্যে নয়, তাঁর কণ্ঠের বোল্‌ শোনার জন্যেও ঘড়ির দোকানে লোকের ভিড় হত। দোকানটি ছিল বর্তমান ডালহৌসি স্কয়ার অঞ্চলে। ছোটভাই কোল্‌সওয়ার্দি

কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট

আসার কয়েক বছর আগেই জর্জ গ্র্যান্ট কলকাতায় এসে ঘড়ির ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজ, কোম্পানির বড় বড় সাহেব ও মার্চেন্ট, জাহাজের কাপ্তেন, অনেকে জর্জকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন এবং তাঁর দোকানেও নিয়মিত আসতেন। সকলে যে ঘড়ির তাগিদে আসতেন তা নয়, অনেকে তাঁর হরবোলার বুলি শুনতে আসতেন, আবার কেউ কেউ আসতেন তাঁর কাছে অভিনয়ের তালিম নিতে। এখনকার হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্ররা ইংরেজী নাটক অভিনয়ে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, আজকাল তা অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করবে। জর্জ গ্র্যান্ট ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম অভিনয়-শিক্ষক। ডিরোজিওর যুগে। যাঁদের 'ডিরোজীয়ান' বলা হয়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি, তাঁর অনেকেই জর্জের কাছে ইংরেজী অভিনয় শিখে-ছেন। একজন ঘড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রগতি-শীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, আর-একজন ঘড়ি-ব্যবসায়ী জর্জ গ্র্যান্ট তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন আধুনিক অভিনয় কলা। কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্টের আমলে হিন্দু কলেজ হয়েছিল প্রেসি-ডেন্সী কলেজ, এবং তিনি সেখানে ছাত্র-দের শিক্ষা দিয়েছেন চিত্রকলা ও অঙ্কন-বিদ্যা। শিবপুরের বর্তমান বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের তিনিই অঙ্কন-বিদ্যার আদিগুরু, তাৎকালিক প্রেসি-ডেন্সী কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের 'প্রফেসার অফ্‌ ড্রয়িং'।

রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড যাত্রার বছর দেড়েক পরে কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট ইংলণ্ড থেকে ভারতযাত্রা করেন এবং বাংলাদেশে কলকাতা শহরে এসে পৌঁছন ১৮০২ সালে। তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর। কলকাতা শহর কেন্দ্র করে তখন নবজাগরণের জোয়ার এসেছে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কার্যকলাপে সোরগোল পড়ে গেছে সমাজে। প্রথম জোয়ারের তরঙ্গও প্রায় বাঁধ ভাঙার মতন উত্তাল, উচ্ছ্বাসের ফেণা ও বুদ্‌বুদ্‌ তাতে প্রচুর। বছর দুই-আড়াই আগেকার সহমরণপ্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ করার আঘাত তখনও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভুলতে পারেনি। একদিকে তাদের ধর্ম-সভার হুঙ্কারগর্জন; অন্যদিকে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের তর্জন-গর্জনে কলকাতার নয় শুধু, সমগ্র বাংলার আকাশ বিদীর্ণ হবার উপক্রম। এমন সময় তরুণ কোল্‌সওয়ার্দি এসে কল-

স্বাস্থ্যের পৌঁছলেন। সামাজিক পরিবেশের ভীতিপ্রদ বিদ্যুৎ-চমকানি দেখে স্বভাবতই তাঁর বিচলিত হবার কথা। কলকাতা শহরও তখন বেশ বড় হয়েছে, সেই গ্রাম্য চেহারা তার আর নেই। লটারী কমিটির উন্নয়ন-পরিকল্পনার কল্যাণে তার পথঘাট পাকা ও প্রশস্ত হয়েছে, হাটবাজার দোকানপাট বসেছে, লোকবসতিও বেড়েছে। যানবাহনের ঘোড়ায় গাড়ি সব পাকা রাস্তার উপর ছুটোছুটি করছে। আগেকার গরুর গাড়ির চেয়ে তার চলার গতি বহুগুণ বেশী। যানবাহনের গতি বেড়েছে, সমাজেরও গতি বেড়েছে। একটা হুমন্ত সমাজ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে জেগেছে, যুগ-যুগান্তের সব আটস-অচল ধ্যান-ধারণা সচল হয়েছে। কোল্‌সওয়ার্দি এই সচলতার প্রাথমিক আবর্তের মধ্যে এসে পড়লেন।

একে বিদেশী, তায় উপর বয়সে তরুণ, মনটাও শিল্পীর মন। কোথায় যাবেন, কি করবেন, ঠাহর করা মুস্কিল হল। বরাত যে একেবারে অকূল পাথারে পড়তে হয়নি তাঁকে। জেনারেল জর্জ গ্রান্ট তখন থাকতেন ওয়েলিংটন স্কয়ার অঞ্চলে ক্রীক রো-তে বাসা করে। ওয়েলিংটনে তখন ট্যাঙ্ক ছিল, স্কয়ার ছিল না এবং লটারী কমিটি নতুন ট্যাঙ্ক কেটে ঐ অঞ্চলের পথঘাট তৈরী করে উন্নতি করেছিলেন। ক্রীক রো-টা একটা পূব-পশ্চিমে বরাবর টানা বেশ বড় খাল ছিল, সেই খালে জেলেদের নৌকা বাঁধা থাকত, তাই পাশেই 'জেলেপাড়া'। খালের নাম ছিল 'ডিঙ্গাডাঙ্গা খাল'। কবে কার ডিঙ্গি হয়ত ভেসে গিয়েছিল ঐ খালে, তাই ডিঙ্গাডাঙ্গা, যেমন উলটাডিঙ্গা। খাল বুজিয়ে ভরাট করে যখন রাস্তা হল তখন তার প্রথম নাম হল 'ডিঙ্গা-ডাঙ্গা স্ট্রীট', পরে হয়েছে ক্রীক রো, ইংরেজী 'ক্রীক' কথাটি পুরনো খালের স্মৃতি বহন করছে। কোল্‌সওয়ার্দি ডিঙ্গাডাঙ্গা স্ট্রীটে ভাড়ার বাসায় এসে উঠলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য হল স্বাস্থ্য-রক্ষা করা। তার জন্য ভাম্বেল মুগুর ঘোরান তিনি নিয়মিত সকালে-বিকালে ভাঁজতে আরম্ভ করলেন। ভোরবেলা উঠে ডিঙ্গাডাঙ্গা থেকে স্ট্র্যান্ডে গঙ্গার ধার পর্যন্ত লম্বা একটা চক্কর দিয়ে আসাও তাঁর প্রাত্যহিক কাজ ছিল। এই ডাম্বেল-মুগুর-ভাঁজা হাতেই তিনি একদিন তুলি-কলম ধরে ছবি এঁকে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একবার বেকায়দায় পড়ে গিয়ে তাঁর মেরুদণ্ডে অত্যন্ত জোরে আঘাত লাগে। তারপর থেকে তিনি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা চলতে পারতেন না, একটু নেহাই ও খুঁড়িয়ে চলতেন। তার জন্যে কেউ কেউ হয়ত তাঁকে খোঁড়া সাহেব শিল্পী বলতেন।

শিল্পীজীবনের কাজ কোল্‌সওয়ার্দি অল্পদিনের মধ্যেই শুরু করে দিলেন কলকাতায়। ইণ্ডিয়ান রিফ্লেক্টর, ক্যাল-কাটা মান্থলি জার্নাল, ইণ্ডিয়া মেডি-ক্যাল, ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবজারভার, বেঙ্গল স্পোর্টিং প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। অধিকাংশে ছবির উপাদান সংগ্রহ করতেন তিনি বাইরের প্রকৃতি ও সমাজ থেকে। আমাদের দেশের নানা-জাতের মানুষের মুখাকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সেকালের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি থেকে আরম্ভ করে বিস্ময়কর প্রকৃতির বিচিত্র সব গাছপালা, জীবজন্তু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে তাঁর অনু-রাগ ছিল গভীর। ঠিক বিদেশীর চোখ দিয়ে নয়, শিল্পীর চোখ দিয়ে তিনি শিল্পবস্তুর বিচার করতেন।

কিন্তু তাঁর শিল্পচর্চার কথা বলার আগে অন্য দু'একটি কীর্তির কথা বলা প্রয়োজন। আপাতঃদৃষ্টিতে হয়ত মনে হবে যে এইসব কীর্তির সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্মের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সেকথা ঠিক নয়। কলকাতা শহরে 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউশন (১৮৩৯) এবং 'ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশান অফ ক্রুয়েল্টি টু এনিম্যাল্‌স' (সি, এস, পি, সি, এ, ১৮৬১) নামক প্রতিষ্ঠানের আদি-পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কোল্‌সওয়ার্দি অন্যতম। হাতে-কলমে কারিগরদের কারুকর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিদ্যার সঙ্গে তাদের পরিচিত করার জন্যে ইংলণ্ডে যন্ত্রশিল্প-বিপ্লবের পর মেকা-নিকদের শিক্ষায়তন গড়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লবের মতন কোন ঘটনা না ঘটলেও, নতুন পাটি

কলকাতার প্রাচীন গৃহের দৃশ্য

দিয়ে কারিগরিবিদ্যার এই আদর্শ সমাজে এসে পৌঁছয়। রেভারেন্ড বোয়াজ ও ডক্টর কার্বিন সর্বপ্রথম কলকাতায় এই জাতীয় একটি মেকানিকদের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। এই উদ্দেশ্যে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮০৯, স্যার জন পিটার গ্রান্টের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে একটি সভা হয়। সভায় বিচারপতি গ্রান্ট এবিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : "ইউরোপের নানাস্থানে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে প্রধানত কারিগরদের আধুনিক বিজ্ঞানের কলা-কৌশল ও নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। এদেশে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে ভদ্রলোকদের একটা ভুল ধারণা আছে এই যে কাজটা ছোটলোকের কাজ এবং এই সব কাজ করলে লোক-চক্ষে সামাজিক ইজ্জত হারাতে হয়। নব্যশিক্ষিত বাংলার তরুণদের মন থেকেও এ ধারণা আজও দূর হয়নি। হবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত হবে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ছাত্ররা এখন নিজেদের হাতে শবব্যবচ্ছেদ করছে। কুসংস্কার কেটে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে, হাতের ও যন্ত্রপাতির কাজ-কর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়বে। তা ছাড়া লেখাপড়া শিখে সকলেই যদি সুপ্রিম কোর্টের জজ হতে চায়, অথবা মুন্সেফি, সদর আমিনী বা ওকালতি করতে চায়, তাহলে সমাজের অন্য সব প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কারা করবে? সমাজের শ্রী ও জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য জজ-উকিলের চেয়ে অনেক বেশি দরকার বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর। একথা আজ এ দেশের লোকের বিশেষ করে বোঝার দরকার। মেকানিকস্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, এই বোধশক্তি এ দেশের লোকের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা।" এরপর আরও অনেকে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, সকলেই ইংরেজ। সভার সম্মতিক্রমে মেকানিকস্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদেশীয় ও ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠিত হয়। স্যার জন পিটার গ্রান্ট সভাপতি হন, জর্জ ও কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট দুই ভাই হন যুগ্ম-সম্পাদক।

প্রতিষ্ঠানের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না। গৃহ থেকে গৃহান্তরে তার কাজকর্ম চলত। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গুণী ব্যক্তিদের ডাকা হত। প্রধানত তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়েই বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হত। তার মধ্যে 'ডিজাইন' ও 'ড্রয়িং'-এরও একটা বিশেষ

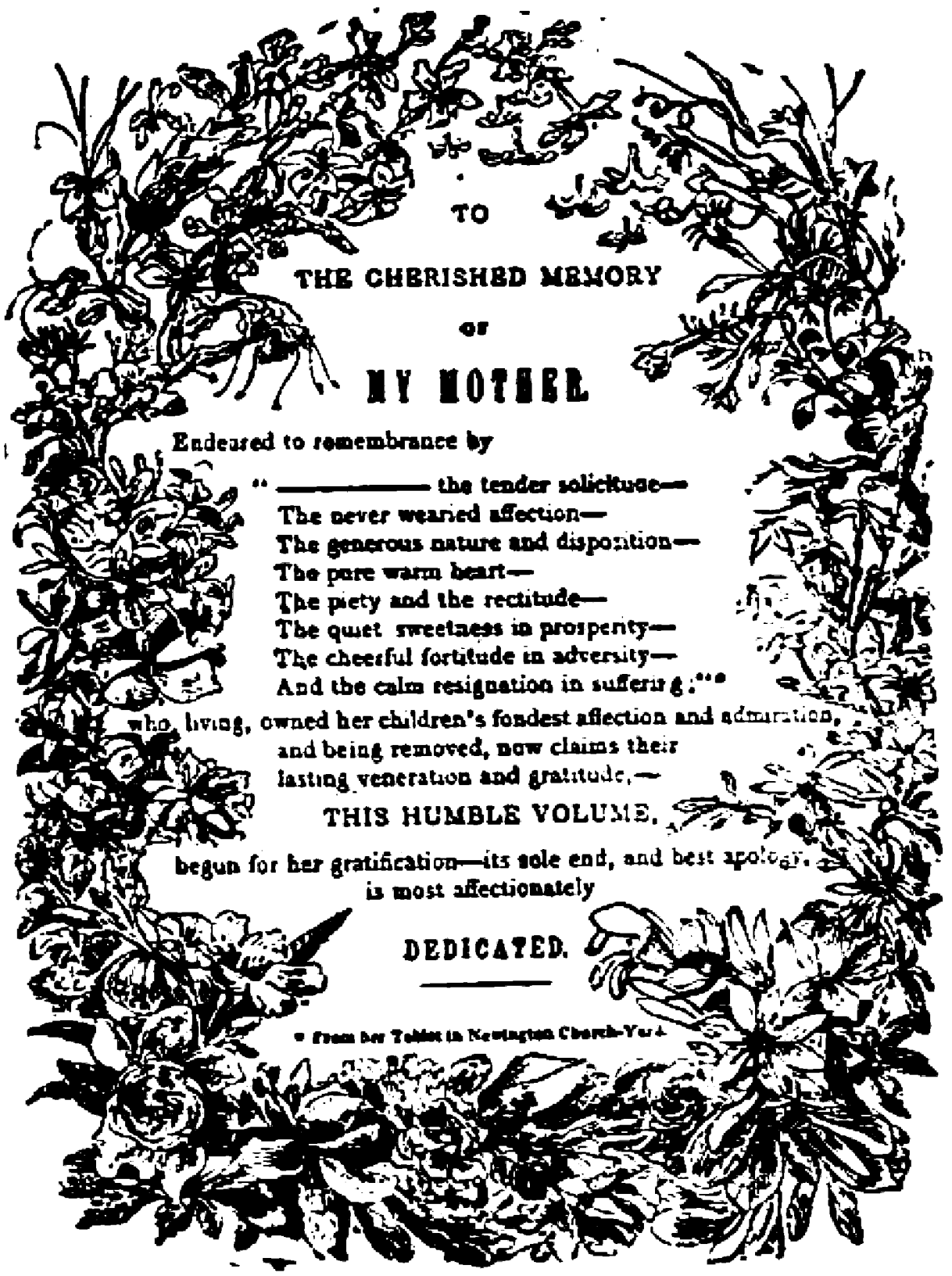

"অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক ইকো" গ্রন্থের উৎসর্গপত্র

ওয়েলিংটনের বাবু দুর্গাচরণ লস্করের বাড়ির অলঙ্করণ

গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। জর্জ ও কোল্‌সওয়ার্দি দুই ভাই এই বিষয়টিকে এক রকম একাধিকার করে রেখেছিলেন বলা চলে। ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব এবং পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে প্রথমে বড় ভাই জর্জ প্র্যাট ইনস্টিটিউশনে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি ছোট ভাই, কোল্‌সওয়ার্দির অধীনে নিয়মিত একটি 'ডিজাইন, ড্রয়িং ও পার্সপেক্‌টিভ' বিষয়ে ক্লাস খোলার প্রস্তাবনা বলা চলে। বক্তৃতায় শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং তাঁর পাশে বসেছিলেন 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সদস্য ওয়েব স্মিথ। স্মিথ নিজে শিল্পচর্চাও করতেন। জর্জের বক্তৃতার তিনি তারিফ করেন খুব এবং সেটা গবর্ণর-জেনারেল অকল্যাণ্ডের কাণে পর্যন্ত পৌঁছয়। এর পর ম্যুয়াট সাহেব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ক্যাপ্টেন বয়েলো 'ঝুলন্ত সেতু' সম্বন্ধে বলেন। জর্জ টমসন বিলেত থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে এসে ইনস্টিটিউশনে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার ফলে ভিক্টর প্রতিষ্ঠান আবার বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পর পর 'লেকচার' চলতে থাকে। এই সময় কোল্‌সওয়ার্দি সপ্তাহে দুদিন করে ড্রয়িং ও ডিজাইনের ক্লাস খোলেন। ক্লাস হত সন্ধ্যায়, বুধবারে সাধারণ ড্রয়িং-এর ক্লাস এবং শনিবারে পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে ক্লাস। সন্ধ্যা ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময় ছিল ক্লাসের। ৮ই এপ্রিল ১৮৪১, কোল্‌সওয়ার্দি তাঁর ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক ড্রয়িং, ডিজাইন ও পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। এদেশের ছাত্রদের আধুনিক ড্রয়িং ও ডিজাইন শিক্ষার আদিগুরু কোল্‌সওয়ার্দির কাজ আরম্ভ হয় এইভাবে, কলকাতার মেকানিকস্‌ ইনস্টিটিউশন থেকে। পরে হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ড্রয়িং-এর শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ড্রয়িং-এর অধ্যাপক পদে নিয়োগ তাঁর খুবই যোগ্য পুরস্কার বলা চলে। তখন এ বিষয়ে অধ্যাপনা করার মতন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

কোল্‌সওয়ার্দি আরও একটি কাজ করেছিলেন যার সঙ্গে তাঁর শিল্পী-জীবনের সম্পর্ক বাইরে থেকে সুদূর হলেও, ভিতর থেকে গভীর। তৎকালে কলকাতা শহরে যান্ত্রিক যানবাহন বলতে কিছুই ছিল না। পাল্কি ছিল, নানা রকমের ঘোড়ার গাড়ি ছিল, আর ছিল সনাতন গরু-মহিষের গাড়ি। বোঝা বহনের জন্যে কুলি মজুর ছিল বটে, তবে গাড়ি-বোঝাই মাল বহনের জন্যে একালের মতন বড় বড় লরি বা ট্রাক ছিল না। গরু-মহিষকেই গাড়ি টেনে তা বহন করতে হত। গাড়োয়ান ও ঠিকাদাররা তাদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করত। অতিরিক্ত মাল বোঝাই করে, অমানুষিক বেত্রাঘাত করে, অর্ধভুক্ত রেখে বাক্‌শক্তিহীন গরু-মহিষের ঘাড়ে চেপে নিজেদের মুনাফা লুটে নেওয়াই ছিল তাদের কাজ। কোল্‌সওয়ার্দি এই দৃশ্য কলকাতার পথেঘাটে দেখতেন। বোঝার ভারে, ক্লান্তিতে ও কশাঘাতে কত গরু-মহিষকে কলকাতার রাজপথে সটান শুয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যে তিনি দেখেছেন তার ঠিক নেই। আরও অনেক শত শত লোক এ-দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে দরদী শিল্পী ক'জন? তাঁরা দেখেছেন চিরাভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে উদাসীন দর্শকের মতন, কোল্‌সওয়ার্দি দেখেছেন শিল্পীর গভীর বেদনা, মমতা ও অনুভূতি দিয়ে। অসহায় মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার যেমন অন্যায়, অসহায় জীবজন্তুর উপর মানুষের অত্যাচার তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম অন্যায় নয়। মানুষ অন্তত কথা বলতে পারে, দুঃখের কথা দুঃখীকে জানাতে পারে, গরু মহিষ তাও পারে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে কোল্‌সওয়ার্দি সচেষ্ট হলেন।

দীর্ঘদিন আন্দোলন করার পর কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে তিনি সমর্থ হলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রুস্তমজী, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং বাহাদুর, মৌলবী আবদুল লতিফ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। এঁদের সকলকে নিয়ে এক সভা ডাকা হল এবং ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬১ সালে কলকাতা শহরে জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণোদ্দেশ্যে একটি সোসাইটি

কসাইটোলার (বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট) চীনা দোকান

(সি. এস. পি. সি. এ.) প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধানত এই সোসাইটির উদ্যোগে প্রাণী-নির্যাতন-বিরোধী অধিকাংশ আইন প্রচারিত হয়েছে বলা চলে। প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৮০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় আঠার-উনিশ বছর কোল্‌সওয়ার্দি এই সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণ-বিকতার জন্যই সোসাইটির প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অধ্যাপনা, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য অবৈতনিক দায়িত্ব পালন করেও এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য পালনে তাঁর ত্রুটি হয়নি কোনদিন।

বিভিন্ন পত্রিকায় ছবি ও নক্‌সা প্রকাশিত হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বেশ খ্যাতি হল। প্রতিকৃতি অঙ্কনে ও নক্‌সাচিত্রে তাঁর কুশলতা দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। 'ইণ্ডিয়া রিভিউ' পত্রিকা (জুন ১৮৩৯) লিখলেন, "মিঃ প্রাণ্টের তুলির দক্ষতা ও ক্ষমতা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তিনিই ভারতবর্ষে চিত্রকলা চর্চার ভিত্ প্রতিষ্ঠা করছেন বললে অতিশয়োক্তি হবে না।" তাঁর নক্‌সা চিত্র-সম্বলিত যে কয়েকখানি বই তখন প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান এইগুলি :

An Anglo-Indian Domestic Sketch.
Rural Life in Bengal.
Lithographic Sketches of Public Characters of Calcutta, 1838-1845.
Oriental Heads.

প্রথম ও দ্বিতীয় বইখানি পত্রাকারে লেখা। ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের ও শ্রেণীর জীবনযাত্রা হল তাঁর পত্রসাহিত্যের বিষয়বস্তু। সাহিত্যিক বর্ণনার সঙ্গে তুলি-কলমের রেখাচিত্রে এই জীবনযাত্রার রূপ তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। পত্রগুলি ইংলণ্ডে তাঁর মা-

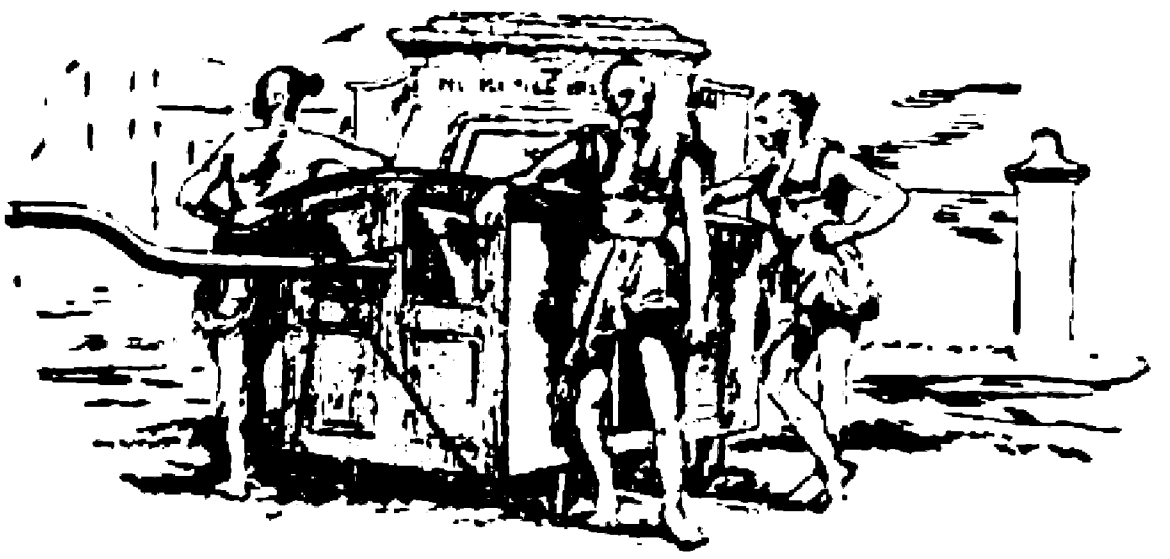

কলকাতার পাখি-বেচারা

বোন ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে লেখা।—'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কে এ দেশের সমাজ, লোকজন, আচার- বই থেকে দু-একটি বিষয়ের উদ্ধৃ করছি। এ দেশের মাদুর, বেড়া ও টাঁটি বর্ণনা আছে বইটিতে, বাড়ির পরিচ্ছ নক্‌সাসহ। হাতিকুঁড়ির যে বিস্তারি বিবরণ আছে তা এদেশের কুশলব কারা শিল্পীদের পক্ষেও দেওয়া সহ নয় যত রকমের হাতি, ছোট-বড় কুচ্ছি খুরি, বদনা, ঢাকনা, মস্ত ডাল-ঘুটি পর্যন্ত এদেশ আছে, কোল্‌সওয়ার্দি তার বর্ণনা দিয়ে, ছবি এঁকে মন ঘুচিয়ে দিয়েছেন চিঠিটে। 'খাঁচা' না এদেশের সনাতন যন্ত্রটির নাম দেও

বাবহার, হাট-বাজার, আহার্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী, শিল্পদ্রব্য ও পশু, এমন কি প্রকৃতির গাছপালা, ফলমূল, জীবজন্তু পর্যন্ত সমস্ত কিছুর বিবরণ মা-বোনদের জানানো তাঁর উদ্দেশ্য। কেবল এ দেশের সমাজের ও লোকের কথা নয়, বিদেশী সাহেবরা এ দেশে এসে কি ধরণের বিচিত্র সমাজ ও জীবন-যাত্রা গড়ে তুলেছে, তার পরিচয়ও তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কেবল ভাষার সাহায্যে অজানা অপরিচিত দেশের সমাজচিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় বলে কোল্‌সওয়ার্দি তুলি-কলমের অপূর্ব রেখাচিত্রের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এঁকে তাঁর প্রথম বই দু'খানির মধ্যে উনিশ শতকের মধ্যভাগের বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের সুন্দর একটি ছবি ফুটে উঠেছে। এই ছবি আমাদের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

কোল্‌সওয়ার্দির দৃষ্টি যে কত সজাগ, কত খুঁটি-নাটির সন্ধানী, তা তাঁর প্রথম বই দু'খানি না পড়লে ও না চোখে দেখলে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

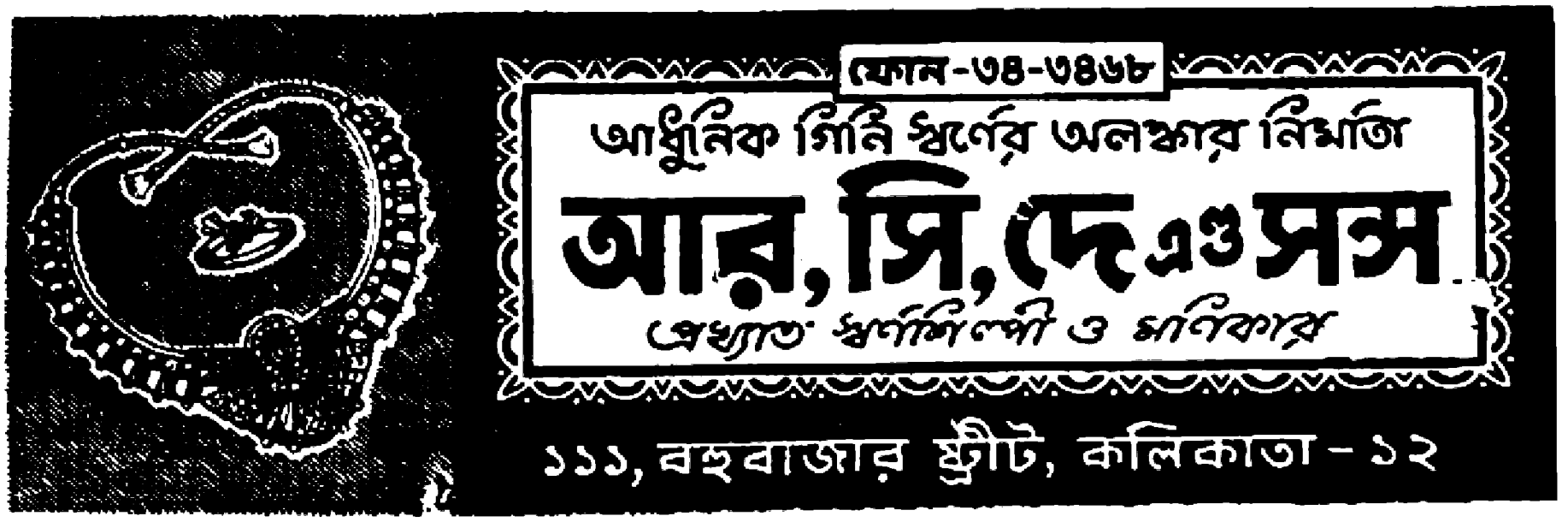

ব্যবসাবাণিজ্যোদ্দেশ্যে সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র কলকাতার বন্দরঘাট

হয়েছে 'এশিয়াটিক হ্যান্ড-মিল।' কেবল রন্ধনপাত্রের নয়, নানা রকমের দুগ্ধ-পাত্রের ও কুঁড়িরও বর্ণনা আছে চিঠির মধ্যে। ভারতের বহু জাতির মতন ভারতীয়দের বোকা বইবার বিচিত্র সব কুড়ির বর্ণনা। ঝাঁকা-মুটের কোড়া, চাঙ্গারি, টুকরি, চুবড়ি, ধামা, খুচি, কুলো, খুচুনি প্রভৃতি কিছুই বাদ নেই। গাড়ীঘোড়া, ঘরবাড়ী, দরজা-জানলা, চাল ও ছাদ, সব বাইরে ও ভিতর থেকে কি রকম দেখায় তা এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির গ্রাউন্ড-প্ল্যান পর্যন্ত বাদ যায়নি। গাছ লতাপাতা ও ফলমূলের রেখাচিত্র দেখলে মনে হয় বিনা রঙেও সেগুলি চিনতে কারো কষ্ট হবে না। নারকেল সুপুরি তাল খেজুর কলা প্রত্যেকটি গাছ কেবল কলমের আঁচড়েই সজীব হয়ে উঠেছে, তার উপর রঙের টান পড়লে যে কি হত তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

'রুরাল লাইফ ইন বেঙ্গল' বইখানি কেবল রেখাচিত্রের দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও মূল্যবান। 'ডোমেস্টিক স্কেচের' মতন এ বইতেও এদেশের জীবনযাত্রার চিত্র লিখে-এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রামজীবনের উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। দাঁড়িমাঝি, নানা রকমের নৌকা, জেলেদের মাছ ধরার বিভিন্ন রকমের জাল এবং বাংলার চাষীদের কৃষিকর্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গ্র্যান্ট বাংলার গ্রাম্য সমাজের আসল রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নীল-চাষ বিষয়ে ৯ নম্বর চিঠিখানি। বাংলা-দেশে নীলচাষ কেমন করে করা হয়, নীলকুঠিতে নীল তৈরী হয় কি পদ্ধতিতে, কত রকমের আমলা কর্মচারী কুলি মজুর নীলকুঠিতে কাজ করে, তাদের বেতন ও মজুরী কি, কাজ কি এবং দস্তুরিই বা কি, সমস্ত বিবরণ কোল্‌সওয়ার্দি পুংখানুপুংখরূপে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কলকাতা শহরে কেদারায় বসে কেতাব পাঠ করে সংগ্রহ করেননি, নিজে গ্রামে গিয়ে, গ্রামে বাস করে, গ্রামের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করে সংগ্রহ করেছেন। তাই তাঁর বর্ণনা এত নিখুঁত।

কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের লিথো-গ্রাফ চিত্রের সংকলনটির মধ্যে যদিও অধিকাংশই বিদেশীদের চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে, তাহলেও আলেখ্য-নিদর্শন ও ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তার যথেষ্ট মূল্য আছে। এমন সব ঐতিহাসিক ব্যক্তির চিত্র তিনি এঁকে রেখেছেন যা আর কোথাও নেই, থাকলেও সহজলভ্য নয়। প্রায় ১৬৭ খানি চিত্রের মধ্যে মাত্র ছ'জন ভারতীয়ের চিত্র আছে—জাল প্রতাপচাঁদ, মুর্শিদাবাদের নবাব, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াজী। 'ওরিয়েণ্টাল হেডস' বইখানিতে প্রায় ৭৮ খানি চিত্র সংগৃহীত হয়েছে, সবগুলিই প্রাচ্য-দেশীয় বিভিন্ন জাতির প্রতিমূর্তি। আরমেনিয়ান পুরোহিত, মালাবারী পণ্ডিত, পাঠান, ওড়িয়া বেয়ারা, ইস্পাহানী হাজীমির্জা, বাঙালী গুরু-প্রসাদ বসু, নাগা গিরিসন্ন্যাসী, আরব শেখ, রোহিলখণ্ডী হাফিজ, জৌন পুরী

কলকাতার মুটিয়া ও নানাপ্রকারের কুড়ি

কিরাময়েটরা, পার্সী ব্যবসায়ী রুস্তমজী, শিক্ষিত বাঙালী তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ কানুনগো রমাপ্রসাদ দুবে, ইহুদী পুরোহিত মোজেস কোহেন, মাড়োয়ারী বণিক তিলকচাঁদ সাহু, বারাণসী মহাজন বাঁদু ছোটেলাল, গুজরাটী বণিক রঘুনাথজী মনোহরদাস, কাবুলেরপ্রভাবী দোস্ত মহম্মদ খাঁ, বাঙালী হিন্দু পরিবারের মেয়েরা, যোগী, ঠগ ও ডাকাত কুলী ও ধাঙড়, বর্মী হিরাতী রাজপুত সিংহলী গারো কারেন নাগা প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন জাতির ও পেশার লোকের মূর্তিচিত্র আঁকতে কোলসওয়ার্দি যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছেন তা বলাই বাহুল্য। শিল্পীদের কাছে তো বটেই, নৃবিজ্ঞান ও জাতিবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেও কোলসওয়ার্দির 'ওরিয়েন্টাল হেডস' স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু বইখানি এত দুষ্প্রাপ্য যে একবার চোখে দেখতে পাওয়াও কঠিন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এবং পরে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ড্রয়িং ও ডিজাইনের অধ্যাপনা করে কোলসওয়ার্দির হাতে অন্য কোন কাজ করার সময় বিশেষ থাকত না। তার কারণ তাঁর অধ্যাপনা কেবল চাকুরীজীবি পালকর করা ছিল না। শিল্পকলা কেবল তাঁর নিজের সাধনার বস্তু ছিল, তেমনি সাধনার বস্তু তা ছাত্রদেরও হোক, এই ছিল তাঁর কামনা। ড্রয়িং, ডিজাইন ও রেখাঙ্কনে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের, বিশেষ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রদের কতখানি পারদর্শী হওয়া দরকার তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই ছাত্রদের সঙ্গে হাতের মতন মিলেমিশে তিনি কেবল তাদের ছবি আঁকতে প্রলুব্ধ করতেন, আর বলতেন যে ড্রয়িং ও ডিজাইনে 'মাস্টার' না হলে ভাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না। তিনি এত মিষ্টভাষী, সদালাপী ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন যে ছাত্ররা ছায়ার মতন তাঁকে অনুসরণ করত। ডাকতে হত না, স্কেচবুক পেনসিল নিয়ে এস বলতে হত না, নিজেরাই আসত, ছবি আঁকত। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাউনিং প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখে জানান যে, কোলসওয়ার্দি প্রাণের টানে কর্তব্যপরায়ণ ও কর্তব্যসাহক, শিক্ষক কদাচিৎ দেখা যায়। মানুষ ও শিল্পী হিসেবে তাঁর মতন হৃদয়বান ব্যক্তিও সমাজে দুর্লভ। ছাত্রদের কাছ থেকে এত গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা খুব কম শিক্ষকেরই ভাগ্যে জোটে।

অধ্যাপনার সঙ্গে নিজের শিল্পচর্চা, সি. এস. পি. সি-এর কাজকর্ম অক্লান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত কোলসওয়ার্দি করে গেছেন। এদেশে কারিগরীবিদ্যার শিক্ষায়তন মেকানিকস্ ইন্সটিটিউশন থেকে যে কাজ তিনি শুরু করেন তার সমাপ্তি ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকতায়। বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের প্রথম যুগের ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকে তাঁর কাছে প্রকৃতবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কেবল এজন্য অবশ্য তিনি স্মরণীয় নন। ৩১শে মে, ১৮৮০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, ৬৭ বছর বয়সে। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি কলেজ থেকে বিদায় নেন। ছাত্রদের কাছে বিদায় গ্রহণের সময় তাঁর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে, চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। ছাত্ররাও অশ্রু সম্বরণ করতে পারে না। তার কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই তিনি স্মরণীয়। কিন্তু আরও একটি কারণে তিনি অবিস্মরণীয়—তিনি বাংলাদেশকে ভালবেসেছিলেন, বাংলার মানুষ, বাংলার লোকশিল্প, বাংলার নিসর্গ তাঁর শিল্পীচিত্ত এমনভাবে অধিকার করেছিল যা বাংলার নিজের সন্তানদেরও কবে কিনা সন্দেহ।

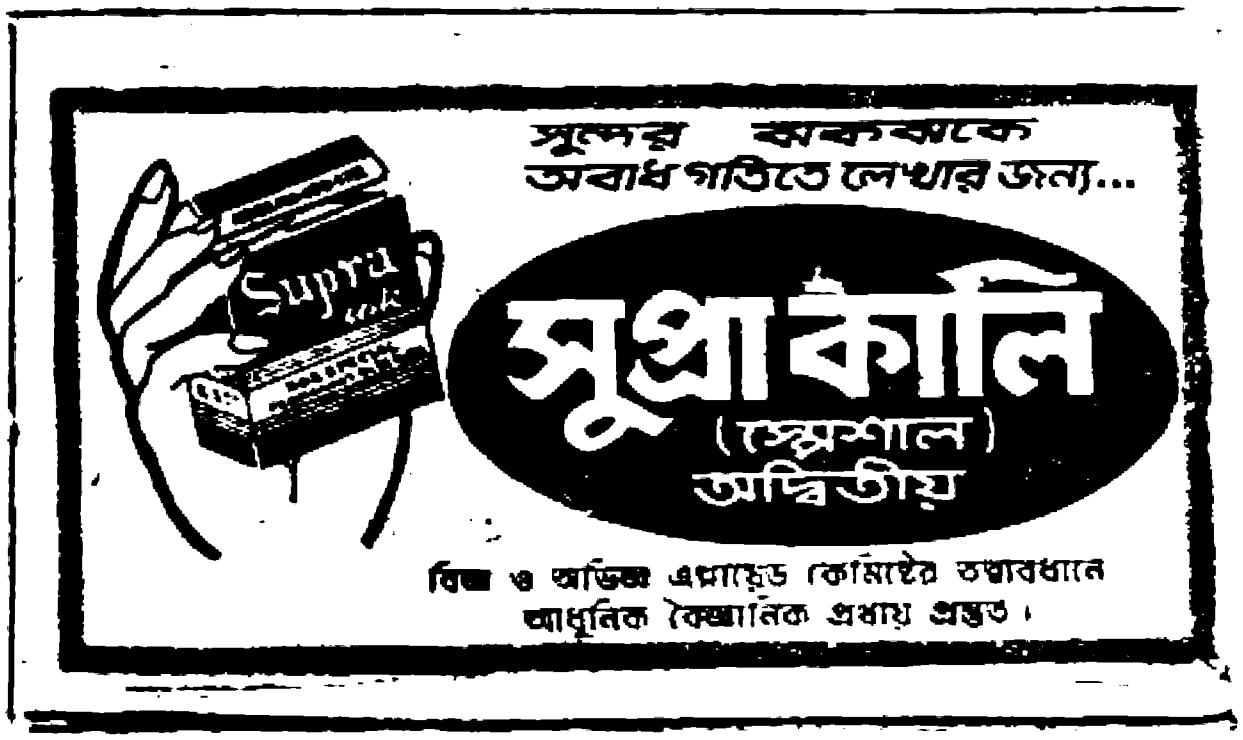

CENTRAL LIBRARY

থেকে (রহস্যোপন্যাস)

॥ এক ॥

আমরা যে-শহরে থাকি সেটা খুবই ছোট জায়গা। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে। এখানকার সামাজিক জীবনপ্রবাহ অত্যন্ত শান্ত এবং ধীর গতিতে চলে। প্রত্যেকেই কাজকর্ম করেন, অথচ কর্ম-চাঞ্চল্যের অনাবশ্যক উদ্ভ্রান্ত আস্ফালন নেই। আমাদের জীবনের ওপর কলকাতার প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই আছে। খবরের কাগজ এবং সাময়িকপত্রের দ্বারা মাঝে মাঝে আমাদের জীবনপ্রবাহ আলোড়িত হয়ে ওঠে। শহরটা ছোট বটে, কিন্তু সিনেমা হাউস আছে দুটি। একটায় প্রধানতঃ বাংলা ছবি দেখানো হয়, অন্যটায় হিন্দী। দুটি হাউসেই সমান ভিড়। বছর দশেক আগে এই অঞ্চলে হিন্দী ভাষার সঙ্গে কারো পরিচয় ছিল না। এখন এখানকার ছেলে-মেয়েরা হিন্দী-ফিল্মের মারফৎ ভাষাটা শিখে

CENTRAL LIBRARY

মালাবার

দীপক চৌধুরী

ফেলেছে বললেই হয়। রাস্তার-ঘাটে আজ-কাল হিন্দী গানের চলতি সুরগুলো প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়।

ছোট শহর বলেই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চেনা-পরিচয় আছে। মন্মথবাবুকে আমিও চিনতুম। জেলা আদালতের পেশকার। অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের মানুষটি বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাধারণ মানুষদের ধারণা, পেশকাররা খুব নিয়ে থাকেন। মনিবের চেয়ে রোজগার তাঁদের বেশি। কিন্তু আমরা জানি মন্মথবাবু ঘুষ নেন না—ধর্মভীরু এবং সাধু-চরিত্রের মানুষ।

পুত্র সন্তান ছিল না তাঁর। একটি মাত্র মেয়ে। ডাকনাম মীনা, ভাল নাম মীনাক্ষী মন্মথবাবু আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেরই অগাধ ভালবাসা মেয়েটির ওপর। তাই বলে মেয়েটিকে আশকারা দেননি কোনোদিনও। মধ্যবিত্তের সংসার হলেও, মীনাক্ষীর লেখাপড়ার জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করেননি মন্মথবাবু। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন মেয়ের ওপর।

রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। অসাধারণ সুন্দরী ছিল মীনা। শুধু সুন্দরী বললেই সবটুকু বলা হল না। পটল-চেরা চোখ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই চোখ দুটি ছিল ভাব ও ভঙ্গীতে ভরপুর। কথা না বলেও

চোখের ভাষায় তার প্রকাশ করতে পারত। মুখের চেয়েও চোখের ভাষা ছিল অধিকতর অর্থপূর্ণ। সবারই ধারণা ছিল, এমন একটা ছোট জায়গায় মীনাক্ষী পথ ভুল করে চলে এসেছে। এখানে ওকে মানায় না। বড় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের শান্ত পরিবেশে ঝড় উঠল। শহরের সর্বত্র এবং সবার মুখে মীনাক্ষীর সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বলেন, মীনার রূপের কাছে উর্বশী দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই ধরনের মন্তব্যের মধ্যে হয়তো অত্যুক্তির দোষ আছে। কবিতা-বর্ণিত উর্বশীকে কল্পনায় দেখতে হয়। কিন্তু মীনাকে দেখতে পায় চোখের সামনে। সেই কারণে, মন্তব্যগুলো একটু বাড়িয়ে-বলার মতো শোনায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই ছোট শহরটায় পুরুষবার সংখ্যা বাড়তে লাগল। মীনাকে সবাই দেখতে চায়। যারা বিবাহিত তাদেরও অবচেতন মনে মীনার উপস্থিতি আগুন জ্বালিয়ে রেখে। শ্যামাঙ্গিনীর মুখে ভেসে ওঠে মীনার প্রতিচ্ছবি। আমাদের এই ছোট শহরের প্রশান্ত জীবনস্রোতে মীনাই প্রথম অশান্তির ঢিল ছুঁড়ল।

আমিও যে মীনাক্ষীর রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হইনি তেমন কথা অস্বীকার করতে পারি না। হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো বা স্ত্রী-রূপেও কল্পনা করে থাকব। অচেতন মনের লীলা-রহস্য মানুষের নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য নয়। প্রত্যক্ষ পাপ না করলে মানুষকে পাপী বলবে কে?

কিন্তু আমি তো মধ্যেয়াভীদের গাদতে সামান্য একটা চাকরি করি—বেহালী কোম্পানীর হিসেব-রক্ষক। মাসিক মাইনে একশো পঁচিশ টাকা। তবে বাড়িভাড়া দিতে হয় না। মৃত্যুর পূর্বে বাবা একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। মা নেই। ভাই-বোনও কেউ নেই। একতলাটা ভাড়া দিয়ে রিখেছি প্রৌঢ়ারী-অফিসার রামলখন সহকারকে। তাতে মাসে মাসে আরও পঞ্চাশটা করে টাকা আসে। তবুও বিয়ের কথা ভাবতে ভয় পাই। মীনাক্ষীকে বিয়ে করার কথা চিন্তা করতে গেলে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। লজ্জাও পাই মনে মনে। তখন ভাবি, দোতলার ঘরে বসে রোমান্টিক হয়ে ওঠাই বুদ্ধিমানের কাজ। দোতলা বাড়িটা আমার মতোই উঁচু হোক না কেন, চাঁদে হাত দেওয়ার মতো উঁচু নিশ্চয়ই নয়।

মন্মথবাবুর সঙ্গে একদিন পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল। এধার-সেধার পর মীনার আলোচনাটা উঠে পড়ল। ওঠালেন মন্মথবাবু নিজেই। বললেন, "ওহে ভাস্কর, তোমরা তো আমাদের হিতৈষী। একটা উপকার করবে?"

"কি বলুন তো—"

"মীনার জন্য একটি পাত্র খুঁজে দাও।"

"ফিরে দেবেন না কি ওর?"

"এতো তাড়াতাড়ি?"

"আঠারো বছর বয়স, তাড়াতাড়ি কি হে?"

"হ্যাঁ।"

মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেলুম আমি। বোধ হয় নিজের কথাই ভাবছিলুম। নিজেকেই পাত্র হিসেবে কল্পনা করছিলুম আমি। প্রস্তাবটা উত্থাপন করতে যাব এমন সময় মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সুপাত্রের সন্ধান দিতে পার?"

"সুপাত্র সম্বন্ধে কি রকম ধারণা আপনার তাই আগে বলুন।"

"ছেলেটি সুশিক্ষিত হওয়া চাই। সরকারী চাকুরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ধরো শ দুই টাকা মাইনে পেলে খুশী হবো আমরা।"

"মাত্র!" আকস্মোসের স্বর বেরুলো আমার গলা দিয়ে।

মন্মথবাবুর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি পূর্বেই সব কথা ভেবে রেখেছেন। স্পষ্টভাবেই বললেন এবার, "আমরা মধ্যবিত্ত। থাকিও ছোট শহরে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই। সুখ কে না চায় বলো? কিন্তু মনে যদি শান্তি না থাকে তা হলে কোটি টাকার বোঝা বয়ে লাভ কি?

বিনীতভাবে বললুম আমি, "আপনার ধারণা হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু মীনার মতো মেয়েকে ছোট শহরে আটক রাখবেন না। কলকাতায় নিয়ে যান। বড় ঘর থেকে বড় চাকুরের সন্ধান করুন। ওকে লুফে নেবে। রূপ সাথে এমন একটি মেয়ে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া মীনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যতোটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়, ওরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল। অনেক উঁচুতে উঠতে চায় সে।"

"কিসের জোরে?" প্রশ্ন করলেন মন্মথবাবু।

"সৌন্দর্যের।" জবাব দিতে দ্বিধা করলুম না আমি।

মৃদু হাসি দুলে উঠল তাঁর ঠোঁটের ওপরে। তিনি বললেন, "রূপের খ্যাতি ওর প্রচণ্ড তা আমি জানি। রূপ যেমন মানুষকে ভোলায়, তেমনি আবার তার আগুনে নিজেও পোড়ে। শুধু গুণ থাকলেই হয় না, সংযমের দড়ি দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এই ফাল্গুনেই মীনার বিয়ে আমি দিয়ে দেব।"

"তাড়াহুড়ো করবেন না।" অনুরোধ করলুম আমি।

"তাড়াহুড়ো না করলে মেয়েটা বিপদে পড়তে পারে। পরেশবাবুকে তুমি কি চেনো?"

"কোন্ পরেশবাবু?"

এখানকার গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলের শিক্ষক।"

"ও হ্যাঁ, নাম শুনেছি বটে। খুব সৎ বলেই তো জানি। সাক্ষাৎ পরিচয় এখনো হয়নি। বাংলা মাসিকে নাকি খুব উঁচু দরের কবিতা লেখেন ভদ্রলোক।"

"তাঁর সঙ্গেই মীনার বিয়ের প্রস্তাব করেছি। আজকাল তো শিক্ষকদের মাইনে বেড়েছে। স্বাভাবিক, উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে খানিকটা স্তিমিত করে রাখতে পারলে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। রূপ এবং শিক্ষা একসঙ্গে মিলিত হলে কলকাতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কি বলো তুমি?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে না? কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকছে। মীনা তো একেবারে ছেলেমানুষ নয়। তাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন না?" আমি যেন মরীয়া হয়ে উঠলুম।

মন্মথবাবু বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পথ আমিও এগিয়ে গেলুম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার মূলে আমার

উদ্দেশ্য ছিল দুটো। প্রথম হচ্ছে এক বিতর্কের দ্বারা মীনার বিয়েটাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলে মীনার সঙ্গে হয়তো একবার দেখা হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো উদ্দেশ্যই আমার সফল হ'ল না। মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেলেন মন্মথবাবু। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কেন ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাই জানো?"

"না। আপনি বলুন—?"

মানুষটি বড় সরল প্রকৃতির। আমি যুবক, শহরে নিজস্ব বাড়িঘরও আছে। বেকার নই। যা হোক চাকরিও একটা করি। মন্মথবাবুদের স্বজাত। মফঃস্বলের লোক হিসেবে চেহারাও আমার খারাপ নয়। তা সত্ত্বেও পাত্র হিসেবে তিনি আমায় উপযুক্ত মনে করেন না। এমন কি মীনাকে যে আমি ভালবাসতে পারি এমন সন্দেহ পর্যন্ত তাঁর মনে আসে না।

মন্মথবাবু বললেন, "সেদিন হঠাৎ মীনার কাণ্ড দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ওর জন্য একটা আলাদা ঘর আছে। দরজাটা একটু ফাঁক করা ছিল। কি মনে ক'রে উঁকি দিলাম আমি। কি অদ্ভুত ব্যাপারটাই না দেখলাম আমি!"

"কি রকম?" মীনার গোপন খবরটা শুনবার জন্য আগ্রহের চাপে ঝুঁকে দাঁড়ালাম মন্মথবাবুর দিকে। খড়কে দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে সুপারির কুচি বার করতে করতে তিনি বললেন, "টেবিলের ওপরে দেখলাম কোন্ এক সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি রয়েছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে জামাকাপড় পরেছে মীনা। তাতেও সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি। একটা ফিতে দিয়ে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মেপে মেপে দেখছে। ফিল্মের একটা বিলিতী পত্রিকা ছিল টেবিলের ওপরে। মনে হল সেই কাগজটাতে শরীরের মাপজোপ সব লেখা রয়েছে। তারপর দেখলাম—"হঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে মন্মথবাবু আমার দিকে চেয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। আমার গল্প শোনার তন্ময়তা বোধ হয় তাঁর চোখে বাড়াবাড়ি ঠেকছিল।

হঠাৎ যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর কি করল মীনা?"

"ছবিটাকে উদ্দেশ ক'রে অভিনয় করতে লাগল সে। হিন্দীতে ডায়লগ্ বলছে....শুনতে কিন্তু ভাল লাগছিল আমার।"

"ভাল অভিনয় করতে পারলে এ-লাইনে আজকাল পয়সার ছড়াছড়ি।" দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য দু' একজন অভিনেত্রীর নাম করলুম আমি।

মন্মথবাবুর চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। চিন্তান্বিতভাবে তিনি বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ পয়সার ছড়াছড়ি! আগুন দেখলে পতঙ্গদের কপাল পোড়ে—পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। পরেশের যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে এই ফাল্গুনেই মীনার বিয়ে দিয়ে দেব। আমার তো লোকজন কেউ নেই, তুমি এসে কাজের বাড়িতে খানিকটা সাহায্য করবে তো?"

"আপনার আমন্ত্রণ না পেলেও করব। চললেন?"

"কেন, আরও কথা আছে না কি?"

"বলছিলুম কি, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে পারতেন। পাত্র হিসেবে পরেশবাবু ভালই। কিন্তু মীনার জন্য আরও ভাল পাত্র যোগাড় করা অসম্ভব হবে না। একটু চেষ্টা করুন। আমরাও না হয় খোঁজ-খবর নেব। খানিকটা সময় দিন আমাদের।"

"দ্যাখো চেষ্টা করে। পরেশের বাবার কাছ থেকে এখনো চিঠি পাইনি।" মন্মথবাবু সদর দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

দরজার বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। কেন দাঁড়িয়ে রইলুম তার কারণটা আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ভাবছিলুম, মীনাকে হয়তো দেখতে পাব। ওর সঙ্গে দেখা হ'লে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মন্মথবাবু ভুল করছেন। মীনাকে বিয়ে করার যোগ্যতা পরেশবাবুর নেই। তা ছাড়া, মীনার মতো একটা লকলকে আগুনের শিখাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে রাখা তাঁর সাধ্যি কুলিয়ে উঠবে না। সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবেন।

মন্মথবাবুর বাড়ির সামনে বার দুই পায়চারি করলুম। নিজে হাতে বাগান তৈরি করেছেন তিনি। ফটকের দু'ধারে দুটো নারকেল গাছ। কয়েক পা ভেতরের দিকে হেঁটে গেলেই ফুলের কেয়ারিগুলো চোখে পড়ে। দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। একতলা বাড়ি। অনেকগুলো নারকোল গাছ বাড়িটার ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয় যেন শান্তিপ্রিয় মানুষ এঁরা। অল্পতে সন্তুষ্ট। ছোট শহরে বাস করবার যোগ্য নাগরিক। দুশো টাকা মাইনের সরকারী চাকুরে হ'লেই হ'ল—তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি নেই মন্মথবাবুর।

না, মীনার সঙ্গে দেখা হবে না। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে মন্মথবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে যাবে। জলখাবার খেয়ে তিনি বাগানে বেরিয়ে আসেন। গাছের গোড়ায় জল দেন। খুরপী দিয়ে বুনো ঘাস পরিষ্কার করেন। এখনো আমি বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছি—দেখতে পেলে তাঁর মনে নানা রকমের সন্দেহের উদ্রেক হ'তে পারে। হয়তো মীনার বিয়েতে কাজ করবার জন্য ডাকবেন না আমায়। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্মথবাবুর বাড়ির সামনে থেকে সরে এলুম আমি।

নদীর দিকটা একটু ফাঁকা। সেই দিকেই পথ ধরলুম। মনে মনে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছি আমি। মন্মথবাবু সৎ লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বোকা। সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধির অভাব। পরেশবাবুর চেয়ে আমার যোগ্যতা কম নয়। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমার অবস্থা তাঁর চেয়ে ভাল। পরেশবাবুর চালচুলো কিছু নেই। আমার দোতলা বাড়ি আছে। শুধু একতলা থেকেই মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া আসে। বাড়ির পেছন দিকে পাঁচ বিঘের বাগান। আমকাঁঠালের গাছ গুনে শেষ করা যায় না। তা থেকেও বছরে হাজার টাকা রোজগার হয়। এই জেলাটা আমের জন্য প্রসিদ্ধ। হ্যাঁ, এম-এ পাস আমি নই। আই-এ পরীক্ষার পর আমি আর পড়িনি। পড়লে আমিও এম-এ পাস করতে পারতুম। তা ছাড়া পরেশবাবুর চেয়ে চেহারা আমার ভাল। মীনার পাশে আমাকে খুব বেমানান ঠেকবে না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে থেমে উঠলুম আমি। একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। মীনার কাছে সোজাসুজি প্রস্তাবটা উত্থাপন করব কি? কিংবা পরেশবাবুকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়? শহরের গুণ্ডা কটি তো আমারই হাতের লোক। বিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে ওরা ধমকে দিতে পারে, ভয় দেখাতে পারে—বলে দিতে পারে পরেশবাবুকে যে, মীনাকে যেন তিনি বিয়ে না করেন। মীনা অন্য একজনকে ভালবাসে। আমার নামটা যদি ওরা পরেশবাবুর কাছে

উল্লেখ করে তাতেও আমি আপত্তি করব না।

ভুল পথে চলে এসেছি। এটা নদীর ধারে যাওয়ার পথ নয়। আমি চলে এসেছি শহরের মধ্যে। 'রূপালী' সিনেমার কাছে। এই মাত্র দুপুরের শো ভাঙল। 'হাউস ফুল' লেখা সাইন-বোর্ডের দিকে নজর পড়ল আমার। সেই দিকেই চেয়েছিলুম। হঠাৎ আমার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠল। পেছন ফিরে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে মীনাক্ষী। একটু হেসে সে বলল, "এই যে ভাস্করদা—চলুন আমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবেন।"

"তুমি কি সিনেমা-হাউস থেকে বেরুলে?"

"হ্যাঁ। ছবিটা আপনার একবার দেখা উচিত। বোম্বেতে শুধু একটা হাউসেই তিন সপ্তাহ চলেছে।"

ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি বোম্বে গিয়েছিলে?"

"যাইনি। তবুও থাকলে একদিন যাব.....যাবই।"

"হ্যাঁ, পরেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

"পরেশবাবু কে?" কুঞ্চিত কোঁচকালো মীনাক্ষী।

"চলো, বলছি।"

মীনাক্ষীদের বাড়ির দিকে পথ ধরলুম। মীনাক্ষী বলল, "চলুন একটু ঘুরে যাই। নদীর ধারে এখন ভিড় নেই বোধ হয়।"

খানিকটা পথ আমরা নিঃশব্দেই এলুম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম রাস্তার লোকেরা মীনার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। মীনাক্ষী সবাইকে টানে। এমন কি বুড়োমানুষেরও দৃষ্টি পড়ে ওর ওপর।

সন্ধ্যের ছায়া পড়ছে নদীর জলে। কেমন একটু ঘোলাটে ঘোলাটে ভাব। মাঘের এখন মাঝামাঝি সময়। একটা মণিপুরী শাল দিয়ে দেহটাকে ঢেকে রেখেছে মীনাক্ষী। লাল টুকটুকে শালের ওপর কালো কুঁচি। নদীর ধারে পৌঁছে মীনাক্ষী প্রশ্ন করল, "পরেশ-বাবু কে, ভাস্করদা?"

"এখানকার সরকারী ইস্কুলের মাস্টার। নতুন চাকরি নিয়ে এখানে এসেছেন। তোমায় বাবা তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান।"

"বাবা বললেন বুঝি?"

"একটু আগেই কথা হল। পরেশ-বাবুর বাবার কাছে প্রস্তাব করে চিঠি লিখেছেন মন্মথবাবু। সম্মতি পেলেই ফাল্গুনের মধ্যে বিয়েটা সেরে ফেলবেন।"

"কই আমি তো কিছুই জানি না।" বিস্ময় আর প্রতিবাদের ভঙ্গী স্পষ্ট হল মীনাক্ষীর চোখে-মুখে। একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল, "মালদা শহরে আমি থাকব না, থাকব না—কিছুতেই থাকব না।"

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী যেন অভিনয় করতে লাগল। প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীও এতো সুন্দরভাবে মনের কথা প্রকাশ করতে পারত না।

একটু উস্কে দিলুম আমি, "তোমার বিয়ে হওয়া উচিত বড়মানুষের সঙ্গে। তা ছাড়া এতো সাত তাড়াতাড়িতে বিয়ে হওয়ার দরকারই বা কি?"

"আমি এখন বিয়ে করব না।"

ওদের বাড়ির সামনে এসে পড়লুম। গেটের চারদিকে আধো-অন্ধকার। মীনাক্ষী গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, "আমরা তোমার পেছনে আছি। শোনো—" গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, "তোমার যা রূপ আর গুণ আছে তাতে একজন মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া তোমার সাজে না। তুমি একদিন ভারত-বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবে। তোমায় আমি চিনি মীনা। কাল একবার এসো... আমি তো একাই থাকি বাড়িতে। পরা-মর্শ করা যাবে।"

মতামত প্রকাশ করল না মীনাক্ষী। আধো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে গেল সে। আরও মিনিট দুই অপেক্ষা করলুম আমি। মনে হল কেয়ারির ফুলগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। লতাগাছগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলুম। সেখানেও যেন অশান্তির ঝড় উঠেছে। কার্নিশের গা থেকে লতা গাছগুলো ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে মন্মথ-বাবুর বাড়িটা অত্যন্ত রুক্ষ দেখাতে লাগল। মৃত বটগাছের মতো প্রাণহীন বাড়িটা পীড়া দিতে লাগল আমায়। কয়েক মিনিটের জন্য আমি বোধ হয় মন্মথবাবুদের ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়ে-ছিলুম।

রাস্তাটা পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরেছে। ঐ কোণায় দাঁড়িয়ে মন্মথবাবুদের বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায়। মোড়ের কাছে এগিয়ে আসতেই দেখা হয়ে গেল পেড্রোর সঙ্গে। মনে হল এই মোড়ে দাঁড়িয়ে পেড্রো মন্মথ-বাবুর বাড়ির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। বুকের রক্ত জল হয়ে এল আমার।

এই শহরের সবচেয়ে বড় গুণ্ডা হচ্ছে পেড্রো। নামটার একটা ইতিহাস আছে। নীলকরদের আমলে এদের পরি-বারটা খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে। এর ঠাকুরদা ছিলেন ধর্মযাজক। বাবা অবিশ্যি সরকারী চাকরি করতেন। কিন্তু শহরের সবাই তাঁকে পাদ্রীবাবু বলে ডাকতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর পারিবারিক নামটা বহন করতে লাগল পেড্রো। ছেলেছোকরা সবাই তাকে সম্বোধন করে, "পাদ্রীদা।" সাম্প্রতিক কালে নামটা উল্টেপাল্টে হয়ে দাঁড়িয়েছে পেড্রো। অনেকে পেড্রোসাহেব বলেও ডাকে।

বছর পঁচিশ বয়স ওর। অটুট স্বাস্থ্য। ওর সাহসিকতার গল্পগুলো কিংবদন্তীর মতো লোকের মুখে মুখে আলোচিত হয়। ওর যখন বছর বারো বয়স তখন এই শহরের ইংরেজ পুলিশ-সাহেবরা পর্যন্ত ওকে ভয় করতেন।

লেখাপড়া বেশি করেনি পেড্রো। কিন্তু ইংরেজীতে কথা বলে ভাল। ছেলেবেলা থেকে শরীরচর্চা করেছে মনোযোগ দিয়ে। তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর খুবই অভাবে পড়ে যায়। মা কিংবা ভাইবোন কেউ নেই। ব্যায়াম করলে খিদে বাড়ে বলে শরীরচর্চা ছেড়ে দিল পেড্রো।

ওর একটা মস্তবড় গুণ ছিল। খুবই পরোপকারী ছিল সে। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করবার জন্য পেড্রো জীবনপণ করেছে বহুবার। তবুও পুলিশের খাতায় ওর একমাত্র পরিচয় হচ্ছে: মারাত্মক গুণ্ডা।

স্বাধীনতার পর কোন এক রাজনৈতিক দল ওকে দিয়ে কাজ করিয়েছে অনেক। নির্বাচনের সময় পেড্রো ছিল ওদের দক্ষিণ হস্ত।

তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে দলের কাছে পেড্রোর আর দাম রইল না। নারকেলের ছিবড়ের মতো পরিত্যক্ত হল শহরের পাদ্রীদা। তাকেই আজ আমি দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখলুম রাস্তার মোড়ে। আমি এগিয়ে যেতেই মাথায় পেল্লো টুপি আর লম্বা প্যান্ট-পরা মানবমূর্তিটা একদিকে একটু স'রে দাঁড়াল। মোড় পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই আমি দেখলুম, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে পেড্রো।

জিজ্ঞাসা করলুম, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস রে?"

"তোমাদের দেখছিলাম, ভাস্করদা।"

"আমাদের?" কথাটা যেন বুঝতে পারিনি আমি।

"হ্যাঁ। তোমাকে, আর.....মনমটো-বাবুর মেয়েটাকে।" ভেংচে উঠল পেড্রো। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাকী অংশটুকু বুক-পকেটে রেখে মৃদু হেসে বলল সে, "তুমি একা একাই মজা লুটবে, ভাস্করদা? আমায় একটু পেসাদ দেবে না?" ইচ্ছে ক'রেই ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢোকাল পেড্রো। আমি দেখলুম, পকেটের ফাঁক দিয়ে একটা ছোরার মুখ রয়েছে বেরিয়ে। চকচক করছে মুখটা। বেশ বড় ছোরা। চওড়াও কম নয়। অন্তত ইঞ্চি তিন তো হবেই। ছোরার মুখে হাত বুলাচ্ছিল পেড্রো।

আমি একটু স'রে দাঁড়ালুম দূরে। সে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করল, "একটু পেসাদ আমায় দেবে না, দাদা?"

"তোর একলার ক্ষমতা তো কম নয়, আমার কাছে ভিক্ষে চাইছিস কেন?"

"তোমরা হচ্ছ গিয়ে ভদ্দরলোক..... মনমটোবাবুও ভদ্দরলোক—" হি হি শব্দে হেসে উঠল গুণ্ডাটা।

পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বললুম, "নে, এটা রাখ তোর কাছে।"

"এ কি দিচ্ছো, ভাস্করদা? পয়সা আমি চাই নে।"

"কেন, ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিস না কি?"

"না। চাকরি পেয়েছি আমি।"

"কি চাকরি?"

"রূপালী সিনেমার গেট আগলানোর কাজ।"

"ও, তাই বল্। আমি ভাবলুম, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছিস বুঝি।"

"জ্ঞান হচ্ছো তুমি? দাও তা হ'লে—" ফস ক'রে আমার হাত থেকে পাঁচ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল পেড্রো। আমি জানতুম যতো বড় চাকরিই না সে করুক, পাঁচটা টাকা হাত-ছাড়া করবে না। রূপালী সিনেমায় গেট-কীপার হয়েছে পেড্রো। ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। দুপুর, সন্ধ্যেতে রূপালী সিনেমার গেট আগলে ব'সে থাকবার ছেলে সে নয়। ত্রিশ-চল্লিশ টাকার বেশি মাইনেও সে পাবে না। তবে সে হঠাৎ কেন চাকরিটা নিতে গেল? প্রায় প্রত্যেকদিনই ছবি দেখতে যায় মীনাক্ষী। একই ছবি বার বার দেখে সে। তবে কি মীনার ওপর চোখ পড়েছে পেড্রোর? যদি পড়েই থাকে তা হ'লে আমি তো মীনাকে রক্ষা করতে পারব না। পেড্রোর হাতে পড়ার চেয়ে পরেশ-বাবুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বিয়ে হ'য়ে যাওয়া ভাল। পেড্রোর হাত আর বাঘের থাবা একই জিনিস। একবার দাগ লাগলে সে দাগ আর উঠবে না। মেয়েটার ভবিষ্যৎ যাবে নষ্ট হ'য়ে। সামাজিক সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলবে মীনা। মধ্যবিত্ত কিংবা উঁচু সমাজের কেউ ওকে আর বিয়ে করতে চাইবে না। কাজটা ভাল করিনি। একটু আগেই মীনাক্ষীর কল্পনার আগুনটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে এলুম আমি। ভারতবিখ্যাত অভিনেত্রী হওয়ার দরকার নেই ওর। পরেশবাবুর সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে ঘর-সংসার করুক। ধন-দৌলত এবং খ্যাতির পরিমাণ যতোই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ শান্তির পেছনেই ছোটে। কালই মন্মথ-বাবুর সঙ্গে দেখা করব আমি। তাঁকে বলব, পরেশবাবু শিক্ষিত লোক এবং পাত্র হিসেবে মীনাক্ষীর পক্ষে উপযুক্তই হবে। ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি? মাঘের শেষে গোটা দুই বিয়ের তারিখ আছে। হাত-পা চালিয়ে কাজ এবং কেনাকাটা করলে ঐ দুই তারিখের মধ্যে যে-কোনো একটা তারিখে বিয়ে হ'য়ে যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ভাল চাকরি পেয়েছিস। পকেটে ছোরা রেখেছিস কেন?"

"ভয় দেখাবার জন্য।" আধ-পোড়া সিগারেটের অংশটা বার করল পেড্রো।

"কাকে ভয় দেখাতে চাস?"

"মন্মটোবাবুকে।"

"কেন?"

"তুমি তো আমার সব কিছু জানো, ভাস্করদা। আমরা হচ্ছি গিয়ে নীলচাষের সমবাকার খৃস্টীয়ান।"

মাথা নিচু ক'রে প্রশ্ন করলুম, "যীশু-খৃস্টকে ভক্তিটক্তি করিস?"

"আগে করতাম। তারপর খিদের জ্বালায় যখন ব্যায়ামচর্চা ছেড়ে দিলাম তখন থেকে আর করি না। এই ছোরাটাই হচ্ছে গিয়ে আমার যীশুখৃস্ট। কিন্তু মন্মটোবাবুই বা কি রকমের হিন্দু?"

"কেন, তিনি তোর কি করলেন? তোর তো একদানাও পাকা ধান নেই, অতএব মই দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

ফুক ফুক ক'রে সিগারেটে টান মারল বার কয়েক। তারপর সে বলল, "আমরা হচ্ছি গিয়ে ধর্মরাজকের সঙ্গ। মিছে কথা বলি না। কিন্তু মন্মটো-বাবু? তিনি মিছে কথা বলেন। পুলিশের কাছে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন।"

"কেন, কি করেছিলি তুই?"

"মেয়েটার রূপ দেখে একদিন আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়েছিলাম। মেয়েটা যে কবে বড় হয়ে উঠল, আমি তা টেরই পাইনি। বুঝলে ভাস্করদা, ওর প্রেমে পড়ে গেলাম। কিন্তু মন্মটোবাবু রিপোর্ট করলেন যে, আমি নাকি তার গায়ে হাত দিয়েছি।"

"তিনি জানলেন কি ক'রে?"

"রাস্তার ভদ্দরলোকদের কাছ থেকে। তারা নাকি গায়ে হাত দিতে দেখেছে। বুঝলে ভাস্করদা, তোমরা যখন মেয়েটাকে দেখো তখন কোনো দোষ হয় না। শুধু আমার বেলায় পুলিশের কাছে মিথ্যে রিপোর্ট দাও তোমরা। ভাবছি, এই শহরে আর থাকব না।"

"কি করবি?"

"হিরোর পার্ট করব ফিল্মে। আর গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে যাও তো ভাস্করদা—" হাত বাড়াল পেড্রো।

ওর হাতে টাকা দিয়ে বললুম, "তোর যা চেহারা ফিল্ম কোম্পানী লুফে নেবে তোকে।"

"ঠিক বলছো?"

"ঠিক বলছি। যাওয়ার আগে আর একদিন দেখা ক'রে যাস। বুঝলি? আরও গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে যেতে।"

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপালী সিনেমা হাউসের দিকে পথ ধরল পেদ্রো।

ওর একটা কথাও বিশ্বাস করলুম না আমি। পরের দিন আদালতে গিয়ে মন্মথবাবুকে সব কথা খুলে বললুম। পেদ্রোর মতো সাংঘাতিক চরিত্রের লোক যা তা করে বসতে পারে। পুলিশের কাছে আগে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। অপরাধ না করলে পেদ্রোর গায়ে হাত দেবে না তারা। তা ছাড়া, পুলিশের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই ভাব এবং বন্ধুত্ব আছে ওর। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, মাঘের শেষেই মীনাক্ষীর বিয়ে হওয়া উচিত।

মন্মথবাবু বিস্মিত বোধ করলেন। গতকাল আমি তাঁকে উল্টোকথাই বলে-ছিলাম। তাতে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে, মীনাকে বোধ হয় আমিই বিয়ে করতে চাই।

সব কথা শুনে তিনি বললেন, "পরেশের সঙ্গে যদি কোনো কারণে বিয়ে না হয়, তা হলে তুমি কি মীনাকে বিয়ে করতে রাজী আছ?"

"কৃতার্থ বোধ করব আমি।" পা-এর ধুলো নিলুম মন্মথবাবুর।

পঁচিশে মাঘ বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। পরেশবাবু ছুটি নিয়ে বালুর-ঘাট গিয়েছেন তাঁর বাবার কাছে। সেখান থেকেই তাঁরা পঁচিশে তারিখ সকালবেলা এসে পৌঁছবেন। কেনাকাটার ব্যাপারে মন্মথবাবুকে সাহায্য করলুম আমি। মীনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পাব বলেই কাজের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিলুম। মন্মথবাবু খুশী হয়েছেন খুব। আমি যে অসৎ লোক নই সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন তিনি। মীনার বিয়েতে আমার স্বার্থ কিছু নেই, তবুও অফিস কামাই ক'রে কাজ করছি। মীনার সঙ্গে বার কয়েক দেখা হয়েছে। চোখ দুটো কোলা কোলা। বোধহয় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কান্নাকাটি করছে। মাকে মাঝে বলে সে, "ভুল করছেন বাবা। মস্ত-বড় ভুল। এ-বিয়েতে আমার মত নেই।"

শহর ছেড়ে গিয়েছে পেদ্রো। বিয়ের দিন পাঁচেক আগে থেকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের দু'একজন লোকের সঙ্গে আমারও চেনা ছিল। ছোট দারোগাসাহেব বললেন, "আমিরা ওর খোঁজ করছিলাম। তাই সে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

পরেশবাবুর সঙ্গে মীনাক্ষীর বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ে দেখবার জন্য পুরো শহরটাই ভেঙে পড়েছিল মন্মথবাবুর বাড়িতে। আমার বিশ্বাস, বারো আনা লোকই মনে মনে এ-বিয়ে অনুমোদন করেনি। এই বারো আনার মধ্যে আমিও ছিলুম।

প্রায় মাসখানিক পর পরেশবাবু আমায় একদিন ডেকে পাঠালেন। তাঁর বাড়িতেই গেলুম আমি। বসতে বললেন না তিনি। হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, "মীনা কোথায়?"

"তার মানে?" আকাশ থেকে পড়লুম আমি!

"দু' সপ্তাহ হ'ল মীনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিনা অনুমতিতেই চৌকির ওপর ব'সে পড়লুম আমি।—

॥ দুই ॥

পরেশবাবুর ব্যবহার দেখে সেদিন অবাক হয়েছিলুম খুবই। গোড়া থেকেই তিনি আমায় সন্দেহ করতে লাগলেন। চৌকির ওপর ব'সে পড়ে মাথা নিচু ক'রে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। মুখে কথা জোগায়নি। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "আপনি আমায় সন্দেহ করছেন কেন?"

পরেশবাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করতে লাগ-লেন। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করতেই তিনি বললেন, "অনেকেই বলছে মন্মথবাবুর মেয়েকে আপনি ভাল-বাসতেন।"

"দু'-একজনের নাম বলুন—"

"নাম শুনে আপনার কি লাভ? এর মধ্যে সত্যিই যদি কোনো রহস্য থাকে আমাকে খুলে বলুন। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তা ঠিক। কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক কিছু সৃষ্টি হয়নি। অতএব ভেতরের রহস্য জানতে পারলেও কষ্ট পাব না আমি। আপনি কি মীনাকে ভালবাসতেন?"

"সে তো কাল্পনিক ভালবাসা। শহরের শত শত লোক কল্পনায় ভাল-বাসত ওকে। মীনা তার খবর রাখত না। দু' সপ্তাহ তো আপনার সঙ্গে বাস করেছে সে। আপনি নিজে কিছু টের পাননি?"

পরেশবাবু উসখুস করতে লাগলেন। অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। মীনার প্রতি তাঁর ভালবাসা জন্মায়নি বটে, কিন্তু তিনি যে ওর স্বামী সেই সত্যটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছে নিশ্চয়ই। বিবাহিত জীবনের দুটো সপ্তাহের ইতিহাস প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে লাগলেন, "অপরের প্রতি প্রেমাসক্তা বলে টের পাইনি। আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে কথা-বার্তা বলত। আমি ভেবেছিলাম, নতুন বলেই দূরত্ব বজায় রাখা স্বাভাবিক। দু'-এক মাস পরেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা সহজভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এর বাইরে আর কিছু সন্দেহ করিনি।"

"কোনো চিঠিপত্র লিখে রেখে যায়নি?"

"হ্যাঁ।" টেবিলের ওপর থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে এনে আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "নিন, পড়ুন।"

দু' লাইনের চিঠি। মীনা লিখেছে : আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। খোঁজ করবার চেষ্টা করবেন না। বাবার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন ব'লে ধন্যবাদ।

হতবাক হ'য়ে ব'সে রইলুম। পরেশ-বাবু আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। মনটা বিষিয়ে উঠল আমার। যতো দোষ, নন্দ ঘোষ। গায়ে প'ড়ে উপকার করতে গিয়েছিলুম। মন্মথবাবুর উচিত ছিল তাঁর জামাই-এর মন থেকে সন্দেহ দূর ক'রে দেওয়া। তা তিনি দেননি। তবে কি মন্মথবাবুও আমাকে সন্দেহ করছেন? আমি একরকম মরীয়া হ'য়ে পরেশ-বাবুকে বললুম, "পুলিশের সাহায্য নিন।"

"না। জোর ক'রে আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে চাই নে। আমার যা বিপদ তা হচ্ছে সামাজিক। শহরের কেউ এখনো টের পায়নি। একদিন তো অবশ্যই টের পাবে সবাই। জিজ্ঞাসা করলে কি বলব তাই শুধু ভাবছি।"

পরেশবাবুর গলার সুর ভিজে উঠল। চোখ দুটোও ছল ছল করছে। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মীনার সঙ্গে যখন ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি তখন সামাজিক ইজ্জতের কথাটা তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠবেই। পাঁচজনের

প্রশ্নের জবাব তাকে একদিন-না-একদিন দিতে হবেই

একটু পরেই পরেশবাবু বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। আমাকে আর শত্রু বলে বিবেচনা করছেন না। আমার সহযোগিতা চাইলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্মথবাবুর মেয়ে অন্য কাউকে ভালবাসত বলে কি আপনার বিশ্বাস হয় না?"

"আমি নিজে চোখে কোন দিনও কিছু দেখিনি।"

"তবে গেল কেন?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। তবে হ্যাঁ, সিনেমার অভিনেত্রী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল মীনার। প্রায় প্রতিদিনই ছবি দেখত। দেশী এবং বিলেতী সিনেমার ম্যাগাজিন কিনত রাশি রাশি। কিন্তু একা একা মালদা শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস ওর না থাকাই উচিত। এখন মনে হচ্ছে মীনা নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসত। আপনার সন্দেহ মিথ্যে নয়। এসম্বন্ধে মন্মথবাবু কি বলেন?"

"মীনার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কিছু হয়নি। তিনি বলেন পুলিসের সাহায্য নিতে। এজাহার একটা লিখিয়ে আসবার জন্য পেড়াপিড়ি করছেন। দেখুন ভাস্করবাবু, ব্যাপারটা আমি আপাতত গোপন রাখতে চাই।"

"কেন? উদ্দেশ্যটা কি?"

"নিজের ভুল বোঝবার সময় ওকে দিতেই হবে।"

বই-পড়া মানুষের মতো কথা বলতে লাগলেন পরেশবাবু। প্রেমের এ্যাকাডেমিক ব্যাখ্যা নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি। প্রাচীন ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, হাঙ্গাম-হুজ্জত ক'রে মেয়েদের মনে প্রেমের সৃষ্টি করা যায় না। পুরুষ যদি তার চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা মেয়েদের মন জয় করতে না পারে তাহ'লে পুলিশ তাকে সাহায্য করবে কি ক'রে? করলেও ফল তার ভাল হয় না।

জিজ্ঞাসা করলুম, "নিজের ভুল বোঝবার জন্য মীনাকে কতোদিন সময় দেবেন ব'লে ভাবছেন?"

"দু'-এক মাস দেখাই যাক না। অপরের প্রতি ওর প্রেম যদি সত্যিই খাঁটি হয় তাহ'লে আমিই বা তেমন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করব কেন? ভাবছি, এখান থেকে বদলি হ'য়ে অন্য ইস্কুলে চ'লে যাব। আমার তো বদলির চাকরি।"

হ্যাঁ, কথাটায় যুক্তি আছে। তিনি যদি শহর ছেড়ে চ'লে যান তাহ'লে মীনাক্ষীর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা চোখে পড়বে না কারুর। পরেশবাবুর কথায় সায় দিলুম আমি। সরলচিত্ত মানুষটির জন্য দুঃখ অনুভব করলুম। আমার নিজের জীবনে যদি এই ধরনের ঘটনা একটা ঘটত তাহ'লে লজ্জায় এবং অপমানে আমিও বোধ হয় ভেঙে পড়তুম। এখন মনে হচ্ছে, মীনার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমার কপালেও লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। অনুরূপ শোকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হ'তো। ওকে বিয়ে করবার জন্য আমিও তো মনে মনে ক্ষেপে উঠেছিলুম। ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন।

একটু পরেই পরেশবাবুর নির্জীব মনটা যেন নতুন উদ্যমে সজীব হ'য়ে উঠল। ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করলেন। তারপর আমার ঘাড়ের ওপর চাপ দিয়ে বললেন, "আপনি যদি ওকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকেন তাহ'লেও আমি লড়াই করতে যাব না। আমি ইস্কুল-মাস্টার বলে ভাববেন না যে, এক বছরের মধ্যে ভেড়া বনে গিয়েছি। যাই বলুন না কেন, মন্মথবাবুর মেয়ে ইয়নগরীর হেলেন নয়। খাকী-পোশাকপরা পুলিশ বাহিনী নিয়ে আপনার দুর্গস্থানটি আক্রমণ করতে যাব না। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার দৈহিক কিংবা আত্মীক সম্পর্ক কিছু হয়নি। আপনাদের প্রেম যদি সাচ্চা হয় তাহ'লে কবুল করুন, মীনাকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি আমি। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন আজকাল সহজ হয়েছে।"

আবার যেন আকাশ থেকে পড়লুম আমি। লোকটা এখনো আমাকে অবিশ্বাস করছে। সরলচিত্ত মানুষদের চরিত্র এই রকমই হয়। একবার যদি কোনোক্রমে মনে তাদের সন্দেহ ঢোকে তাহ'লে সহজে সেই সন্দেহের ভূতটা মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি ভাবলুম, এই সন্দেহের মূলে আছেন মন্মথবাবু। তিনি নিশ্চয়ই এমন কোনো কথা বলেছেন যাদ্বারা পরেশবাবু ভেবে নিয়েছেন মীনার সঙ্গে আমার প্রেম-প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। তা যদি হবে, মীনাকে আমি বিয়ে করতে নিশ্চয়ই দিতুম না। বিয়ের আগেই নিখোঁজ হ'য়ে যেত সে।

পরেশবাবুর কথায় আহত বোধ করা স্বাভাবিক। উঠে পড়লুম আমি। আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাস্তা পর্যন্ত এলেন। তাঁর ডান হাতটা টেনে নিয়ে বললুম, "আমি একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে তো বটেই। বিশ্বাস করুন, মীনাক্ষীর খবর আমি জানি না।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল পরেশবাবুর মুখে। রাগ হ'ল আমার। আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল খুব। অপরের বউ-চুরির অভিযোগ স্বীকার করতে রাজী নই আমি। আত্মাভিমান এতো প্রবল হ'য়ে উঠল যে, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললুম। প্রতিজ্ঞা ক'রে বললুম, "আমি যে নির্দোষ তা আমি প্রমাণ করব—করবই।"

হন হন ক'রে রাস্তা পার হ'য়ে যাচ্ছি। দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। কি ক'রে প্রমাণ করব তার পথ আমার জানা নেই। তবু প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলুম। রাগের মাথায় ছেলেমানুষী ক'রে ফেলেছি তা হোক, কথা আমায় রাখতেই হবে। ইস্কুলটা বাঁ দিকে রেখে ডান দিকের পথ ধরলুম। মন্মথবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তাঁর মনোভাবটা আমার জানা চাই। তিনিও কি আমায় সন্দেহ করেন?

নিশ্চয়ই করেন। নইলে পরেশবাবুর সাহস এতো বেশি বাড়তে পারত না। বার বার ক'রে একই কথা বলতে পারতেন না তিনি। কিন্তু মীনাক্ষী একা একাই বা পালিয়ে যাবে কি করে? ছেলেবেলা থেকেই তো দেখছি ওকে। অভিনেত্রী হওয়ার শখ ওর সাম্প্রতিক। বছর দুই আগেও এতো ঘন ঘন ছবি দেখতে কিংবা ফিল্ম-ম্যাগাজিন কিনতে ওকে দেখি নি। মাত্র দু' বছরের মধ্যে এতো বেশি দুঃসাহস সঞ্চয় করল কোথা থেকে? পেছনে কেউ নিশ্চয়ই আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসত সে। পরেশবাবুর কাছ থেকে শুনে এলুম, শাড়ি-গহনা কিছু রেখে যায়নি মীনা। মন্মথবাবুর একটি মাত্র মেয়ে। প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলেন। সারা-জীবনের গচ্ছিত টাকা সবই ঢেলে দিয়েছিলেন মেয়ের বিয়েতে। সব নষ্ট হয়ে গেল আজ। শাড়ি-গহনা সব নিয়েই

নিখোঁজ হয়েছে মীনা। এর পেছনে প্রেম, না ডাকাতির অভিসন্ধি? ফুসলে-ফাসলে মেয়েটাকে বার করে নিয়ে মেরে ফেলেনি তো?

পেদ্রোকে সন্দেহ করা অসম্ভব। অন্তত সোজাসুজি দায়ী করা যায় না। বিয়ের আগে থেকেই শহর ছেড়ে গিয়েছে সে। তা ছাড়া, পুলিশের ধারণা, পেদ্রো গুণ্ডা হ'তে পারে—গুণ্ডাই সে, কিন্তু খুনের প্রবৃত্তি ওর মধ্যে নেই। যারা ওর ভেতরটা ভাল করে চেনে তারা বলে, পেদ্রোর মনটা অত্যন্ত নরম—বালকোচিত। তাছাড়া, পেদ্রোর সঙ্গে মীনাক্ষীর যোগাযোগ থাকলে আমার দৃষ্টি ওরা এড়িয়ে যেতে পারত না। আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, গুপ্তচরের মতো মীনার ওপর নজর রেখেছিলুম আমি। অফিসের কাজ ফেলে মিথ্যা অজুহাতে দুপুরবেলা বেরিয়ে যেতুম। সিনেমার আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতুম। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও পেদ্রোর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখিনি। মীনার ওপর পেদ্রোর লোভ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ফুসলে-ফাসলে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। মীনার চিঠি পড়ে মনে হয়, স্বইচ্ছায় এবং চতুর্দিক দেখেশুনেই ভবিষ্যতের পথ বেছে নিয়েছে সে। পূর্ব-পরিকল্পনার অভাবও পাওয়া যায়। মন্মথবাবুকে ভয় করত সে। আইনও বাবার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ইস্কুলের মাস্টার যতো তেজী মানুষই হোক না কেন, পয়সা খরচ করে ওকে খুঁজতে বেরুতে পারবে না। এখন স্মরণ হচ্ছে, বিয়ের দু' দিন আগে এই ধরনের একটা মন্তব্য করেছিল মীনাক্ষী। বলেছিল, "অল্প মাইনের মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ভালই করলে, ভাস্করদা।"

জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "কেন?"

"শাপে বর।"

পেড়াপীড়ি সত্ত্বেও ভাবার্থটা পরিষ্কার করেনি মীনা। মন্মথবাবুর বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তে লাগল আমার। পূর্ব-পরিকল্পনার পথ ধরেই নিখোঁজ হয়েছে সে। এখন ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা করতে লাগলাম, "মেয়েটা যেন অক্ষত থাকে, বেঁচে থাকে।" সোনার পরিমাণটা একটু বেশি। প্রেমিকটি যদি দুর্বৃত্ত হয়, তা হ'লে লোভ সামলাতে কষ্ট হবে।

বাগানে বসে মন্মথবাবু খুরপি দিয়ে ঘুনো ঘাস তুলছিলেন। মুখের ওপর তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন দেখলুম না। প্রকৃতপক্ষে খুবই শান্ত এবং ঠাণ্ডা মেজাজে কাজ করছেন বলে মনে হ'ল আমার। আমাকে দেখে ঘুনো ঘাস উৎপাটন করা বন্ধ করলেন না। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, খবর কি, ভাস্কর?"

বিনীত স্বরে বললুম, "পরেশ-বাবুর বাড়ি থেকে আসছি।"

"কি খবর তার?" নির্লিপ্ত ভঙ্গী মন্মথবাবুর।

"বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন তিনি?"

"কেন?" গলার স্বরে হেঁচকা টান মারলেন।

"মীনা হঠাৎ নিখোঁজ হ'য়ে গেল, তাই।"

"তুমি নিজে কিছু সন্ধান দিতে পার না?"

যা সন্দেহ করেছিলুম তাই ঘটেছে। মনের ভারসাম্য এবার আমি বজায় রাখলুম। উত্তেজনা-তুরগের বল্গাটাকে ধরে রাখলুম শক্ত করে। একটু ঢিলে দিলেই তুরগটা ছুটবে। মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেও পারি। শান্ত এবং সমাহিত স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করলুম, "আমি সন্ধান দেব কি করে?"

"তোমার সঙ্গেই তো যা একটু ভাব ছিল ওর।"

"আপনি ঠিক জানেন?"

"জানি।"

"শহরের আর কারো সঙ্গে কি মীনা কথাবার্তা বলত না?"

"চোখে পড়েনি এবং শুনিওনি।"

অপমানে দুটো কানই লাল হ'য়ে উঠল আমার। কড়া কথা দু' একটা শুনিয়ে দেওয়া দরকার। বললুম, "আপনি তো দুপুরবেলা দপ্তরে বসে সরকারী কাজ করতেন। মীনা কেতো ছবি দেখতে। দুনিয়ার যতো রাবিশ ছবি তাও সে বাদ দিত না। ওর যাওয়া আসার পথটা তো আপনি আগলে বসে থাকতেন না, চাটার্জিমশাই?"

খুরপীটা ঘাসের ওপর ফেলে রেখে এবার উঠে দাঁড়ালেন মন্মথ চাটার্জি। মুখের ওপর দেখলুম, গাম্ভীর্যের আস্তর টানা। একটা মাটির ঢেলা পা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার মেয়েকে আমি চিনি।"

"তা হ'লে আমি বলব, আমাকে আপনি চেনেন না। পরের বউ লুঠ করবার মনোবৃত্তি আমার নেই।"

"কি করে বুঝব?" লঘু সুরে প্রশ্ন করলেন মন্মথবাবু।

"বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি আমি।"

অপেক্ষা করলুম না আর। কথা কাটাকাটি করে লাভ হ'তো না কিছুই। মীনাকে খুঁজে বার না করতে পারলে এঁদের মন থেকে সন্দেহ দূর করা যাবে না। মনের সঙ্কল্প আমার ক্রমশই দৃঢ়তর হচ্ছে। মীনাকে খুঁজে বার করতেই হবে। সোনার গহনা আত্মসাৎ করবার জন্য ওকে যদি খুন করে ফেলেও থাকে, তবুও তার শবদেহটাকে খুঁজে আনব আমি। মহানন্দায় জলে স্রোতের বেগ খুব কম। ভাসতে ভাসতে যতো দূরেই চ'লে যাক না কেন, শবদেহটার হদিস পাওয়া চাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মীনাক্ষী বেঁচে রয়েছে। বাগানের বাইরে বেরিয়ে এসে বললুম, "ওর খোঁজ না আনতে পারলে মালদা শহরে ফিরে আসব না আর। নমস্কার।"

মন্মথবাবু হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

এর পর আরও এক মাস কেটে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পারলে মীনাক্ষী এতো দিনে ফিরে আসত। গতকাল পরেশ চক্রবর্তী মালদা শহর ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। বদলি হয়েছেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সরকারী ইস্কুলে। কারো সঙ্গেই তিনি দেখা করে যাননি। এমনকি মন্মথ-বাবুর সঙ্গেও না।

মীনার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ গোপন নেই। ক্রমে ক্রমে খবরটা সবারই কানে গিয়ে পৌঁচেছে। শহরটা গরম হ'য়ে ওঠবার একটু আগেই স্থান ত্যাগ করলেন পরেশবাবু।

দিন সাতেক পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মন্মথবাবুও বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ করতে। দু' মাসের ছুটি নিয়েছেন। শুনলুম, কাজে যোগ দেওয়ার আর ইচ্ছে নেই। মালদা শহরে একা পড়লুম আমি। ঘটনাটা এখানেই ঘটেছে

বটে, কিন্তু পরিণতির দৃশ্যটা উন্মোচিত হ'ল অন্য জায়গায়। কি বিচিত্র কাহিনী! পরিণতির দৃশ্যটাও কি করুণ! রূপ শুধু ভোলায় না, নিরস্তরণের বাঁধুনি আলগা হ'লে নিজেকেও পোড়ায়। মীনাক্ষীর জীবনচরিত সেই কথাই প্রমাণ করে। ছোট শহরের কাহিনী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ট্রেনে চেপে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল বড় শহরে।

আমাকে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হ'ল। বেহালী কোম্পানীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিলুম। ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি হ'য়ে গেল। আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে আরও হাজার দশেক বেশি পাওয়া যেত।

এক দিন সবার অগোচরে বেরিয়ে পড়লুম মালদা শহর থেকে। কেউ টের পেল না।

চলেছি কলকাতা।

॥ তিন ॥

আগেও বার কয়েক কলকাতা এসেছিলুম। কিন্তু কোনোবারই দিন সাতেকের বেশি থাকিনি। রাস্তাঘাট চেনা ছিল না। প্রত্যেকটা রাস্তাই দেখতে এক রকমের মনে হ'তো। কলকাতা পৌঁছে শেয়ালদার কাছেই একটা আস্তানা খুঁজে নিলুম। 'পান্থ-নিবাস' নামে বোর্ডিং-এর পুরো একটা ঘর ভাড়া করলুম। ঘরটা ছিল দুই সীটের। ম্যানেজার শশীকান্ত ধর বললেন, "দুই সীটের ভাড়া আপনাকে দিতে হবে। খাওয়া খরচ আবিশ্যি এক-জনের হিসেবে দিলেই চলবে।"

বড় অদ্ভুত ধরনের মানুষটি। প্রথম দর্শনে ধারণা জন্মাল, শশীকান্ত ধর আমাদের মতো মানুষ নন, একটি মূর্তিমান জহ্লাদ। যেমন মোটা, তেমনি কালো। মাথাটা ভূ-গোলকের মতো, উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। চোখ-দুটো সব সময়েই জ্বল জ্বল করছে। চোখের মণি সাদা নয়, রক্তাভ। রক্তের চাপ বেশি, না অতিরিক্ত মদ্যপান করেন, প্রথম ক'দিনের আলাপে তা বুঝতে পারিনি। অফিস ঘরটাই তাঁর শোবার এবং খাবার ঘর। ঘরের এক দিকে একটা চৌকি ফেলা আছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষা। চৌকির দুটো পা আমার চোখে পড়ল। অর্ডার দিয়ে তৈরি না করালে চৌকির পা এমন মোটা এবং শক্ত হ'তো না। ম্যানেজারবাবুর ভার বহনের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। যে-চেয়ারটায় তিনি বসেন সেটাও বাজারের চলতি সাইজের চেয়ার নয়।

হাত-পা নাড়াতে কষ্টই হয় তাঁর। টেবিলের গায়ে বুক ঠেকিয়ে ব'সে হিসেবপত্র লেখেন। একবার লেখেন বেলা বারোটায়, আবার লেখেন রাত দশটায়। বাকী সময়টা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে থাকেন। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটাও ধরতে ইচ্ছে করে না। চাকরবাকর কেউ কাছে থাকলে তারাই তুলে এনে তাঁর কানের কাছে ধ'রে রাখে। কখনো কখনো চিৎকার ক'রে ডাকেন, "কই রে লেতাই-লেতাই—" নিতাই ছুটে আসে। তিনি বলেন, "হাতটা আমার তুলে দে টেবিলের ওপর।"

একদিন রাত্রি বেলা ব'সে গল্প করছিলুম ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। মাঝে মাঝে তিনি দেয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ তুলে সময় দেখছিলেন। দশটা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নরহরি ব'লে একটা চাকরকে ডাকতে লাগলেন ম্যানেজারবাবু।

"কই রে নরহরি, শিগগীর আয়।"

নরহরি এল। ঘরে ঢুকে সে বলল, "দশ নম্বরের বাবু খাবেন না। বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন।"

"তিনি জানেন তো না খেলেও চার্জ দিতে হবে?"

"জানেন।"

নরহরি দেখলুম নিঃশব্দে টেবিলটা পরিষ্কার করতে লাগল। খাতা ক'খানা সরিয়ে রাখল শেলফের ওপর। টেলি-ফোনটা তুলে নিয়ে ফেলে রাখল চৌকির এক পাশে। ইতাবসরে নিতাই এল জলের গেলাস নিয়ে। দুটো গেলাস। ভাবলুম, ধরমশাই বোধ হয় পর পর দু' গেলাস জল খান। একটু পরেই নরহরিও ফিরে এল। তার দু হাতের চেটোর ওপর দুটো থালা। নিতাই থালা দুটো নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি ব'লে উঠলুম, "আমি তো নটায় আগেই খেয়ে নিয়েছি, ম্যানেজারবাবু। আবার এরা খাবার নিয়ে এল কেন?"

"আমার জন্য।"

"দু' থালা ভাত কেন?"

"দশ নম্বরের বাবুটি তো খাবেন না। ওরে ও লেতাই, আজ কি তোরা রাবড়ি দিসনি?"

"দিয়েছি বাবু।"

"তবে এক বাটি রাবড়ি দিলি কেন?"

"নরহরি আনতে গেছে। বাবুরা সব একসঙ্গে খেতে বসেছেন বলে। বাটি আর খালি নেই। আপনি খেতে আরম্ভ করুন—রাবড়ি এসে যাবে।"

ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। বুঝতে পারলুম কেন তিনি দু' থালা ভাত খেতে বসেছেন। দশ নম্বরের বাবুটিকে তো চার্জ দিতেই হবে। অতএব তাঁর বরাদ্দ অংশটা ম্যানেজারবাবু খেয়ে নিচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলুম, "যদি দু'জন বাবু আজ বাইরে থেকে খেয়ে আসতেন তা হ'লে তাঁর খাবারটা খেত কে?"

"আমি।" জবাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করলেন না শশীকান্ত ধর। পোনা মাছের এক খণ্ড পেটি মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "না খেলে সন্ধ্যের মধ্যে খবর দিতে হয়। তা হ'লে একবেলার চার্জ লাগে না। তা দেখুন ভাস্করবাবু, আপনি এতো অবাক হচ্ছেন কেন? সংসারে জন্ম নেওয়া কিসের জন্য? খাওয়ার জন্যেই তো। এই যে কলকাতার লোকগুলো ট্রামে-বাসে দিন-রাত পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে তার কারণ কি?" হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একটা ঢেঁকুর বেরিয়ে এল। আওয়াজটা হ'ল সোডার বোতল খোলার মতন। উদরস্থ বায়ুর পরিমাণ এতো জোরে বেরিয়ে এল যে, গেলাসের জলটা নড়ে উঠল একটু। লজ্জা পেলেন না শশী-কান্তবাবু। স্বাভাবিক সুরে আবার তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষের সুখ-দুঃখের মূলেও এই খাওয়া।"

"কিন্তু একটা পরিমাণ থাকা চাই তো।"

"আপনি যাকে যোগ্য পরিমাণ মনে করেন আমার কাছে তা পাখীর আহার মনে হয়। পরিমাণ করবার একমাত্র যন্ত্র হচ্ছে উদর।"

"তা হোক, তবুও ফলাফলের দিকে নজর রাখতে হবে। মোকতে পাওয়া গেল ব'লেই খেতে হবে তার কি মানে আছে? খাচ্ছেন, অথচ হাতখানা নাড়াতে পেরে

কষ্ট পান। মেদ বাহুল্য তো স্বাস্থ্য-হীনতার লক্ষণ।"

"স্বাস্থ্য দিয়ে কি করব আমি?"

প্রশ্নটার মধ্যে যেন রহস্যের সুর শুনতে পেলুম আমি। নিঃশব্দে খেতে লাগলেন ম্যানেজারবাবু। নরহরি দ্বিতীয় বাটি রাবড়ি নিয়ে এসেছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার আড়ালে। সেই কারণে রহস্য জানবার চেষ্টা করলুম না আমি। চুপ ক'রে ব'সে তাঁর খাওয়া দেখতে লাগলুম।

রাবড়ির বাটি দুটো একদিকে সরিয়ে রেখে তিনি ডাকলেন, "নরহরি—"

"আজ্ঞে—"

"আজ আর রাবড়ি খাব না। তোরা খেয়ে নিগে যা। বুঝলেন ভাস্করবাবু, বছর পাঁচেক আগেও আমি রোগা ছিলাম।" তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে তিনিই বললেন, "আপনার চেয়েও রোগা ছিলাম। হ্যাঁ রে নরহরি, তুই তো পুরনো লোক, বল্ সত্যি বলছি কি না?"

"যথার্থ। একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। কেঁদুলীর মেলায় গিয়েই তো সেবার সব্বোনাশ হ'ল।" রহস্যের গুটনো সুতোর মুখটা একটু খুলে দিয়ে নরহরি এঁটো বাসন নিয়ে চ'লে গেল ঘর থেকে। লম্বা সাইজের বিড়ি বার করলেন শশীকান্ত ধর। ছোট বিড়ির অর্ধেকটা মোটা ঠোঁটের মধ্যে গলে যায় বলে তিনি অর্ডার দিয়ে লম্বা বিড়ি তৈরি করিয়ে আনেন। প্রত্যেক দিনই নরহরি কিংবা নিতাই এসে দেশলাই জ্বালিয়ে দেয়। আজ আমি ছিলুম ব'লে উঠে গিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরলুম। বার দুই বিড়িতে টান মেরে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ আর হিসেবপত্র লিখব না।"

"কেন?"

"দিল নেই। পুরনো ব্যামো বড্ড বেশি দিক্ দিচ্ছে। গল্পটা শুনবেন নাকি?"

"বলুন না শুনি।"

"হ্যাঁ, মুখ বলেও তো উপায় নেই। ঐ শালা নরহরি তো গল্পটা ধরিয়ে দিয়ে গেল। কেঁদুলীর মেলায় কখনো গিয়েছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"বড্ড শালা নেড়া-নেড়ীর ভিড় সেখানে। তা হ'লে প্রথম থেকেই শুরু করি। বজবজে আমার দেশ। লেখাপড়া করেছি ইস্কুল পর্যন্ত। কয়েক বিঘে চাষের জমি ছিল। তাই দিয়ে সংসার চ'লে যেত। তারপর মাগ্গীর বাজারে বাবা বললেন, এবার আর ঘরে ব'সে থাকলে চলবে না। চাকরি-বাকরির খোঁজ করো। আমার বয়স তখন কুড়ি। পনরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম। মনোরমার বয়স ছিল দশ। বাবার হুকুম শুনে তো ভড়কে গেলাম। মনোরমা এই সবে পনরোয় পড়ল, বেশ ভাগরডোগর হয়েছে। চাকরি খুঁজতে কলকাতা যাই কি ক'রে? তবু যেতে হ'ল। এলাম কলকাতা। চাকরি পাওয়া তো সোজা কথা নয়। এটা-ওটা ক'রে সময় কাটতে লাগল। প্রায়ই বদলির কাজ পেতাম। এইভাবে বছর খানিক কেটে গেল। পেট ভ'রে খেতে পেতাম না। মাঝে মাঝে বাবা আবার টাকার সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখতেন।"

"এই এক বছর কি বাড়ি যাননি?"

"গিয়েছি। হয়তো দু' তিনবারের বেশি নয়। যেতে ইচ্ছে করত না। বাড়ি গেলেই মনোরমা শাড়ি গহনা চাইত। ভাত জুটত না। শাড়ি গহনা দেব কোত্থেকে? পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মাঝে-সাজে বায়স্কোপ দেখতে যেত। নজর বদলাতে লাগল মনোরমার। আমার এই রোগা-পটকা চেহারা আর ভাল লাগছে না ওর। প্রায়ই বলত, 'চেহারার এ কি হাল হয়েছে? দেখে এসো গিয়ে পবন-কুমারের চেহারা—কি সুন্দর! প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে।' জিজ্ঞাসা করতুম, 'পবনকুমারটি কে?' যেন আর্তনাদ ক'রে উঠত মনোরমা, 'ওমা, সে কি কথা! তার নাম শোনোনি? তোমার বিষ খেয়ে মরা উচিত। পবনকুমার হচ্ছে এ্যাক্টর।' বুঝলেন ভাস্করবাবু, মনোরমার কথা শুনে অনেক দিন দেশে যাইনি। একটা ভাল চাকরির খোঁজ করতে লাগলাম। 'পান্থনিবাসের' মালিক আমাদের দেশের লোক। তাঁর সঙ্গে একদিন পথের মাঝ-খানে দেখা হ'য়ে গেল। বোর্ডিং-হাউস দেখাশোনা করবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। তাঁকে এখন অনেক-গুলো ব্যবসা চালাতে হয়। নিজে দেখা-শোনা করবার সময় পান না।' আমায় তিনি একশো টাকা মাইনে দেবেন। খাওয়া এবং থাকা ফ্রী। সেই দিনই চাকরি নিলাম। বাসের তখন মাঝামাঝি সময়। যেখানে চল্লিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করছিলাম সেখানে আর গেলামই না। পনরো দিনের টাকা সেখানেই প'ড়ে রইল। বাবাকে লিখলাম আমার উন্নতির কথা। মনোরমাকেও লিখলাম, শাড়ি পাঠাচ্ছি। দু' মাস পর গহনা গড়িয়ে দেব। নিজেও ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলাম। রোগা-পটকা ব'লে গাল দিয়েছে মনোরমা। মাস দুই পরে ওকে তাক লাগিয়ে দেব। মনে মনে কতো রকমের 'ডায়লগ' তৈরি করতে লাগলাম —প্রথম সাক্ষাতের সময় কি রকম ভাষায় কথা বলব আমি।" হাঁপিয়ে পড়লেন শশীকান্ত ধর। আমি বললুম, "একটু না হয় জিরিয়ে নিন। একটা বিড়ি ধরাবেন কি?"

"না। আপনি বরং স্নানঘর থেকে তোয়ালেটা এনে দিন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" উঠে গিয়ে একটা শুকনো তোয়ালে এনে দিলুম। বড্ড বেশি ঘেমে গিয়েছিলেন। গলগল ক'রে ঘাম পড়ছিল কপাল আর গলা থেকে। আট-দশটা রুমাল ভিজে যেতে এক মুহূর্তও সময় লাগত না। একটা বড় সাইজের টার্কিশ তোয়ালে এনে তাঁর ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখলুম।

ঘাড়-গর্দানের ঘাম মুছে ম্যানেজার-বাবু গল্প বলতে শুরু করলেন, "মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর হয়নি।"

"বলেন কি?" পা তুলে জড়োসড়ো হ'য়ে চেয়ারের ওপর উঠে বসলাম।

"হ্যাঁ, দু' মাস পরে শাড়ি-গহনা নিয়ে দেশে যাব ভাবছি এমন সময় বাবার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম এল : শিগগীর চ'লে এসো। ভাবলাম, মনো-রমার কিংবা বাবারই অসুখ করেছে খুব। যাওয়ার মুখে মালিক এসে আরও শ-দুই টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। দুর্গানাম জপতে জপতে বজ-বজের দিকে রওনা হ'য়ে গেলাম। মনে মনে যে-সব ডায়লগ ঠিক ক'রে রেখে-ছিলাম তার একটা কথাও আর মনে রইল না। রাস্তা থেকে বাড়ির সদর দরজাটা আমাদের দেখা যায়। আমি দরজার দিকে চাইতে পারলাম না। ভয় করছিল। শাড়ি আর গহনার পুঁটলিটা বগলের তলায় চেপে মাথা নিচু ক'রে 'হাঁটি-হাঁটি পা পা' ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলাম বাড়ির দিকে। দরজায় কড়া নাড়তে হ'ল না। বাবা বেরিয়ে এলেন। কেন শক্তসমর্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভেতরে নিয়ে আমায় তিনি বললেন "বৌমা নেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হ'ল?" হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে জবাব দিলেন তিনি, "কেঁদুলীর মেলায় গেছলাম

বৌমাকে নিয়ে। পরদিন ঘুম থেকে উঠে চৌধি সে নেই। বোষ্টমরা বলছে যে, নদীর জলে ডুবে মরেছে।' নিজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করলাম, 'নদী?' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করিনি। ঐ গৌরাঙ্গর সঙ্গে পালিয়েছে। ঐ ছোঁড়াটা এখানে ঘন-ঘন আসত। বড় সুন্দর ছিল রে গৌরাঙ্গ। একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গান করত। এখানকার লোকদের পাগল করে দিয়েছিল। গৌরাঙ্গই আমাদের নিয়ে মেলায় গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে ওদের মধ্যে সোহাগের সম্পর্ক ছিল আমি আর তা কি করে জানব বল্? কীর্তনিনি—সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমাদের নগেন দাসের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে তোর পাকা করে ফেলেছি। বৌমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে আজ দু' দিন থেকে নগেন এসে আমার পা-এ তেল মাখাচ্ছে ঘন ঘন। কয়েক শো টাকা নগদ দেবে রে—ও কি কোথায় চললি?'

"বুঝলেন ভাস্করবাবু, হাঁ করে বাবা তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি রাত্রের ট্রেন ধরে ফিরে এলাম কল-কাতায়।"

"বৌকে আর খুঁজে পেলেন না?"

"না। চার বছর হ'য়ে গেছে।"

"চেষ্টা করেননি?"

"আফিম-খাওয়া চিড়িয়া যতোদিন না নেশা কাটছে ততোদিন তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। মাঝখান থেকে ভাত খেয়ে খেয়ে দেহের ওজন বাড়িয়ে ফেললাম মণ দুই।"

"এখন তা হ'লে কি করছেন?"

"বউ-এর ফোটো পুজো করছি। এই গতর নিয়ে নগেন দাসের কাছে উপস্থিত হ'লে জুতিয়ে আমার নাস বানিয়ে দেবে।"

"পুলিশে খবর দিয়েছিলেন কি?"

"বলে রেখেছি মশাই—" বিড়ি বার করলেন শশীকান্ত ধর। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি দেশলাই বার ক'রে বিড়িটা তাঁর ধরিয়ে দিলুম। তিনি বললেন: "আপনি সিগারেট খান জানি। আজ না হয় একটু বিড়ির ধোঁয়া টানুন মশাই। সিগারেট টেনে ভেতরের জ্বলুনি কমে না।"

তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগলুম আমি। দু'-এক টান দিতেই দম আটকে আসবার উপক্রম! আগেই সন্দেহ করেছিলুম, বিড়ির মধ্যে শুধু তামাক পাতা নেই। আমাকে কাশতে দেখে তিনি হেসে ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "হাসছেন যে?"

"বড় ছেলেমানুষ আপনি! বুকের জ্বলাটা এখনো তুলতুলে করেছে। আমার

"বড় ছেলে মানুষ আপনি। বুকের জ্বলাটা এখনো তুলতুলে রয়েছে।..."

মতো ঝামা নয়.....বুঝলেন কি না তামাকের সঙ্গে একটু গাঁজা মেশানো আছে।"

আমার সন্দেহটা মিথ্যে হয়নি। হাঁসের ডিমের মতো বড় বড় চোখ দুটো তাঁর সর্বক্ষণই লাল হ'য়ে থাকে। ভেবে-ছিলাম মদ খান নিশ্চয়ই। তারপর মাঝে মাঝে গাঁজার গন্ধও পেয়েছি। কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি কিছুই। এখন ম্যানেজার শশীকান্ত ধরের স্বীকারোক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা রইল না।

আমার দু' আঙুলের ফাঁকে বিড়িটা জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেল। মাথা ঘুরছিল আমার। চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। ম্যানেজারবাবুর শেষের কথাটা স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলুম। সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। একটু সুস্থির হওয়ার পর বললুম, "বড় কড়া নেশা।"

"হ্যাঁ, বুকের নেশা তো। আজ দুটো টানই যথেষ্ট, কাল আবার ট্রাই করবেন। দিন সাতেক পর নেশার মজা পাবেন। তা ছাড়া—" কথা বন্ধ করে শূন্য দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "তা ছাড়া বুকের হাড়েও জ্বলুনি থাকা চাই। নইলে কোনো নেশাই তেমন জমে না।"

রাত এগারোটা বাজল। দেয়াল-ঘড়িতে টং টং করে আওয়াজ হল এগারো বার। গল্পটা শেষ হয়নি। ঠিক কোন্ জায়গায় এসে যে থেমে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলুম, "চারটে বছর ঘরে বসেই নষ্ট করলেন? খোঁজাখুঁজি করলেন না?"

"বলে রেখেছি মশাই।"

"কাকে বলে রেখেছেন?"

"ইনস্পেক্টর লাহিড়ীকে। দূরে সি-আই-ডি। আমাদের বরযাত্রের লোক। ইস্কুলে আমরা এক বেঞ্চে এক ক্লাসে

পড়েছিলাম। প্রতি ক্লাসে দু' বছর ক'রে পড়তে হ'তো আমার।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "তিনি এখানে আসেন না?"

"প্রায়ই আসে। ভারি আড্ডাবাজ লোক। হয়তো এই অঞ্চলে সে ডিউটি দিতে আসে। হোটেলের ওপর নজর রাখে। আমাদের এই পান্থনিবাসটিকে কিন্তু পবিত্র হিন্দু হোটেল বলে ভুল করবেন না, ভাস্করবাবু। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে কতো রং বেরং-এর চিড়িয়া এসে বাসা বাঁধে এখানে।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। সেদিন তো ইনস্পেক্টর লাহিড়ী এসে এক জোড়া চিড়িয়াকে সাত নম্বর ঘর থেকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। লরহরি এসে বললে যে, মেয়েটা না কি ঐ লোকটার বউ নয়।"

"বলেন কি শশীবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার অফিস ঘরের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল। ছোঁড়াটাকে দেখে মনে হ'ল কুস্তিটুস্তি করে। পাকা পোনা মাছের মতো লাল টুকটুকে গায়ের রং। লহরে বোধ হয় নতুন। পবন-কুমার কেউ এল—"

"মেয়েটাকে দেখেননি?"

"ভাল ক'রে দেখিনি। প্রায়ই দেখতাম ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকা। লেতাই লালা বলত, খাসা দেখতে। আমার সামনে দিয়ে নিয়ে গেল ওদের। চেয়ারে বসে শিস দিয়ে গান ধরলাম আমি—বিদায় সঙ্গীত। দশ দিনের আগাম টাকা আগেই আদায় ক'রে রেখেছিলাম। বড় দুঃখের রাজত্বে ম্যানেজারি করছি, দাদা!! ম্যানেজারি করছি আর মেটা হচ্ছি।"

মনের ভেতর দুরাশার ঢেউ উঠল। তবে কি ঘোমটা-দেওয়া মেয়েটি শ্রীলাকী? সঙ্গের লোকটা তা হ'লে কে? পেল্লা খুব জোয়ান তা ঠিক। কিন্তু তার গায়ের রং তো পাকা পোনার মতো লাল নয়। জিজ্ঞাসা করলুম, "ছেলেটি কি মাথায় টুপি পরত? এই ধরুন যাকে আমরা গোলো টুপি বলি?"

"না টুপি পরতে কখনো দেখিনি।" সন্দেহের দৃষ্টিতে ম্যানেজারবাবু আমার দিকে চেয়ে রইলেন। হয়তো ভাবছেন, মেয়েটি নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী। কিন্তু তাঁকে তো আমি আগে একদিন বলেছিলাম, আমি বিবাহিত নই। বোধ হয় কথাটা ভুলে গিয়ে থাকবেন। কয়েক বউ পালিয়ে গেলে যে তাঁর মনে আনন্দের ঢেউ ওঠে তাতে আর সন্দেহ নেই। মৃদু মৃদু হাসছিলেন তিনি। আমোদ উপ-ভোগ করছেন।

আমি বললুম, "ইনস্পেক্টর লাহিড়ীর সঙ্গে আমায় একদিন পরিচয় করিয়ে দেবেন।"

"কেন বলুন তো? আপনারও বউ চুরি গিয়েছে না কি?"

"আজ্ঞে না, আমার এক বন্ধুর। আমি অ-বিবাহিত। আজ চলি।"

বাইরে বেরিয়ে এলুম। ম্যানেজার-বাবুর ঘরে বিরাট একটা আওয়াজ উঠল। তিনি হাসছিলেন। অতো মোটা মানুষের এতো জোরে হাসা নিরাপদ নয়। দাঁড়িয়ে গেলুম আমি। হাসি থামবার পর তিনি গান ধরলেন :

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পীরিতির কথা।
সই কে বলে পীরিতি ভাল—

গান শেষ ক'রে হাঁক দিলেন ম্যানেজার শশীকান্ত ধর, "কই রে লরহরি, এক কুঁজো জল নিয়ে আয়—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। দাদা, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? এসো, একটু নেশা ক'রে যাও।"

বুঝলাম, আমি যে অবিবাহিত তা তিনি বিশ্বাস করেননি। আর অপেক্ষা করলুম না, সাত নম্বর ঘরে ফিরে এলুম। এই ঘরটারই ইতিহাস একটু আগে শুনে এলুম আমি।

॥ চার ॥

দেখতে দেখতে ছটা মাস কেটে গেল। কলকাতার রাস্তা-ঘাট মোটামুটি চিনে ফেলেছি। টালিগঞ্জের স্টুডিও-গুলোতে যাওয়া-আসা করছি। চৌরঙ্গীর বড় হোটেলেও মাঝে মাঝে যাই। আমাকে আর মফঃস্বলের লোক বলে মনে হয় না। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। প্যান্ট-কোট পরে সাহেব বনে গিয়েছি। থাকি অবিশ্যি পান্থ-নিবাসে।

ইনস্পেক্টর লাহিড়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্ব মজে উঠল। মীনাক্ষী সম্বন্ধে সব কথাই খুলে বলেছি তাঁকে। এই ব্যাপারের সঙ্গে আমার স্বার্থের সীমাটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি। সবচেয়ে দরকারী কথাটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। শান্ত-প্রিয়, শিক্ষিত এবং সৎ বংশের একটি মেয়ে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। জীবনটা নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার আগে তাকে উদ্ধার করা চাই। সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করাই তো পুলিশের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব। পাঁকল পরিবেশকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবেন তাঁরা।

একদিন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী এসে বললেন, "ফিল্ম কোম্পানীর লোকদের কাছ থেকে দু'-একটা খবর সংগ্রহ করেছি।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। তবে ঠিক মতো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তদন্তের ব্যাপারে কোনো খবরই তুচ্ছ নয়।" প্রশান্ত লাহিড়ী স্বইচ্ছায় আমাকে সাহায্য করছেন। এটা তাঁর সরকারী কাজ নয়। অতএব চব্বিশ ঘণ্টাই মীনাক্ষীর সন্ধানে সময় দিতে পারেন না।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ধরনের খবর পেলেন, প্রশান্তবাবু?"

"মেয়েটা কলকাতায় এসেছে, অন্য কোথাও যায়নি। ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য চিত্র-পরিচালকদের সঙ্গে দেখাও করেছে। তার একটা ফোটো আমায় দেখাতে পারেন, ভাস্করবাবু?"

ফোটো আমার কাছে ছিল না। স্মরণশক্তি থেকে মীনাক্ষীর চেহারার বর্ণনা দিতে লাগলুম। আরও বার করেক বর্ণনা আমি দিয়েছি। কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ীর চোখের সামনে মীনাক্ষীর ছবিটা স্পষ্ট হয়নি। এ আমার নিজেরই অক্ষমতা। মীনাক্ষীর স্বামী পরেশবাবু কবিতা লেখেন। তিনি হয়তো এ-কাজটা সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে তো আর হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না।

নোট বই বার ক'রে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "ফাল্গুন মাসের দশ তারিখে একটি মেয়ে পরিচালক দাশরথি রায়ের সঙ্গে দেখা করেছিল। একাই গিয়েছিল সে। হ্যাঁ, সুন্দরী তাকে বলা চলে। মফঃ-স্বলের মেয়ে তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই। ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য খুবই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। দাশরথিবাবুর যতদূর মনে পড়ে মেয়েটি নাম বলেছিল রূপকুমারী—"

"রূপকুমারী?"

"হ্যাঁ। হাসলে বাঁ দিকের গালে টোল পড়ে।"

"ঠিক, এই তো মীনাক্ষী—" লাফিয়ে উঠলুম আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, "তারপর কি হ'ল, প্রশান্তবাবু?"

"তারপর দাশরথিবাবুর কাছে আর যায়নি সে। ফিল্ম জগতের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তিনি যতদূর খবর রাখেন তাতে মনে হয়, ঘন ঘন হাত বদলাচ্ছে। শিক্ষানবিশীর সময় স্টুডিও-তে কাজ থাকে না। হোটেল-রেস্তরাঁয় ঘুরে বেড়াতে হয়। এর অর্থ যে কি তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভাস্করবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। উল্কাকাল্কার পথটা তো সরল নয়। তা ছাড়া এ হচ্ছে গিয়ে শিল্পের জগৎ।"

শেষের কথাটার মধ্যে বোধ হয় ব্যঙ্গোক্তির সুর মেশানো ছিল। তাই প্রশান্ত লাহিড়ী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক হ'য়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি করে ওর সন্ধান পাওয়া যায়?"

"ঠিকানাটা বার করতে হবে।"

"আমার মনে হয় মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেলে আমি ওকে এই শিল্পের জগৎ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব।"

ইন্সপেক্টর লাহিড়ী মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দুটো টিকিট বার ক'রে আমায় বললেন, "রূপকুমারীকে আজ আমরা দেখতে যাব।"

"কোথায়?"

"নিউ এমপায়ারে। আজ সাড়ে ছ'টায় সেখানে একটা বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে। রূপকুমারী নাচ দেখাবে—"

"কিন্তু মীনাক্ষী তো নাচতে জানত না!"

"প্রতিভা থাকলে দু' দণ্টা মুদ্রা তুলতে ক'টা দিন সময় লাগে বলুন? একেবারে প্রথম সারিতে টিকিট কিনেছি—প্রতি টিকিটের দাম দশ টাকা।"

"তা হোক। এ খরচা আমার—" পার্স থেকে টাকা বার করতে গেলুম। প্রশান্ত লাহিড়ী আমার হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, "জানি, ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছেন। ওটা এখন আপনার কাছে থাক। পরোপকার করতে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, ত্রিশ হাজার টাকা গলে যেতে বেশি দিন সময় লাগবে না।"

"কিন্তু তাই বলে আপনি কেন কুড়ি টাকা খরচ করতে যাবেন? এটা তো আপনার নিজের কাজ নয়—"

"নয় কেন, ভাস্করবাবু? মীনাক্ষীকে রক্ষা করা আমি সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করি। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। ম্যানেজারবাবুকে আগে থেকে খবর দিয়ে দিন, আজ রাত্রে এখানে খাবেন না। এক-বেলার চার্জ বেঁচে যাবে।"

হাসতে হাসতে আমি বললুম, "চার্জটা বড় কথা নয়। ম্যানেজারবাবুকে অতিরিক্ত খাদ্যের লোভ থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে আসল কাজ।"

সাড়ে ছ'টার পাঁচ মিনিট আগে আমরা নিউ এমপায়ারে এসে উপস্থিত হলুম। প্রেক্ষাগার পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। ইনস-পেক্টর লাহিড়ী আমায় বললেন, "আলো নিবে যাওয়ার আগে ভাল ক'রে একবার নজর দিয়ে দেখুন তো এখানে সেই লোকটি আছে কি না।"

"কোন্ লোকটি?" মীনাক্ষীর চিন্তায় মনটা আমার ভরপুর হ'য়ে ছিল।

"আপনাদের সেই পেদ্রোর কথাই বলছি।"

"ও হ্যাঁ—" প্রেক্ষাগারের চারদিকটা দেখলুম, না, লম্বা প্যান্ট আর পেলো টুপি দেখতে পাচ্ছি না।"

"এখানে এসে হয়তো ধুতি পাঞ্জাবি পরছে। ভাল ক'রে দেখুন।"

প্রথম সারির দিকে এগুতে এগুতে দু' দিকেই দৃষ্টি ফেললুম, কিন্তু পেদ্রোকে দেখতে পেলুম না। নিজেদের আসন দখল ক'রে ব'সে পড়লুম আমরা। প্রথম দু' সারিতে আমরা ছাড়া বাঙালী আর কেউ নেই। প্রশান্ত লাহিড়ীর পাশে একজন বিদেশী, মনে হয় গুজরাটী ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন। হঠাৎ তিনি এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে প্রশান্তবাবু যে? কি ব্যাপার, আপনিও দেখছি নাচ-গানা পছন্দ করেন। এখানে ডিউটি দিচ্ছেন না কি?"

"আমরা কি চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি দিই, খান্দুভাই? আপনাদের মতো আমাদেরও গান-বাজনা শোনবার শখ আছে।"

বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রথম আইটেম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্য-নাটিকা। অর্কেস্ট্রা বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারের আলো যেন নিবে অন্ধকার হ'ল। প্রশান্ত লাহিড়ী আমার দিকে ঝুঁকে বেশ ফিসফিস সুরে বলতে লাগলেন, "প্রথম সারিটায় যাঁরা বসেছেন তাঁরা সব এ-লাইনের মার্কা-মারা লোক।"

"কোন্ লাইনের, প্রশান্তবাবু?"

"স্মাগ্‌লিঙের লাইন। সবাই বেশ ধনী। খান্দুভাই বাংলা এবং হিন্দী ফিল্মে প্রচুর টাকা খাটান। ইনি হচ্ছেন ফাইনেন-শিয়ার। বোম্বেতেও বড় কারবার এঁর।"

মনোযোগ দিয়ে নৃত্য-নাটিকাটি দেখ-বার ভান করছিলেন ইন্সপেক্টর লাহিড়ী। প্রকৃতপক্ষে আশপাশের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিলেন তিনি। এবং যাঁরা নিজেদের মধ্যে নিচু সুরে বাক্যালাপ করছিলেন তাঁদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছিলেন প্রশান্তবাবু।

নাটিকাটি শেষ হ'তে প্রায় পঁয়-তাল্লিশ মিনিট লাগল। বাইরে থেকে আমি একটা প্রোগ্রাম কিনে এনেছিলুম। পাতা উল্টে দেখলুম, অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় আইটেম হচ্ছে রূপকুমারীর ভারতীয় নৃত্য।

পর্দা ওঠবার আগে প্রথম সারিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। আমিও একটু নড়েচড়ে বসলুম। কনুই দিয়ে গুঁতো মারলেন লাহিড়ীবাবু। অস্ফুট স্বরে বললেন, "চুপ ক'রে বসুন। অতো নড়া-চড়া করছেন কেন?"

পর্দা উঠে গেল। রঙ্গমঞ্চে আলো নেই। মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। তারপর শুরু হ'ল সেতারের টুং টাং আওয়াজ। খান্দুভাই পা গুটিয়ে চেয়ারের ওপর উঠে বসেছেন। হঠাৎ দেখি টর্চ লাইটের মতো সরু একটা আলোর রেখা রঙ্গ-মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়ল। ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রূপকুমারী উপুড় হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে রঙ্গমঞ্চের ওপর। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দেহে প্রাণ এল তার। নাচের ভঙ্গীতে উঠে বসল সে। হাতে মুদ্রা তুলল। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। পূর্ণোদ্যমে নাচতে লাগল রূপকুমারী। সেই সরু আলোটার রং বদলাচ্ছে ঘটে, কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। ইনস্পেক্টরসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছেন?"

"না।"

"কেন?"

"আলো কই? তার উপরে রং মেখে মুখের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। মাথায়

উপরে দেখছি স্তূপের মতো এক গাদা চুল। ওর তো এতো বেশি চুল থাকার কথা নয়!"

"বাঙাল আর কাকে বলে! ও তো নকল চুল মশাই—"

"দাঁড়ান ভাল ক'রে দেখছি।"

দেখবার চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু মীনাক্ষী বলে নিঃসন্দেহ হ'তে পারলুম না। রঙ্গমঞ্চটা পুরোপুরি আলোকিত হ'ল না। সারা জায়গা জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে রূপকুমারী। নাচের গতিও গেল বেড়ে, অথচ ওড়নাটা এক মুহূর্তের জন্যও মুখ থেকে খুলে পড়ছে না। আধো-অন্ধকারে ঢাকা রইল ওর মুখ। আলো-ছায়ার খেলা চলতে লাগল শেষ পর্যন্ত—প্রায় মিনিট পনরো হবে। তারপর হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল যবনিকা। বোকা সেজে নিঃশব্দে ব'সে রইলুম আমি। ইনসপেক্টর লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকাতে ভয় করতে লাগল। রেগে গিয়েছেন তিনি। কুড়িটা টাকাই জলে ফেলে দেওয়া হ'ল।

নৃত্য-শেষে করতালির হুড়োহুড় পড়ে গেল। শুধু খান্দুভাইকে দেখলুম, গালে হাত দিয়ে ব'সে রয়েছেন। কোনো-রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা নেই। মাঝে মাঝে শুধু প্রশান্ত লাহিড়ীর দিকে চোরাদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। বোধ হয় এই ভাবে মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। তারপর তৃতীয় আইটেম শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রেক্ষাগার অন্ধকার হ'য়ে গেল। আমরা দেখলুম, খান্দুভাই উঠে পড়লেন। দু' সারি চেয়ারের মাঝখান দিয়ে চ'লে গেলেন তিনি। আমি বললুম, "বোধহয় বাথরুমে গেলেন খান্দুভাই।"

"না—আমার পেছু পেছু আপনিও চ'লে আসুন ভাস্করবাবু!" প্রশান্ত লাহিড়ী উঠে পড়লেন। সেই একই পথ ধ'রে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আমি দেখলুম নিউ এম্পায়ারের সামনে মস্ত বড় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। খান্দুভাই গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। তারপর কোথা থেকে সেই রূপকুমারী এসে উপস্থিত হ'ল গাড়িটার সামনে। দরজাটা খুলে রেখেছিলেন খান্দুভাই। রূপ-কুমারীও উঠে বসল গাড়িতে। প্রশান্ত লাহিড়ীর হাত চেপে ধ'রে সহসা ব'লে উঠলুম আমি, "ঐ—ঐ তো মীনাক্ষী!"

গাড়ি টা বেরিয়ে গেল। মীনাক্ষীও আমায় দেখতে পেয়েছিল। প্রশান্ত লাহিড়ী মৃদু হেসে বললেন, "চলুন, এবার পেট ভরে খেয়ে নেয়া যাক। কুড়ি টাকা খরচ করা বৃথা হয় নি। কি বলেন?"

আমি কিছু বললুম না, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম চৌরঙ্গীর দিকে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি বেয়ে কতো উঁচুতে উঠেছে মীনাক্ষী আমি তা আন্দাজ করতে পারলুম না। চেহারাটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। মফস্বলের মেয়ে ব'লে আর কেউ ভুল করবে না। নাচ শিখেছে মীনাক্ষী। দু'-একজনের মুখে রূপকুমারীর প্রশংসাও শুনেছি। কারো কারো ধারণা, ভবিষ্যতে নাম করবে সে। রূপকুমারীর পরিচয় সম্বন্ধে যে-সব গল্প প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটাই মিথ্যা। দু' একজনের মুখে এমন কথাও শুনেছি, "রূপকুমারী বাঙালী নয়।" মীনাক্ষী যদি বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে ওঠে কোনোদিন তাতেও আমি খুশী হবো না। আমি জানি বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার আগে ওর ব্যক্তিগত জীবনটা ভেঙেচুরে শত টুকরো হ'য়ে যাবে। এর চেয়ে কম দাম দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে বেশি দূর পৌঁছতে পারবে ব'লে মনে হয় না আমার। গুজবের মধ্যেও এক পয়সার সত্যি আমি আবিষ্কার করেছি। খান্দু-ভাই-এর কবলে পড়েছে মীনা। কয়েক ধাপ ওপরে ওঠবার পর ওকে নিচের দিকে টেনে রেখেছেন খান্দুভাই। মাঝা-মাঝি জায়গায় ঝুলে রয়েছে রূপকুমারী।

মীনাক্ষীর ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারেন নি ইনসপেক্টর লাহিড়ী। খান্দুভাই-এর হেপাজতেই আছে সে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় যে বাস করছে তার হদিস পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝে বোম্বে যাওয়া-আসা করছে তেমন খবরও কানে এল। কলকাতার বড় বড় হোটেল আর রেস্তরাঁয় গিয়ে প্রায়ই উঁকি দিই। মীনাক্ষীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতে পারে ব'লে আশা ক'রে থাকি। এমনিভাবে আরও তিন মাস কেটে গেল কলকাতায়।

প্রশান্ত লাহিড়ী আশা ছাড়েন নি। যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তিনি। অফি-সিয়েল কাজ এটা নয় তাঁর। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই পরিশ্রম করছেন। তা ছাড়া তাঁর আত্মাভিমানেও আঘাত লেগেছে। মফস্বলের একটি বাঙালী মেয়ের ঠিকানা খুঁজে বার করতে না-পারলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। নিউইয়র্ক কিংবা লণ্ডনের মতো বড় জায়গা এটা নয়। শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সবটুকুই তাঁর চেনা। যে-কোনো রাস্তার যে-কোনো বাড়ির নম্বর বললে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নিতে পারেন।

আজ একটু রাত ক'রে পান্থনিবাসে এলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। বোধ হয় ন'টা বেজেছে। আমার খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। বিছানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলুম। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, "একটা হিন্দী ছবি দেখে এলুম। এগুলোকে ফাইটিং ছবি বলে। বড় বড় সিনেমা হাউসে এ সব ছবি দেখানো হয় না।"

"হঠাৎ কেন ফাইটিং ছবি দেখতে গেলেন?"

"আপনার ঐ 'পাদ্রীদা-'র গল্প শুনে সন্দেহ হচ্ছে মীনাক্ষীর পেছনে সেই ছেলেটাই আছে। পেড্রোই তাকে শোষণ করছে।"

"কি রকম?"

"এই ধরুন ভাড়া খাটাবার মতো।"

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। বাজে কথা বলবার লোক তিনি নন। তদন্ত করতে গিয়ে কোথাও নিশ্চয়ই মীনাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর নজরে পড়েছে।

ঘরের এককোণায় একটা ইজি-চেয়ার ছিল। সেখানে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে ধূমপান করছিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। হিন্দী ছবি দেখার ব্যাপারটা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি জানেন ভাস্করবাবু, পেড্রো বোম্বেতে আছে?"

"না।"

"সেখানে গিয়ে এই সব ফাইটিং ছবিতে অভিনয় করছে সে। হিরো হয়েছে। এক শ্রেণীর লোকের কাছে পেড্রো অত্যন্ত প্রিয়। তরোয়াল চালায় ভাল। দূর থেকে ছোরা চালাবার দক্ষতা না কি অসাধারণ। আজ সেই লোকটিকে দেখে এলাম আমি।"

বিস্মিত বোধ করলুম। কিন্তু মনে মনে খুশীও হলুম খুব। রূপালী সিনেমার গেট-কীপারী করার চেয়ে ফাইটিং ছবির হিরো হওয়া ভাল। মাজদা টাউনে উৎপাত তো কম করে নি। আমার ধারণাটা প্রকাশ করলুম প্রশান্ত

লাহিড়ীর কাছে। হেসে ফেললেন তিনি। বললেন, "গেট-কীপার হওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ওর।"

"কি?"

"মীনাক্ষীর সঙ্গে ঐখানেই ওর দেখা হতো। হয়তো দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।"

"একথা বলছেন কেন আপনি?"

"এক মাস হল মীনাক্ষী এখানে নেই। সে বোম্বে গিয়েছে। খান্দুভাই আর ওকে টাকাপয়সা দেন না। বত্রিশ ঘাটের জল যদি না খেতে হয় তা হলে পেন্ত্রোর ওপর নির্ভর করতে হবে মীনাক্ষীকে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় তা তো আপনি জানেন। একবার যাবেন না কি বোম্বে? শহরটা দেখে আসবেন?"

"আপনি যাবেন কি করে, প্রশান্তবাবু?"

"মাস খানিকের ছুটি নেব। ছুটি আমার পাওনা আছে।"

"যেতে পারি, কিন্তু খরচপত্র সব আমার। আপনাকে একটি পয়সাও খরচ করতে দেব না।"

প্রশান্ত লাহিড়ী বোধ হয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে ঢুকল পেন্ত্রো। হাসতে হাসতে দমকা হাওয়ার মতো লাফ মেরে এগিয়ে এল আমার কাছে। বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলল সে: "ভাস্করদা, আমি জানি কেন তুমি এখানে এসেছ?"

"কেন?"

"সেই মনমহোবাবুর মেয়েটাকে খুঁজতে।"

"কি করে জানলি?"

"মালদা গিয়েছিলাম। সেখানে শুনে এলাম তোমার সব কাণ্ড। বাড়ি-ঘর বেচে দিয়েছ। তুমি কি মনমহোবাবুর মেয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়েছ ভাস্করদা?"

"সে কথার জবাব পরে দিব। কিন্তু আমার এখানকার ঠিকানা জানলি কি করে পেন্ত্রো?"

হি হি শব্দে হেসে উঠল পেন্ত্রো। আমার চিবুকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, "মালদা থানার ছোট দারোগা সাহেবকে চিঠি লিখেছ না তুমি?

দারোগাসাহেব চিঠিখানা আমায় দেখালেন।"

"দেখালেন?"

"হ্যাঁ। তুমি তাঁকে আমার খবর জানাতে লিখেছ।" পেন্ত্রোর গলার স্বরটা শেষের দিকে গভীর হয়ে এল। হাসি-খুশী ভাবটাও আর নেই। জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও তুমি ভাস্করদা?"

"মীনাক্ষীকে।"

"কেন?"

জবাব আমি তোকে দেব না। আগে স্বীকার কর, মীনাকে তুই ভাগিয়ে নিয়ে গেছিস। বল, সত্যি কি না?"

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল পেন্ত্রো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল প্রশান্ত লাহিড়ীর দিকে। যেন চমকে গেল একটু। ইনসপেক্টর লাহিড়ী উঠে পড়লেন। বললেন, "আজ চলি, ভাস্কর-বাবু।"

"পা-এর ধুলো দিয়ে যান, দাদা—" সত্যি সত্যি পেন্ত্রো হাত নামিয়ে দিল প্রশান্তবাবুর পা-এর দিকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে আমার কি আগে কখনো দেখা হয়েছে?"

"দেখা হয় নি, কিন্তু বাঁশী শুনেছি—" সশব্দে হাসতে হাসতে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পেন্ত্রো। পান্থ-নিবাসের চাকর-বাকররা ওকে বেরিয়ে যেতে দেখল।

যাওয়ার আগে ইনসপেক্টর লাহিড়ী বললেন, "এ বড় সাংঘাতিক চরিত্রের লোক। আগে কখনো খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল কি?"

"না।"

আর কোনো কথা বললেন না, ইনস-পেক্টর সাহেব। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন যেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সারাটা রাত ঘুম এল না আমার। পেন্ত্রো হঠাৎ কেন এসে উপস্থিত হল তার কারণটা বুঝতে পারলুম না। সে কি আমায় ভয় দেখাতে এসেছিল? তা যদি হয়, তবে মীনাক্ষীর নিখোঁজ হওয়ার মূলে ওরই হাত রয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, প্রশান্তবাবুর সন্দেহটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পেন্ত্রোর সঙ্গে মীনাক্ষীর প্রেমের সম্পর্ক থাকাও অস-ম্ভব নয়। খুবই বিচিত্র ব্যাপার মনে হচ্ছে। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার সত্য হয় না তাই বা কেমন যুক্তি?

ভয় পেলুম আমি। পেন্ত্রোর হঠাৎ-আগমনটা আমার চোখে ভাল লাগল না। এই অঞ্চল থেকে উঠে যেতে হবে। বালিগঞ্জের দিকে একটা নতুন আস্তানা খুঁজে নেয়ার সঙ্কল্প করলুম। আপা-ততঃ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজার খিল লাগিয়ে দিলুম।

পরের দিন হোটেল থেকে বাইরে বেরুলাম না। প্রশান্ত লাহিড়ীর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে বাসা-বদল করা ঠিক নয়। কিন্তু দুটো দিন তিনি অনুপস্থিত রইলেন। ভয়ের মাত্রা বাড়ল আমার। পর পর দুদিন তখনো অনুপস্থিত থাকেন নি প্রশান্তবাবু। ম্যানেজারবাবুও তাঁর কোনো হদিস দিতে পারলেন না।

চতুর্থ দিন সকালবেলা ইনসপেক্টর লাহিড়ী এসে উপস্থিত হলেন। একটু উত্তেজিত মনে হল তাঁকে। ইজি-চেয়ারে ব'সে সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলুম। অপেক্ষা করছিলুম ভয়ঙ্কর কিছু একটা শোনবার জন্য। এমন চাপা-উত্তেজনার কণ্ঠ পেতে আগে কখনো তাঁকে দেখি নি।

একটু বাদেই তিনি বললেন, "জিনিসপত্র সব চটপট গুছিয়ে নিন। আজই রওনা হ'তে হবে—তাই করব।"

"কোথায়?" অবশ্যই ভয় পেলুম আমি।

"বোম্বে। খুনের দায়ে ধরা পড়েছে রূপকুমারী।"

"তার মানে? মীনাক্ষী খুন করেছে?"

"করেছে কি না তদন্ত ক'রে যাচাই করতে হবে। আপাতত বোম্বের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে রেখেছে।"

"পেন্ত্রো? তাকে গ্রেপ্তার করে নি?"

"তাকেও করেছে। কিন্তু খুনের রাত্রে পেন্ত্রো কলকাতায় ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঠিক খুনের সময়টাতে পেন্ত্রো আপনার ঘরে ব'সে গল্প কর-ছিল। আমরাই তার সাক্ষী। ঘটনাটা কি গতকালের কাগজে আপনি পড়েন নি?"

"না তো!"

"বোম্বের শহরতলীতে একটি মহিলা তাঁর নিজের বাগান বাড়িতে বাস করতেন। গুজরাটী। লাখ তিনেক টাকা ছিল তাঁর। সন্তান কিংবা [illegible] নেই। খান্দুভাই [illegible] মামীমা। [illegible] তিনি ভালবাসতেন খুব। [illegible]

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মাস ছয় আগের ঘটনা। খান্দুভাইকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"কেন?"

"পুলিশ সন্দেহ করছে ঐ তিন লাখ টাকার লোভে লক্ষ্মী দেবীকে খুন করিয়েছেন তিনি। বছর খানিক থেকে খান্দুভাই-এর ব্যবসা ভাল চলছিল না। বহু টাকা লোকসান দিয়েছেন। একটা বুড়ো চাকর ছিল লক্ষ্মী দেবীর। এই সঙ্গে তাঁর পারিবারিক ডাক্তারকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডাক্তার পাটেল। প্রায় বছর পনরো ধ'রে তিনি লক্ষ্মী দেবীর চিকিৎসা করতেন। তাঁর ওপর লক্ষ্মী দেবীর বিশ্বাস ছিল অগাধ। এক চাকরটিকে ছাড়া আর সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।"

"কিন্তু, খান্দুভাই-এর অবস্থা খারাপ হ'ল কি ক'রে? মীনাক্ষীর ওপর টাকার বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন না কি?"

এ-লাইনের লোকদের কিছু ঠিক নেই। আজ রাজা, কাল ফকীর। আবার পরশু দিনই হয়তো রাজা হ'য়ে বসবে। যাক। এখন কি করবেন আপনি? যাবেন তো আমার সঙ্গে?"

"নিশ্চয়ই।" তক্ষুণি আমি জামা-কাপড় গুছতে লাগলুম। সারা শরীরে কাঁপুনী উঠেছে। এই ধরনের একটা বিপদের মধ্যে যে মীনাক্ষী পা ফেলতে পারে তেমন আশঙ্কা আমার ছিল। বিশেষ ক'রে সেই রাত্রে পেড্রোর ভাব-ভঙ্গী দেখে আশঙ্কা আমার অমূলক নয় ব'লে ভেবে রেখেছিলুম আমি। শুধু ব'সে ব'সে সময় গুণছিলুম।

ইনসপেক্টর লাহিড়ী বললেন, "সঙ্গে কিছু টাকা নেবেন। প্লেনের টিকিট আমি কেটে ফেলেছি।"

"কতো টাকা নেব?"

"হাজার দুই নগদ থাকলেই চলবে। কতোদিন সেখানে থাকতে হবে তা এখন বলা শক্ত। আমি যাচ্ছি গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে। পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে তাঁরা একজন অভিজ্ঞ সি-আই-ডি অফিসারের সাহায্য চেয়েছিলেন। আমাদের বড় সাহেব বললেন, 'তুমিই যাও লাহিড়ী। খুনের সঙ্গে একটি বাঙালী মেয়ে জড়িয়ে পড়ল—একটু দেখেশুনে যত্ন নিয়ে তদন্ত করবে। সত্যিকারের আসামীকে ধরা চাই।' ভাস্করবাবু, আপনার হাত-পা অতো কাঁপছে কেন? তা হ'লে কি বোম্বে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আপনার? মনের কথাটা খুলে বলুন তো—"

"ইচ্ছে আমার ষোল আনা, প্রশান্ত-বাবু। সারা জীবনে একটিও খুনের গল্প পর্যন্ত পড়ি নি। তাই প্রথমটায় খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বিশেষ ক'রে মীনাক্ষীর বিপদের কথা ভেবে বুকের রক্ত আমার শুকিয়ে গিয়েছে। যাক, প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছি। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হ'য়ে উঠব।" একটু থেমে আমিই আবার বললুম, "মীনাক্ষী কখনো খুন করতে পারে না। পেড্রোই ওকে বিপদে ফেলেছে।"

প্রশান্ত লাহিড়ী হেসে উঠলেন। মতামত কিছু প্রকাশ করলেন না। যাওয়ার আগে শুধু ব'লে গেলেন, "এই নিন আপনার টিকিট। আর আমি আসব না। একেবারে বিমানঘাটিতে দেখা হবে।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সাত নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডিটেকটিভ প্রশান্ত লাহিড়ী।

॥ পাঁচ ॥

বোম্বে পুলিশের একজন সি-আই-ডি অফিসার ইনসপেক্টর দেশাই সান্টা ক্রুজ বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য হোটেল ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। এই অঞ্চলটার নাম প্যারেল। ধনীলোকদের বসবাসের পাড়া এটা নয়। হোটেলটা অবিশ্যি ভালই। আমাদের দু' জনের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। ইনসপেক্টর দেশাই-এর সঙ্গে প্রশান্ত লাহিড়ী আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি আমার বন্ধু, ভাস্কর আচার্য। দুটি আসামীকে ইনি চেনেন।" আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন ইনসপেক্টর দেশাই।

এক টেবিলে ব'সেই আমরা ব্রেক-ফাস্ট খেলুম। ডাইনিং-রুমে আর কেউ ছিল না। কথা প্রসঙ্গে প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "শহরতলীটা এখান থেকে কত দূরে?"

"মাইল পনরো। আমাদের এক কর্মচারী একটা মোটর গাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি। বেলা দশটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত ড্রাইভার ডিউটি দেবে। মাঝখানে একটা নাগাদ এক ঘণ্টার জন্য ছুটি দিলেই চলবে। দেশমুখ নামে একটি ছেলেকেও সঙ্গে দেব আপনার। রাস্তা-ঘাট সব আপনাকে চিনিয়ে দেবে সে।" বললেন ইনসপেক্টর দেশাই।

চা-এর পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "গাড়ির দরকার নেই। আমি ট্যাক্সি চেপেই যাওয়া-আসা করব। দেশমুখ ছেলেটিকে চেনা করিয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে তার সাহায্য আমি নেব। লক্ষ্মীদেবীর চাকরটি এখন কোথায়?"

"শহরতলীর বাড়িতেই আছে।"

"তাকে গ্রেপ্তার করেন নি কেন?"

"বহুদিনকার পুরনো লোক—খুবই বুড়ো। সংসারে তার কেউ নেই। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য রেখেছি বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয় কিনা। তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছি।"

সিগারেট ধরিয়ে বসলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। চোখ বুজে বার কয়েক টান মারলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মীদেবীর ওয়ারীশ কেউ ছিল না?"

"একটি ভাইপো আছে আহমদাবাদে। এখনো নাবালক। আগামী বছর জুলাই মাসে সাবালক হবে।"

"কোনো উইল রেখে গিয়েছেন কি লক্ষ্মীদেবী?"

হ্যাঁ। সব টাকা-পয়সা এবং শহর-তলীর বাড়িটা ভাইপো-কে দিয়ে গিয়েছেন। হাজার পঞ্চাশ টাকার শেয়ার ছিল। সেগুলো তাঁর মৃত্যুর পর খান্দু ভাই পাবেন ব'লে ঘোষণা ক'রে গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আপনার জানা দরকার। লক্ষ্মীদেবীর যে তিন লাখ টাকা ছিল তা কেউ জানত না।"

"আপনারা জানলেন কি করে?"

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছ থেকে। তিনি বললেন যে, সাত দিন আগে টাকা-গুলো ভল্ট থেকে বার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবী।"

"ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কোন্ দেশীয় লোক?"

"গুজরাটী।"

"লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল কি?"

"তা অবিশ্যি খোঁজ করি নি আমরা।"

হঠাৎ উঠে গিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী ডাইনিং-রুমের একটা জানলা খুলে

সময় মীনাক্ষী হাজার দশেক টাকার গহনা নিয়ে এসেছিল?

বললুম, "বেশি ছাড়া কম নয়। তা কি আর আছে? এতোদিনে পেত্নোর হাতে পড়ে গলে গিয়েছে সব।"

ইনসপেক্টর দেশাই বাধা দিয়ে বললেন, "যেসব কোম্পানীতে পেত্নো কাজ করত সেখানে আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম। সেখান থেকে রোজগার ওর ভালই হতো। অন্তও গোটা তিন ছবিতে অনায়াসে ছিল পেত্নোর। তবে হ্যাঁ, মারা-মারি কাটাকাটির প্রতি ঝোঁক ছিল খুব। খুনের দৃশ্যগুলো এতো নিখুঁতভাবে করত যে, অভিনয় বলে বোঝা যেত না।"

"আপনার কথা মিথ্যা নয়। আমি নিজেও সেদিন কলকাতায় ওর একটা ছবি দেখে এলাম। প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের পেটে এমনভাবে তরোয়াল চালিয়ে দিলে পেত্নো যে, আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। আচ্ছা মিস্টার দেশাই, খুনীর ছোরাটা আপনি দেখেছেন কি?"

"এখানেও একটা জন্তবড় রহস্য লুকোনো আছে।" ইনসপেক্টর দেশাই-এর মুখে অস্বস্তির আভাস। চিন্তান্বিত-ভাবে বলতে লাগলেন তিনি, "খুনও তার নিজের ছোরা ব্যবহার করে নি। লক্ষ্মী দেবীর বালিশের তলায় একটা ছোরা থাকত সব সময়েই। মনে হয় তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ছোরা দিয়েই তাঁকে হত্যা করেছে। নিজের ছোরা কাজে লাগায় নি খুনী।"

"হয়তো হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না।—" গড়গড়ার নলটা হাতের মুঠোতে ধরে রেখে প্রশান্তবাবু বললেন, "হয় তো শুধু টাকাটাই চুরি করতে এসেছিল..... তারপর হয়তো লক্ষ্মী দেবীর ঘুম ভেঙে গেল.....তিনি চোরটাকে চিনেও ফেললেন.....এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, লক্ষ্মীদেবীই আগে তাকে আক্রমণ করেছিলেন....."

"কোনো কিছুই অস্বীকার করা যায় না। তবে, দিন সাতেক থেকে তিনি অসুখে ভুগছিলেন। হার্টের ব্যারাম। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন। আক্রমণ করবার মতো শক্তি তাঁর না থাকাই উচিত। শত্রুর সঙ্গে হস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই নি।"

"হাত পা-এর ছাপ যা যা নেয়া দরকার, নিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ, অভিজ্ঞ আসামীদের কারো সঙ্গে মিলছে না। ছোরার বাঁটে শুধু লক্ষ্মী দেবীরই হাতের ছাপ পাওয়া যায়। এর দ্বারা মনে হয়, খুনীর হাতে অবশ্যই গ্লাভস্ লাগানো ছিল।"

"তা হলে হস্তাধস্তি একটু হওয়াই স্বাভাবিক। জানলার পা-এর ছাপ পান নি কারো?"

"পেয়েছি। এদের সবার চেয়ে পা-এর ছাপ বড়। এদেশে মানুষের এতো বড় পা সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। নকল জুতো, অর্থাৎ বড় সাইজের জুতো পরে এসেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।"

"ছোরাটা কোথায়?"

"লেবরটোরিতে। রক্ত-মাখানো অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে।"

প্রশান্ত লাহিড়ীর স্মরণ শক্তি যে কী প্রচণ্ড তা আমি জানি। খুঁটিনাটি ব্যাপারও তিনি ভোলেন না। মনে রাখবার একটা বিশেষ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন তিনি। কথা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। ঈষৎ পূর্বের আলোচিত কথাগুলো সেই সময় আবার তিনি নিজের মনে আগাগোড়া আলোচনা করেন। স্মরণ শক্তির মধ্যে প্রত্যেকটি কথা আঠার মতো লেপ্টে থাকে। এখন তিনি ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার প্যাটেল কি খুব বড় ডাক্তার? অর্থাৎ, রোজগার কেমন?"

"নাম আছে খুব। বিদ্বান তো বটেই। বিয়ে করেন নি।"

"বয়স কতো?"

"আটচল্লিশ।"

"পুরুষের পক্ষে আট-চল্লিশ এমন কিছু বেশি বয়স নয়।" মন্তব্য করলেন প্রশান্তবাবু। তারপর তিনিই আবার বলতে লাগলেন, "রূপকুমারীর সঙ্গে তাঁর নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। ঐ দিক দিয়েও একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যেতে পারে। লক্ষ্মী দেবীর বাড়িতে ডাক্তার প্যাটেলের শেষ ভিজিট কবে?"

"খুনের দিন সকালবেলা।"

"আচ্ছা মিস্টার দেশাই, সিন্দুকের চাবিটা থাকত কোথায়?"

"বালিশের তলায়।"

"বরাবর?"

"বাদ্রোও তো তাই বলে।"

"চাকরটা সেবাহি সব খবরই রাখে... অথচ ঐ লোকটাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেন নি। পুরনো হলেই কি তার সাত-খুন মাপ? আজ আপনি কী আছেন নিশ্চয়ই। সেদ্রুকে এখন দরকার নেই। আপনাকে সঙ্গে নিয়েই দুপুরের দিকে আমরা একবার লক্ষ্মী দেবীর বাড়ি যেতে চাই। কি বলেন? অসুবিধে হবে না কি আপনার?"

"কিছু না। আপনার কথাবার্তা শুনে আমার এখন মনে হচ্ছে, তদন্তের শুরুতেই অনেক ভুল করেছি আমরা। কটার সময় আসব বলুন?"

"খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে এই ধরুন বেলা দুটো নাগাদ এলেই চলবে। ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন। খুব বেশি জানাশোনা ড্রাইভার যদি হয় তাকে আনবেন না। অপরিচিত ট্যাক্সি-ড্রাইভার হলেই ভাল হয়। শহরতলীতে পৌঁছবার মাইল খানিক আগে তাকে ছেড়ে দিতে চাই।"

"বেশ, তাই হবে।" ইনসপেক্টর দেশাই উঠে পড়লেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়েও গেলেন। হঠাৎ আবার তাঁকে দাঁড়াতে বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী। জিজ্ঞাসা করলেন, "খান্দুভাই সম্বন্ধে কিছু বললেন না তো? তাঁর কলকাতার অফিস থেকে কয়েকটা খবর আমি সংগ্রহ করে এনেছি। এখানকার ব্যবসা তাঁর কেমন চলছে?"

"খারাপ। দুটো হিন্দী ছবিতে প্রায় দশ লাখ টাকা মার খেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে দশ লাখ টাকা তো দশ টাকার সমান। ঐ ব্যাঙ্কেই খান্দুভাই-এর মোটা একাউন্ট ছিল—"

"একটু দাঁড়ান। ব্যাঙ্কের কোন্ ব্রাঞ্চে? যেখানে লক্ষ্মী দেবীর টাকা ছিল সেখানে তো?"

ইনসপেক্টর দেশাই যেন বোকা বনে গেলেন! হতবাক হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, সেই একই ব্রাঞ্চে।"

"তা হলে লক্ষ্মী দেবীর তিন লাখ টাকার খবর খান্দুভাই-এর জানা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। যাতায়াত যখন ছিল তখন কেরানীদের মারফৎ খবরটা তিনি বার করে নিয়েছেন বলে আমরা অন্তত সন্দেহ করতে পারি। বলুন, পারি কি না?"

"পারি—অবশ্যই পারি।"

"তাহলে সেখানেও একটা তদন্তের পথ খোলা রয়েছে। রূপকুমারীর পেছনে যতো টাকা তিনি ঢেলেছেন বলে আপনার মনে হয়, মিস্টার দেশাই?"

"শুজব তো অনেক। কিন্তু যারা রূপকুমারীকে জানে, তারা বলে খান্দু-ভাই ওকে পান নি। আসলে সে ভালবাসে পেত্নোকে। আমি খবর পেয়েছি, খান্দুভাই-এর সঙ্গে মেলামেশা করা পেত্নো পছন্দ করত না। অনেকবার নাকি কলকাতা গেছে শুধু খান্দুভাইকে

শাসিয়ে আসবার জন্য। মেয়েটার না কি টাকার খাঁই খুব বেশি। বোম্বে এলে রূপকুমারী থাকত তাজমহল হোটেলে। খরচ দিতেন খান্দুভাই। এ'দের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত পেড্রোর ছায়া।"

"তা হলে ডাক্তার প্যাটেলের জামীনের বিরুদ্ধে 'মুভ' করার দরকার নেই। তাঁকে ছেড়ে দিন। খান্দুভাই আর মীনাক্ষীর যোগাযোগটার ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। পেড্রোকেই বা ধরে রেখে লাভ হবে কি? বেচারীর কনট্রাই নষ্ট হচ্ছে। তার হয়ে কেউ জামীন চাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ—ফিল্ম কোম্পানী ব্যারিস্টার দাঁড় করিয়েছে। তা ছাড়া পেড্রোর ব্যাঙ্কে হাজার দশেক টাকাও আছে।"

ইনসপেক্টর দেশাই গেলেন। তাঁর পিছু পিছু আমিও বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "খাওয়া-দাওয়াটা একটু আগে আগে সেরে নেবেন, ভাস্করবাবু। তারপর ঘুমিয়ে পড়ুন। এতো বেশি উত্তেজনা আপনার পক্ষে ভাল নয়। শহরতলীতে আপনার যাওয়ার দরকার নেই। অবিশ্যি বেকার বসিয়ে রাখব না আপনাকে। কাজ দেব।"

"কি কাজ, এখুনি বলুন।"

"প্যারেলে যে-সব বাঙ্গালীরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করুন। পেড্রোর খবর পাবেন তাঁদের কাছ থেকে। এমন কি মীনাক্ষীর খবর পাওয়াও অসম্ভব হবে না।"

"বেশ, তাই করব। দেখুন প্রশান্ত-বাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বলুন কি কথা?"

"পেড্রোকে আপনি জামীনে খালাস দেওয়ার কথা বললেন। ওর ওপর আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনার কথাবার্তা শুনে এমন ধারণা জন্মেছে আমার যে, পেড্রোর প্রতি আপনার সহানুভূতি জন্মেছে। কিন্তু কেন? ওর আজীবনের ইতিহাসে গুণ্ডামীর তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই। টাকার জন্য পেড্রো অনায়াসেই খুন করতে পারে।"

"সে তো তদন্তসাপেক্ষ, ভাস্করবাবু।"

"মীনাক্ষীর বেলায় কি সেই যুক্তি খাটে না? অথচ, সে যেন জামীনে খালাস না পায় তার জন্য ইনসপেক্টর দেশাইকে আপনি সতর্ক থাকতে বললেন।"

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখে। মিষ্টি হাসির মধ্যে দুষ্টুমীর আভাস পেলুম আমি। তিনি বললেন, "এমন নিঃস্বার্থভাবে কোনো পুরুষ যে মেয়েদের ভালবাসতে পারে তার প্রমাণ আগে কখনো চোখে পড়েনি আমার।"

"কার কথা বলছেন মিস্টার লাহিড়ী?"

"আপনার।"

লজ্জায় মুখ আমার লাল হয়ে উঠল। আর অপেক্ষা করলুম না। মীনাক্ষীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার উদ্বেগের মাত্রা হয়তো স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই আর প্রশান্ত-বাবুর সঙ্গে আলোচনার দরকার বোধ করলুম না। তাঁর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি। মনে মনে আমি কি তবে মীনাক্ষীকে ভালবাসি?

বেলা দুটোর সময় ইনসপেক্টর দেশাই এলেন। সঙ্গে এসেছে দেশমুখ। সি-আই-ডি পুলিশের হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে—ইনফরমার। প্রশান্তবাবুর ঘরে আমিও ছিলুম। ইনসপেক্টর দেশাই বললেন, "আপনার আন্দাজ ঠিকই হয়েছে মিস্টার লাহিড়ী। প্যারেলের একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পেড্রোর বন্ধুত্ব হয়েছে—প্রায় প্রত্যেক দিনই সেখানে যাওয়া আসা করত সে। দেশমুখ খবর এনেছে।"

"কোথায় দেশমুখ?"

"বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"ডাকুন তাকে।"

ঘরে ঢুকল দেশমুখ। প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ বাড়িতে কি যুবতী স্ত্রীলোক কেউ আছেন?"

"আজ্ঞে না, সার। প্রদীপখান্না বলে এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি বিবাহিত। আপাতত স্ত্রী তাঁর কলকাতায় আছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স প্রদীপবাবুর। এখানে তিনি খান্দুভাই-এর অফিসের হিসাব-রক্ষক।"

"পেড্রোর সঙ্গে কতোদিনের আলাপ?"

"তা প্রায় এক বছর হবে।"

"প্রদীপবাবুর সঙ্গে পেড্রোর বয়সের তো অনেক ফারাক দেখছি.....যুবতী স্ত্রীলোকও কেউ নেই। তবে কেন সে এখানে প্রতিদিনই যাওয়া আসা করত? হিসাব-রক্ষকরা সাধারণত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। পেড্রোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বটা একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না, মিস্টার দেশাই?"

"এখন তো তাই মনে হচ্ছে—"জবাব দিলেন দেশাই সাহেব।

প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার, খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তদন্তের ব্যাপারে বোম্বে পুলিশের শৈথিল্য নজরে পড়েছে তাঁর। (আসামী-দের পক্ষ থেকে কেউ কি তদ্বির করছে গোপনে? খান্দুভাই-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম নয়। দশ-বিশ লাখ টাকার লোকসান তাঁর পক্ষে কিছুই না।) দুপুরবেলা খাবার টেবিলে ব'সে প্রশান্ত লাহিড়ী তবু বলেছিলেন যে, খান্দুভাই-এর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভুল খবর পাওয়া দরকার। এ'দের টাকা-পয়সার জগতটা অত্যন্ত জটিল। এখন বুঝলুম, দেশমুখের খবরটা তাঁর কাজে লাগবে। প্রদীপবাবুর কাছ থেকে দু' একটা তথ্য খুঁজে বার করতে পারবেন। বলা যায় না, খুনের রহস্যটা আবিষ্কার করার পথ হয়তো প্রদীপবাবুর বাড়ি থেকে শুরু হয়েছে। পেড্রোর গুপ্তহাত এখানেই মিলিত হয়েছে খুনীর হাতের সঙ্গে। তিন লাখ টাকার দেনাপাওনা মিটে গিয়েছে প্রদীপ রাহার মারফৎ।

তামাক খাওয়া শেষ হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ীর। গড়গড়ার নলটা খুলে নিয়ে গুটিয়ে রাখলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "চলুন ভাস্করবাবু, আপনিও চলুন। দেশমুখের আসবার দরকার নেই। সে বরং প্রদীপ রাহার ওপর দৃষ্টি রাখুক।"

পথে বেরিয়ে প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার প্যাটেল বিয়ে করেননি কেন?"

টায়ারে ব'সে ইনসপেক্টর দেশাই জবাব দিলেন, "তাই তো, সে সম্বন্ধে কোনো তদন্ত করা হয়নি!"

"আর তো বিয়ের বয়সও নেই—" পকেট থেকে একটা নোট বই বার করে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রশান্তবাবু বললেন, "আটচল্লিশ বছর বয়স। টাকা রোজগার করেন প্রচুর.....আচ্ছা, লক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে তাঁর কোনো প্রেমের কাহিনী জড়িয়ে নেই তো?"

"কি রকম?" প্রশ্ন করলেন ইনসপেক্টর দেশাই।

"এই ধরুন, যৌবনে ডাক্তার প্যাটেল লক্ষ্মীদেবীকে ভালবাসতেন। কিন্তু বিয়ে হ'ল না। লক্ষ্মীদেবীর বাবা কাপড়ের কলের মালিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। বিধবা হওয়ার পর ডাক্তার

প্যাটেলের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কটা আবার তিনি.....এমন কি অবৈধ যোগাযোগ থাকাও অসম্ভব নয়। বাবুরাও অর্বিন্দা এই সম্বন্ধে খবর রাখবে তা হলে। তাকে আপনারা কেন যে গ্রেপ্তার করেননি, বুঝতে পারলাম না।"

"আমরা বারো ঘণ্টা এক নাগাড়ে জেরা করেছি ওকে, পেটে কিছু থাকলে বলে ফেলত। আমাদের বড়সাহেব মিস্টার ড্রাইভার নিজেও ছিলেন জেরার সময়। তাঁর হুকুম মতোই বাবু রাওকে ছেড়ে দিতে হ'ল।"

"বড়সাহেবের নিশ্চয়ই অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।" কথা শেষ ক'রে সিগারেট ধরালেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি পৌঁছবার এক মাইল আগেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলুম আমরা। ফেরবার মুখে চলন্ত ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ব'লে আশ্বাস দিলেন ইনসপেক্টর দেশাই। রাস্তাটা নির্জন নয়। গাড়ি যাওয়া আসা করছে। পা-এ হেঁটেও লোক চলেছে। সাইকেলের সংখ্যাও অনেক। এখান থেকে খানিকটা দূরেই একটা মস্ত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়েল নগর গড়ে উঠছে। শ্রমিকদের ব্যারাকগুলো দেখা যায়। বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী আশ-পাশটা ভাল ক'রে দেখলেন।

বাড়িটার নাম লক্ষ্মী বিল্ডিংস। বেশ বড় বাড়ি। গাছপালা আছে অনেক। যত্নের অভাবে জঙ্গলাবৃত মনে হয়। ফুলের বাগান নজরে পড়ল না। বোধ হয় ফুলের শখ ছিল না লক্ষ্মীদেবীর। ইনসপেক্টর দেশাই বললেন যে, মাস দুই-এর জন্য লক্ষ্মীদেবী প্রতি বছরই শিমলা গিয়ে থাকতেন। শরীর খারাপ না হ'য়ে পড়লে ডাক্তার প্যাটেলকে সেখানে ডেকে পাঠাতেন না তিনি।

বাগানের জন্য মালী কেউ নেই। বাইরের ফটকে দারওয়ান বসত না কখনো। একমাত্র বাবু রাও ছাড়া অন্য কাউকে কাছে রাখেননি লক্ষ্মীদেবী। তবে হ্যাঁ, জমাদার একজন আছে। সকালবেলা সে আসে। ঝাড়পোঁছ ক'রে দিয়ে সকালবেলায়ই চ'লে যায়। মাস ছয় আগে পর্যন্ত রান্নার লোক একজন ছিল। মহারাষ্ট্রীয়। দু' মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।

বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। চারদিকে বেশ উঁচু দেয়াল। তবে লাফিয়ে পার হ'য়ে যাওয়া যায়। বাড়ির পেছন দিকে এসে প্রশান্তবাবু প্রাচীরের ওপর উঠে পড়লেন। বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলেন, ঐ দিকেও একটা রাস্তা আছে। বড় সুন্দর রাস্তাটি। আঁকাবাঁকা নয়, লম্বা।

প্রাচীর থেকে নেমে প'ড়ে প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাথরুমটা কোন্ দিকে? যেখান দিয়ে খুনীটা ঢুকেছিল ব'লে আপনাদের বিশ্বাস?"

বাড়িটার পূব দিকে আমরা এলুম। একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতালার বাথরুম পর্যন্ত। জমাদারদের ওঠা নামার পথ এটা। প্রশান্তবাবু উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। জানালা ঠিক নয়। ছোট দরজা একটা। হাত দিয়ে ধাক্কা মারলেন তিনি। খুলল না। ভেতর থেকে নিশ্চয়ই খিল লাগানো আছে। নিচে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলুম, লাহিড়ী মশাই মিনিট দুই ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন।

নিচে নেমে এসে বললেন, "চলুন, এবার ভেতরে ঢোকা যাক। বাবু রাও কোথায়? তাকে ডাকুন। দাঁড়ান, আগে চলুন ওর শোবার ঘরটা দেখে আসি।"

বাবু রাও তার নিজের ঘরেই ছিল। মনে হ'ল একটু আগেই সে ঘুম থেকে উঠেছে। যতটা বুড়ো মনে হয় সেই অনুপাতে তার বয়স কম। ইনসপেক্টর দেশাই বলেছিলেন, ষাট বছর বয়স। আমাদের কিন্তু দেখে মনে হ'ল সত্তরের কম নয়। বাবু রাও-এর মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। ছায়াটা সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তার, শোকের নয়। লোকটিকে দেখে আমার ভাল লাগল না। অর্বিন্দা প্রশান্ত লাহিড়ীর কথা শুনে শুনে আমি তো চারজন আসামীকেই খুনী ব'লে ভেবে রেখেছি। যখন যার কথা বলেন তাকেই খুনী ব'লে ধারণাটা জন্মায়।

বাবু রাও-এর বিছানার গায়ে একটা ইলেকট্রিক বালব লাগানো রয়েছে। নিচু হ'য়ে প্রশান্তবাবু পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, ইলেকট্রিকের তার খাটের গা দিয়ে উঠে এসেছে ওপরে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "একেবারে মাথার ওপরে একটা বালব লাগিয়েছ কেন?"

"আমি লাগাইনি, হুজুর। মিস্ত্রী লাগিয়েছে।"

"তা আমি জানি—" একটু যেন থমকে উঠলেন প্রশান্ত লাহিড়ী, "এটার উদ্দেশ্য কি?"

"এটা কলিং-বেল, হুজুর। মাতাজীর খাটের গায়ে সুইচ আছে। দরকার পড়লে তিনি আমায় বিছানায় শুয়েই ডাকতে পারতেন। আমার ঘুম একটু বেশি, তাই কানের কাছে ঘণ্টা বাজার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।"

"যে-রাত্রে তাঁকে খুন করা হয় সেই রাত্রে তিনি তোমায় ডাকেননি?"

"না, হুজুর।"

"কখন টের পেলে যে তাঁকে খুন করা হয়েছে।"

"বেলা আট-টায়। অতো বেলা পর্যন্ত তিনি ঘুমতেন না। দরজায় ধাক্কা দিলুম অনেকবার—জমাদারকেও বললুম ধাক্কা মারতে। কিন্তু মাতাজীর সাড়া পাওয়া গেল না। টেলিফোন ক'রে পুলিশকে খবর দিতে গিয়ে দেখি, ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

"খারাপ হ'য়ে গিয়েছে?" ভুরু কোঁচকালেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"আজ্ঞে। টেলিফোনের তার কেটে রেখে গিয়েছিল খুনী। তারপর জমাদারকে বসতে ব'লে আমি খবর দিতে গেলুম থানায়।"

"মাতাজীর ঘরে যে ছিন লক্ষ টাকা ছিল তা কি তুমি জানতে?"

"আজ্ঞে না, হুজুর।"

"মিস্টার দেশাই, চলুন এবার লক্ষ্মীদেবীর ঘরটা দেখে আসি।"

আমাদের আগে দোতালায় উঠে গেল বাবু রাও। জানালা-দরজাগুলো খুলে দিল সে। প্রথমে ড্রইং-রুমে ঢুকলুম আমরা। বাবু রাও বলল, খুনের দিন বিকেলবেলা খান্দুভাই আর রূপকুমারী এখানে ব'সে গল্প করে গিয়েছেন। ডাক্তারসাহেব এসেছিলেন সকালবেলা। প্রায় প্রত্যেক দিনই আসতেন তিনি।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "সন্ধেবেলা কখনো আসতেন না ডাক্তার প্যাটেল?"

"আসতেন?"

"কতক্ষণ পর্যন্ত থাকতেন?"

"আটটা নটা—"

"তার বেশি নয়?"

বাবু রাও মাথা নিচু ক'রে ফেলল। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। বোধ হয় অবৈধ প্রেমের পথটা আবিষ্কার করবেন ব'লে

হিলি। মনে মনে একটা প্রেমের সম্পর্ক নিশ্চয়ই গ'ড়ে তুলেছেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। ভেবেচিন্তে বাবু রাও বলল, "হ্যাঁ, কখনো সখনো একটু বেশি রাত হ'য়ে যেত। বিশেষ ক'রে মাতাজী যেদিন তাঁকে খাবার নেমন্তন্ন করতেন।"

"রাত কাটাননি কখনো?"

মনে পড়ছে না।"

"মনে করবার চেষ্টা করো। কাল আবার আসব আমরা। ঘটনার দিন রূপকুমারী কতোক্ষণ ছিল এখানে?"

মাথায় চুলে হাত বুলতে লাগল বাবুরাও। মাত্র পাঁচদিন আগের ঘটনা। তবুও যেন স্মরণ করতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

"রূপকুমারী রাত আট-টা পর্যন্ত ছিলেন। কিন্তু খান্দুভাই চলে গিয়ে-ছিলেন সন্ধ্যের আগে।"

"খান্দুভাই-এর কথা তোমায় জিজ্ঞেস করিনি।" প্রশান্ত লাহিড়ীর গলার স্বর গম্ভীর হ'য়ে গেল। দু' এক মিনিট বিরতির পর আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "রূপকুমারী ফিরে গেল কার সঙ্গে?"

"পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে।"

ইনসপেক্টর দেশাই এবার সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কই, তোমার প্রথম জবানবন্দিতে এই কথাটার উল্লেখ নেই তো?"

"ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—কি বলতে কি বলেছি মনে পড়ছে না। আমি তো লিখতে পড়তে জানি না.....কি লিখছেন আপনারা কি ক'রে বলি....."

বিস্মিত বোধ করলেন ইনসপেক্টর দেশাই। প্রথম দিন খুবই সরল প্রকৃতির ব'লে মনে হয়েছিল। কথার মধ্যে বিন্দু-মাত্র মারপ্যাঁচ ছিল না। আজ কিন্তু উল্টো ধারণা জন্মাল। বাবু রাওকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইনসপেক্টর দেশাই বললেন, "তুমি সেখানে বলেছ, খান্দু-ভাই-এর সঙ্গে রূপকুমারী সন্ধ্যের আগেই চ'লে গিয়েছিল।"

"বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কালকের শোনা-কথা আজ মনে থাকে না।"

"বটে?" লাফিয়ে উঠলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। "কোন্‌টা তা হ'লে সত্যি? ঠিক ক'রে বলো—তোমার কোনো ভয় নেই।"

"পাদ্রী সাহেবের সঙ্গেই গিয়ে-ছিলেন রূপকুমারী।" জবাব দিতে দ্বিধা করল না বাবু রাও।

ইনসপেক্টর দেশাই বললেন যে, পুরো জবানবন্দির মধ্যে লোকটা এক-বারও পেড্রোর নাম উল্লেখ করেনি। ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পেড্রো এখানে এসেছিল তা তুমি আমায় বলোনি কেন, বাবু রাও?"

"এখানে তিনি আসেননি, রাস্তা থেকে গাড়িতে বসে হর্ণ বাজিয়েছিলেন। রূপকুমারী মাতাজীকে বললেন যে, পেড্রো এসেছে। আমি তখন বসবার ঘরেই ছিলাম। মাতাজীকে পান দোক্তা দিচ্ছিলাম।"

লোকটিকে আর সরল প্রকৃতির বলে মনে হল না আমাদের। ড্রইং-রুম থেকে এবার আমরা শোবার ঘরে এলুম। লাগালাগি ঘর নয়। মাঝখানে একটা করিডোর আছে। করিডোরের একধারে টেলিফোনটা নজরে পড়ল আমাদের। খুনের রাত্রে টেলিফোনের তারটা কাটা ছিল। এখন সেটা মেরামত করা হয়েছে।

শোবার ঘরটির প্রতিটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। স্নান ঘরেও ঢুকলেন তিনি। পেছন দিকের ছোট দরজাটা খুললেন। লোহার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আবার তিনি বাগানের চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগলেন। ডাক্তার যেমন মনোযোগ দিয়ে রোগীর রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, প্রশান্তবাবুও তেমনি খুনের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘরের ধূলিকণাটি পর্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন।

শোবার ঘরে ফিরে এসে পকেট থেকে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস বার করলেন তিনি। বিবর্ধক কাচ। এই কাচের মধ্য দিয়ে দৃষ্টব্য পদার্থকে বড় দেখায়। হঠাৎ তিনি পূব দিকের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা দেখলুম, দেয়ালের গায়ে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। কাদার মতো রং—কালচে বললেই ঠিক বলা হবে। চোখে কাচ লাগিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী বেশ খানিকক্ষণ দাগটা পরীক্ষা

চোখে কাচ লাগিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী বেশ খানিকক্ষণ দাগটা পরীক্ষা করলেন

করলেন। ইনসপেক্টর দেশাইকে ডেকে বললেন, "বিছানা থেকে দেয়ালটার দূরত্ব কম নয়। লক্ষ্মীদেবী বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আপনারা বলছেন, আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়নি। তা যদি সত্যি হয়, তবে এতদূর পর্যন্ত রক্ত এল কি করে? ফিনকি দিয়ে রক্ত

বেরুলেও দেয়ালের গায়ে ঠিক এই ধরণের দাগ পড়ত না। মিস্টার দেশাই, আমরা যদি আপাতত কল্পনা করে নেই যে, আততায়ীর হাতটা কোনোক্রমে দেয়ালের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল তা হ'লে কি ভুল হবে? দেয়ালের বেশ উঁচু দিকেই দাগটা রয়েছে। তা যদি হয় তবে লোকটি যে লম্বা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শুধু লম্বা নয়, আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হ'য়েছিল বলেও ধরে নিতে পারি আমরা।"

তাঁর কথা শুনে বাবু রাও চোখ নিচু করল। ত্রাসের সঞ্চার হল তার মনে। সে বেশ লম্বা মানুষ। বাবু রাও-এর দিকে ঘুরে প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "কলিং বেল যখন ছিল, তখন লক্ষ্মী-দেবী কি তোমায় ডাকেননি একবারও? সুইচটা তো দেখছি খাটের গায়ের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। হাত বাড়ালেই সুইচ।"

"আজ্ঞে না, ডাকেননি। মেইন-সুইচটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল খুনী।"

"মেইন-সুইচটা কোথায়?"

"একতলায়।"

"সেখানে সে গেল কি ক'রে?"

"ঢোকবার পথ আছে।"

"খুবই জ্বালাতনা লোক—" প্রশান্ত লাহিড়ী পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করলেন। নোট বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দেয়ালের গা থেকে রক্তের দাগটা খুঁড়তে লাগলেন। পুরো দাগটাই চেঁছে তুলে ফেললেন তিনি। তারপর মোড়কটা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, "চলুন, এবার যাওয়া যাক।"

বেরুবার মুখে প্রশান্তবাবু অন্য দিকে আর দৃষ্টি দিলেন না। মাথা নিচু ক'রে চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। আমরা তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম।

খানিকটা দূরে এগিয়ে আসবার পর এক একটা লোক এসে ইনসপেক্টর দেশাইকে স্যালুট করল। আমরা তিন-জনেই দাঁড়িয়ে গেলুম। মিস্টার দেশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর? বাবু রাও-এর সঙ্গে কেউ দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছিল কি?"

না, স্যার। তবে বাবু রাও সকালবেলা প্রত্যেক দিনই একবার বাইরে আসে। ঐ দোকান থেকে চাল ডাল কেনে—"

"প্রত্যেক দিনই চাল ডাল কেনে কেন? দোকানীর ওপর চোখ রেখো। হয়তো দোকানীটাই সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করে।"

"আজ্ঞা, স্যার।"

ফেরবার মুখে প্রশান্তবাবু বললেন, "প্রদীপ রাহার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে ভাল হতো। আজ তো রবিবার, বাড়ি থাকা সম্ভব।"

প্রদীপ রাহা বাড়িতেই ছিলেন। ইনসপেক্টর দেশাই আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি বললেন, "কাল তা হ'লে কোর্টে একবার আসছেন তো?"

"হ্যাঁ, ডাক্তার প্যাটেলকে একবার দেখতে চাই। কোর্ট থেকে বেরিয়ে আপনাকে নিয়ে একবার লেবরীটরিতে যাব।"

প্রদীপ রাহা আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। প্রশান্তবাবু নিজের কথা গোপন করলেন না। পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন তাও বললেন তিনি। লক্ষ্মীদেবীর খুনের মামলা সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছেন শুনে প্রদীপ-বাবু বললেন, "হ্যাঁ, অপরাধীকে খুঁজে বার করা খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। দেখুন চেষ্টা করে। আমাদের মালীক খান্দুভাইকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করল বুঝতে পারছি না।"

"তাঁর কাছে আপনি কতদিন ধরে চাকরি করছেন?"

"বছর দশ হ'ল। প্রকাণ্ড ধনী লোক।" শেষের কথাটা কেন অবান্তর বলে মনে হল আমাদের। আমরা চুপ করে রইলুম। প্রদীপবাবু আবার বলতে লাগলেন, "তিন লক্ষ টাকা চুরির উদ্দেশ্যে যদি লক্ষ্মীদেবীকে খুন করে থাকে তা হ'লে খান্দুভাই যে নির্দোষ তেমন কথা আমি জোর ক'রেই বলতে পারি। তা ছাড়া খান্দুভাই হচ্ছেন গিয়ে স্ফূর্তিবাজ লোক—সুন্দরী স্ত্রীলোক-দের নিয়ে মজে থাকতেই ভালবাসেন। এই ধরণের লোকেরা পৃথিবীতে আসেন মজা লুটতে, খুন করতে নয়।"

"রূপকুমারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি রকমের ছিল, মিস্টার রাহা? জিজ্ঞাসা করলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী।

"হ্যাঁ, প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলার মেয়ে তো, বত নিচেই নামুক, সহজে সে ইজ্জত হারাতে চায় না। আমার যতদূর ধারণা, রূপকুমারীকে খান্দুভাই নষ্ট করতে পারেননি।"

"এর কারণ কি? রূপকুমারীর পেছনে টাকা ঢালতে তো কার্পণ্য করেন নি খান্দুভাই। এখানে তাজমহল হোটেলে এসে ওঠে রূপকুমারী। খরচ দেন তিনি। তবে কেন রূপকুমারীকে পেলেন না খান্দুভাই?"

"ব্যাপারটা তা হ'লে আপনাদের খুলেই বলি—" জড়োসড়ো হয়ে বসলেন প্রদীপ রাহা। "গোড়া থেকেই তিনি পেড্রোকে ভয় করতেন। লোকে বলে, পেড্রো রূপকুমারীকে ভাড়া খাটাচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। টাকার দরকার নেই পেড্রোর। রূপকুমারীকে ভালবাসে সে। এমন ভালবাসার তুলনা নেই। মেয়েটা শুধু উড়তে চায়—টাকার খাঁই প্রচণ্ড। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী হতে চেয়েছিল। কিন্তু—" থেমে গেলেন প্রদীপবাবু। ভেবেচিন্তে তারপর তিনিই বলতে লাগলেন, "কপালে না থাকলে কেউ কিছু হ'তে পারে না মশাই। বেশি নাম করে ফেললে হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে আমাদের মালিক ওকে ঝুলিয়ে রাখলেন বোম্বে-কলকাতার মাঝখানে। পেড্রো গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে : এ-লাইন ছেড়ে দাও, তুমি, মীনা। চলো, মালদা ফিরে যাই। নয়তো অন্য কোথাও গিয়ে নিরিবিলিতে ব'সে ঘর-সংসার করি। মেয়েটা রেগে ওঠে। ধমকে দেয় পেড্রোকে। বলে : আর এসো না তুমি আমার কাছে। প্রাদ্রীদা, তোমায় আমি ভালবাসি না। বুঝলেন মশাই, ছেলেটা তবু যাওয়া-আসা করে। অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয় ওকে। পেড্রো তবু আঠার মতো লেগে থাকতে চায়। একদিন তো মশাই দুজনে কলড়া করতে করতে ট্যাক্সি থেকে নেমে এল। আমি তো ঘ মেরে ব'সে রইলুম এই ঘরে। পেড্রো বললে : চলো, তোমায় স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। খেঁকিয়ে উঠল রূপকুমারী : কেন যাব তাঁর কাছে? পেড্রো বলল : আমায় যখন আর ভাল-বাস না, তখন স্বামীর কাছেই তো ফিরে যাওয়া উচিত। মেয়েটা বলে : না যাব না। খান্দুভাই-এর কাছে থাকব। ফস্ করে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করে বলে ওঠে পেড্রো : এটা দেখিয়েছি খান্দুভাইকে। দরকার হয় তোমাদের দুজনকে শেষ করে দিয়ে ফাঁসিতে লটকে যাব। বুঝলেন মশাই, আমি তো থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। বললাম ওকে, 'হ্যাঁ রে পেড্রো, তুই না খৃস্টান—তুই খুন করবি? ফেলে দে ছোরা।' মিষ্টি

হেসে জবাব দেয় সে, 'এই তো আমার বাঁশুখেটে রাহাবাবু।' এই রকমই ওদের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। এমন সময় দুম ক'রে বিনা নোটিশে আকাশ থেকে বোমা ফেলে দিল খুনী। লক্ষ্মীদেবী খুন হ'য়ে গেলেন। ধরা পড়ল সবাই। আমার তো বিশ্বাস, খুনের সঙ্গে এ'রা কেউ জড়িত নেই। আমি আবার বলছি, টাকার জন্য পেড্রো কখনো কাউকে খুন করবে না।"

জিজ্ঞাসা করলুম আমি, "কেন করবে না?"

"ওর নিজের রোজগার ভাল। ক্রমশই আয় বাড়ছে।"

যুক্তিটা তাঁর মেনে না নিয়ে বললুম, "মালদা শহরের সবচেয়ে বড় গুণ্ডা ছিল সে। তিন লাখ টাকার জন্য একটা বুড়ীকে পেড্রো অনায়াসেই খুন করে ফেলতে পারে। ভদ্র বংশের একটি মেয়েকে ভাগিয়ে আনতে পারল, আর একটা সামান্য স্ত্রীলোককে খুন করতে পারবে না? অতি সাংঘাতিক গুণ্ডা—"

আমার যুক্তিও মনঃপূত হল না প্রদীপ রাহার। মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তিনি, "পৃথিবীতে আজ গুণ্ডার সংখ্যা কিছু কম নয়। প্রতিদিনই বাড়ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা গুণ্ডাই খুনী নয়। বিরূপ সামাজিক অবস্থায় পড়ে অনেকেই গুণ্ডামী করে। এই জন্য সামাজিক অবস্থাকে খানিকটা দায়ী করা চলে। যতদূর বুঝতে পেরেছি, পেড্রোর রক্তে খুনের নেশা নেই। অর্থের নেশাও প্রবল নয়।"

"কি রকম?" কৌতূহল জাগল আমার।

"প্রথম যখন পেড্রো আর মীনাক্ষী বোম্বে এল, তখন টাকার অভাব ছিল খুব। মীনাক্ষী তার গহনাগুলো বেচে ফেলবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠল। দু' এক হাজার টাকার গহনা নয় মশাই, আজকের বাজারে অন্তত পনরো হাজার তো হবেই। পেড্রো বেচতে দিল না। বললে সে, 'তোমার বাবার দেওয়া গহনা বেচতে দেব না। কুলীর কাজ ক'রে তোমায় খাওয়াব।' বুঝলেন ভাস্করবাবু, একদিন দেখি গহনার পুঁটলিটা পেড্রো নিয়ে এসেছে আমার কাছে। আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে সে, 'রাহাবাবু, এটা তোমার কাছে রেখে দাও। মীনা চাইলেও দেবে না। মন্মথবাবুর কতো কষ্টের টাকা!' সেই থেকে গহনাগুলো আমার কাছেই পড়ে রয়েছে।

মীনা অবিশ্যি কোনোদিনও চাইতে আসে নি। শুধু দিন সাতেক আগে খান্দুভাই একদিন আমায় বলেছিলেন, 'রূপকুমারীর গহনাগুলো শুনেছি আপনার কাছে আছে। কাল অফিসে আসবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।'

"নিয়ে গিয়েছিলেন কি?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"না। দু' দিন অফিস কামাই করলাম। খোঁজাখুঁজি ক'রে পেড্রোকেও ধরতে পারলাম না। তারপর তো একদিন খবরের কাগজ খুলে দেখি খান্দুভাইকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।"

"তিনি গহনাগুলো কেন চেয়েছিলেন?"

"বলতে পারি না। কোটিপতি লোক—"

"কোটিপতি লোকেরাও তো শুনেছি কখনো কখনো অল্প টাকার জন্য বিপদে পড়েন। বিশেষ ক'রে এ-লাইনের লোকদের তো হামেশাই টাকার দরকার।" প্রশান্ত লাহিড়ী কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্রদীপ রাহার দিকে। জবাব কিছু দিতে পারলেন না তিনি। উঠে পড়লেন সহসা। আমাদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "দেখুন চেষ্টা ক'রে। ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজত্বে গর্তের অভাব নেই। বাঘের সন্ধান করতে গিয়ে সাপের খোঁজ পাওয়া যায়। নমস্কার।"

অস্বস্তির হাসি ফুটে উঠল প্রদীপ রাহার মুখে।

॥ সাত ॥

পরের দিন জামীনে মুক্তি পেলেন ডাক্তার প্যাটেল, খান্দুভাই আর পেড্রো। মীনাক্ষীর জন্যও জামীনের আবেদন করেছিলেন ব্যারিস্টার ভগত। আপত্তি তুললেন সরকারী পক্ষের উকিল। আরও পনরো দিনের সময় চাইলেন এ'রা। ম্যাজিস্ট্রেট শুনানীর দিন ধার্য করলেন পনরো দিন পরে। এবং সেই সঙ্গে তিনি এ'দের সতর্ক ক'রে বলে দিলেন যে, ঐ তারিখে পুরো রিপোর্ট তাঁর কাছে পেশ করা চাই।

আমরাও গিয়েছিলাম আদালতে। দর্শকদের ভিড় হয়েছিল খুব। ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। দর্শকদের মধ্যে সবাই দেখলুম রূপকুমারীর প্রতি সহানুভূতিশীল। তাকে আসন দেওয়া হল না বলে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল এরা। বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল না। আমিও ভিড়ের মধ্যে ছিলুম। ইনসপেক্টর লাহিড়ী বসেছিলেন অন্য জায়গায়। আদালত উঠে যাওয়ার পর আমি আর তাঁকে দেখতে পাই নি।

কাঠগড়াটা দেখতে খাঁচার মতো। দু'খানা বেঞ্চ পাতা ছিল। একটাতে বসেছিল মীনাক্ষী। অন্যটায় ও'রা তিন-জন। কারো মুখেই লজ্জা ভয় কিংবা দুঃখের চিহ্ন নেই। প্রত্যেকেরই ধারণা, পুলিশ ভুল ক'রে এ'দের ধ'রে নিয়ে এসেছে। আসল খুনী নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে বাইরে।

কিন্তু পেড্রোই শুধু ভয় পেয়েছে দেখলুম। পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হ'য়ে গিয়েছে। দাড়ি কামায় নি। মাথায় চুল উসকোখুসকো। ওকে দেখবার জন্য শহরের একশ্রেণীর লোক ভিড় জমিয়েছে আদালত ঘরে। পেড্রো এদের কাছে একজন মস্তবড় হিরো। আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝলুম, পেড্রোকে এরা 'ক্যাপটেন পেড্রো' ব'লে ডাকে। সমস্তটা সময় সে মুখ নিচু ক'রে রেখেছিল। বোম্বের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার আভেরী যখন ওর হ'য়ে জামীনের আবেদন করছিলেন তখনও সে একবারের জন্যও মুখ তুলে চেয়ে দেখে নি। ও যাতে আমাকে দেখতে পায় তার জন্য বার দুই চেষ্টা করেছিলুম আমি, কিন্তু চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'ল।

মীনাক্ষী আমায় দেখেছে। বিন্দুমাত্র লজ্জা পেল ব'লে মনে হ'ল না আমার। সারা মুখে ঔদ্ধত্যের ছাপ। কেন কাঠ-গড়ায় ব'সে মীনাক্ষী বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার গৌরব বোধ করছে। গতকাল চিঠি লিখেছি পরেশবাবুকে। তিনি কৃষ্ণনগর সরকারী ইস্কুলে বদলি হ'য়ে গিয়েছেন। একটা কথাও গোপন করি নি। সে যে মালদা থেকে পেড্রোর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল তাও জানিয়েছি তাঁকে। পরেশবাবুর সন্দেহ যে অমূলক সেই কথাটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি বার বার। মীনাক্ষী কি ক'রে রূপকুমারী হ'ল তার একটা তথ্যমূলক ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেছি তাঁর কাছে।

মন্মথবাবু এতদিন নিশ্চয়ই মালদা ফিরে গিয়েছেন। গতকাল তাঁকেও চিঠি লিখেছি। পরেশবাবুর কাছে লেখা চিঠি

থানার কার্বন কপির মতো। প্রায় একই রকমের চিঠি।

ব্যারিস্টার ভগতের আবেদন নামঞ্জুর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠে পড়লেন। পাশের দরজা দিয়ে চ'লে গেলেন খাসকামরায়। মীনাক্ষীকে নিয়ে দু'জন সেপাই বেরিয়ে এল বারান্দায়। আমিও পেছনে পেছনে ছুটে গেলুম ওর। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে পারলুম না। জনতাকে রুখে রাখবার জন্য একাধিক পুলিশের লোক মোতায়েন ছিল বারান্দায়। দূরে দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম, একটা কালো রং-এর আবদ্ধ গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল রূপকুমারী।

ডাক্তার প্যাটেল চ'লে গেলেন ট্যাক্সি চেপে। খান্দুভাই-এর নিজের গাড়িটা অপেক্ষা করছিল কোর্টরুমের সামনে। বহু ধনী লোক এসেছেন তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সবাই এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছিলেন। দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল আমার, খান্দুভাই বুঝি মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন। তিনি যে জামীনে খালাস পেলেন সেকথা বুঝি ভুলে গিয়েছে সবাই।

মনে মনে রাগ হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ীর ওপর। খুনীর সঙ্গে দেখা নেই, অথচ রূপকুমারীকে ধরে রাখলেন তিনি! ডাক্তার প্যাটেল, খান্দুভাই আর পেড্রোকে জামীনে খালাস ক'রে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ব্যস্ততার মাত্রা আমার চোখে খুব বেশি ব'লে মনে হয়েছিল। তাঁর এই ব্যস্ততার মূলে হয়তো কারণ একটা আছে। কিন্তু তাই ব'লে মীনাক্ষীকে কটা দিনের জন্য ছেড়ে দিলে তদন্তের মহাভারত তাঁর অশুদ্ধ হয়ে যেত কি? ডিটেকটিভ লাহিড়ীর কি যে মনোবাঞ্ছা বুঝতে পারলুম না।

পেড্রোর পেছনে পেছনে জনতা বেরিয়ে এল। বাইরে এসে জনতা চিৎকার ক'রে উঠল, "ক্যাপটেন পেড্রো জিন্দাবাদ!" দু' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। চারজন আসামীর মধ্যে ওর কেন সবচেয়ে বেশি লজ্জা বোধ হচ্ছে তার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। প্রকৃতপক্ষে পেড্রো হচ্ছে কালকাটা সেপাই। লজ্জা-সরমের বালাই ওর থাকবার কথা নয়। অথচ লজ্জার বোঝা মাথায় নিয়ে কোর্টরুমের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। জনতার প্রীতি-সম্ভাষণে কৃতার্থ বোধ করল না একটুও।

ফিল্ম কোম্পানীর মালীক করীমভয় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন সামনে। বললেন, "আপনার গাড়ি নিশ্চয়ই গ্যারেজে বন্ধ আছে। চলুন আমার গাড়িতে। পৌঁছে দিয়ে আসি।"

জনতার মধ্যে থেকে চার পাঁচজন ট্যাক্সিওয়ালা একসঙ্গে ব'লে উঠল, "ক্যাপটেন সাহাব, মেরা ট্যাক্সিমে তশরিফ লাইয়ে—"

ভড়কে গেলাম! বলে কি, এরা সবাই পেড্রোর পা-এর ধুলো ভিক্ষা করছে! আমি আর আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। আমি যে ক্যাপটেন সাহেবকে চিনি সেটা প্রমাণ করতে না পারলে যেন ট্যাক্সিওয়ালাদের চেয়েও ছোট হ'য়ে যাচ্ছিলুম। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে চ'লে এলুম ওর সামনে। ফাইটিং ছবির হিরোর ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বললুম, "চল্, আমার হোটেলে চল্ পেড্রো।"

চমকে উঠল পেড্রো। আমার দিকে মুখ তুলে বলল, "এ কি ভাস্করদা যে! তুমি বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছে গেছ?"

"কি করি বল্—সারা দেশ জুড়ে তোরা যা কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছিস! না এসে পারলুম না। খুশী হয়েছি রে পেড্রো। তোর একটা মোটরগাড়ি আছে শুনলুম। না কিনলেও পারতিস। ট্যাক্সিওয়ালারা সবাই তোর গুণগ্রাহী—ফ্যান। বিনে ভাড়ায় তোকে ওরা ট্যাক্সিতে তুলতে পারলেও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে। এদিকে মীনাক্ষী তো দেখছি ভারত-বিখ্যাত অভিনেত্রী হ'য়ে বসেছে। জামীন পর্যন্ত পেলে না। কোথায় চললি?"

"চলো ভাস্করদা, আমার বাড়ি চলো।"

"ও, তোর একটা বাড়িও আছে দেখছি! হ্যাঁ, গাড়ি যখন আছে তখন বাড়িও একটা থাকবে। কতো টাকায় কিনেছিস রে?"

"ভাড়ার ফ্ল্যাট। তাও ভাড়া আমি দিই না, দেয় ফিল্ম কোম্পানী।

ভাস্করদা, যাবে আমার ওখানে?"

"হ্যাঁ, চল্ যাই—দেখে আসি। খুনের মোকদ্দমার আমি আবার তোর মতো জড়িয়ে না পড়ি।"

করীমভয়-এর গাড়িতে উঠে বসলুম আমরা। আশে পাশে কোথাও প্রশান্ত লাহিড়ীকে দেখতে পেলুম না। এমন কি ইনসপেক্টর জেনাই পর্যন্ত নেই। আবার আমার রাগ হ'ল প্রশান্তবাবুর ওপর। এখানকার পুলিশকেও বোধ হয় ভুল বোঝাচ্ছেন তিনি। পেড্রোর ওপর যে চোখ রাখা প্রয়োজন তা তিনি মনে মনে স্বীকার করছেন না। ছোকরাটা যে কী ভীষণ প্রকৃতির গুণ্ডা তা কি ইনসপেক্টর লাহিড়ী এখনো বুঝতে পারেন নি? কি যে তিনি করছেন একমাত্র ভগবান জানেন। কাল তো লক্ষ্মী দেবীর শোবার ঘরে গিয়ে দেয়াল চেঁছে খানিকটা আস্তর নিয়ে এলেন। সারা ঘরে আরও কতো জায়গায় বাসি রক্তের দাগ ছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি দেয়ালটা চাঁছতে গেলেন কেন? প্রশান্ত লাহিড়ী সি-আই-ডি, কিন্তু বাঙালী। হয়তো নিজের মনে মনে সুন্দর একটা গল্প তৈরি করছেন। শেষ পর্যন্ত গল্পটা হয়তো সুন্দরই হবে, কিন্তু সত্যিকার খুনীটা ধরা পড়বে না। নীরবে, নিভৃতে তিন লাখ টাকা ভোগ ক'রে যাবে সে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে যাবেন প্রশান্ত লাহিড়ী। চাকরির উন্নতিও হবে তাঁর। মীনাক্ষী জেল খাটবে। কালক্রমে ক্যাপটেন পেড্রো আরও বড় হবে—জেনারেল পেড্রো সেজে ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে সদর্পে হেঁটে বেড়াবে সে। প্রশান্ত লাহিড়ীর তদন্তের নমুনা দেখে নিরাশ হ'য়ে পড়লুম আমি। আমি জানতুম, মনে অশান্তি নিয়ে তিনি খুনীর সন্ধান করতে বোম্বে এসেছেন। আসবার আগের দিন ছোট মেয়েটা তাঁর অসুখে পড়ল। একশো দু' ডিগ্রী জ্বর দেখে এসেছেন। বোধ হয় সেই কারণে চিন্তাধারা তাঁর জট পাকিয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মী দেবীর খুনের ব্যাপারে যে পেড্রোর হাত আছে সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু যাদুরাও লোকটাও তো নির্ভরযোগ্য নয়। গতকাল সে একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। খুনের দিন পেড্রো এসে রূপকুমারীকে লক্ষ্মী দেবীর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে বিবৃতি দিল! সেদিন পেড্রো যে বোম্বে ছিল না তার সাক্ষী তো আমরাই। অবিশ্যি যাদু রাও বলেনি যে, পেড্রোকে সে দেখেছে। গাড়িতে ব'সে হর্ণ বাজিয়েছিল। পেড্রোর গাড়ির হর্ণ-টা ওর চেনা থাকাই উচিত। এখন তা হ'লে প্রশ্ন উঠছে: পেড্রোর গাড়িটা কে নিয়ে এসেছিল লক্ষ্মী দেবীর বাড়ির সামনে? এর জবাব একমাত্র রূপকুমারীই দিতে পারে। পেড্রো বোকা লোক নয়। নিজে হাতে সে খুন করবে না। হয়তো অন্য কাউকে খুন করবার জন্য নিয়োগ করেছিল পেড্রো। ঐ দিন

কলকাতা থাকার অর্থই হচ্ছে অ্যালিবাই প্রমাণ করা।

করীমভয়-এর গাড়িটা এসে পৌঁছল একটা অতি সুন্দর রাস্তায়। বড়লোকদের পাড়া ব'লে নিঃসন্দেহ হলুম আমি। এটাই হচ্ছে বোম্বের বিখ্যাত মালাবার হিলস্। কোটিপতিদের বাড়িঘর সব এইখানে। পেড্রোর ফ্ল্যাট কি তবে এই মালাবার হিলস্-এ? করীমভয়-কে প্রশ্নটা করলুম আমি। তিনি বললেন যে, পেড্রো সাহেবের জন্য অতি কষ্টে এখানে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় ক'রে দিতে হয়েছে। বিস্ময়ের চাপে বিমূঢ়ের মতো নির্বাক হ'য়ে গেলুম আমি! পেড্রো থাকে মালাবার হিলস্-এ। মালদা শহরে তো ওর মাথার ওপর ছাদ ছিল না। অন্য লোকের রকে শুয়ে ঘুমত। নিজের বাড়ি ব'লে কোনো ঠিকানা ছিল না। ওর নিজের মুখেই শোনা গল্প। পেড্রোর এক মেশোমশাই ছিলেন চন্দ্রধরপুরে। তাঁর নাম ছিল রবার্ট পুরকায়েস্থ। ট্রেণের ইঞ্জিন চালক ছিলেন। পেড্রোকে না কি মাঝে মাঝে পোস্টকার্ড লিখতেন। ঠিকানা দিতেন : কেয়ার অব ভুবন চ্যাটার্জির রোয়াক। মালদা শহরের নামী লোক ছিলেন ভুবনবাবু। তাঁর বাড়ির ফটকের বাইরে দু' দিকে দুটো মঞ্চের মতো রোয়াক ছিল। দিনের বেলা শহরের ছেলেরা ওখানে ব'সে আড্ডা মারত। আড্ডার সর্দার ছিল পেড্রো। পিওনদের মধ্যে অনেকেই ছিল ওর বন্ধু। অতএব রোয়াকের ঠিকানায় লেখা পোস্টকার্ড পেড্রোর হাতে পৌঁছে যেত যথাসময়ে।

গাড়িবারান্দার তলায় এসে মোটরটা থেমে গেল। বিমূঢ়ের মতো গদির গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে আছি দেখে পেড্রো বলল, "নেমে এসো, ভাস্করদা। এই বাড়িটাতেই আমার ফ্ল্যাট।"

স্বপ্নের ঘোর ঘনতর হচ্ছে। নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। করীমভয় পেড্রোকে বললেন, "দুটো দিন বিশ্রাম করুন। বুধবার থেকে শুটিং আরম্ভ হবে। এটা কোন্ বই-এর শুটিং, আপনি জানেন তো?"

"না—ভুলে গিয়েছি।"

"বাগদাদ কা খুনী।" হাসতে হাসতে আনন্দের ঢেউ তুলে করীমভয় গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। বাগদাদের খুনী হাজত থেকে ফিরে এসেছে। বুধবার থেকে শুটিং আরম্ভ হবে। লক্ষ্মী দেবীর খুনীটিকে খুঁজে পাওয়ার আগে বইটা তিনি শেষ ক'রে ফেলতে পারবেন!

লিফ্‌টে চেপে চারতলায় উঠে এলুম আমরা। আঠারো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেল্ টিপল পেড্রো। জিজ্ঞাসা করলুম, "ঘরে আবার কাকে রেখে গিয়েছিলি রে? সুন্দরী আয়াটায়া না কি?"

"আমার রান্নার লোক একজন আছে। হোসেন। সব কাজই করে সে।" পেড্রোর গাম্ভীর্য এখনো অটুট রয়েছে।

ঘরে ঢুকে আরও বেশি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। ঘরগুলো যে শুধু চলতি নিয়মে সাজানো-গুছনো তা নয়, রুচি-সম্মতও বটে। মেয়েদের স্পর্শ আছে ব'লে মনে হ'ল আমার। মীনাক্ষী যে এখানে আসত তাতে আর সন্দেহ নেই। হয়তো সে এসে পেড্রোর ঘর-দোর সব সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পেড্রো বলল, "ভাস্করদা, এটা তোমার নিজের বাড়ি ব'লে মনে ক'রো। তুমি ব'সো। আমি চট ক'রে স্নানটা সেরে আসছি। ক'দিন তো চানটান কিছু হয় নি। হোসেন—"

"জী—" দরজার ও-পাশ থেকে বেরিয়ে এল হোসেন।

"খাবার কিছু আছে তো?"

"জী। সব তৈয়ার হ্যায়।"

"কি ক'রে জানলি আমি আসব?"

"সুবামে করীম সাব বোলে থে।"

মালদা শহরের পেড্রো গুণ্ডা স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। বিস্ময়ের ঘোর আমার কেটে গিয়েছে। স্বপ্নের ফ্ল্যাট এটা নয়। ক্যাপটেন পেড্রোর বাসস্থান এটা। ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর। একটা বসবার, একটা খাবার, অন্যটা শোবার। ইংরেজী 'এল' অক্ষরের মতো নক্‌শা। প্রথম দুটো ঘর পাশাপাশি, এক লাইনে। শোবার ঘরটার অবস্থান দ্বিতীয় লাইনে। কোণাটা পার হ'য়ে এলে ছোট্ট একটা করিডোর চোখে পড়ে। তারপর বাবুর্চি-খানা। মাঝখানে দরজা আছে। বন্ধ ক'রে দিলে বাবুর্চিখানাটা ঐ তিনখানা ঘর থেকে আলাদা হ'য়ে যায়। বন্দোবস্তটা আমার কাছে ভাল লাগল খুব। আমিও তো মফস্বলের লোক। ভাল জিনিস দেখবার সুযোগ এই তো আমার প্রথম।

ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখতে লাগলুম আমি। শোবার ঘরে দেখলুম একখানা খাট, একজনের শোয়ার মতন। দু'জনের ব্যবস্থা রাখে নি পেড্রো। ছোঁড়াটার চরিত্র ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার। এই সব ফ্ল্যাটগুলো তো সমাজ-সংসারের বাইরে। নীতি-দুর্নীতির বিতর্ক এখানে নেই। ফ্ল্যাটের অভিধানে ঐ দুটো কথার অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকার কথা নয়। অথচ পেড্রোর শয়ন-কামরায় ঢুকে মনে হ'ল, কোনো একটা পবিত্র পীঠস্থানে প্রবেশ করলুম বুঝি কোনো জিনিসেই উচ্ছৃঙ্খলতার তিলমাত্র চিহ্ন নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝক্-ঝক্ করছে সব। দেয়ালের গায়ে দুটো ফোটো রয়েছে। একটা ওর ঠাকুরদার। অন্যটা বাবা-মায়ের। বিলেতী সিনেমার লাস্য-ময়ী অভিনেত্রীদের ছবি একটাও নেই। এমন কি মীনাক্ষীর ছবিও দেখতে পেলুম না আমি।

পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে দিলুম। সমুদ্র দেখা যায় এখান থেকে। কী সুন্দর দৃশ্য! ঝির ঝির ক'রে হাওয়া ঢুকতে লাগল জানলা দিয়ে। এ হাওয়ার বুকে ধুলোকালি নেই। শয়নকামরায় ওর যদি ক্লেদের চিহ্ন থাকত তা হ'লে হাওয়ার পুণ্যে পরিষ্কার হ'য়ে যেত তা। পেড্রোর ঘরটাকে পৃথিবীর নবতম আশ্চর্য ব'লে ধারণা জন্মাল আমার। কোথায় ভুবন চাটুজ্যের রক, আর কোথায় এই মালাবার পাহাড়ের ফ্ল্যাট! আমার মনের হিসেবে ভুল বেরুতে লাগল। এমন ঘরে যে বাস করে সে কেন যাবে খুন করতে? পেড্রোর পক্ষে তিন লাখ টাকা রোজগার করাও অসম্ভব নয়।

মিনিট পনরো পর স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এল পেড্রো। জিজ্ঞাসা করলুম, "দাড়ি কামিয়ে এলি না কেন?"

"ওটা এখন রাখব ভাস্করদা।"

"কেন রে?"

"ওটা শোকের চিহ্ন। যতদিন না লক্ষ্মী দেবীর খুনীটা ধরা পড়ে ততদিন আমি আর দাড়ি কামাব না।"

"তার মানে, তুই বলতে চাস, খুনের ব্যাপারে তোর হাত একেবারে সাফ?"

"হ্যাঁ।"

"পরের বউকে ভাগিয়ে আনতে পারলি, আর একটা বিধবা স্ত্রীলোককে খুন করতে পারবি না কেন?"

"পরের বউকে আমি ভাগিয়ে আনি নি। পরের বউটি ভাগিয়ে এনেছে আমায়। ভাস্করদা চলো, খাবার টেবিলে ব'সে গল্প করি।"

"ও, হ্যাঁ চল্—আজকাল তো তুই টেবিলে ব'সে ভাত খাস—"

"তোমাদের কাণ্ড দেখে ভাবছি, মালদা শহরে ফিরে যাব আবার। ভুবন চাটুজ্যের হুকে শুয়ে হুমেব। ভাত খাব পাইস-হোটেলের কলাপাতায়।"

"কেন, কেন একথা বলছিস?"

"আমার উন্নতি তোমরা কেউ সহ্য করতে পারছ না, ভাস্করদা।"

খাবার টেবিলে এসে বসলুম আমরা। যে-হোটেলে উঠেছিলুম আমরা তার চেয়ে ব্যবস্থা অনেক ভাল। চেয়ারে বসলেই খিদে বেড়ে যায়। খাওয়ার প্রতি একটা অদ্ভুত ধরনের সম্ভ্রম জন্মায়। মালদা শহরে আমরা তো রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে খেতে বসি। হাপুস-হুপুস ক'রে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে উঠে যেতে পারলে যেন বেঁচে যাই। সেখানে খাওয়াটা হচ্ছে কর্তব্যের বোঝা—এখানে আনন্দ।

পেদ্রো বলল, "তুমিও কিছু খাও, ভাস্করদা।"

"না রে। হোটেল থেকে আমি খেয়ে বেরিয়েছি।"

"সে তো সকালবেলা। হজম হ'য়ে গিয়েছে। এখন ক'টা বেজেছে জানো? দুটো। সকালে আমি সাধারণত ভাত খাই না। ভাত খেলে ঘুম পায়। স্টুডিওতে গিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে না।

হোসেন—" হাঁক দিল পেদ্রো।

"জী—" আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল হোসেন।

"সাহেবও খাবেন।"

পেদ্রোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও খেতে লাগলুম। মাছ, মাংস আর সবজী। ভাত নেই। পাউরুটি আর পরোটা ছিল টেবিলে। চমৎকার রান্না করে হোসেন। মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিলুম। হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি খাওয়া শেষ ক'রে পেদ্রো সিগারেট ধরালো। জিজ্ঞাসা করলুম, "ওকি রে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল? অতো কম খেলে বাঁচবি কেমন ক'রে? তা ছাড়া তুই হাঙ্গিস গিয়ে কিন্ধ-জগতের ক্যাপ-টেন পেদ্রো। স্বাস্থ্যই হচ্ছে তোর মূলধন। খা—মাংসটুকু খেয়ে নে।"

"না ভাস্করদা, আর খাব না আমি।" একটু হেসে পেদ্রোই আবার বলল, "বেশি খেলে তুমি হয়তো বলবে, এতো-দিন খেতে পাস নি কিনা, তাই রাক্ষসের মতো খাচ্ছিস এখন। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি তো জানো, ভাস্করদা, বাবার মৃত্যুর পর বহুদিন পেট ভ'রে খেতে পাই নি। খিদে বাড়ে ব'লে ব্যায়ামচর্চাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। কী সাংঘাতিক দিন গিয়েছে আমার! লেখাপড়া শিখতে পারলাম না, তাও তো টাকার অভাবের জন্যই। মালদায় ধনী-লোকের সংখ্যা তো কম নয়—এমন কি ভুবনবাবুর কাছে গিয়েছিলাম টাকার সাহায্য চাইতে। ক্লাস সেভেনে পড়ছি তখন। ইস্কুলের মাইনে বাকী পড়েছে। ভুবনবাবু বললেন, 'তুই তো খৃস্টীয়ান, তোর নিজের সমাজের কাছে হাত পাত গে যা।' ভাস্করদা, জীবনে আমি দু'বার কেঁদেছি। একবার যখন ক্লাস সেভেন থেকে বই আর খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম—অন্যবার, যেদিন ব্যায়ামচর্চা ছেড়ে দিলাম। সে কি কান্না আমার। অতো বড় একটা জোয়ান ছেলে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে দেখে পাইস হোটেলের মালীক গদাই শিকদার হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন! হাসি থাম-বার পর বললেন, 'লেকাপড়ার মুখে ঝেঁটা! কাল থেকে এখানে বাসন-কোসন ঘষে দিস, দু' বেলা পেট ভ'রে খেতে দেব।' তাই করতে লাগলাম, ভাস্করদা। কিন্তু দুপুরবেলা খাওয়ার সময় একদিন বললেন, 'করছিস কি পাদ্রী? মাছ খাচ্ছিস কেন? তিনটের লগ্নে যদি অন্নের এসে যায়?' ঝপ ক'রে সত্যিসত্যি থালার ওপর থেকে মাছের টুকরোটা তুলে নিয়ে গেলেন গদাই শিকদার! বাসন মাজার কাজও ছেড়ে দিতে হ'ল। মাঝখানের ইতিহাসটুকু তো তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ। যেটুকু তুমি দেখ নি সেটুকু বলছি এখন। চলো বসবার ঘরে গিয়ে বসি। টেবিলটা সাফ ক'রে ফেলুক হোসেন। এক পেয়ালা কফি খাবে, ভাস্করদা?"

"কফি? সে কি জিনিস রে? কোনো দিন তো খাই নি। নেশা-টেশা হবে না তো?"

"হ'লই বা নেশা, পুরুষমানুষ একটু নেশা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। হোসেন, কফি নিয়ে আয়।"

বসবার ঘরে এসে বসলুম আমরা। পশ্চিমদিকের জানলাটা খুলে দিল পেদ্রো। এখান থেকেও সমুদ্রের জল দেখা যায়। পেদ্রোর প্রতি ঈর্ষায় আমি জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলুম। কী সুখেই না গুণ্ডাটা বাস করছে মালাবার পাহাড়ে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে পেদ্রো বলল, এই সব আসবাবপত্র আমার নয়। করীম সাহেব দিয়েছেন। গোড়া থেকেই তিনি আমার সাহায্য করছেন। তাঁর দয়াতেই রুজি-রোজগার হচ্ছে আমার। প্রথম ছবিটায় পুরো টাকাই লোকসান দিয়েছিলেন। তবু তিনি নিরাশ হন নি। এখন অবিশ্যি বহু টাকা লাভ করছেন। নেমক-হারামী করি নি। অন্য কোম্পানী বেশি টাকা দিতে চায়। যাই নি তাদের কাছে। যাক। একদিন হঠাৎ মীনাক্ষীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল আমার। মেয়েটার এমন চেহারা যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়লাম। কাছে যেতুম না ওর, যদি না সে ডেকে পাঠায়।"

"তোকে ডাকতে যাবে কেন মীনাক্ষী?" প্রতিবাদ ক'রে উঠলাম আমি।

"মীনাক্ষীও আমায় ভালবাসত কি না, তাই।"

"গাঁজা! মায়ের কাছে মাসীর খবর বলতে আসিস নে, পেদ্রো। ভাবছিস, আমি বুঝি মায়োয়াড়ীদের গদিতে ব'সে ওদের হিসেব দেখতুম শুধু? মীনার ওপর আমি সর্বক্ষণই চোখ রাখতুম। কই কোনোদিন তো দু'জনকে তোদের এক-সঙ্গে দেখি নি?"

"সে তোমার দোষ, ভাস্করদা। মীনাক্ষীর বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়ে-ছিলে তুমি। মীনার প্রতি যে তুমি আকৃষ্ট তা সে টের পেয়েছিল। তোমার নজর এড়াবার জন্য কতো দিন সে আমায় নিয়ে গিয়েছে তোমারই বাড়ির পেছন দিকে—আমবাগানটায়। মীনা বলত, 'এখানে ভাস্করদার দৃষ্টি পৌঁছবে না।' তুমি যে ওকে তোমার বাড়ি যেতে বলে-ছিলে তাও আমি জানি।"

পেদ্রোর কাছে খুবই ছোট হ'য়ে গেলুম। হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে নয়। মীনাক্ষী না বললে এই [illegible] পেদ্রো কিছুতেই জানতে পারতো না। ধরা পড়লুম বটে, কিন্তু [illegible] আমার বলবার [illegible] সহানুভূতি প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা হ'ল। মীনাক্ষীকে দেখেছি অনেকবার, কথাও বলেছি ওর সঙ্গে দু'চার পর ঘণ্টা। কিন্তু ওর চাতুর্য [illegible] সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। আসল কথা, মীনাক্ষীর চরিত্রের কিংবা মনের খবর আমি রাখতুম না। শুধু জানতুম, অভিনেত্রী হ'তে চায় সে।

বিলেতী সিগারেটের টিন বার ক'রে আমার দিকে এগিয়ে ধরল পেদ্রো।

স্মৃতি মন্থনে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অন্যমনস্ক। সিগারেটের টিনটা আমার নাকের ডগা পর্যন্ত তুলে ধরল সে। বললুম, "বড্ড বেশি চিন্তা করছিস। তারপর কি হল বল।"

"বুদ্ধির খেলায় আমিও হেরে গেলাম, ভাস্করদা। মীনাক্ষীর সংস্পর্শে এসে আমার মন থেকে অসৎ বুদ্ধি সব ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। আমি যে লেখাপড়া শিখি নি তার জন্য অনুতাপের আর অন্ত রইল না। পুরনো, ছেঁড়া ক্লাস সেভেনের বইগুলো খুঁজে বার করলাম একদিন। তোমারই বাগানে ব'সে বললাম ওকে, 'আমি আবার লেখাপড়া করতে চাই। তোমার যোগ্য হ'তে চাই, মীনা।' আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল সে, 'বি-এ, এম-এ পাশ লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। পাদ্রীদা, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তোমার মতো জোয়ান পুরুষ তো মালদা শহরে দ্বিতীয় কেউ নেই। তুমি যখন আমার এক হাত দিয়ে হাল্কা বেলুনের মতো শূন্যে তুলে ফেল তখন আমার মনে হয়, তোমার মতো যোগ্য পাত্র এই শহরে আর কে আছে? বিয়ে করা কিসের জন্য, পাদ্রীদা? তোমাদের ঐ এম-এ পাশ প্যাকাটি বাবুকে আমি দেখেছি। যেমন রোগা, তেমন বেঁটে। একটু অপেক্ষা করো বাবাকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আমার অমতে তিনি এম-এ পাশ পরেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করছেন। ফুঃ! আমার ধারণা ছিল, বিয়ের পর মীনাক্ষীর মনের খেদ যাবে মিটে। আমি জানতাম না, ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য মনে মনে জ্বলে-পুড়ে মরছে সে। এই ব্যাপারটা আমার কাছে পুরোপুরি গোপন করে গিয়েছিল। তার বিয়ের তিন দিন পর, বাবার বাড়ি যাচ্ছি ব'লে বেরিয়ে এল মীনা। তোমারই বাগানে ব'সে অপেক্ষা করছিলাম আমি। এসেই বললে, 'কলকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত করো।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? পরেশবাবু তো খুব ভাল লোক।' নাকটা উঁচু ক'রে ব'লে উঠল সে, 'আরে রাম, রাম! বিছানায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে পড়ে। পাদ্রীদা, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিন দিন তো চেষ্টা ক'রে দেখলাম।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হ'লে বিয়ে করতে গেলে কেন?' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মীনাক্ষী। বললে, 'মালদা শহর থেকে তুমি এখন সরে পড়ো। তুমি যে এখানে নেই তা তো পুলিশ জানেই। নদীর ওপারে তুমি অপেক্ষা করবে, মঙ্গলবার সকালে আমি গিয়ে পৌঁছব। বুঝলে?' বললাম, 'না, আমি তোমায় ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। মাপ করো।' ধমকে উঠল মীনা, 'অশিক্ষিত খৃস্টীয়ান' প্রেম করবার সময় সাহসের তো অভাব হয় নি?' তবু বললাম আমি, 'গালাগাল দাও আপত্তি করব না। কিন্তু পরের বউকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।' ভাস্করদা, আমার গালে একটা দড়াম ক'রে চড় বসিয়ে দিয়ে বলল মীনাক্ষী, 'গুণ্ডা না আরশুলা! চলো, আমিই তোমায় ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কাওয়ার্ড! ছোট শহরে সাহস দেখিয়ে চ্যাঙড়াদের কাছে 'হিরো' সাজতে পারো ,আর আমার মতো একটি রূপকুমারীর জন্য জীবন দিতে পারো না?' রাজী হ'য়ে গেলাম। ও যে ফিল্মে অভিনয় করবে ব'লে এরই মধ্যে নাম পাল্টে ফেলেছে তাও আমার জানা ছিল না। কলকাতা চলে এলাম আমরা।"

অনেকক্ষণ আগেই কফি দিয়ে গিয়েছিল হোসেন। পেয়ালাটা মুখ পর্যন্ত তুলে আবার নামিয়ে রেখেছিলুম। গন্ধটা সহ্য করতে পারি নি। এখন আবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি, কফিটা ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে। পেড্রো বলল, "থাক তোমার কফি খাওয়ার দরকার নেই। হোসেনকে চা আনতে বলছি।"

চা আনবার হুকুম দিয়ে পেড্রো আবার গল্প বলতে শুরু করল, "কলকাতা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে গোটা তিন ঠিকানা বার করল মীনাক্ষী। চিত্র পরিচালকদের নামও লেখা ছিল কাগজটায়। প্রত্যেক দিনই তাদের কাছে নিয়ে যেতে লাগলাম ওকে। প্রায় দিনই আমাকে অফিসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যেত। কি যে কথাবার্তা হচ্ছে জানতে পারতাম না। কয়েকদিন পর আমি বুঝতে পারলাম, ফিল্মে অভিনয় করবার উদ্দেশ্যেই পালিয়ে এসেছে সে। ভালবাসার কাহিনীটা মিথ্যে। আমাকে সে বডি গার্ড হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ফিল্ম-কোম্পানীর অফিসে যাতায়াত করতে করতে খান্দুভাই-এর সঙ্গে পরিচয় হয় ওর। একদিন সে ফিরে এসে বলে, 'বোম্বে যাচ্ছি নাচ শিখতে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি করব?' সুটকেস কাপড়-চোপড় গুছতে গুছতে বললে সে, 'তুমিও চলো। খান্দুভাই-এর ওপর চোখ রাখবে। লোকটা মজেছে। কোটিপতি লোক। কালকের প্লেনে রওনা হবো। এই নাও টাকা। তুমিও সেই প্লেনের টিকিট কাটবে।' হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বার করল মীনাক্ষী। চলাফেরা করছে এবং কথা বলছে সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে। আমি তাল রাখতে পারছি না ওর সঙ্গে। মরীয়া হ'য়ে ব'লে ফেললাম, 'বোম্বে যেতে পারব না।' মুখ ভেংচে প্রশ্ন করল, 'কেন, কি করবেন আপনি?' বললাম, মালদা ফিরে যাব। রূপালী সিনেমার গেট-কিপারী করব।' হাত তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিয়ে মীনাক্ষী বলল, 'ছিলে বাপ্তী কিংবা মুসাফরাশ—হয়েছে খৃস্টীয়ান। বুদ্ধি এখনো পাকে নি। বোম্বে গেলে দেখবে বরাত খুলে যাবে। এখানকার হোটেলের পয়সা সব আজ রাত্রেই মিটিয়ে দিয়ো। ওতে সবসুদ্ধ হাজার টাকা আছে। গেট-কীপারী যদি করতে চাও তা হ'লে ছোট শহরে কেন? খান্দুভাই তোমায় বোম্বে গিয়ে গেট-কীপারের চাকরি একটা জুটিয়ে দেবেন।' হঠাৎ সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে সে, 'খান্দুভাই তোমাকে ভীষণ ভয় পান, পাদ্রীদা। বলেন, ডাকু। আজ রাত্তিরে খাবো না। বড় হোটেলে ডিনার খাচ্ছি। রাত দশটার পর মেম সাহেবদের নাচ দেখানো হবে। তুমি যাবে না কি? তা হ'লে তুমি আলাদাভাবে ঢুকে প'ড়ো সেখানে। মাঝে মাঝে খান্দুভাইকে তোমার চেহারাটা দেখিয়ো। লোকটা কিন্তু বদমায়েস।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হ'লে যাচ্ছ কেন?' মুখে পাউডার ঘসতে ঘসতে জবাব দিল মীনা, 'তিন তাসের জুয়া খেলতে ব'সে তিন টেক্কা কে না চায়? খান্দুভাই-এর সঙ্গে দু'জন নামকরা ডিরেক্টারও আসছেন।' হ্যাণ্ডব্যাগটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মীনা। ভাস্করদা, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"ও, হ্যাঁ ভাই তো—হোসেন চা দিয়ে গিয়েছে দেখছি।" চা-এর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললুম, "কী সাংঘাতিক মেয়ে! আমরা মফস্বলের লোক, এ সব গল্প শুনতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

"আমার মতো গুণ্ডা পর্যন্ত হঠে গেল রূপকুমারীর কাছে। হাল ছেড়ে দিলাম। মাস দুই পর্যন্ত কলকাতা-বোম্বে ছোটাছুটি করলাম ওদের সঙ্গে। খান্দুভাই ওকে আশার-বেলুনে চাপিয়ে আকাশে ভাসিয়ে রাখলেন। হাতছাড়া করতে চান না। অভিনয় করবার সুযোগ পেলে হয়তো সে নাম করতে পারত। কিন্তু আমার অবস্থা তখন শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এক টাকার জন্যও

মীনার কাছে হাত পাততে হয়। তিন মাস পার হয়ে গিয়েছে। এমন সময় উড়ো জাহাজে বোম্বে যাওয়ার পথে আলাপ হ'ল করীম সাহেবের সঙ্গে। আমার চেহারা দেখে নিশ্চয়ই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজ করি। বললাম, 'রূপকুমারীর বডি গার্ড'। আগে গুণ্ডামী করতাম। দূর থেকে ছোরা চালাতে পারি। এক সময়ে বুক দিয়ে মোটর গাড়ি রুখে দিতে পারতাম।' করীমভয় লুফে নিলেন আমায়। আমার বুকের ক্ষমতার কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করেন নি। পাশে বসে আমার বাইসেপসের মাংসটা টিপে দেখে বললেন, 'এক তাল লোহা!' লোহার কারবারই করীমভয়-এর সবচেয়ে বড় ব্যবসা। তাঁর ফিল্ম-কোম্পানীতে চাকরি হয়ে গেল আমার। মীনাক্ষী আমার ছবি দেখে নি বটে, কিন্তু খবর রাখে। ফুরসৎ পেলেই কলকাতা গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে আসতাম। দু' একবার ওর হয়ে খান্দুভাইকে শাসিয়েও এসেছি। কিন্তু কাজ হয় নি। অভিনয় করবার সুযোগ পায় নি মীনাক্ষী। হতাশ হয়ে পড়েছিল সে। খান্দুভাই-এর হতাশার পরিমাণও কম নয়। যেমনভাবে মীনাক্ষীকে পেতে চেয়েছিলেন তিনি, তেমনভাবে পান নি ওকে। আমার তো তাই মনে হয়। মাস-খানিক আগে টাকার অভাবেও পড়েছিল মীনা। আমার টাকার সে হাত দেয় না। ভাস্করদা, ফিল্ম-কোম্পানীর লোভেদের কাছে শুনেছি, খান্দুভাই-এরও নাকি খুবই টাকার অভাব যাচ্ছে। আমার নিজের সন্দেহ, মীনাক্ষীকে বিপদে ফেলেছেন তিনি। নিজের অজ্ঞাতসারে এমন কাজ করেছে সে যার জন্য পুলিশ ওকে জামীন পর্যন্ত দিতে চায় নি। ভাস্করদা, তুমি কি আমার কোনো কথা অবিশ্বাস করলে?"

"আমি তো পুলিশের লোক নই, আমি অবিশ্বাস করলেও তোর কোনো ক্ষতি হবে না। মুটো সংসার নষ্ট হয়ে গেল শুধু সেই কথাই ভাবছি। একটা প্রশ্ন করব তোকে, সত্যি জবাব দিবি কি?"

"তোমার কাছে কোনো কথাই গোপন করি নি, মিথ্যে বলব কেন?"

"তুই কি মীনাকে ভালবাসিস?"

"হ্যাঁ।"

"বিয়ে করতে পারলে সুখী হবি?"

"সুখের কথা কি করে বলি—"

"কিন্তু তোর কাহিনী শুনে মনে হ'ল, মীনা তোকে ভালবাসে না।"

"আমার ধারণাও সেই রকমের। জানো, আজ পর্যন্ত মীনা একবারও আমার এখানে আসে নি?"

এই সময় কলিং-বেল বেজে উঠল। একটু পরেই হোসেন এসে খবর দিল, প্রদীপ রাহা এসেছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতে বলল পেড্রো। ডাকবার আগেই তিনি এসে ঢুকে পড়লেন ড্রইং-রুমে। পেড্রোর হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছেই রেখে দাও ভাই। পরের গহনা আমি আর রাখতে পারব না।"

"কেন, কি হ'ল রাহা বাবু?" জিজ্ঞাসা করল পেড্রো।

"কি জানি ভাই, মামলা-মোকদ্দমা শুরু হ'য়েছে। কোঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে না পড়ে। তা ছাড়া, খান্দু-ভাই একদিন গহনাগুলো চেয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন।"

"কেন?" অপরিমিত বিস্ময় পেড্রোর চোখে-মুখে, "তিনি কি করে খবর পেলেন, রাহাবাবু?"

"বোধ হয় রূপকুমারী বলে থাকবে।"

"কিন্তু হঠাৎ ওদের গহনার দরকার পড়ল কেন.....মাত্র তো হাজার পনরো টাকার গহনা..... তবে কি খান্দুভাই-এর হাতে নগদ টাকা কিছু নেই....." ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল পেড্রো। পায়চারি করছে আর ভাবছে। আমি বললুম, "আজ চলি রে। আবার দেখা হবে। আমার হোটেলের ঠিকানা তো তুই জানিস। ভাল কথা। কলকাতা থেকে ইনস্পেক্টর লাহিড়ী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এক হোটেলেই আছি।"

আমি যে বেরিয়ে এলুম, তাও লক্ষ্য করল না পেড্রো। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সে।

॥ আট ॥

সেদিন পেড্রোর বাড়ি থেকে নেমে আসতে বার দুই পা হড়কে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আসামীদের চেয়ে হতাশার পরিমাণ আমারই ছিল বেশি। এক হাত দূরের পথটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম না। মীনাক্ষীর গল্প শুনে আমি যেন অর্ধ-মৃতের অবস্থায় একতলায় নেমে এসেছিলুম। হোটেলে ফিরে এসে শুয়ে পড়েছিলুম আমি। মনে হয়েছিল, এতো দীর্ঘপথ জীবনে বোধ হয় আর কোনো দিনও অতিক্রম করতে হবে না। অবচেতন মনের লুকনো সত্য বিশ্লেষণ করতে লাগলুম। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এতদূর পর্যন্ত ছুটে এসেছি কেন? পৈতৃক বাড়িখানাও আর নেই। জীবনের স্বাভাবিক গতিটা ভুল পথে চালিত হওয়ার মূলে আমারই অবচেতন মনের প্ররোচনা ছিল। মীনাক্ষীর জন্য লোভের আমার সীমা নেই। হয়তো পেড্রোর চেয়েও বেশি। নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে আমি যে জড়িত নেই শুধু সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্য এতদূর ছুটে আসি নি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি চেয়েছিলুম মীনা বিপদে পড়ুক। অবস্থা জটিল হয়ে উঠুক। তারপর আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়াব। ভালবাসার পরীক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছিলুম মনে মনে। মীনাক্ষীর গ্রেপ্তার হওয়ার খবর শুনে প্রশান্ত লাহিড়ীর সামনে উদ্বেগের নানা-বিধ প্রমাণ দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু মনে মনে খুশী হয়েছিলুম খুব। মীনাক্ষীর জীবনটা যদি ভেঙেচুরে যায় তা হ'লেই ওকে পাব আমি। এখন মনে হচ্ছে, এতোগুলো লোকের মধ্যে আমার চেয়ে বড় ক্রিমিনাল আর কেউ নেই।

বাকী দিনটা বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলুম। ইনস্পেক্টর লাহিড়ী কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন জানি না। জান-বার কোন ইচ্ছাও নেই আর। পেড্রোর ইতিহাসটা শুনবার পর ওকে আর খুনী বলে সন্দেহ হচ্ছে না। পেড্রো যদি খুন না করে থাকে তা হ'লে এই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে লাভ কি? আমি তো পেড্রোকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য বোম্বে এসেছিলুম ছুটে। ওকে সরিয়ে দিতে পারলে রূপমণ্ডটা আমার দখলে আসবে ব'লে ভেবে রেখেছিলুম। আমি যে প্রবল ঈর্ষার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলুম তাতে আর সন্দেহ নেই। এখন মনে হচ্ছে, সবার ওপর দিয়ে পেড্রোই টেক্কা মেরে বসল। সত্যিকারের 'হিরো' হ'য়ে বসেছে সে। এমন কি একটি আদর্শ চরিত্র ব'লে ধারণা জন্মেছে আমার। সাধারণ একটা গুণ্ডা ব'লে আর ওকে হেয় করা চলবে না।

ওকে ছোট ক'রে রাখবার মূলে বোধ হয় আমরাই ছিলুম—ছিল মালদা শহরের পুরো সমাজটা। আমরা কেউ সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করি নি। ওকে তলিয়ে যেতে দেখেও এগিয়ে আসি নি সাহায্য করতে। যারা আজ রুকে বসছে

কিংবা গুণ্ডামী করছে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পেল্লার মতো উপেক্ষিত। সমাজের এই আধুনিক সমস্যাটা আজ আমার চোখে নতুন ধরনের আলোকপাত করল। আশে-পাশে যাঁরা সাধু ও সৎ বলে পরিচিত তাঁদের অপরাধের মাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলুম। সমাজ-বিজ্ঞানের লুকনো দিকটা চোখে পড়ল আমার। আমি অপরাধী। মালদা শহরের ভুবন চাটুজ্যের অপরাধ আমার চেয়েও বেশি।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ঘরে ঢুকলেন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী। হাসি-খুশী ভাব। সত্যিকার খুনীটাকে ধরে ফেলেছেন না কি? এঁদের অবিশ্যি দেখে কিছু বোঝা যায় না। গাম্ভীর্যের তলায় হাসির ঢেউ থাকে লুকনো। হাসির অন্তরালে গাম্ভীর্যের বরফ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলেও বোঝা যায় না কিছু। বড় অদ্ভুত জীব এঁরা।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "অতো মুষড়ে পড়েছেন কেন, ভাস্কর-বাবু?"

"না তো! মুষড়ে পড়ব কেন?"

হেসে উঠলেন তিনি। অর্থাৎ আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "রূপকুমারী জেলে আছে বটে, কিন্তু আছে খুব সুখে। তাজমহল হোটেলের মতো বন্দোবস্ত। কংগ্রেসী আমলের জেল কি আপনি কখনো দেখেছেন?"

"না, সৌভাগ্য হয় নি।"

"যাবেন না কি দেখতে?"

বলে কি লোকটা! খুনের ব্যাপারে আমাকেও সন্দেহ করতে লাগলেন নাকি প্রশান্তবাবু? ঠাট্টা করছেন, না সত্যি-সত্যি বলছেন যে, আমাকেও জেল খাটতে হবে?

বললুম, "কপালে থাকলে একদিন বাসিন্দে হ'য়ে যাব জেলখানার। কি বলেন?"

"নাঃ, মেজাজ আপনার ভাল নেই। চলুন, বেরুতে হবে।"

"কাল তো সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। কিছু বুঝতে পারলেন কি?

হ্যাঁ মশাই, কাল যে মেয়াল ছেঁছে আস্তর নিয়ে এলেন তার কি হ'ল? এমন গম্ভীরভাবে চাঁছতে আরম্ভ করে দিলেন যে, আমি ভাবলুম খুনীটা বুঝি আস্তরের তলায় লুকিয়ে রয়েছে। সত্যি, আপনাদের কাণ্ড দেখলে মাঝে মাঝে এত হাসি পায় যে, চেপে রাখতে পারি না। শুনেছি বিলেতের ডিটেকটিভরা এই রকমের আজগুবী কাণ্ড করতে ভালবাসে।"

আমার কথা শুনে আবার তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, "রেগে গিয়েছেন আপনি। কি করব এই অবস্থায় রূপকুমারীকে জামীনে খালাস দেওয়া যায় না।"

"রূপকুমারীর জন্য আমার অতো মাথা ব্যথা নেই, মশাই।"

"কবে থেকে? প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখে দুষ্টুমীর হাসি, "কাল তো পেল্লোর বাড়ি গিয়েছিলেন—"

"আপনি কি করে জানলেন?"

"রাত্তিরে প্রদীপ রাহার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তদন্তের জন্য তাঁর বাড়ি যেতে হয়েছিল আবার। পেল্লোর কথা-বার্তা শুনে কিছু বুঝতে পারলেন কি ভাস্করবাবু?"

"এখন তো মনে হচ্ছে ছোঁড়াটা একটি আদর্শ চরিত্রের মানুষ। দেশের অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয়দের পাশে বসিয়ে দিলে বেমানান ঠেকবে না। মানবচরিত্রের রহস্য বোঝা আমার কর্ম নয়। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়িঘর বেচে মানবচরিত্র বোঝবার জন্য বোম্বে আসবার দরকার ছিল না। কি যে করলুম ঘোড়ারডিম কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাড়ির পেছন দিকে পাঁচ বিঘের একটা বাগান ছিল। আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যা ছিল অনেক। ওখানে ব'সেই শুনলুম ওরা প্রেমাভিনয় করেছে!"

"বলেন কি?"

"হ্যাঁ মশাই। অতো কাছে থেকেও মানব চরিত্র দুটি দেখতে পেলুম না। বোম্বে এসে কি আর দেখব ছাই, বলুন? ভাবছি, কালই আমি কলকাতা ফিরে যাব। চাকরিবাকরির জন্য চেষ্টা করতে হবে।"

"বড্ড বেশি দমে গিয়েছেন। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দু-দিনের মধ্যে অতো হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন? চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কোথায় যাবেন?"

প্রথমে খান্দুভাই-এর কাছে। তার-পর ডাক্তার প্যাটেলের বাড়ি।" আমার হাতে ধরে টান মারলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

অফিসেই ছিলেন খান্দুভাই। বহু-লোক এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সবাই এঁরা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেরাণীরা কাজকর্ম বন্ধ করে যার যার চেয়ারে চুপ করে বসে রয়েছে। প্রদীপ রাহাকেও দেখলুম আমরা। একটা মোটা আকারের 'চেক-বই' তাঁর হাতে। পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁর সামনেই দাঁড়ালুম। ব্যস্তভাবে উঠে পড়লেন তিনি, বললেন, "বসুন, বসুন। মালিকের ধরতাই লোক।

"খান্দুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চান নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কিছু নেই।" বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"আমি নিজেই যাচ্ছি, খবর দিয়ে আসি। আপনাকে তিনি চেনেন তো?

"চেনেন। ব্যস্ত মানুষ তিনি। ভুলে যেতেও পারেন। বলবেন যে, কলকাতার প্রশান্ত লাহিড়ী। নামটা লিখে দেব কি?

"কিছু দরকার নেই। একটু বসুন আপনারা।"

প্রদীপ রাহা অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেক-বইটা খুলে ফেললেন প্রশান্তবাবু। চেকের মধ্যে কি যেন দেখে নিলেন একবার। দেখতে বোধ হয় এক সেকেণ্ডও লাগল না। একটু পরেই ফিরে এসে প্রদীপ রাহা বললেন, "আসুন আপনারা।"

বড় হল ঘরটা পার হয়ে এলুম আমরা। চওড়া একটা বারান্দা অতিক্রম করে পৌঁছলুম এসে মস্ত বড় একটা ড্রইংরুমে। প্রদীপ রাহা বললেন, "খান্দু-ভাই-এর প্রাইভেট ড্রইং-রুম। এখানেই আপনাদের বসতে বললেন। মিনিট দশ পর তিনি আসবেন। কি খাবেন আপনারা? চা, না কফি?"

"কিছু না। হোটেল থেকে এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি।" বললেন প্রশান্তবাবু।

প্রদীপ রাহা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী। দেয়ালের গায়ে ভারত বিখ্যাত অভিনেতা আর অভি-নেত্রীদের ছবি টাঙ্গানো ছিল। রূপ-কুমারীর ছবিও একটা দেখলুম আমরা।

ড্রইং-রুমের সংলগ্ন স্নানঘর আছে। সেখানে ঢুকে পড়লেন, প্রশান্ত

লাহিড়ী। ভেতর দিকে অন্য একটা দরজা নজরে পড়ল তাঁর। ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট একটা ঘর রয়েছে সেদিকে। অন্ধকার। জানালাটা বন্ধ। পকেট থেকে এক ব্যাটারীর টর্চ বার করলেন প্রশান্তবাবু। ক্ষিণ আলোতেও ঘরখানার সব কিছু দেখতে পাওয়া গেল। আসবাবপত্র কিছু নেই। শুধু একটা খাট রয়েছে। বড় খাট। তাতে বিছানা পাতা। খাটের পাশে খুব ছোট সাইজের একটা টি-পয়। তার ওপরে ফুলদানিটা চোখে পড়ল আমাদের। টাটকা ফুলের গন্ধও পেলুম। ফুলদানির তলায় রূপকুমারীর একটা পাসপোর্ট সাইজের ফোটো।

ফিরে এলুম ড্রইং-রুমে। জিজ্ঞাসা করলুম, "এসব জায়গা সার্চ করে নি পুলিশ?"

"এদের কাণ্ড দেখে মনে হয়, করে নি।"

"তোশকের ওপর টিপে টিপে কি দেখছিলেন আপনি?"

"তিন লাখ টাকার বাণ্ডিলটা হাতে ঠেকে কি না।"

"আপনার কি বিশ্বাস খান্দুভাই টাকা চুরি করেছেন?"

"বিশ্বাস নয়, শুধু সন্দেহ। চেক-বইতে দেখলাম, শেষ চেক কাটা হয়েছে কুড়ি দিন আগে। ভাবছি, এতবড় ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁরা কুড়ি দিন পর্যন্ত চেক না কেটে থাকতে পারেন কি না।"

"অসম্ভব। তা হলে অফিস চলতে পারে না।" কথাটা বলে ফেলে হেসে ফেললুম আমি। বললুম আবার, "আপনার কথা শুনলে প্রত্যেকের ওপরই সন্দেহ আসে। আজ সকালে তো ভেবেছিলুম আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন।"

"তাই না কি?" প্রশান্ত লাহিড়ীও হাসতে লাগলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হলেন খান্দুভাই। কাকুতি মিনতি করে বললেন, "মাপ করবেন লাহিড়ীবাবু। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাদের। কি করব। পাঁচ দিন তো আপনারা ধরে রাখলেন। কোনো কাজ কর্ম করতে পারি নি। কাজ সব জমে গিয়েছে। ও কি আপনাদের চা দেয় নি?"

"দিতে চেয়েছিলেন। আমরাই বারণ করলুম। চা-এর দরকার নেই। একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। অন্য জায়গায় কাজ আছে। কটা কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করুন।"

"বুঝতে পারছেন কি খান্দুভাই, আমরা এসেছি আপনার মাসীমার খুনের ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করতে?"

"অবশ্যই বুঝতে পারছি। নইলে আপনার মতো যোগ্য অফিসার কেন ছুটে আসবেন কলকাতা থেকে? আপনি যে ঘুষ খান না সে খবর এদিকের ধনী-লোকেরাও জানে।"

"আমাকে নিয়ে আপনাদের মধ্যে খুব আলোচনা হচ্ছে বুঝি?"

"একটু-আধটু হচ্ছে বৈ কি। সবাই জানে আপনি আমার জান্-পহান্ আদমি। আপনার সোল্লো খুব ভাব আছে।" একা একাই হেসে উঠলেন খান্দুভাই। পাঁচ দিন হাজতবাসের পর মুখের রেখাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে। হাসির মধ্যে প্রফুল্লতা নেই। উদ্বেগের গভীরতাও লক্ষ্য করা যায়।

প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মী দেবীর যে তিন লাখ নগদ টাকা ছিল তা কি আপনি জানতেন?"

"জানতাম।"

"কি করে?"

"মাসীমা নিজেই আমায় বলেছিলেন।"

"তিনি কি কোনো উইল রেখে গিয়েছেন?"

প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন খান্দুভাই। বললেন, "উইলের খবর তো সবাই জানে।"

"কি করে?"

"খবরের কাগজ পড়ে।"

"সে তো লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুর পর সবাই জেনেছে। আমি জানতে চাইছি, তাঁর মৃত্যুর আগে আপনি জানতেন কি না।"

"জানতাম।"

"মাসীমা বলেছিলেন কি?"

একটু ভেবে নিয়ে খান্দুভাই জবাব দিলেন, "না, মাসীমা তাঁর উইলের ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন রেখেছিলেন।"

"তা হলে আপনি জানলেন কি করে?"

"তাঁর সলিসিটার জীবরাজ মেহটার কাছ থেকে।"

"মক্কেলের গোপন খবর তিনি আপনাকে বলতে গেলেন কেন?"

"সে তো জীবরাজ বলতে পারে—"

"এই তিন লাখ টাকার মধ্যে একটি পয়সাও যে তিনি আপনাকে দেন নি তা কি আপনি জানতেন না?"

"জানতাম। জীবরাজই বলেছে। তিন লাখ কি পাঁচ লাখ টাকা যে আমার কাছে কিছুই না জীবরাজ তা বুঝতে পারত বলেই মাসীমার উইল নিয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কী করত।"

"কি রকম?"

"বলত,—ওরে খান্দু, মাসীমা তোকে কলা দেখিয়েছেন উইলে। শুধু হাজার পঞ্চাশ টাকার শেয়ারের খুদকুঁড়ো দিয়ে গেছেন তোকে।"

সিগারেট ধরালেন প্রশান্ত লাহিড়ী। বোধহয় জেরার পয়েন্টগুলো মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আবার, "গত ছ'মাস কত টাকা লোকসান দিয়েছেন, খান্দুভাই?"

"আমার কর্মচারীরা বলতে পারবে।"

"যদি বলি বিশ লাখেরও বেশি?"

"অসম্ভব নয়। আমাদের ব্যবসায়ে তুলোর মতো টাকা ওড়ে। বিশ-ত্রিশ লাখ টাকার লোকসানের খবর আমার কাণ পর্যন্ত পৌঁছয় না, প্রশান্তবাবু।"

"কতো লাখ পর্যন্ত লোকসান হলে আপনার কাণে এসে পৌঁছবে বলে আপনি মনে করেন?"

"এই ধরুণ লাখ পঞ্চাশ হলে আমার ওরা বলবে।"

"খান্দুভাই, আমার বিশ্বাস তার চেয়েও বেশি লোকসান আপনি দিয়েছেন। আপনার কোনো ব্যাঙ্কেই আজকের তারিখে নগদ টাকা কিছু নেই।"

"আমার কর্মচারীরা বলতে পারবে। নগদ টাকা মানে কি? কোটি টাকার ক্রেডিট আছে আমার।"

"তাও নেই। ব্যাঙ্ক আপনাকে আর বিশ্বাস করে না। পাঁচ হাজার টাকার চেক কাটলেও ব্যাঙ্ক টাকা দেবে না আপনাকে।"

"আমার কাছে এটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে।"

"মিছে কথা বলছেন খান্দুভাই। গত কুড়ি দিনের মধ্যেও আপনার অফিসের চেক বই থেকে চেক কাটা হয় নি। যেসব স্ত্রীলোকদের নিয়ে আপনি সময় কাটান তারাও কেউ টাকা পায় নি। আপনার পাটরাণী রূপকুমারীকে তাজহমল হোটেলে রেখেছেন। এক মাসের বিল বাকী তার। এসব কথা থাক। আপনার মাসীমা যে ভল্ট থেকে টাকা নিয়ে এসেছিলেন তা কি আপনি জানতেন?"

"না।"

"সিকিউরিটি বিভাগের একটি কেরাণীকে আমরা আজ সকালে গ্রেপ্তার করেছি। জবানবন্দিতে সে বলেছে, আপনি জানতেন। তাকে আপনি একশো টাকা ঘুষ দিয়েছেন খবরটা জানবার জন্য। এবার বলুন, লক্ষ্মী দেবীকে খুন করেছে কে? আপনি, না রূপকুমারী? কার ওপর সন্দেহ হয় তাও বলতে পারেন।"

"আমার সন্দেহ পেড্রোর ওপর। ডাক্তার প্যাটেলও তাই বলেন।"

উঠে পড়লেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "পেড্রোর ওপর আপনার খুব রাগ, তাই না? তাকে আপনি ভয় পান।"

"আমাকে সে অনেকদিন ছোরা দেখিয়েছে।"

"সেইজন্যই তো রূপকুমারীর সর্বনাশ করতে পারেন নি। দেহসম্ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ওর ওপর আপনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আজ চলি, খান্দুভাই।"

"ছোরা দেখানোটা অপরাধ নয়?" চেঁচিয়ে উঠলেন খান্দুভাই।

"পেড্রো ছোরা দেখায়, মারে না।"

পথে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, "খান্দুভাইকে ছেড়ে দিলেন কেন? খুনীকে তো পেয়েই গেলেন?"

"না, পাই নি ভাস্করবাবু।"

হতবুদ্ধির মতো তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলুম। তাঁর জেরা শুনে আমার তো বিশ্বাস হয়ছিল, আসল অপরাধীকে ধরে ফেলেছেন প্রশান্তবাবু। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি আবার উল্টো কথা বলছেন! তদন্তের নাম করে তিনি কি ছেলেখেলা করছেন? আমি কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ীর ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারলুম না। বোধ হয় সি-আই-ডি অফিসার হিসেবে ইনসপেক্টর দেশাই প্রশান্তবাবুর চেয়ে অনেকগুণ চতুর। তাঁর হাতেই তদন্তের দায়িত্বটা থাকলে ভাল হতো।

রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"ডাক্তার প্যাটেলের বাড়ি।"

"আর কেন দাদা, ছোটাছুটি করছেন? এদের মধ্যে কেউ আসামী নন। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটি তো আপনার পকেটেই রয়েছে।"

"কি বলুন তো?"

"ঐ যে সেই মোড়কটা—যাতে এক চামচ আস্তর মুড়ে রেখেছেন।"

"ঠাট্টা করছেন, না ভাস্করবাবু?"

"ঠাট্টা নয় দাদা হাঁপিয়ে পড়েছি। একবারটি তো রূপকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। তাও করলেন না। এত দূর এলুম, দু-একটা কথা না বলে যাই কি করে? এর পর তো লটকে দেবেন মেয়েটাকে।"

"আপনার ব্যথা যে কোথায় তা কি আমি বুঝি নি? দু একটা দিন সবুর করুন। রূপকুমারীকে আপনার কাছে পৌঁছে দেব।"

"বলেন কি, মীনা মুক্তি পাবে?"

"যদি সে খুনের সঙ্গে জড়িত না থাকে।"

"ও—বুঝেছি। এই ধরণের কথা তো আপনি প্রথম থেকে বলে আসছেন।"

চার্চগেটের কাছে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লুম আমরা। এই অঞ্চলেই থাকেন ডাক্তার প্যাটেল। খোঁজাখুঁজি করলেন না প্রশান্তবাবু। বোধহয় গতকালই বাইরে থেকে বাড়িঘর তাঁর দেখে গিয়েছেন। চারতলায় উঠে এলুম। দরজার পাশে পেতলের ওপর নাম লেখা রয়েছে। কলিং-বেলটা নেম-প্লেটের ঠিক তলায়। ডাক্তার প্যাটেলের নামের পেছনে বিলেতী ডিগ্রীর বাহুল্য। বড় ডাক্তার। একটি লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বিহারী বলে মনে হল আমার। হাতে লাল রং-এর জাবেদা খাতা।

প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার সাহেব কি বাড়ি নেই?"

"আছে, হুজুর। বুড়ো চাকরটা ভারি বদমায়েস। যখনি আসি তখন সে বলে, সাহেব বাড়ি নেই।"

"তার মানে কি, শেঠজী?"

"আমি শেঠ নই, হুজুর। ছোট একটা মুদী দোকান খুলেছি। ছ' মাস ধরে ঘুরছি একটা টাকাও আদায় করতে পারছি না। প্রায় শ দুই টাকার জিনিস বাকীতে নিয়ে এসেছে চাকরটা। এখন শুনছি, দুধওয়ালাকেও টাকা দেন নি ডাক্তার সাহেব। আরও অনেক পাওনাদার ঘোরাঘুরি করছে।"

"সে কি!" গলা দিয়ে আমার একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। আমার গায়ে খোঁচা মেরে প্রশান্তবাবু বললেন, "চুপ চুপ করুন ভাস্করবাবু।" ঐ লোকটার দিকে ঘুরে বললেন, "এখন তুমি যাও, পরে অন্য সময় এসো।"

"আপনারাও কি পাওনাদার?"

"না।"

"আচ্ছা যাচ্ছি। আর আসব না। এবার কেস ঠুকে দেব। কত বড় ডাক্তার প্যাটেল সাহেব দেখে নেব আমি।" লোকটি গালাগাল করতে করতে চলে গেল লিফটের দিকে।

প্রশান্তবাবু বেল টিপলেন। প্রায় মিনিট দুই পরে দরজা খুলল ডাক্তার প্যাটেলের ভৃত্য। আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে চাই?"

"ডাক্তার সাহেবকে।"

"কি বলব তাঁকে?"

"বলো যে পুলিশের লোক এসেছেন দেখা করতে।"

পলক না ফেলতেই দরজাটা সে বন্ধ করে দিল। ফিরে আসবে কি না তাও সে বলে গেল না। প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "আসবে। মণিবকে জিজ্ঞেস করতে গেছে।"

"কিন্তু বড় অদ্ভুত ঠেকছে সব। মুদীর টাকা পর্যন্ত বাকী ফেলেছেন। গয়লার বিল বাকী। বিলেতী ডিগ্রীর সংখ্যা তো কম নয়—থাকেনও ভাল জায়গায়। ডাক্তার প্যাটেলের কি প্র্যাকটিস নেই?"

"তদন্ত করবার জন্যেই তো এলাম এখানে। দেখা যাক।"

"আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে, প্রশান্তবাবু।"

"কেন?"

"কি জানি আপনার সঙ্গে ঝামেলা না লেগে যায়। লোকটাকে দেখে কাল আমার ভাল লাগে নি।"

"আমার সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, ভয় কি? আপনার যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এরপর পুলিশ বিভাগে আপনাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেব। বেহালী কোম্পানীর গদিতে ফিরে গিয়ে কি করবেন?"

চাকরটা আসে নি। এসেছেন ডাক্তার প্যাটেল নিজেই। খুব অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। মিষ্টি হেসে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন।"

আমাদের নিয়ে তিনি তাঁর চেম্বারে ঢুকলেন। রোগীদের ওয়েটিং রুমের মধ্য দিয়ে যেতে হল আমাদের। বসবার জন্য গুটি কয়েক চেয়ার পড়ে রয়েছে। খুবই অগোছাল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় অনেকদিন ধরে এখানে কোনো রোগী এসে বসে নি। ওয়েটিং-রুমটা অব্যবহৃত রয়েছে। সেন্টার টেবিলের ওপর কতকগুলো ম্যাগাজিন আছে দেখলুম। সেগুলো কিন্তু গোছানো। কেউ হাত দিয়েছে বলে মনে হয় না।

ডাক্তার প্যাটেলের চেম্বারে ঢুকে প্রশান্তবাবু বললেন, "আমি ইন্সপেক্টর লাহিড়ী। ইনি মিস্টার আচার্য।"

"দয়া করে বসুন আপনারা।"

"দেখুন ডাক্তার প্যাটেল, আমরা এসেছি আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করতে। লক্ষ্মী দেবীর চিকিৎসক ছিলেন আপনি। অতএব তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুসম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। আশা করি আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। আমাদের সাহায্য করবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাদের আমি এই প্রথম দেখলাম। মনে হচ্ছে বোম্বের লোক আপনারা নন। আপনাদের আইডেনটিটি কার্ড সঙ্গে এনেছেন কি? অর্থাৎ পরিচয়-নির্দেশক-পত্র?"

"অবশ্যই এনেছি। নইলে আপনিই বা যার তার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন কেন? খুনের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সঙ্গে আমার সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।"

"সার্চ তো একবার হয়ে গিয়েছে।" একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন ডাক্তার প্যাটেল। পরিচয়-নির্দেশক পত্রটা ভাল করে দেখলেনও না। প্রশান্তবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তা হলে আগে সার্চ করে নিন।"

"না, না—সার্চ এখন করতে চাই না আমি। আপনাকে শুধু জানিয়ে রাখলাম। আপনার মতো সাবধানী লোকের সবকিছু জানা দরকার। আপনি এবার বসুন, ডক্টর।"

"হ্যাঁ, বসছি। একটু চা আনতে বলি?"

"ধন্যবাদ। এখন আর চা খাব না।"

একটু হেসে ডাক্তার বললেন, আমরাও রোগীর বাড়ি গিয়ে কখনো কিছু খাই না।—অন্ প্রিন্সিপল্। আপনার লাইনে আপনিও হচ্ছেন গিয়ে ডাক্তার। আমি আপনার রোগী। তা বেশ, রোগ ধরবার চেষ্টা করুন এবার। অর্থাৎ কি জানতে চান, বলুন।"

প্রশান্ত লাহিড়ী দেরি করলেন না। তদন্ত শেষ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরে যেতে চান। মেয়েটার অসুখ দেখে এসেছেন। ইতিমধ্যে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। আমিও যে একজন পুলিশের লোক সেটা প্রমাণ করবার জন্যই ঘরের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে লাগলুম। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলে ডাক্তার প্যাটেলের সন্দেহ উদ্রেক হতে পারে।

ইন্সপেক্টর লাহিড়ী বলতে লাগলেন, "প্রথমেই ধরে নিচ্ছি লক্ষ্মী দেবীর খুনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই। এক সময়ে, অর্থাৎ ছাত্রজীবনে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে আপনার প্রেম-প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। ছিল তো?

"ও—ইয়েস। অস্বীকার করব কি করে?" ডান হাতের আঙুলগুলো তাঁর একটু কেঁপে উঠল যেন। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। নিশ্চয়ই। প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনাটা কলকাতার বাঙালী ডিটেকটিভ টের পেল কি করে তাই ভেবে খানিকটা হয়তো হকচকিয়ে গিয়েছেন। আমি নিজেও যারপরনাই বিস্মিত বোধ করলুম। বিস্মৃতির ভস্মস্তূপ থেকে প্রেম-প্রণয়ের কাহিনীটা আবিষ্কার করার সংবাদ এই আমি প্রথম শুনলুম।

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "অতএব আপনার প্রণয়িনীর হত্যাকারী ধরা পড়ে তা আপনি নিশ্চয়ই চান। নয় কি?"

"ও—ইয়েস। অবশ্যই চাই।"

"তা হলে বলুন, পেড্রোর ওপর আপনার সন্দেহ হয় কি না?"

"না। ছেলেটাকে বার কয়েক দেখেছি আমি। তা ছাড়া লক্ষ্মীর ওখানে যে টাকা আছে সে খবর ওর জানবার কথা নয়।"

"আমারও সেই রকমের ধারণা। বাবু রাও সম্বন্ধে মনে মনে কোনো কিছু ভেবে দেখেন নি আপনি?"

"দেখেছি, মিস্টার লাহিড়ী। কিন্তু ওর একলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক কাজ করা অবিশ্বাস্য মনে হয়।"

"রূপকুমারীর সঙ্গে যদি হাত মিলিয়ে থাকে?"

"তিন লক্ষ টাকা বেমালুম হজম করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব।"

"যদি তিনজনের হাত একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে থাকে?"

"হ্যাঁ, তিনজনের হাত মিলিত হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।" ঘাড়ের মাংস দুলিয়ে ডাক্তার প্যাটেল ডান হাতটা ফেলে রাখলেন টেবিলের ওপর। নিশ্চিন্ত বোধ করার ভঙ্গীটা সুস্পষ্ট হ'ল।

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "তৃতীয় ব্যক্তি বলতে তো বাকী থাকেন খান্দুভাই।"

"ও, গড্! তাঁর কথাই তো প্রথম দিন থেকে মনে পড়ছে আমার।" চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়লেন ডাক্তার প্যাটেল।

"কেন বলুন তো?" প্রশ্ন করলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী।

"লোকটার সাংঘাতিক টাকার অভাব যাচ্ছে।"

"কি ক'রে জানলেন?"

"চারদিকেই শুনতে পাচ্ছি।"

"একটা দিকের নাম বলুন দয়া ক'রে।"

"ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেদিন বলছিলেন কথায় কথায়। অদ্ভুত যোগাযোগ হ'ল। ব্যাঙ্কে আমারও একটা একাউন্ট আছে।"

একটু নড়ে চড়ে বসলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে এগিয়ে ধরলেন ডাক্তার প্যাটেলের দিকে। ধূমপানের অভ্যাস নেই ব'লে

সিগারেট তিনি নিলেন না। শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মী দেবী তিন লাখ টাকা হঠাৎ কেন বাড়ি নিয়ে এলেন তার কারণ কিছু আপনি জানেন কি?"

"না। এটাও আমার কাছে একটা মস্তবড় বিস্ময়। তবে হ্যাঁ, ক'মাস থেকে শরীরটা ওর ভাল যাচ্ছিল না। এন্‌জাইনা পেক্টোরিস। একবার হার্টের ওপর একটা আক্রমণ হ'য়ে গিয়েছে। হয়তো ভেবেছিল, টাকার অভাবের জন্য চিকিৎসার অসুবিধা ঘটতে পারে। হাতের কাছে নগদ টাকা রাখা দরকার। কিংবা—"

বাধা দিয়া প্রশান্ত লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন, "এই তিন লাখ টাকার কথা আপনি কি জানতেন না?"

"জানতাম ব্যাঙ্কে আছে। লক্ষ্মী নিজেই আমায় বলেছে। ইদানিং খান্দুভাই-এর ঘন ঘন যাওয়া-আসা দেখে কেমন একটু সন্দীহান হ'য়ে উঠেছিলাম। সব সময়েই রূপকুমারী তার সঙ্গে থাকত। লক্ষ্মীকে এর কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নও করেছি। পরিষ্কার জবাব কিছু দেয় নি সে। শুধু বলত, আত্মীয়-স্বজনেরা দেখতে আসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।"

"অশেষ ধন্যবাদ, আপনার সাহায্যের কথা মনে থাকবে আমার—"

মনে হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ী বুঝি উঠে পড়ছেন। কিন্তু তা নয়, ঝুঁকে ব'সে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দু' একটা আমায় দিতে পারেন কি, ডাক্তার প্যাটেল?"

"অব কোর্স—কেন দেখাতে পারব না?" ডান দিকের ড্রয়ার খুলে তিনি একটা ফাইল বার করলেন। ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ীর দিকে ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন।"

পাশে বসে আমিও রিটার্নগুলো দেখতে লাগলুম। বেশ মোটা টাকা ইনকাম ট্যাক্স দেন ডাক্তার প্যাটেল। গত দু' বছরের ট্যাক্সের পরিমাণটা খুব বেশি। কিন্তু তার আগে যা দিতেন তা অত্যন্ত সামান্য।

প্রশান্তবাবু ফাইলের দিকে চোখ রেখে বললেন, "গত দু' বছর থেকে আপনার প্রাকটিস খুব বেড়ে গিয়েছে দেখছি। অথচ তার আগে আপনার ইনকম খুবই কম। বছর পাঁচ আগে তো কোনো টাকাই আপনি দেন নি। এতোগুলো বিলেতী ডিগ্রী কাজে লাগে নি বুঝি?"

জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না ডাক্তার প্যাটেল।

ফাইলটা রেখে দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, "আপনার ডাইরী বইগুলো একবার দিন তো। আশা করি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না?"

"কিচ্ছু না। আপনাদের সঙ্গে তো সার্চ ওয়ারেন্ট আছেই।" ডাক্তার প্যাটেল উঠে গিয়ে শেল্‌ফের ওপর থেকে তিনখানা ডায়েরী বই নিয়ে এলেন। গত তিন বছর ধ'রে যে-সব রোগী দেখেছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা লেখা আছে এতে।

ইন্‌কাম ট্যাক্সের হিসেবের জন্য লিখে রাখতে হয়। ডাক্তার প্যাটেলের টাকা পয়সার হিসেব দেখবার জন্য প্রশান্ত লাহিড়ী কেন এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বুঝতে পারছিলুম না। বিলের টাকা সময়মতো না দেওয়ার অভ্যাস অনেকেরই থাকে। বিশেষ ক'রে যাঁদের অভাব নেই তাঁরাই বিলের টাকা দিতে গড়িমসি করেন বেশি। এই ধরনের লোক মালদা শহরেও আমি দেখেছি। এ'রা ধনী লোক ব'লেই ইজ্জতের ভয় করেন না। যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল না তাঁরাই ইজ্জত রক্ষার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। বিলের টাকা শোধ ক'রে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

মরক্কো চামড়া দিয়ে বাঁধানো ডায়েরী বই তিনখানা খুব মনোযোগ সহকারে দেখলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল গুটি কয়েক রোগীর নাম-ঠিকানা মুখস্থ করছেন বুঝি। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলুম। ব'সে প্রশান্ত লাহিড়ীর গাম্ভীর্যপূর্ণ তদন্ত-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে আর ভাল লাগছিল না। বিলেতী ডিটেকটিভ উপন্যাস প'ড়ে বোধ হয় লোকটি চতুর হওয়ার চেষ্টা করছেন। উপন্যাসে যা ঘটে বাস্তবক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হয় কি?

ডাইরী বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "কয়েকজন রোগীর নাম দেখছি প্রায় প্রতি মাসেই লেখা আছে। তিন বছর ধ'রেই চিকিৎসা করছেন। এঁদের ব্যাধিটা কি?"

"হঠাৎ স্মরণ করা মুশকিল।"

"তা ঠিক। দেখুন, লক্ষ্মী দেবীর নাম তো কোথাও দেখছি না?"

"তাঁর কাছ থেকে কখনো আমি ফী নিই নি।"

"ও, হ্যাঁ। যাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসা যায় তাঁর কাছ থেকে ফী নেওয়া অসম্ভব। বড় বড় ডাক্তাররা তো শুধু চিকিৎসক নন, মানুষও। ধন্যবাদ ডাক্তার প্যাটেল। আজ আমরা উঠছি। তদন্তের ব্যাপারে আপনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন। দরকার হ'লে আবার আসব।"

"অবশ্যই আসবেন। দুপুর বেলাতেই আমি একটু ফ্রী থাকি। সকাল-সন্ধ্যায় রোগীর ভিড় এতো বেশি হয় যে, কথা বলার ফুরসৎ থাকে না। নমস্কার।"

দরজা পর্যন্ত ডাক্তার প্যাটেল এলেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়বার নমস্কার বিনিময় হ'ল। তারপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি।

করিডোর ধ'রে ডান দিকে এগিয়ে গেলুম আমরা। ঠিক সেই সময় লিফট-টা উঠে এল ওপরে। একজন ইয়োরোপীয়ান চারতলায় উঠেছেন। লিফ্‌টম্যান আমন্ত্রণ জানালো, "আইয়ে সাব।" লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকে পড়লুম আমরা।

লিফ্‌টম্যানটি বিহার প্রদেশের লোক। বকবক করার বদ অভ্যাস আছে। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলুম আমরা। প্রশান্ত লাহিড়ী সহসা যেন নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। সংবাদ সংগ্রহের যোগ্য লোক ব'লে লিফ্‌টম্যানটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মত্ত হ'য়ে উঠলেন। আলাপ-আলোচনা করতে করতে সে ব'লে উঠল, "উ ডাগ্‌তর নেহি, চোট্টা।"

"চোট্টা?" গভীর বিস্ময়ের ভান ক'রে প্রশ্ন করলেন প্রশান্তবাবু।

"জী, হাঁ।"

"কেন, টাকা পয়সা তো বহুত রোজগার করেন—"

"কুছ নেহি। সব ঝুট্‌ হ্যায়।"

"কেন রোগী আসে না এখানে?"

"হাম্‌ তো কভি দেখ্‌তা নেহি। শুনা হ্যায় ডাগ্‌তর সাহেব কো একঠোই রোগী থে.....উ তো আভি খুন হো গিয়া।"

আমরা বেরিয়ে এলুম রাস্তায়। খান্দুভাই-এর অফিস থেকে যে-মনোভাব নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলুম, এখনকার

মনোভাবও ঠিক সেই ধরনের। তখন ভেবেছিলুম, আসল অপরাধী হচ্ছেন খান্দুভাই। এখন ভাবছি, খান্দুভাই নন, ডাক্তার প্যাটেল।

আমার চারদিকের জগতটাকে সত্যিই বিচিত্র মনে হ'তে লাগল। লক্ষ টাকার বিনিময়েও এমন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যায় না।

॥ নয় ॥

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নোট বইতে কি যেন লিখছেন ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ী। যে কাজই করেন সেটাই যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয়। আমি ভাবি, এবার নিশ্চয়ই রহস্য-সমাধানের সূত্রটা খুঁজে পেলেন প্রশান্তবাবু। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভুল ভেঙে যায় আমার। তাঁর কথা শুনে ধারনা জন্মায়, গোলকধাঁধার পথটা খুঁজে পান নি।

ট্যাক্সিতে উঠে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "ডাক্তার প্যাটেলের দু' একটি রোগীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, চলুন।"

"তাঁরাও এই খুনের সঙ্গে জড়িত ব'লে সন্দেহ করছেন না কি?"

"তদন্ত করতে নেমে আমরা সবাইকে সন্দেহ করি। ব্যাপারটা তা নয়। ডাক্তারের ডায়েরী বইতে দেখলাম, কয়েকজন রোগী গত তিন বছর ধরে ক্রমাগত চিকিৎসা করাচ্ছেন। রোগ সারছে না, অথচ একই ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছেন তাঁরা—কেমন একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে না?"

"না, মশাই আমি আর কোনো মতামত প্রকাশ করব না। বড় সাংঘাতিক লোক আপনি। আমাকে বোকা বানাবার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। যদি বলি অস্বাভাবিক, তার পরের মুহূর্তেই প্রমাণ ক'রে দেবেন এইটেই স্বাভাবিক।"

আমার কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন প্রশান্তবাবু। মধ্য-বয়সী ভদ্রলোকটি যখন হাসতে থাকেন তখন তাঁকে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির একটি ভালমানুষ বলে মনে হয়। শুনে সি-আই-ডি ব'লে ভাবা যায় না। মানবচরিত্রের স্ব-বিরোধী দিকগুলো প্রতিদিনই চোখে পড়ছে আমার। পেদ্রো তো ইতিমধ্যেই বোকা বানিয়ে দিয়েছে আমাকে। মীনাক্ষীর গল্প যা শুনে এলুম তাতেও বিস্মিত বোধ করেছি। মনে হয়েছে, মালদা [illegible] জন্মদাবাবুর মেয়ে এ নয়। অন্য কেউ হবে বুঝি। পেদ্রোর মতো একটা দুর্ধর্ষ গুণ্ডাকে ভাগিয়ে আনবার ক্ষমতা রাখে সে। মালদা শহরের মতো ছোট জায়গায় যারা বাস করে তাদের বোধ হয় কোনোকালেই ঘুঁষি পাকে না। আজীবন তারা ছেলেমানুষ থাকে। মানবচরিত্রের জটিলতা আমরা বুঝতে পারি না। কলকাতার 'পান্থনিবাস'-এ কয়েক মাস বাস করলেই সারাজীবনের অজ্ঞতা লোপ পেয়ে যায়। ট্যাক্সিতে বসে হঠাৎ আজ ম্যানেজার বাবুর কথা মনে পড়ল। পরেশবাবুর মত শিক্ষিত লোক তিনি নন। গৌরাঙ্গ বাউলের সঙ্গে বউ তাঁর পালিয়ে গিয়েছে। নিজের ভুল বুঝে স্ত্রী তাঁর একদিন ফিরে আসবে তেমন দার্শনিক মনোভাব নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে পারেন নি তিনি। হোটেলের ঘরে ব'সে ছিলে ছিলে মরছেন। এক ঘণ্টার জন্যও ঘরটার বাইরে আসেন না। সংসারের কারো সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেন নি। পান্থনিবাস-এর মধ্যেই সারা বিশ্বটা সীমাবদ্ধ হ'য়ে গেছে। তিনি মনে মনে সত্যিই বিশ্বাস করেন, তাঁর বন্ধু ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ী একদিন-না-একদিন বউকে তাঁর খুঁজে এনে দেবেন। শশীবাবুর এই ভ্রান্ত ধারনাটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা আমি করি নি।

ট্যাক্সিওয়ালা ব'লে উঠল, "আন্ধেরী আ গিয়া।"

"ও, তাই না কি? চলুন ভাস্করবাবু, এখানেই নেমে পড়ি। তারপর বাড়ির ঠিকানাটা খুঁজে বার করা যাবে।"

নেমে পড়লুম আমরা।

যা ভেবেছিলুম তাই। পুরনো রোগীর ঠিকানা খুঁজছেন প্রশান্তবাবু। আমি রাস্তার অপেক্ষা করতে লাগলুম। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। অফিসের ভিড় চোখে পড়ল আমার। কিন্তু কোথাও কোনো হৈ-হুল্লোড় নেই। গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ছে না কেউ। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভিড়। কলকাতার ঠিক উল্টো।

প্রায় আধঘণ্টা পর ফিরে এলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। বললেন, "না, ডাক্তার প্যাটেলের রোগী এখানে কেউ নেই। ডায়েরীবইতে মিথ্যে নাম আর ঠিকানা লিখে রেখেছেন ব'লে সন্দেহ হচ্ছে আমার। খবর নিলাম, এই ঠিকানায় ডাক্তার প্যাটেলের রোগী কোনোদিনই বাস করে নি।"

"এর অর্থ কি?"

"ক্রমে ক্রমে অর্থটা পরিষ্কার হবে। এখন ভাবছি, রোজগার তাঁর কিছুই নেই।"

"অতো টাকা ইন্‌কামট্যাক্স দেন কি ক'রে?" প্রশ্ন করলুম আমি।

"একটা পূর্ব-পরিকল্পনার আভাস পাচ্ছি। ইন্‌কাম নেই, অথচ ইন্‌কাম ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছেন—ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না আপনার?"

"না মশাই, আমি আর কাউকে সন্দেহ করব না। নিজেকে বোকা বানাবার ইচ্ছে নেই আমার।" হাসতে লাগলুম আমি।

"তা হ'লে চলুন একবার মালাবার হিল্‌সে যাই। সেখানেও একজন রোগীর ঠিকানা আছে।" ট্যাক্সি ডাকলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, "কাল তো রূপকুমারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জেরা করতেও ছাড়েন নি। সে কি বলে?"

"প্রথমে তো কথা বলতে চায় না, শুধু রেগে ওঠে। বড্ড বদমেজাজী। মিষ্টি কথা ব'লে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলাম। আপনি যে এসেছেন এখানে তা সে জানে। আদালতে দেখেছে আপনাকে। জানতে চেয়েছিল, বাবা কিংবা পরেশবাবুও এসেছেন কি না। বললাম, না তাঁরা আসেন নি। হাজত-বাসের পর মনে হ'ল খানিকটা লজ্জাবোধ এসেছে রূপকুমারীর। খান্দুভাই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম তাকে। সে বললে যে, ঘটনার দিন খান্দুভাই ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবীর কাছে। লক্ষ্মীদেবী শোবার ঘরে ছিলেন। সে গিয়ে সোজাসুজি ঢুকে পড়েছিল সেইখানে। বাবুরাওকেও সে দেখেছিল। বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। সেদিন তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন, সঙ্গে ড্রাইভার ছিল না। বাবু রাও-এর সঙ্গে কথা বললেন খান্দুভাই। একটা কথাও বুঝতে পারে নি রূপকুমারী। কারণ, গুজরাটি ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, সেদিন বাবু রাও-কে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মনে হয়েছিল, সে যেন খান্দুভাই-এর জন্যই অপেক্ষা করছিল বাড়ির সামনে। যাই হোক, সন্ধ্যের সময় একলাই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্মী দেবীর অনুরোধে রূপকুমারী থেকে গেল। ট্যাক্সি ক'রে ওকে তাজমহল হোটেলে পাঠিয়ে দেবেন ব'লে কথা দিলেন লক্ষ্মী দেবী।"

"ফিরে গিয়েছিল কার সঙ্গে?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"সেইটেই একটা রহস্য। রূপকুমারী বলছে খান্দুভাই ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। [illegible] বাধিয়েছেন

ড্রাইভার। কিন্তু আপনি তো জানেন, বাবু রাও কালকে অন্য কথা বলেছে। কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছে। এখানেই নেমে পড়ি আসুন—"

যেখানে নামলুম আমরা সেখান থেকে পেড্রোর বাড়িটা কাছেই। বোধহয় দু'খানা বাড়ি পরে। এবারেও আমি রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলুম। নোট বই বার ক'রে ঠিকানাটা একবার দেখে নিলেন প্রশান্তবাবু। আমি পায়চারি করতে লাগলুম। হাঁটতে হাঁটতে একবার চ'লে গেলুম পেড্রোর বাড়ির দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। দুটো বাড়ির পরেই পেড্রোর বাড়িটা দেখতে পেলুম। গাড়ি-বারান্দাটার তলায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলুম। ওটা কি পেড্রোর গাড়ি না কি? নতুন গাড়ি ব'লেই তো মনে হচ্ছে। আবার আমার বুকের হাড়ে জ্বলুনী আরম্ভ হ'ল। মালদায় পেড্রো গুণ্ডার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সেখানে চালচুলো কিছু ছিল না, এখানে সে মালাবার পাহাড়ে থাকে! পরিবর্তনটা বড্ড বেশি আকস্মিক। ভগবানের লীলা-রহস্য বোঝা মুশকিল। লগ্ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউসের গল্পটা শুনেছি। এখন মালদা থেকে মালাবার-এর গল্পটা ছবির মতো চোখের ওপর ভেসে উঠল। পেড্রোর আর অভাব কিছু নেই। শুধু মীনাক্ষীকে পেলে ষোল আনা আশা ওর পূর্ণ হয়। জেল থেকে মুক্তি পেলে মীনা কি করবে বুঝতে পারছি না। যদি সে পেড্রোকে ভাল না বাসে তাহ'লে কার কাছে যাবে? পরেশবাবু নিশ্চয়ই ওকে আর গ্রহণ করবেন না। মন্মথবাবুর মতো শান্তি-প্রিয় মানুষ কি একটি লকলকে আগুনের শিখাকে ঘরে রেখে মালদা শহরে বাস করতে পারবেন? তা ছাড়া অতো বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুকের তলায় চেপে রেখে মীনাক্ষীর পক্ষেও ছোট শহরে বাস করা অসম্ভব হবে। তবে সে যাবে কোথায়? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো আমি অবিশ্যি ওর সামনেই পড়ে রয়েছি। মীনাকে আশ্রয় দেওয়ার লোভ আমারই বোধহয় সবার চেয়ে বেশি। ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার দৃষ্টান্তটা কি চোখে পড়বে না মীনার?

ফিরে এলুম নিচুর দিকে। প্রশান্ত-বাবু অপেক্ষা করছিলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হ'ল?"

"ঐ নামে কোনো লোক এখানে নেই। কোনোদিনই ছিল না। খুনের রহস্যটা ক্রমশই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এখন আপনি কি করবেন, ভাস্করবাবু? আমি একবার

শারদীয়ার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন.....

আর. ডি. বির ছবি

শশীবাবুর সংসার (রজত জয়ন্তী)

শেষপর্যন্ত (সুবর্ণ জয়ন্তী)

কাঞ্চন মূল্য (রজত জয়ন্তী)

পরবর্তী চিত্রমুক্তি

আর. ডি. বনশাল প্রযোজিত

প্রতিভা বসুর

অতল জলের আহ্বান

চিত্রনাট্য: বাণীকুমার ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা: অজয় কর সঙ্গীত: হেমন্ত মুখার্জী

সুমিত্রা বিশ্বাস · সৌমিত্র · ভানু · জহর · ছায়া দেবী

তরুণকুমার · রঞ্জনা · অপর্ণা

তারাশঙ্করের রাজপুত্র

কালকূটের অলকা প্রস্তুতির পথে

STEVE REEVS

GOLIATH AND THE BARBARIANS

আর, ডি, বি এণ্ড কোম্পানী

লোটাস সিনেমা বিল্ডিংস্

১০৬এ, এস. এন. ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা—১৪

সি-আই-ডি বিভাগের বড় সাহেব মিস্টার ফ্লাইডারের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। সাড়ে ছ'টায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা।"

"আমি হোটেলে ফিরে যাব।"

এই সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের পাশে। পোলো টুপী পরা মাথাটা গাড়ির বাইরে বার ক'রে দিয়ে পেড্রো জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কি করছ, ভাস্করদা? আরে, দাদা যে!" গাড়ি থেকে নেমে প্রশান্ত লাহিড়ীর পা-এর ধুলো নিতে যাচ্ছিল পেড্রো। কিন্তু বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "থাক, থাক। এতো ভীড় তোমার তো থাকবার কথা নয়।"

"তা ঠিক, আমি তো গুণ্ডা—" গম্ভীর হ'য়ে গেল পেড্রো।

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "আমি চলি। ঐ একটা ট্যাক্সি আসছে।"

চ'লে গেলেন ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ী।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল পেড্রো। এই দৃশ্যটা মালদা শহরের গলির অন্ধকারে কতবার চোখে পড়েছে। কতদিন ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠে লাফিয়ে স'রে গিয়েছি দূরে। হো হো ক'রে হেসে উঠেছে পেড্রো। আগে সে পা'-জামা পরত। মাথায় লাগাত পোলো টুপী। তারপর কোথা থেকে একটা খাকী ট্রাউজার জোগাড় করল। এখন সন্দেহ হচ্ছে, খাকী ট্রাউজার কেনবার পয়সা দিয়েছিল মীনাক্ষী। এক মেয়ে ব'লে মনুষ্যবাবু মীনাক্ষীর হাতে টাকা দিতে কার্পণ্য করেন নি কখনো।

গাড়ির গায়ে হাত বুলতে লাগলুম আমি। বললুম, "খাসা গাড়ি কিনেছিস পেড্রো। তোর দেহের মতো মজবুত। কতো পড়ল রে?"

"বারো হাজার। প্রথম পাঁচ হাজার নগদ দিয়েছি। তারপর কিস্তী চলছে। চলো না ভাস্করদা, বোম্বে শহরটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি তোমায়। যাবে?"

"মাগনা মদ বামুনেও খায়। যাব নিশ্চয়ই। হ্যাঁ রে পেড্রো, রূপকুমারীকে পাশে বসিয়ে হাওয়া খেতে যাস নি কখনো?"

"না।"

"কেন?"

"সে বলত, গুণ্ডার সঙ্গে মেলামেশা করলে লোকে অপবাদ দেবে। আমার কপালে একটা দাগ দেখছ, ভাস্করদা?" পেড্রো টুপীটা মাথা থেকে আলগা ক'রে তুলে ধরল সে। আমি দেখলুম, কপালে ওর সত্যি সত্যি একটা দাগ রয়েছে। আধ ইঞ্চির মতো লম্বা। বললুম, "হ্যাঁ, দাগ তো একটা দেখতে পাচ্ছি। রাজটিকা না কি রে? কই আগে তো কখনো দেখি নি?"

"আগে ছিল না। রাজটিকাই বটে! মীনাক্ষী একদিন জুতো ছুঁড়ে মেরে-ছিল। তাজমহল হোটেলে গিয়েছিলাম দেখা করতে। সেখানে গেলে ভীষণ রেগে যেত সে। বলত, বরবাদ্‌চিরা দেখতে পেলে নিন্দে করবে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "তা হ'লে যেতিস কেন?"

"মীনাক্ষী একদিন চিঠি লিখে জানিয়েছিল টাকার অভাবে পড়েছে। তাই টাকা দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই ব'লে উঠল সে, 'বর্বর খৃস্টীয়ান, লোক দিয়ে কিংবা মণিঅর্ডার ক'রে টাকাটা পাঠাতে পারলে না? তোমার অনুগ্রহ আমি চাই না। পনরো হাজার টাকার গহনা তুমি রেখে দিয়েছ। সেটা বাঁধা রেখে আমার হাজার পাঁচেক টাকা এনে দাও।' আমি দু' হাজার টাকা ওর দিকে এগিয়ে ধ'রে বললাম, 'গহনাগুলো হাত-ছাড়া ক'রো না। টাকা লাগে আমি আরও দেব।' টাকার বাণ্ডিলটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মীনা, 'এতো বড় আস্পর্দার কথা! আমি তোমার রক্ষিতা না কি? বেরিয়ে যাও এখান থেকে—' তবু দাঁড়িয়ে রইলাম ব'লে পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে কস ক'রে মেরে বসল আমায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। চ'লে যাচ্ছিলাম। বললে সে, 'নিরক্ষর চাষা, একটু দাঁড়াও।' ছুটে গিয়ে বাথরুম থেকে তুলো আর আইডিন নিয়ে এল। আমার কপালে আইডিন লাগাতে লাগাতে বলল, 'জুতোর গোড়ালিতে কতো ধুলোমাটি থাকে। সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে তাও কি জানো না? ক্লাস সেভেনে তুমি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়ো নি, পাদ্রীদা? অশিক্ষিত মেষপালক আর কাকে বলে! যাও, মাঠে গিয়ে এবার ভেড়া চড়াও গে যাও। এখানে আর কখনো এসো না, বুঝলে?' আর কোনো দিনও তাজমহল হোটেলে যাই নি, ভাস্করদা। মাস খানেক আগের ঘটনা।"

"ভাল করেছিস না গিয়ে। রূপকুমারী তোকে ভালবাসে না রে—এতো অপমান তুই সহ্য করিস কি ব'লে, পেড্রো?"

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পেড্রো বলল, "আমি ওকে ভালবাসি কি না.....তাই মান অপমানের প্রশ্ন কখনো আমার মনে ওঠে না। ভাস্করদা, আমায় তুমি আহাম্মক ভাবছ, তাই না?"

"তোর চেয়ে বড় আহাম্মক সংসারে আর দ্বিতীয়টি নেই। চল, এবার বোম্বে শহরটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। রূপোলী সিনেমার মালিকদের গিয়ে বলব সব কথা।"

গাড়িতে স্টার্ট দিল পেড্রো।

দিন দুই হোটেল থেকে বাইরে বেরুলেন না প্রশান্ত লাহিড়ী। যখনি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকি তখনি তিনি বলেন, "তদন্ত শেষ হয়েছে। মনে মনে গল্পটাকে সাজাচ্ছি এখন। খুনীটাকে ধরেছি ব'লে আশা হচ্ছে। কিন্তু চোরটা এখনো জালে পড়ছে না।"

"তার মানে? খুনী আর চোর দু'জন আলাদা আলাদা লোক নাকি?"

"সেই রকমই সন্দেহ হচ্ছে।"

"তবে কি টাকার জন্য লক্ষ্মীদেবীকে খুন করেনি?"

"টাকা চুরি করাটাই যে আসল উদ্দেশ্য তাতে আর সন্দেহ নেই।"

"না মশাই; আপনার ধাঁধার উত্তর আপনিই ঠিক করুন। আমার মাথায় ওসব কিছু ঢুকছে না। এই যে ইনস্‌পেক্টর দেশাই এসে গিয়েছেন। দুটিতে বসে দরজা বন্ধ ক'রে ভাবুন। পরে আমি শুনব সব।"

তৃতীয় দিনও প্রশান্তবাবু হোটেলেই রইলেন। সকালবেলা ইনসপেক্টর দেশাই একবার এসেছিলেন। সঙ্গে দেশমুখও ছিল। দরজা বন্ধ ক'রে কি যে ও'রা আলাপ-আলোচনা করলেন জানি না। জানবার আকাঙ্খা আমার আর নেই। আমি শুধু ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি। মীনাক্ষী মুক্তি পেলেই হ'ল। ওর জন্যই তো আমার বোম্বে আসা।

সন্ধ্যার পর প্রশান্ত লাহিড়ী আমার ঘরে এলেন। বললেন যে, সকালের ডাকে কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে। মেয়েটার জ্বর আরও বেড়েছে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন, টাইফয়েড।

জিজ্ঞাসা করলুম, "তদন্তের কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন বাকী কাজটুকু

সেশাই-এর বাড়ে চাপিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"খাসীটুকুর জন্যই তো বোম্বে এসেছি। অর্থাৎ অপরাধীকে জল থেকে ডাঙায় তুলে আনতে হবে। প্রত্যেকটি আসামী তো দেখছি গভীর জলের মাছ। পেড্রো নিশ্চিন্ত মনে শুটিং-এ যোগ দিচ্ছে। খান্দুভাই অফিস নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার প্যাটেলও বাড়ি থেকে বাইরে আসেন না। বাবু রাও সিন্ধি রান্নাবান্না ক'রে খেয়েদেয়ে আরামে ঘুম লাগাচ্ছে। আমরা শুধু ওঁদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা চোখ রাখবার ঝামেলা পোয়াচ্ছি।"

"এই যে কাল বললেন, খুনীটার হদিস পেয়েছেন?"

"মনে মনে তো পেয়েছি। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণের তো দরকার। তা ছাড়া চোরটাকেও খুঁজে বার করা চাই।"

একটু পরে ইনসপেক্টর সেশাই এলেন। আমার ঘরে ব'সেই গল্প-গুজব চলতে লাগল। ওঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। ইনস্‌পেক্টর সেশাই-এর বিশ্বাস, এর মধ্যে অন্য একটা অদৃশ্য হাত লুকনো আছে। কিন্তু ইনসপেক্টর লাহিড়ী বলেন, "না, এঁদের মধ্যেই খুনী, এঁদের মধ্যেই চোর।" প্রশান্তবাবুর এই যুক্তিটাও মেনে নেননি ইনসপেক্টর সেশাই। তাঁর ধারণা, যে খুনী সেই চোর।

রাত প্রায় দশটা। উঠে পড়েছিলেন ইনস্‌পেক্টর সেশাই। এমন সময় আমার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, ওপাশে সেই পোলো টুপী পরা মুণ্ডাটি এসে উপস্থিত হল। বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "আসতে পারি কি, ভাস্করদা?"

"আয়, আয়। কি ব্যাপার এত রাত্রে? প্রশান্তবাবু, পেড্রো এসেছে।"

ভেতরে এল পেড্রো। উত্তেজনায় মুখের রেখা ভাঙাচোরা। সে বলল, "খান্দুভাই আর ডাক্তার প্যাটেল এক সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বাড়ির দিকে গেলেন। খান্দুভাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আর ডাক্তার প্যাটেল তাঁর দিকে ঝুঁকে ব'সে রয়েছেন দেখলাম।"

"কোথা থেকে আসছিলেন ওঁরা?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"তা তো আমি দেখিনি।"

"অত দূর করবেন না, মিস্টার সেশাই। ওহে পেড্রো সাহেব তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে কি?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"আছে।"

"তা হলে তোমার গাড়িতেই যাই। ডাক্তার প্যাটেল কিংবা খান্দুভাই তোমার গাড়িটাকে চেনেন?"

"এতো বড় আশ্চর্যের কথা। আমি তোমার রক্ষিতা না কি?"

"বোধ হয় না।"

"মিস্টার সেশাই আপনি একবার বড়সাহেবকে ফোন ক'রে বলুন, আমরা ওখানে যাচ্ছি।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "আমায় সঙ্গে নেবেন না?"

"বেশ তো, চলুন না—"

যে-রাস্তা দিয়ে প্রথমদিন আমরা লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি গিয়েছিলুম, সেই রাস্তাটা এড়িয়ে যেতে বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী। অন্য একটা রাস্তাও ছিল সেখান দিয়ে গেলে লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি পৌঁছতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগে। আমরা সেই পথেই ওঁদের অনুসরণ করতে লাগলুম। প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, সেই পথেই ওঁদের ধরতে হবে। পেড্রো সাহেব, আরও একটু জোরে চালাও। হাগ-রাত্তোহরা হাই ওয়ের ওপর কোথাও যেন আমাদের পড়তে না হয়। তা হলে ওখানে ভিড় বাড়তে পারে।"

গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল পেড্রো। যেখান থেকে রাস্তাটা দুদিকে আলাদা হয়ে গিয়েছে সেইখানে পৌঁছতেই ইনসপেক্টর সেশাই বললেন, "একটু দাঁড়াও, পেড্রো সাহেব। ঐ কে যাচ্ছে সাইকেলে চেপে? সেলমুখ না?"

হ্যাঁ, সেলমুখই বটে। সাইকেল থেকে নেমে পড়ে সেলমুখ বলল, "আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম, সার।"

"কেন, কি ব্যাপার?"

একটু আগে খান্দুভাই আর ডাক্তার প্যাটেল গাড়ি থেকে নামলেন। খান্দুভাই

আগে আগে আর ডাক্তার প্যাটেল পেছনে। খান্দুভাই-এর পিঠে পিস্তলের মুখটা ঠেকিয়ে রেখেছেন ব'লে খবর দিল আমাদের ওখানকার ইন্‌ফরমার।"

"তা হ'লে ডাক্তার প্যাটেল তাঁকে জোর ক'রে ধরে এনেছেন—এ তো দেখছি আবার নতুন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়। চলো, পেড্রো সাহেব—শিগ্‌গীর।" তাড়া দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

রাস্তাটা পার হ'য়ে এল পেড্রো। তারপর মাঠ। এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করল না সে। গাড়িটা নামিয়ে দিল মাঠের মধ্যে। প্রশান্তবাবু বললেন, "এ কি করছ, গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে না?"

"বাস্, থাক।" বে-পরোয়াভাবে জবাব দিল পেড্রো।

পুরো মাঠ-টা গাড়িতে বসে অতিক্রম করা গেল না। মাঝখানে নেমে গেলুম আমরা। ছুটতে লাগলুম সবাই। প্রশান্ত লাহিড়ী সবার আগে। আমি অবিশ্যি একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলুম। পেড্রো আমার হাত চেপে ধরল। জিজ্ঞাসা করল, "কষ্ট হচ্ছে না কি, ভাস্করদা?"

"তা একটু হচ্ছে বৈ কি। তোরা হচ্ছিস গিয়ে গুণ্ডা আর পুলিশ। চড়াই-উৎরাই লাফিয়ে পার হ'য়ে যাওয়া তোদের অভ্যেস আছে। ও কি, অতো জোরে টানছিস কেন? ছাড়, ছেড়ে দে—আমি একাই যেতে পারব।" পেড্রো তবু আমার হাত ছাড়ল না। টানতে টানতে নিয়ে এল আমায়। প্রশান্ত লাহিড়ী আর দেশাই অবলীলাক্রমে উঠে গেলেন প্রাচীরের ওপর। পেড্রো তার ঘাড়টা নিচু করে দিয়ে বলল, "এখানে পা রেখে উঠে পড়ো তুমি, ভাস্করদা।"

আপত্তি জানাবার সময় নেই। আমি দেখলুম, ও'রা দুজন প্রাচীরের ও-পাশে নিঃশব্দে নেমে পড়লেন। পেড্রোর ঘাড়ের ওপর উঠে পড়লুম আমি। ঘাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রাচীরটা টপকাতে কষ্ট হ'ল না আর। এক মুহূর্তের মধ্যে পেড্রোও নেমে এল লক্ষ্মীদেবীর বাগানে।

এবার ইন্সপেক্টর দেশাই চললেন আগে আগে। পথঘাট তাঁর চেনা। পা টিপে টিপে পথ চলছিলুম আমরা। ইন্সপেক্টর দেশাই দেখলুম পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে হাতে রাখলেন। ব্যাপার দেখে আমার মনে হ'ল, এটা বোধ হয় পেড্রোর ফাইটিং পিক্‌চারের রিহার্সেল হচ্ছে। এই ছবিটার নাম কি 'বাগদাদ কা খুনী?'

লক্ষ্মীদেবীর বাবুর্চিখানাটা পেছন দিকে। পর পর তিন চারখানা ঘর ব্যারাকের মতো পাশাপাশি। এর মধ্যে একটা ঘরে বাবু রাও থাকে। জানলাটা এখন খোলা রয়েছে। আমরা এসে ঐ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। সাধারণ বাঙালীর চেয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী লম্বা। গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে তিনি বাবু রাও-এর ঘরের দৃশ্যটা দেখে নিলেন একবার। তারপর আমরাও এক এক ক'রে ঘরের ভেতরটা দেখলুম।

সত্যই নাটকীয় ব্যাপার। ডাক্তার প্যাটেল খান্দুভাই-এর বুকের সঙ্গে পিস্তলের মুখটা ঠেকিয়ে রেখেছেন। চৌকির ওপর ব'সে বাবু রাও ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। ডাক্তার প্যাটেল বললেন, আমি জানি লক্ষ্মীর টাকার সন্ধান আর কারো জানা ছিল না। টাকাটা আপনারাই নিয়েছেন। স্বীকার করুন খান্দুভাই—নইলে আজ আপনারা আমার গুলী খেয়ে মরবেন। আমি ঘড়ি দেখছি, আর দু' মিনিটের সময় দিলাম—"

বাইরে দাঁড়িয়ে আমরাও মিনিট গুনতে লাগলুম। কী সাংঘাতিক উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তা! প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে দু' মিনিট ফুরিয়ে গেল বুঝি। এবার বোধ হয় গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হবে। আওয়াজ হ'ল কিন্তু কান্নার। বাবু রাও কাঁদছে। ভয় পেয়েছে সে। মৃত্যুকে ভয় কে না করে? টিক টিক ক'রে সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। ইন্‌স্পেক্টর দেশাই-এর হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে নিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে নলটা চুকিয়ে রেখে তিনিও ঘরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। আমার সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। বাগদাদ কা খুনীর নায়কটির কোমরটা যে কখন আমি জড়িয়ে ধ'রে রেখেছিলুম টের পাই নি তা। নিজের অজ্ঞাতসারে আর কি কি যে করেছি আজ আর তা মনে করতে পারছি না।

ডাক্তার প্যাটেলের কণ্ঠ থেকে সতর্ক-ধ্বনি উচ্চারিত হ'ল, "আর আধ মিনিট আছে, খান্দুভাই। বলুন, লক্ষ্মীর টাকা চুরি করেছে কে?"

এবার ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল বাবু রাও। কানে আঙুল দিলুম আমি। গুলীর শব্দটা শুনতে চাই না। থিয়েটার-ফিল্মে চার-পাঁচটা মৃত্যু ঘটলে আসে যায় না কিছু। ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হ'য়ে গিয়েছে। দেহের বাইরে এবং ভেতরে দুই স্তরেই জল। লক্ষ্মী দেবীর বাগানে আজ জোনাকীর অভাব নেই। অন্ধকারের ঘনত্ব ওরাই খানিকটা হাল্কা ক'রে দিচ্ছে। মৃত্যুর পরে লক্ষ্মী দেবী আবার হয়তো জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অসংখ্য জোনাকীর মধ্যে একটা জোনাকী বোধ হয় তিনি নিজেই। আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনিও কি আজ এই দৃশ্যটা দেখতে এসেছেন? তাঁরই প্রেমাস্পদ ডাক্তার প্যাটেলকে দেখবার সাধ হয়েছে নিশ্চয়ই। একটা জোনাকী তার পুচ্ছদেশ থেকে আলোক বিকিরণ করতে করতে উঠে গেল জানলা পর্যন্ত।

খান্দুভাই-এর গলার সুর চিনতে পারলুম আমি। কম্পিত কণ্ঠে বললেন তিনি, "হ্যাঁ, টাকাটা আমিই চুরি করেছি।"

হেসে উঠলেন ডাক্তার প্যাটেল। হাসি থামতে সময় লাগল। তারপর তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "কখন নিলেন এবং কবে?"

"খুনের দিন সন্ধেবেলা। রূপকুমারী যখন মাসীমার সঙ্গে গল্প করছিল সেই সময় বাবু রাও স্নানঘরের জানলা দিয়ে টাকার বাণ্ডিলটা ফেলে দিয়েছিল বাগানে।"

"রূপকুমারী এ খবর জানে?"

"না। মাসীমাকে অন্য ঘরে ব্যস্ত রাখার কৌশলটা সে ধরতে পারে নি।"

ডাক্তার প্যাটেল আরও মিনিট দুই নীরব রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মীকে খুন করল কে?"

"আমরা কেউ নই।"

"পুলিশ তা কখনো বিশ্বাস করবে না। ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না, খান্দুভাই। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। পুলিশকেও টেলিফোনে খবর দিয়ে আসি।"

"একটু দাঁড়ান, ডাক্তার প্যাটেল। লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে আপনার অবৈধ প্রণয় ছিল তা আমরা জানি। অনেক কিছু বাবু রাও স্বচক্ষে দেখেছে। মাসীমার টাকাটা আপনি একাই পাবেন ব'লে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন।

আসুন, তিন লাখ টাকা আমরা ভাগ করে নিই। আমরা যখন কেউ খুন করি নি, তখন ভয় করব কাকে? আপনি নিন দেড় লাখ, আমি এক লাখ আর বাবু রাও নিক পঞ্চাশ হাজার। রাজী?"

"টাকাটা কোথায়?"

"আমার গাড়ির পেছনের সীটের তলায়।"

আবার মিনিট দুই তিনের নৈঃশব্দ্য। গল্পটা শুনতে এবার আমার মজা লাগছিল। ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছে। জোনাকীটাও দেখলুম, জানলা থেকে সরে যাচ্ছে দূরে। চোরটাকেই বোধ হয় দেখতে এসেছিলেন তিনি। খুনীর সঙ্গে মোলাকাত তাঁর নিশ্চয়ই হয়েছিল। অন্তত প্রশান্ত লাহিড়ীর সেই রকমই বিশ্বাস।

ডাক্তার প্যাটেল বললেন, "খুনীটাকে না ধরতে পারলে, পুলিশের তদন্ত বন্ধ হবে না।"

খান্দুভাই বললেন, "রূপকুমারী আর পেড্রোর ওপর সন্দেহটা সৃষ্টি করতে পারা যায়..... যদি হাজার পঞ্চাশ টাকা পেড্রোর গাড়ির মধ্যে কোথাও রেখে আসতে পারেন। সেই সঙ্গে নোটের নম্বর লেখা লিস্টটাও থাকবে। তারপর পুলিশের কাছে একটা উড়ো চিঠি ছেড়ে দেওয়া..... দেখুন ডাক্তার প্যাটেল, আপনার এবং আমার দু'জনেরই টাকার দরকার খুব। এ মাসে আমার কর্মচারীরা মাইনে পায় নি এখনো। এবং আমরা বাঁচতেও চাই।"

"হ্যাঁ, প্ল্যানটা মন্দ নয়। আমাকে বরং আপনি এক লাখ টাকাই দিন। বাকী পঞ্চাশ হাজার পেড্রোর গাড়িতে রাখুন।" একটু থেমে ডাক্তার প্যাটেলই বললেন, "কিন্তু লক্ষ্মীকে সত্যি সত্যি খুন করল কে সেটাও তো জানা চাই খান্দুভাই।"

লক্ষ্মী মাসীমার তো হার্টের ব্যারাম ছিল। হঠাৎ কোন্ দিন টেঁসে যেতেন। আপনার জীবনটা তো মাসীমা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। তিন লাখ টাকার লোভ দেখিয়ে সারাটা জীবন প্র্যাকটিস করতে দেন নি। আপনার যৌবনটাও নষ্ট করেছেন তিনি। বিয়ে-সাদি পর্যন্ত করতে দিলেন না। যে ফ্ল্যাটে থাকেন আপনি তার ভাড়া বাকী পড়েছে ছ' মাসের। আপনার বাড়িওয়ালা আমার বন্ধু। যে-স্ত্রীলোক আপনার এতবড় সর্বনাশ ক'রে গিয়েছে তার হত্যাকারীর নাম জেনে আমাদের কি লাভ?"

"এ-সব গোপন খবর আপনি কার কাছে শুনলেন?"

"বাবু রাও সব জানে। ঐ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটি সব বলত বাবু রাওকে। আমার বিশ্বাস, পাপিষ্ঠাকে যে খুন করেছে সেও টাকার খবরটা জানত। আমাকেও চিনত সে। মাসীমার বাড়িতে ইদানিং ঘন ঘন আসছিলাম কি না—আমরা। বাবু রাও-এর ভাগটা আমি রেখে দেব। মোকর্দমা মিটে গেলে তুমি আমার অফিসে চ'লে এসো, বাবু রাও। বুঝলে?"

এই সময় জোনাকীটা আবার কোথা থেকে উড়ে এসে উঠে গেল জানলা পর্যন্ত। আমি নিঃসন্দেহ হলুম, জোনাকীটাই লক্ষ্মী দেবী। লুকিয়ে

সত্যই নাটকীয় ব্যাপার! ডাক্তার প্যাটেল খান্দুভাই-এর বুকের সঙ্গে পিস্তলের মুখটা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

ভেবেছিল টাকাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। তারপর ঘটনাসমূহের এমন যোগাযোগ ঘটল যে, খুনীটা সিন্দুক খুলে দেখে, টাকাটা বেহাত হ'য়ে গিয়েছে! আমার এমন ধারণা জন্মেছিল, মাসীমা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল খুনীটাকে। সেইজন্য খুনীটা খুন করতে বাধ্য হ'ল তাঁকে। ডাক্তার প্যাটেল, এবার ভেবে দেখুন কী সাংঘাতিক একজন নষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোকের খপ্পরে পড়েছিলেন। আমার তো মনে হয় খুনীটা পুণ্য-কাজ ক'রে গিয়েছে। সে যে টাকাটা পেল না, থার্ড পারসন হিসেবে আমার তা-হি কষ্ট তার জন্য। এবার চলুন, টাকাটা ভাগ ক'রে নিয়ে সরে পড়ি

লুকিয়ে নিজের অতীত ইতিহাস শুনছেন। সুবিখ্যাত বোনপোটির মুখ থেকে লুকনো ইতিহাসটা শুনতে তাঁর ভাল লাগবে না জানি। কিন্তু উপায় কি? তাঁর বিশ্বাসী ভৃত্য বাবু রাও পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পাপ ক'রে এ-জগৎ থেকে স'রে পড়লেও রক্ষা নেই। জোনাকী হ'য়েও নিজের পাপ-কাহিনী শুনবার জন্য ছুটে আসতে হয়। জীবন কাটাতে হয় জঙ্গলের অন্ধকারে। দিনের আলো সহ্য করতে পারে না এরা।

প্রাচীরের ও-পাশে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝলুম, তিনটি চরিত্রই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রিভলবারটা হাতে নিয়ে

প্রশান্ত লাহিড়ী জঙ্গলের পাশ দিয়ে চ'লে গেলেন আগে আগে। আমরাও তাঁর পিছু নিলুম। সামনের দিক থেকে মিস্টার ড্রাইভার এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর দেশমুখ। আমাদের তিনটি দল একই সঙ্গে মিলিত হ'য়ে গেল গাড়ি-বারান্দার তলায়। এ যেন গল্প-উপন্যাসের মতো অলীক মনে হচ্ছে। সত্যিকার জীবনের ঘটনা এ নয়।

প্রশান্ত লাহিড়ীই কথা বললেন প্রথম, "বাবু য়াও, বসবার ঘরের আলো জ্বালিয়ে দাও। আসুন আপনারা ডাক্তার প্যাটেল। আপনাদের গল্প আমরা শুনেছি।"

বসবার ঘরে ঢুকে ডাক্তার প্যাটেল সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, "গল্পটা তা হ'লে শুনেছেন! দেখুন আপনাদের হ'য়ে চোরটাকে ধ'রে দিলুম আমি। বাড়ির সামনে থেকে খান্দুভাই-এর পেটে পিস্তলের নল্ ঠেকিয়ে এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলুম।"

ঘটনাটা যে কি ঘটেছে বড় সাহেব মিস্টার ড্রাইভার আন্দাজ করতে পারলেন না। হাঁ ক'রে ব'সে রইলেন স্বর্গীয়া লক্ষ্মী দেবীর ড্রইং-রুমে। প্রশান্ত লাহিড়ী অল্প কথায় ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। তারপর ইনস্-পেক্টর দেশাইকে বললেন, "একটা টাকাও খরচ হয় নি। খান্দুভাই-এর গাড়ি থেকে টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে আসুন। খান্দুভাইকে সঙ্গে নিয়ে যান।"

ঘরের আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা হয়েছে। হাত পা সব কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ঘটনাগুলো এতো দ্রুতগতিতে ঘটে যাচ্ছিল যে, অনুধাবন করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। তবে একটা কথা আমার স্বীকার করতেই হ'ল। প্রশান্ত লাহিড়ীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না আমার। হ্যাঁ, দুঃখে সি-আই-ডি নিশ্চয়ই।

ওঁদের টাকা নিয়ে ফিরে আসতে বোধ হয় মিনিট পাঁচেকও লাগল না। এই গাড়িটা ছাড়া পুলিশ আর সব জায়গাই সার্চ করেছিল। গাড়ির গদির তলায় যে তিন লাখ টাকা লুকিয়ে রাখতে পারেন খান্দুভাই তেমন অনুমান এঁরা করতে পারেন নি। খান্দুভাই নিজেই গিয়ে টাকাটা বার ক'রে আনলেন ব'লে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগল না। বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছেন তিনি। ডাক্তার প্যাটেল তাঁকে খুনী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করছেন। মুহূর্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য চেঞ্জ হ'ল।

খান্দুভাইকে প্রশ্ন করেন নি কেউ, তা সত্ত্বেও তিনি হাতজোড় ক'রে বলতে লাগলেন, "বাবা বিশ্বনাথের দিব্যি, খুন আমরা করি নি। আমাদের কোনো দোষ নেই। এটা তো আমার আপন মাসীমার টাকা। তাঁকে না ব'লে টাকাটা নিয়েছি, এই যা দোষ। তিনি বেঁচে থাকলে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতেন না।"

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন ডাক্তার প্যাটেল। বলতে লাগলেন, "খুন আপনি করেন নি, তবে করল কে? বাবু য়াওকে দিয়ে আপনিই খুন করিয়েছেন—"

প্রশান্ত লাহিড়ী ডাক্তার প্যাটেলের পকেট থেকে রুপ ক'রে পিস্তলটা বার ক'রে নিয়ে বললেন, "আপনার মনের অবস্থা এখন উন্মাদভাবাপন্ন—বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছেন। এটা সরিয়ে নিলুম। খুন করেছেন আপনি।"

দুম্ ক'রে একটা বোমা পড়ল ঘরে। বড় সাহেব মিস্টার ড্রাইভার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। নড়ে-চড়ে বসলেন একটু। পাইপ ধরালেন তিনি।

প্রশান্ত লাহিড়ী বলতে লাগলেন, "আর কিছু ছিল না, তবু ইন্‌কাম ট্যাক্স দিতেন। তিন লাখ টাকাটার ওপর ভীষণ লোভ ছিল আপনার। লক্ষ্মী দেবী আশা দিয়েছিলেন টাকাটা আপনাকে দিয়ে যাবেন ব'লে। অথচ লোকের কাছে কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন আপনি। অত বড় বিলেত ফেরৎ ডাক্তার রক্ষিতার টাকায় ধনী হয়েছেন শুনলে লোকে কি বলবে? অতএব রোজগারের পুরো টাকাটাই গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে দিচ্ছিলেন আপনি। সত্যি কি না বলুন?"

"এ আপনি কি ক'রে জানলেন?" জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার ড্রাইভার।

"ডাক্তার প্যাটেলের বুড়ো চাকরটি সব জানে, সার। লক্ষ্মী দেবী যে ভল্ট থেকে টাকাটা তুলে এনেছিলেন তাও ইনি জানতেন। সিকিউরিটি বিভাগের সেই কেয়ারটেকার এঁদের দু'জনের কাছ থেকেই ঘুষ খেয়েছে।"

ডাক্তার প্যাটেল অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, "তাতে কি প্রমাণ হয় আমি খুন করেছি?"

"না, তা হয় না—" প্রশান্ত লাহিড়ী উঠে গিয়ে ডাক্তার প্যাটেলের বাঁ হাতের আস্তিনটা ওপর দিকে তুলে ধ'রে বললেন, "এই দেখুন সার, যা এখনো শুকোয় নি। লক্ষ্মী দেবী এঁকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন। এবং ছোরা দিয়ে তিনি এঁকে আঘাত করেছিলেন প্রথম। ডাক্তার প্যাটেল, সত্যি কি না বলুন?"

"হ্যাঁ।" স্বীকার করলেন ডাক্তার প্যাটেল। তারপর নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, "প্রায় বিশ বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস রয়েছে এর পেছনে!! তবু লক্ষ্মীকে আমি খুন করতে চাই নি। টাকাটা নিতেই ঢুকেছিলাম সেইখানে—সে আমায় চিনে ফেলল। ছোরা দিয়ে আঘাত করল আমায়। চেঁচিয়ে উঠল, চোট্টা, ডাকু—আরও কতো কি!..... বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি, লক্ষ্মী বিধবা হয়েছে। ছেলেবেলাকার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। লক্ষ্মী আবার আমার কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করল..... প্রায় বিশ বছরের সম্পর্ক..... বিয়ে করতে চেয়েছি বহুবার..... কিন্তু তবু আমি খুন করতে চাই নি। সঙ্গে আমার কোনো অস্ত্রই ছিল না। লক্ষ্মীই আমায় আঘাত করল প্রথম..... তারপর সিন্দুক খুলে দেখি, টাকার বাণ্ডিলটা উধাও হয়েছে। মিস্টার লাহিড়ীকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না..... আমার পুরনো চাকরটিকে পর্যন্ত ঘুষ দিয়েছেন—"

"গরিব লোক, ছ' মাস থেকে মাইনে পাচ্ছে না সে।" বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"হ্যাঁ, আপনার কৃতিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। যাক, এ ভালই হ'ল। বেঁচে থাকাটাও আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠেছিল। ব্যর্থতার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলাম অনেক নীচে। আমার মৃত্যু হওয়াই উচিত।" ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার প্যাটেল বললেন, "চোরটাকে ধরতে পারছিলেন না আপনারা। আমিই ধরিয়ে দিলাম।"

ইনস্‌পেক্টর দেশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "স্নান ঘরের ছোট দরজাটা খুলে রেখেছিল কে?"

"আমি জানতাম না ওটা খোলা আছে। এখন অবিশ্যি বুঝতে পারছি, টাকার বাণ্ডিলটা ওখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর ওটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল বাবু য়াও। মরবার আগে একটা কথা জেনে গেলাম..... পাপের বাণিজ্যে লাভ হয় না কোনো পক্ষের। লক্ষ্মীর হয় নি, আমারও হ'ল না। চলুন, জল নামবার আগে আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশে ঘন মেঘ। লক্ষ্মীর দু' চোখ ভরা জল!" সোফার গায়ে এলিয়ে

পড়লেন ডাক্তার প্যাটেল। ডান হাতের আঙুলগুলো মটকাতে লাগলেন তিনি।

প্রশান্ত লাহিড়ী এবার পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে বড়সাহেবের দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "সার, এটা রিপোর্ট। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, দেয়ালের গায়ে যে-রক্তটা লেগে ছিল সেটা লক্ষ্মী দেবীর নয়। এটার গ্রুপ আলাদা। আমার ষোল আনা বিশ্বাস, এটা ডাক্তার প্যাটেলেরই রক্ত। তাঁর বাঁ হাতটা ধস্তা-ধস্তির সময় কখন যে দেয়ালের গায়ে লেগে গিয়েছিল টের পান নি তিনি। কাল এঁর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেই সঠিকভাবে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।"

লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু ক'রে রাখলুম আমি। এই আস্তর নিয়ে কতো ঠাট্টা-ইয়ার্কী করেছি প্রশান্তবাবুর সঙ্গে!

সেই রাত্রে এঁদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

॥ দশ ॥

গল্প লিখতে ব'সে পাঠক-পাঠিকাদের মতো আমার নিজের মনেও একটা প্রশ্ন উঠছে : রূপকুমারীর কি হ'ল?

পুলিশ তদন্ত ক'রে দেখল, রূপ-কুমারীর কোনো দোষ নেই। নিজের অজ্ঞাতসারে সে খান্দুভাইকে সাহায্য করেছে বটে, আইনের চোখে তা অপরাধ নয়।

সোমবার দিন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রূপকুমারীকে উপস্থিত করা হ'ল। সেদিন অবিশ্যি আদালতে ভিড় ছিল না। আমি গিয়েছিলুম আদালত বসবার আগেই। সঙ্গে আমার মন্মথবাবু ছিলেন। তিনি রবিবার সকালে এসে বোম্বে পৌঁছেছেন। উঠেছেন আমার হোটেলেই। পনরো দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। লক্ষ্মী দেবীর খুন সম্পর্কে গল্পটা বলেছি তাঁকে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই ব্যাপারের সঙ্গে মীনাক্ষীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যোগা-যোগ কিছু নেই। তা হ'লেও মালদা-শহরের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে খুনের গল্পটা শোনবার জন্য। খবরের কাগজের বিক্রি বেড়ে গিয়েছে। লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না মন্মথবাবু। পাড়ার ওপর ক্ষেপে রয়েছে শহরের লোক।

মন্মথবাবুকে বুঝিয়ে বললুম যে, পেড্রোর দোষ নেই। থাকলেও খুব সামান্য। মন্মথবাবু বিশ্বাস করলেন না। মালদার লোকেরাও বিশ্বাস করবে না জানি। সেই জন্যই আজ আমি গল্পটা লিখে ফেললুম। বই আকারে যখন বেরুবে তখন পেড্রোকে চিনতে পারবে সবাই। বোধ হয় এই গল্পের মধ্যে পেড্রো-চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটলে কাহিনীটা আমি লিখতুমই না। খবরের কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা বোম্বে থেকে যা লিখে পাঠাতেন তাই প'ড়েই পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মিটে যেত।

সোমবার বেলা এগারোটার সময় রূপকুমারীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপ-স্থিত করল পুলিশ। রূপকুমারীর জন্য সেদিন আর কোনো উকিল-ব্যারিস্টার আসেন নি। সবাই জানেন, খান্দুভাইকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফী দেওয়ার লোক নেই। আগে থেকেই উকিল-ব্যারিস্টারেরা সাবধান হ'তে গিয়েছেন।

অবিশ্যি উকিল-ব্যারিস্টারের দর-কারও ছিল না। পেড্রো তবু তার নিজের ব্যারিস্টার মিস্টার ভগতকে নিয়ে এসেছে আদালতে। আজ ওর নিজেরও মুক্তির দিন। ওর বিরুদ্ধেও অভিযোগ প্রত্যাহার করেছে পুলিশ।

মন্মথবাবু আদালতের ভেতরে ঢুকলেন না। তিনি নিজেও পেশকার। সারাজীবন আদালতের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছেন। আসামী-ফরিয়াদী দেখবার কৌতূহল তাঁর নেই।

সেই কাঠগড়াটার মধ্যেই রূপকুমারী এসে বসল। আজও দেখলুম, চারদিকে পাহারাওয়ালাদের ভিড়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সতর্কতা ওদের অবলম্বন করতেই হয়। ইনস্পেক্টর দেশাই ম্যাজি-স্ট্রেটের কাছে তাঁর নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। এবং বললেন, "ইওর অনার, আসামী রূপকুমারীর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।"

পেড্রোর সম্বন্ধেও সেই একই কথা বললেন তিনি। এদের মুক্তির কথা ঘোষণা ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অর্ডার লিখলেন।

আমি মীনাক্ষীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলুম। খাঁচার মধ্যে ব'সে কি যে সে ভাবছিল জানি না। মালদা শহরটাকে চিরকালই সে গ্রামের মতো ক্ষুদ্র জায়গা ব'লে সমালোচনা করত। বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে নি। ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস আজ প্রায় তেরো-চোদ্দ দিন ধ'রে হাজতে বাস করছে সে। ঐ স্বল্প আয়তনটুকুর

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ, হস্ত-রেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক, গভর্ণ-মেণ্ট দ্বারা উপাধিপ্রাপ্ত রাজ-জ্যোতিষী মহো-পধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রীহরিশ চন্দ্র শাস্ত্রী মোক্ষবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা লোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা-মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অদ্বিতীয়। তিনি প্রশ্ন গণনায়, কপ্তকোষ্ঠি নির্মাণে এবং নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধারে অদ্বিতীয়। দেশ-বিদেশের মনীষিবৃন্দ নানাভাবে সুফল লাভ করিয়া অযাচিত প্রশংসাপত্রাদি দিয়াছেন। আপনিও নিজের ভাগ্যও জেনে নিন।

সদা ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ

শান্তি কবচ:—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্ব-দুর্গতিনাশক, সাধারণ—৫৲, বিশেষ—২০৲।

কল্যাণ কবচ:—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲, বিশেষ—৪৫৲।

ধনদা কবচ:—লক্ষ্মীদেবী পুত্র, আয়ু, ধন ও কীর্তি দান করিয়া ভাগ্যবান করেন। সাধারণ—২৫৲, বিশেষ—২৫০৲।

হাউস অব এস্ট্রোলজি (ফোন ৪৭-৪৬৯০)
৪৫এ, এস. পি. মুখার্জি রোড,
কলিকাতা—২৬।

মধ্যে একটা তুলনামূলক ছবি কি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে নি? হাজতের তুলনায় মালদা শহরটাকে কি বিরাট বড় ব'লে মনে হয় নি ওর? কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে মীনাক্ষী জানি না। কর্মী-বিহীন তুরুপের মতো উচ্চাকাঙ্খায় তুরুপটিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তা হ'লে সে পথে-বিপথে ছুটে বেড়ায়। কন্যাটিকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা চাই। এই জন্য হয়তো শিক্ষার প্রয়োজন আছে। পিতার কর্তব্য সম্পাদনে মন্মথবাবু যে অত্যন্ত শিথিল ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

প্রশান্ত লাহিড়ী শনিবার দিনই প্লেন ধ'রে চ'লে গিয়েছেন কলকাতা। ফেরার মুখে তাঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বার বার। এমন সুন্দর একটি সামাজিকতাপ্রিয় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় হয় নি।

আদালতের বাইরের বারান্দায় এসে মীনাক্ষী বলল, "কাপড়-চোপড় বদলাতে হবে। আগে একবার তাজমহল হোটেলে চলো ভাস্করদা।"

বললুম, "সেখানে তোমার কাপড়-চোপড় নেই।"

"কেন?"

"অনেক টাকা বাকী ছিল। বহুদিন থেকে বিলের টাকা শোধ করতে পার-ছিলেন না খান্দুভাই। তোমার ঘরটাকে খালি ক'রে দিতে হ'ল।"

"কে করল খালি?"

"পেড্রো। প্রায় হাজার পাঁচেক টাকার বিল জমে গিয়েছিল।"

"টাকা শোধ করল কে?"

"পেড্রো।"

"খান্দুভাই এখন কোথায় ভাস্করদা? তাঁকে তো দেখছি না?"

"তিনি আবার হাজতে ঢুকেছেন। লক্ষ্মী সেবীর তিন লাখ টাকা তিনিই চুরি করেছিলেন। কিন্তু মহিলাটি খুন হয়েছেন ডাক্তার প্যাটেলের হাতে। মীনা, এঁদের নামগুলো এখন তোমার ভুলে যেতে হবে। হয়তো এখানকার জগতটা খুবই বড়—হ্যাঁ, স্বীকার করছি বিরাট। কিন্তু এই জগতে বাস করবার জন্য তুমি তৈরি হও নি।"

কথাগুলো আমার চুপ ক'রে শুনল মীনাক্ষী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "পাদ্রী দা কোথায়?"

"ঐ তো এগিয়ে গিয়েছে—চলো, তোমার বাবা এসেছেন।"

"আর কেউ আসে নি?"

চমকে উঠলুম আমি। আর কে আসবে ব'লে আশা করছে মীনাক্ষী? পরেশবাবুর কথা ভাবছে না কি সে? তাঁর নামটা উচ্চারণ করতে সাহস পেলুম না আমি। চুপ ক'রে রইলুম। খানিকটা দূরে এগিয়ে আসবার পর দেখা হ'ল মন্মথবাবুর সঙ্গে। দু' চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছিল।

পেড্রো এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। পোলো টুপীটা মাথা থেকে একটু তুলে সম্মান দেখাল মন্মথবাবুকে। মীনাক্ষীর দিকে মুখ ক'রে বলল, "এই যে তোমার গহনার প্যাকেট—"

"বাবার হাতে দাও।"

হাত বাড়িয়ে প্যাকেট-টা নিয়ে নিলেন মন্মথবাবু। তারপর পেড্রো আবার বলল, তোমার যে-সব জিনিসপত্র তাজমহল হোটেলে ছিল, সবই পৌঁছে দিয়ে এসেছি ভাস্করদার হোটেলে। শুধু তোমার সেই এক পাটি জুতো ফিরিয়ে দিই নি। আমি চলি মীনা, বাই বাই—" মাথাটা নিচু করল একটু। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল ওর নিজের গাড়িটার দিকে।

আমার নিজের চোখ আর শুকনো ছিল না। রুমাল বার ক'রে চোখ মুছতে লাগলুম। ঐ গুণ্ডাটা শেষ পর্যন্ত আমায় না কাঁদিয়ে বিদায় নিতে পারল না।

মন্মথবাবু বললেন "পরেশ এসেছে। বোধ হয় পরেশ। গাখো তো।" আমরা তিনজনেই একসঙ্গে পুব দিকে দৃষ্টি দিলুম। হ্যাঁ, পরেশবাবুই তো। গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাতে একটা চটের ব্যাগ রয়েছে। বোধ হয় জামা-কাপড় এনেছেন ওতে ক'রে। মাস্টার মানুষ, চটের থলিটা দেখতে খারাপ কি সুন্দর ভেবে দেখেন নি। রোগা মানুষটিকে আরও বেশি শীর্ণ দেখাচ্ছে। মাথার চুল সব উসকো-খুসকো। সম্ভবত স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। পরেশবাবু যে আসবেন, তাঁকে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হ'তো। আমরা হাঁটতে লাগলুম গাছতলার দিকে। মীনাক্ষীও এল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। এতদিন পর হয়তো জীবনের সত্য পথটা দেখতে পেল। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন, শুধু এই প্রার্থনাটাই আমি পৌঁছে দিলুম তাঁর কাছে।

আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম আমরা। মন্মথবাবু বললেন, "আজই আমরা চ'লে যাব, ভাস্কর। তুমি কি করবে?"

"দু' চার দিন থাকব এখানে।"

"বেশ। মালদা গিয়ে দেখা ক'রো।"

ওঁরা তিনজন সামনে, আমি পেছনে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা অভিনীত হ'য়ে গেল। যা স্বাভাবিক তাই ঘটল। স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী। ইচ্ছে ক'রেই পিছিয়ে পড়লুম আমি। আমার ও মীনাক্ষীর মাঝখানে যবনিকার কালো পর্দাটা মুহূর্তের জন্য দুলে উঠে আবার স্থির হ'য়ে গেল।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল পেড্রো। আমি ভাবলুম, টুপী খুলে ও'দের বুঝি সালুট করল সে। তা নয়, কপালের সেই কাটা দাগটার ওপর হাত রেখে বিনয়ে, ভক্তিতে এবং ভালবাসায় মাথাটা নিচু ক'রে রাখল পেড্রো।

অশিক্ষিত খৃষ্টীয়ানটা 'কলসীর কাণা' হজম ক'রে ফেলেছে। প্রেম বিতরণে পরাঙ্মুখ নয়।

দূরে দাঁড়িয়ে আমিও আজ ওকে নমস্কার করলুম।

সমাপ্ত

আপনাদের
সেবায়
সম্পূর্ণ
আত্মনিয়োগ
করেছে

এসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়ান এণ্টারপ্রাইজেস
প্রাইভেট লিমিটেড

২০৬, আচার্য জগদীশ বোস রোড, কলিঃ ১৭ [illegible] শাখা—পাটনা — মজঃফরপুর
(ওয়েলিংটন সার্কুলার রোড)
টেলিফোন—৪৪-৬০০০, ৬০২০ এবং ৬১৩৮

পিতৃ ঋণ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

আলিপুরে সুরেশের এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক দিন ধরেই লিখছেন ভদ্রলোক, বহুবার কলকাতাতে এসেও অনুরোধ করে গেছেন—সুতরাং তিনি আন্তরিক-ভাবেই আমাকে চান এমন সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম আমার অনুমান ভুল অথবা আমার ঠিক সে সময় যাওয়াটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। কারণ আমি যা চেয়েছিলাম—কদিন হাত-পা মেলে বিশ্রাম করতে—তার উল্টো ব্যবস্থাই করে রেখেছেন তিনি। এবং সেটাকে রীতিমত জব্দ করার ব্যবস্থাই বলা চলে।

অর্থাৎ এক কথায়, তিনি গুটি-কতক সভা যুগিয়ে রেখেছেন আমার জন্য পরপর। তারিখ, সময়, ক্ষিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে আছে—আমার জন্য কিছুই আর বাকী নেই। ঠাসা এবং পাকা প্রোগ্রাম, অনেক লোকের সঙ্গে অনেক বন্দোবস্ত—এক্ষেত্রে আমার মতামত এবং সম্মতির প্রশ্নটা নিতান্তই তুচ্ছ।

আর আমার সম্মত হওয়া ছাড়া উপায় বা কী? নইলে আমার আশ্রয়দাতা অপমানিত হন। তিনি আমার বন্ধু বলে দিকে দিকে রটনা করে দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন অতগুলি লোককে, এখন আমি রাজী না হলে তাঁর মুখ থাকে না। অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলাম। মনে মনে নিজেকে নির্বোধ বলে গাল দিতে লাগলাম এবং প্রতিজ্ঞা করলাম যে অতঃপর কোন পরিচিত লোককে খবর

নিশ্চয় তেমনও বিশ্রাম করতে যাওয়ার মতো মূর্খতা আর কখনও করব না।

প্রথম প্রথম তিন-চারটে দিন মন্দ লাগল না। সভা যেমনই হোক, সভা উপলক্ষে যে ভ্রমণটা হচ্ছিল সেটার মধ্যে যথেষ্ট রোমান্স ছিল। তুমার্সের চা-বাগান অঞ্চল এতকাল কিছুই দেখিনি—সেটা বেশ ভাল করেই দেখা হয়ে গেল। অধিকাংশ সভার আয়োজন চা-বাগান এলাকার এবং তার কোনটাই শহর থেকে কুড়ি মাইলের কম দূরে নয়। জীপ বা গাড়িতে করে এই 'পটন-অজ্ঞান্ত-মধুবন-পদ্মপুর' যাতায়াত করতে সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে যেত সত্য কথা—এক এক রাস্তা এমন দুর্গম যে প্রাণ হাতে করে যেতে হ'ত প্রতিটি মুহূর্তে—তবু একেবারে এই অপরিচিত পরিবেশে, নতুন আবহাওয়ায় বাংলা-দেশের এই অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরে মনে মনে বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞই বোধ করছিলাম।

কিন্তু বিপদ বাধল কলাচিনি চা-বাগানে গিয়ে।

এখানটাও শহর থেকে বাইশ মাইলের মতো। পথে শুনলাম নিবিড় বন জঙ্গল পড়বে। বন্ধু অভয় দিলেন, 'অপূর্ব পথ, খুব ভাল লাগবে আপনার!'

সেখানে সভাটা নাকি সন্ধ্যায়। সাড়ে ছটার আগে সভা করা সম্ভব নয়—অফিস আছে। কথা হল তাঁরা আমাকে পাঁচটা নাগাদ নিয়ে যাবেন এখান থেকে। ওখানে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগবে বড় জোর, একটু বিশ্রাম করে সভায় যাব। সভার প্রোগ্রাম যা-ই থাক, ওঁরা আমাকে সাহায্যার্থে কমিয়ে নটায় ছেড়ে দেবেন—যাতে আমি ঠিক দশটায় শহরে ফিরে আসতে পারি।

সভাতে নিয়ে যাবার সময় যতটা আগ্রহ ফেরার সময় ততটা থাকা সম্ভব নয়—এটুকু অভিজ্ঞতা আমার এতদিনে হয়েছে। সুতরাং মনে মনে ঐ দশটা-টাকে এগারোটা হিসেব করে নিলাম, দেখলাম তাতেও খুব ক্ষতি হবে না। এসেই শুয়ে পড়া তো। এগারোটার আগে এমনিও ঘুমোবার অভ্যাস আমার নেই।

প্রোগ্রামের প্রথমার্ধে অবশ্য কোনও গোলমাল হ'ল না। তাঁরা বরং পাঁচটা বাজবার দশ মিনিট আগেই গাড়ি নিয়ে এলেন। পথে আর এক চা-বাগানে মিনিট কতক থেমে একটু 'চা-যোগ' করে নিয়েও আমরা সওয়া ছটার মধ্যে অকুস্থলে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলাম সব যেন কেমন মিইয়ে গেল। আমাকে এক ভদ্রলোকের বাসার বাইরের ঘরে বসিয়ে উদ্যোক্তারা যে ডুব মারলেন, সাড়ে সাতটার আগে আর কারুর টিকি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

যাঁর ওখানে সাময়িক ভাবে অতিথি হয়েছিলাম তাঁর বাবা বসেছিলেন আমার কাছে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা, 'আজ এখানে শুনছি কী একটা মেলিন খারাপ হয়ে গেছে, যে জন্যে অনেকে বাস্ত। আমার ছেলেরা তো কেউ বাড়িই আসেনি এখনও। অনেককেই ছুটির পর আটকে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া এখনে কারেন্ট থাকে সাড়ে ছটায়—স্টেজের কাজ কিছু বাকী আছে, আলো না জ্বললে সেসব নাকি ঠিক হবে না। কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—সাতটা সাড়ে সাতটার আগে সভা আরম্ভ করতে পারবে না।'

চা-জল খাবারের অবশ্য কোন ত্রুটি হ'ল না—ইতিমধ্যে একাধিকবার বাহুল্যক চা এসে পৌঁছল—কিন্তু একা এইভাবে প্রায়-অন্ধকার ও গরম ঘরে বসে থাকা যে নিতান্ত বিরক্তিকর। প্রায়-অন্ধকার বললাম এই জন্য যে যদিও ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল— আলোর জোর ছিল না। হয় কম পাওয়ারের বলব্—নয়তো কারেন্টের জোর নেই।

তার ওপর—তবু যা হোক বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এতক্ষণ বসে দু-একটা কথা চালাচ্ছিলেন—তিনিও সন্ধ্যাহ্নিক করতে চলে গেলেন। রেখে একা বসে রইলাম জন্তুর মতো। সঙ্গী কতকগুলি কীট-পতঙ্গ শুধু। কত কী পোকা আলোয় আকৃষ্ট হয়ে অনবরত ঘরে ঢুকছে, তাদের বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখলে ভয় করে। এখানকার অরণ্যানীগুলো পর্যন্ত কিম্ভূত-কিমাকার দেখতে। বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক এত প্রবল যে আশপাশের

কোয়ার্টারে কথাবার্তার শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে হরেক রকমের নিশাচর পাখির ডাক—এর আগে সে ধরণের আওয়াজ কখনও শুনিনি। সবটা জড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন নিশীথ রাত্রি।

রাগ এবং বিরক্তি—এ'দের ওপর এবং আমার বন্ধুর ওপর তো বটেই—নিজের ওপরও বড় কম হচ্ছিল না। অন্য কোন সভ্য জায়গা হলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে গাড়ি ডেকে চলে যেতাম। কিন্তু এখানে নিরুপায়। অজানা অচেনা জায়গা, জঙ্গলের পথ—মানবসভ্যতা থেকে বহু দূরে। এ'রা দয়া করে গাড়ি না দিলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং বসে বসে সে বিরক্তি পরিপাক করা ছাড়া আর কিছু করবারও নেই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা সত্য করে উদ্যোক্তারা দেখা দিলেন ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। অবশ্যই যাঁরা গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে গিছলেন তাঁরা আসেননি, খুঁজে করে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

'একটু সার দেরি হয়ে গেল। মানে এমন মুস্কিল— আজই র‍্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আটকে রাখলে—শালা পাঞ্জাবী তো, এসব সাহিত্য সভাটভা অত বোঝে না! ওদের কাছে কাজের দামটাই সব চেয়ে বড়। কিছু মনে করবেন না স্যার। এটুকু মেকাপ্ করে নেব—'

কতকগুলো চড়া কথা বললাম। কিন্তু সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা তা বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম। তারপর বললাম, 'আমাকে কিন্তু আগেই ছেড়ে দিতে হবে! আপনাদের ফাংশন থাকে পরে যা হয় করবেন—আমি অতক্ষণ থাকব না!'

'সে তো নিশ্চয়ই। সে কথা বলতে! নটার মধ্যে ছেড়ে দেব আপনাকে!'

আশ্বাস দিয়ে উঠলেন তিনচার জন।

ছাড়লেন তাঁরা ঠিক সাড়ে দশটায়।

উপায়ও নেই। উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত ছাড়া দুটি মাত্র আইটেম। একটি সঙ্গীতালেখ্য আর একটি নৃত্যনাট্য। সঙ্গীতালেখ্যটির কথা সবাই জানেন, কতকগুলো প্রলাপের সঙ্গে অনেকটি গান বাঁধা। গানটা গাওয়াই উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু গান বিলে যারা গাইতে পারে না তাদের কিছু দেবার থাকে না। তাইতেই প্রলাপগুলোর অবতারণা। একজন লেখে, তার কাছ থেকে মোটা চাঁদা পাওয়া যায়—আগে একজনই পড়ত, এখন পড়ে বহু লোকে। সবাই খুশী হয়।

আমার অনুমতির কেউ অপেক্ষা করলনা—বলা বাহুল্য। সভাপতিকে আজকাল সভা পরিচালনা করতে হয়না—করে অন্য লোকে, প্রধানত উদ্যোক্তারা। (নইলে চাঁদা ওঠে না, যিনি মাইকে ঘোষণা করবেন—তিনি সম্ভবত বেশ কিছু দেন!) সুতরাং সভাপতিবরণের পরই সঙ্গীতালেখ্য ঘোষণা করা হ'ল। এক ঘণ্টার ওপর চলল সে যন্ত্রণা, শেষের দিকে একজনকে ডেকে বললাম যে 'এবারেই আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করুন—নৃত্যনাট্য পরে হবে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সে আর আপনাকে বলতে হবে না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু সঙ্গীতালেখ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নৃত্যনাট্য ঘোষিত হয়ে গেল, হারমোনিয়ামে সুর উঠল এবং কতকগুলি ফুলের মালা পরা কিশোরী নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল।

অগত্যা 'চিত্রার্পিতের মত' বসে থাকা ছাড়া আর আমার কী করবার থাকতে পারে?

রাগ এতই হয়েছিল যে চালে একটা বড় ভুল ক'রে ফেললাম। বক্তৃতা দিতে উঠে কিছু মনের ঝাল ঝাড়লাম উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে। ফলে হয়তো তাঁরা চটে রইলেন এবং আমাকে জব্দ করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

যাইহোক, সভা থেকে বেরিয়ে আবার সেই টিনের বাংলোর বাইরের ঘরটিতে এসে বসলাম। বড় বড় গাংফাড়িং, বীভৎস চেহারার 'মথ্' ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুবরে পোকায় ভরে গেছে ঘর—তার সঙ্গে সেই লম্বা লম্বা ভয়াবহ ধরণের আরশুলো।

বললাম, 'আমি খাওয়া দাওয়া কিছু করব না—দয়া ক'রে আমাকে এখনই ছেড়ে দিন!'

সকলে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন।

'সবই প্রস্তুত, একটু কিছু মুখে না দিলে এঁরা বড় দুঃখ পাবেন যে স্যার!'

'আর কতক্ষণই বা। গাড়ি যখন তৈরী আছে—তখন ব্যস্ত হয়ে লাভ কী! এখন রাত্রিবেলা, পথ ফাঁকা—তিন কোয়ার্টারের মধ্যে শহরে পৌঁছে যাবেন!' ইত্যাদি, ইত্যাদি—

কিন্তু আমি বেঁকে দাঁড়ালাম।

আমি বসবও না, খাবও না। এখনই আমার গাড়ি চাই।

আবারও সেই রক্ষণশীল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'গাড়িতো আমাদের এখানের নয়, গাড়ি হল পালছেঁড়া চা-বাগানের ম্যানেজারের। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে তাঁর ফ্যামিলিকে আনতে গিয়েছিল—তাঁরা সবাই ফাংশনে ছিলেন—তাঁরই পাঁচ মেয়ে, দুজন নাচল, তিনজন গানে ছিল। এখন তাঁদের পৌঁছতে গেছে—সাত মাইল সাত মাইল চোদ্দ মাইল। ফিরে না এলে কোন উপায় নেই!'

অসহ্য রাগে এবং নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে দুঃসহ ক্ষোভে মাথা ধরে উঠল; চোখে যেন জল এসে যেতে লাগল বিরক্তিতে। কিন্তু সবই হজম ক'রে এসে বসলাম। লুচি ও মুরগীর মাংসেও হাত দিতে হ'ল। রাত হয়েছে, অবিরাম চা খেয়ে খেয়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—কিছু না খেলে আরও ভেঙ্গে পড়বে। ওদের ওপর রাগ ক'রে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

খেতে খেতে হঠাৎ সব আলো নিভে গেল।

'ওরে হ্যারিকেন রে, হ্যারিকেন জ্বাল। শিগগির! ব্যাথ ব্যাথ—গোলমালে বড় ভুল হয়ে গেছে।'

গৃহকর্তা, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির ছেলে চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শোনা গেল, এখানে প্রত্যহই রাত সাড়ে এগারোটায় কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ফ্যাক্টরীর কাজ চালু হয়। ডায়নামো থেকে কারেন্ট তৈরী হয়—তার এত শক্তি নেই যে বাড়ি ও রাস্তার সব আলো জ্বালিয়েও ভারী ভারী মোটর চালায়। এঁরা নাকি ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিলেন, অন্তত ঘণ্টাখানেক বেশী আলো জেবলে রাখার, সাহেব ম্যানেজার রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। বিজলীঘরের ইনচার্জ বলছে যে, যেহেতু সে কোন লিখিত অর্ডার পায় নি—সেহেতু নিয়মের ব্যতিক্রম সে করতে পারবে না।

এখন উপায় আছে র‍্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে গিয়ে বলার কিন্তু সে দেখলাম কেউই এগোতে চান না।

অগত্যা হ্যারিকেনের আলোতেই ভোজন পর্ব শেষ ক'রে আবার বাইরে এসে বসলাম।

চারদিকে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। সামান্য বসতি—বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশটি

কোয়ার্টার হবে সব জড়িয়ে—সব নিশুতি হয়ে এসেছে। একটা হ্যারিকেন বা প্রদীপের চিহ্নও কোথাও দেখা যায় না। ওদিকে সম্ভবতঃ মেঘ ঘনিয়ে এসেছে খুব, কারণ গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

আকাশের দিকে চেয়ে বোঝার উপায় নেই। বড় বড় গাছে আকাশ ঢেকে আছে। তাছাড়া এত জোনাকি যে, কোনটা তারার আলো আর কোনটা জোনাকি বোঝা মুস্কিল।

এ বাড়ির এ'রাও সব শুয়ে পড়েছেন। শুধু গৃহস্বামী বসে বসে হাই তুলছেন আর বিড়ি খাচ্ছেন। আরও আছেন তিন-চারটি তরুণ ছেলে। নেহাৎ ঘাড়ে পড়ে রয়েছি—বিদায় না ক'রে যেতে পারছেন না।। তাঁরা যেতে চাইলেও এ বাড়ির ইনি সহজে ছাড়বেন না—তা তাঁর মুখ-ভাব দেখেই বোঝা গেল।

এত স্থানাভাব যে বাকী রাতটুকু শুয়ে যেতে বলবারও সাহস নেই এ'দের। এই বাইরের ঘরের একটি সংকীর্ণ বিছানাতেও দুটি ছেলে এসে শুয়েছে ইতিমধ্যেই, শুনলাম গৃহস্বামীও ওখানেই শয়ন করবেন। সেটা কি ক'রে সম্ভব, তা আজও ভেবে পাই নি।

বারোটা, ক্রমে সাড়ে বারোটাও বেজে গেল।

এ'রাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন এবার।

এত দেরি তো হবার কথা নয়।

তবে কি—

ফিসফিস ক'রে যা কথা হ'ল ওঁদের নিজেদের মধ্যে—তাতে ক'রে বুঝলাম বুঝি ড্রাইভার হয়তো নেশা করে ঘুমিয়ে পড়েছে—গাড়ী আনবার কথা মনে নেই। তখন কথা হ'ল যে সাইকেল ক'রে কেউ যাবে নাকি?

চোদ্দ মাইল উঁচু-নীচু পাহাড়ে-রাস্তা—কে যাবে এই অন্ধকারে, ফিরবেই বা কখন?

এঁদের এতক্ষণের প্রশান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেই আমার যা শান্তি। নইলে আমার তখন অকথনীয় কষ্ট হচ্ছে, একটু শুতে পেলেই বেঁচে যাই আমি। শোবার মত একটা নিরিবিলি ভাল জায়গার জন্যে আমি তখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করতেও রাজী ছিলাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। যে গাড়ীতে এসেছিলাম সে গাড়ীর ইঞ্জিনে গোলমাল আছে। আসবার সময় দুবার তিনবার দাঁড়িয়েছে। এই অন্ধকার বিজন পথে যদি একেবারেই বিগড়ে যায়?

ওধারে তো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে। মেঘেরও যে ডাক, —তাতে খুব অল্পে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না!

ভয়ার্সের বৃষ্টি—নামলেই প্রবল ধারা শুরু হয়ে যায়।

কথাটা বললাম খুলে।

এ'দের মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তাহলে একটু কষ্ট ক'রে লরীতে যাবেন স্যার? লরী কিন্তু একটা হুডের মধ্যেই আছে।

'এই বৃষ্টিতে খোলা লরী!'

'না, মানে ড্রাইভারের পাশে বসলে খুব জল লাগবে না। বরং একটা বর্ষাতি দিয়ে দিচ্ছি, ড্রাইভারের হাতে ফেরৎ দেবেন। বলেন, তো আমরাও কেউ সঙ্গে যেতে পারি!'

অগত্যা তাতেই রাজী হলাম। আর উপায় কি? তখন রাত একটা বাজে। আমি আর বসতে পারছি না।

গৃহস্বামী তো চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন—অনেকক্ষণ।

মুখের কথা খসাতেই একজন ছুটে বেরিয়ে পড়লেন—সেই জলের মধ্যেই।

তারপরও আধ-ঘণ্টাটাক সেই দুঃসহ প্রতীক্ষা।

বাড়ীওলা তো অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমোচ্ছেন, এতক্ষণে ঘুমটা বোধ করি গাঢ় হয়ে এল। বিছানা থেকে একটা ছেলের নাক ডাকা শোনা যাচ্ছে। যে দুটি তরুণ কর্মকর্তা আমার জন্যে আটকে ছিলেন, তাঁরাও বেশ ঢুলতে শুরু করেছেন।

শুধু ঘুম নেই আমার চোখেই। ঘুম আসা সম্ভবও নয়। যন্ত্রণায় কোমর-পিঠ খসে যাচ্ছে। বসে বসে হাঁটুতে ব্যথা শুরু হয়ে গেল, চোখ দুটো করকর করছে, দুটো রগেই অসহ্য টনটনানি। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে?

অগত্যা বসে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগলাম। শোনবার মতই শব্দ। মেঘ ডাকছে মুহুর্মুহু, যেন ভারি ভারি রোলার চালিয়েছে কে আকাশের পথে—গুরু-গুরু গুম-গুম শব্দ বিদ্যুতের শিখার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। সে শব্দ এই নিস্তব্ধ অরণ্য দূরে পাহাড়ে পর্যন্ত ভয়াবহ প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়বার আওয়াজও কম নয়—কারণ আশেপাশে সব কোয়ার্টারেই টিনের চাল। বৃষ্টির ফোঁটাই তো কেল বড়, তার ওপর তার অধিকাংশই গাছপালায় পড়ে আরও বৃহত্তর জলবিন্দু রচিত হয়ে পড়ছে। সে শুধু শব্দ নয়—তাকে কোলাহল বলাই উচিত।

অবশেষে দূরে গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। মোটরের এবং হর্ণের শব্দ। সচকিত হয়ে উঠলেন এঁরা। একটু ক্ষীণ আশা আমার মনেও দেখা দিল।

সকলে মিলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, ঐ তো আলোও দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ যে দুজোড়া আলো, দুদিক থেকে!

লরী আর গাড়ী প্রায় একসঙ্গেই এসে পৌঁছল।

ড্রাইবার বাহাদুর ভেবলেওনি, নেশাও করে নি—গাড়ীটাই পথে বিগড়েছিল—গাড়ী সারিয়ে নিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেছে। সঙ্গে অন্য লোক তো নেই, তায় এই অন্ধকার পথ—নিজেই টর্চ ধরে সারানো এক হাতে—সুতরাং দেরি তো হতেই পারে।

এখন কিসে যাবো—গাড়ীতে না লরীতে?

দুই ড্রাইভারই আশা ও আশঙ্কায় আকুল হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল। দুজনেরই ইচ্ছা আমি অপর যান ব্যবহার করি।

আমি এঁদের দিকে ফিরে বললাম, 'দেখুন আপনারা আমাকে ঢের কষ্ট দিলেন, এবার আপনাদের একটু কষ্ট করা উচিত। আমি গাড়ীতেই যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের কেউ লরী নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। এই ভয়াবহ পথ, গাড়ী যদি বিগড়োয় তো কি অবস্থা ভাবুন দিকি! গাড়ীর অবস্থা তো বোঝাই যাচ্ছে, লরী কেমন তাই বা কে জানে। একটা সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স সঙ্গে থাকা ভাল!

হ্যারিকেনের আলোতে মুখভাব খুব ভাল ক'রে দেখা যায় না—তবু ঠিক খুশী যে কেউ হলেন না কথাটা শুনে, সেটুকু বেশ বোঝা গেল।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তিনজনে তিন-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একজন বললেন,

তাই হোক তাহলে, অভিজিৎ তুমিই বরং সঙ্গে যাও, তুমি তো কল-কব্জা একটু বোঝ-সোঝ।

অভিজিৎ অভিহিত ছোকরাটি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল, 'বেতে আমি পারি কিন্তু একা যাব না। আপনারাও সঙ্গে চলুন।'

'কিন্তু ড্রাইভারের পাশে তিনজন তো ধরবে না—'

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'আমার বোনের টাইফয়েড তা তো জানেনই সুশীলদা, আমি কি করে যাই বলুন?'

সুশীলদা সামান একটু চুপ করে থেকে শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'বেশ, আমিই যাচ্ছি অভিজিতের সঙ্গে।..... এই উপলক্ষে তোমার রুগ্না বোনের কথা যদি মনে পড়ে থাকে তো সেই তবু একটা লাভ। কবে যেন, হ্যাঁ, আজই বোধহয়—তোমার বাবা দুঃখ করছিলেন যে, পাড়ার লোক এসে রাত জাগছে, যার বোন সে খবরও রাখে না! যাক গে—'

এ অভিযোগের অবশ্যই কোন উত্তর এল না। যাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হবে, তাকে সব সময় সব কথার উত্তর দিতে গেলে চলে না।

আর আমি তো একেবারেই নীরব শ্রোতা। কথা কইতে গেলেই মান বিবেচনার কথা উঠবে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোন বিবেচনা করতে প্রস্তুত নই। যা পাইনি—তা আমিই বা দিতে যাব কেন?

অগত্যা অভিজিৎ আর সুশীলবাবুকে তৈরী হতে হ'ল। সেও এক পর্ব। বর্ষাতি টর্চ প্রভৃতি যুদ্ধস্ত প্রতিবেশীদের ডেকে সংগ্রহ করে বাড়িতে খবর দিয়ে প্রস্তুত হ'তে হ'তে আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল।

তারপর এক সময় সত্যি-সত্যিই সেই দুঃসহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আমাদের দুটি গাড়ীই, ঘোরতর নৈশ দুর্যোগের মধ্যে সুপ্তিমগ্ন ছোট্ট গ্রামটিকে উৎকিত ক'রে প্রবল শব্দে স্টার্ট দিল ও অকারণেই হর্ণ দিতে দিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত শব্দের কোলাহল তুলে এসে এক সময় পাকা সরকারী রাস্তায় উঠল।

এরপর আর কোন হাঙ্গামা নেই; শুধুই চলা। পর পর দুটো কী চা-বাগান এলাকার বিরল জনবসতি পেরিয়ে গিয়ে একটানা ঘন বন শুরু হ'ল। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির অন্ধকারে অরণ্য বসতি একাকার হয়ে গিয়ে সবই নিবিড় বন বলে মনে হচ্ছে অবশ্য—নেহাৎ হেড লাইটের তীব্র আলোতে দুটো সাইন বোর্ড দেখেই চা-বাগানের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম। কদাচিৎ কোন ভিজে করোগেটের ছাদে আলোটা পিছলেও পড়েছিল দু-একবার। কিন্তু এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না বন ছাড়া; গাছ পালায়, লতায় জড়াজড়ি নিরন্ধ্র জঙ্গল শুধু।

আমাদের গাড়ীটা আগে আগে যাচ্ছে, লরীটা পিছনে। তার হেড লাইটের আলো আমাদের পিছন দিক থেকে এসে গাড়ীর মধ্যেটা আলোকিত করছে—আমি নিশ্চিন্ত আছি।

অবশ্য মধ্যে মধ্যে পিছনের আলোটা সরে যাচ্ছে, পিছনের অন্ধকারে লুকিয়ে যাচ্ছে কোথায়। তবে তাতে চিন্তার কোন কারণ বোধ করি নি, কারণ উঁচু-নীচু পাহাড়ে-পথ, বাঁকও অজস্র, সব সময় দুই গাড়ী এক লাইন ধরে চলা সম্ভব নয়।

কিন্তু একবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেও আলোটার পুনরাবির্ভাব না ঘটায় সচেতন হয়ে উঠলাম। বাহাদুরের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বললাম, 'একটু দাঁড়াবে নাকি বাহাদুর, ওরা যেন বড্ড পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে—'

ঘ্যাচাং ক'রে সশব্দে ব্রেক কষল বাহাদুর।

'পিছিয়ে পড়েছে, না পিছন ফিরেছে?'

কণ্ঠে নিদারুণ সংশয় বাহাদুরের, ঈষৎ রাগও যেন উঁকি মারছে তার সঙ্গে।

সন্দেহটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে জেগেছে আমারও। সন্দেহ জিনিসটা বুঝি এমনিই মারাত্মক।

কিন্তু সত্যিই—সরে পড়বার এই তো চমৎকার সুযোগ। এতক্ষণে সোজা পিছন দিকে দৌড় মেরেছে নিশ্চয় ওদের লরী। এতটা পথ যে বৃথা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করব না এটা তো ঠিক।

'কী করব?' প্রশ্ন করল বাহাদুর।

'একটু গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেখবে নাকি? ধরো পথে যদি কোথাও বিগড়ে-টিগড়ে গিয়ে থাকে?'

আসলে নিজের নিরাপত্তার চেয়েও ওদের জন্য করুণার নেশা প্রবল হয়ে উঠেছে। তেড়ে গিয়ে যদি ধরতে পারি তো এবার ওদের আগে দিয়ে নিজে পিছনে থাকব। রাত দুটো বাজে—আমার ঘুমের দফা তো শেষ হয়েই গেছে, কাল ভোরেই আর একটা সভা, হয়তো পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত হবার প্রশ্ন উঠবে। এ ক্ষেত্রে ওদের এখন ফিরে গিয়ে আরাম করার চেষ্টাটা যদি পণ্ড করতে পারি, সেইটেই বড় লাভ।

বাহাদুর পূর্ববৎ প্রচ্ছন্ন বাঙ্গের সুরে বলল, 'তাহলে হর্ণ দিত ওরা—অনেক আগেই।'

'হয়ত দিয়েছে। যা ঝড়-জলের শব্দ আর মেঘ ডাকছে, তোমার তো জানলার সব কাঁচ আঁটা—শুনতে পাও নি হয়ত।'

বাহাদুর কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'দেখুন সত্যিই যদি ওরা ফিরে গিয়ে থাকে তো এতক্ষণ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তাহ'লে ওদের ধরতে হ'লে আবার সোজাসুজি কলা-চিনিতেই ফিরে যেতে হবে। কী লাভ হবে তাতে? তার চেয়ে চলুন, যেমন যাচ্ছি তেমনি গিয়ে আপনাকে তো পৌঁছে দিই। যে বর্ষা নেমেছে তাতে হয়ত খানিকটা পরে শহরে পৌঁছনোই যাবে না। শহরে ঢোকবার মুখে জায়গাটা নিচু, বড় জল জমে।'

ওর কথায় যে যুক্তি আছে তা মানতেই হ'ল। আমিও একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'তাহলে চল যেমন যাচ্ছিলে। এখন দেখছি ওদের কাউকে এ গাড়িতেই নেওয়া উচিত ছিল। ওরা দলছাড়া হয়ে থাকবে—এত বিবেচনা করতে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

'তাহলে অন্তত আমার আসবার সময়টা কষ্ট হ'ত না। এই পথে একা আজ আর ফিরতেই পারবনা। বাকী রাতটা ওখানেই এই গাড়িতে বসে কোথাও কাটিয়ে দিতে হবে।'

বেশ স্পষ্ট অনুযোগের সুর বাহাদুরের কথায়। কিন্তু তখন আর এসব কথায় লাভই বা কি? অগত্যা চুপ ক'রে রইলাম।

বাহাদুরও আবার স্টার্ট দিল।

অর্থাৎ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু গাড়ি আর নড়ল না। প্রথমটা অত কিছু ভাবিনি, পুরনো গাড়ি, ছাড়তে একটু দেরিই হয়—তবে যখন তিনচার মিনিট ধস্তাধস্তি করার পরও কোন ফল হ'ল না—তখন হঠাৎ এখানে এই মধ্য-পথে গাড়ি অচল হওয়ার সম্ভাব্য ফলাফল কল্পনা ক'রে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

'কী হ'ল বাহাদুর?'

'কী হ'ল তাইতো বুঝতে পারছিনা বাবু। এরকম তো হবার কথা নয়।

'খুলে দাখো না একটু—'

বোকরির কণ্ঠস্বর অকারণেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'দেখব কি করে?' বাহাদুরও খে'কে ওঠে, 'এই বৃষ্টিতে কে আলো ধরবে কে কাজ করবে! একজন একটা বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেললে তবে হয়। তা আপনার সঙ্গে তো একটা ছাতি পর্যন্ত নেই।'

ওর মেজাজ খারাপ হবার যে অত্যন্ত সঙ্গত কারণ আছে তা বুঝি। ওর সাহিত্য-প্রীতি নেই, সভাসমিতির উদ্যোক্তা নয় ও—এমন কি এ বাগানের লোকও নয়। মিছিমিছি ওর এ দুর্ভোগ কেন!

সুতরাং ভয়ে ভয়ে ঈষৎ অনুনয়ের ভঙ্গীতেই বলি, 'তা আমিই না হয় নেমে টর্চ ধরছি, তুমি দ্যাখো কোথায় কী বিগড়েছে। একটু ভিজব হয়ত, তা আর কি করা যাবে। গরজ বড় বালাই।'

বাহাদুর দেখলাম সঙ্কোচের বিশেষ ধার ধারে না। সে বললে, 'একটু নয় বেশ ভিজবেন। কিন্তু আপনি ভিজলেও কোন সুবিধা হবে না। এই জলের মধ্যে ইঞ্জিন খুলে কাজ করব কি করে? ওপরে একটা কিছু আড়াল দরকার। আমার এই একটি পুরনো বর্ষাতি ভরসা। এ যদি ঢাকা দিই তো আমি গায়ে দেব কি? আমি ভিজতে পারব না, তিন মাস আগেই আমার নিমোনিয়া হয়েছিল।'

এবার আর তিক্ততা চেপে রাখতে পারি না। বলি, 'বেশ হয়েছিল। তবে আর কি, আপদের শান্তি। সারা রাত গাড়িতেই বসে কাটাই, সকালে যদি কেউ এদিকে আসে তো ভাল, নইলে হে'টেই ফিরতে হবে।...অবশ্য তার আগে যদি বাঘ-ভালুকে খেয়ে না শেষ করে।'

'গাড়িতে বসে থাকলে বাঘ-ভালুকে খেতে পারবে না, সে সব কিছু ভাববেন না। জানলার কাঁচ ভেঙ্গে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে এ কখনও শুনিনি। তবে হাতীর কথা আলাদা। তেমন বদ্জাত হাতী হ'লে গাড়ি সুদ্ধ উল্টে দিয়ে যাবে...তা কৈ, এদিকে তো এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি, হাতীর পালে তো পড়ি নি কোন দিন।'

খুব যে ভরসা পেলাম না তা বলা বাহুল্য—তবে বললামও না আর কিছু। কিই বা বলব। অদৃষ্ট ছাড়া এখন তো আর পথও নেই। যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে।...তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, রাগে বিরক্তিতে দৈহিক কষ্টে চোখে আমার তখন জল এসে গিয়েছে—কথা বলার মতো অবস্থাও নেই।

বাহাদুর বোধ হয় আমার অবস্থাটা বুঝল। হয়ত তার মায়াও হ'ল একটু। সে বলল, 'আপনি মিনিট কতক একা বসতে পারবেন? আমি তাহলে একটু খোঁজ করে দেখি ওদের। যদি সত্যিই কোথাও আটকে গিয়ে থাকে—। ওদের পেলে গাড়িটাও মেরামত হয়, চাই কি লরীতে বসে চলেও যেতে পারেন আপনি।'

'একা বসতে পারবেন' এ প্রশ্নটার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তা গ্রহণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর কি? 'কলকাতার বাবুদের দুর্নাম প্রমাণিত করতে রাজী নই আমি।...তা ছাড়া যদিই একটা উপায় হয়, এই অকূল সমুদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার—সেটাও বিচ্ছে। সুতরাং উত্তর দিলুম, 'তা আর পারব না কেন, লক্ষ্মী ক'রে বসে থাকব। তুমি থাকলেই বা কতটা আটকাবে? তবে তুমি কত দূরে এই জলে হাঁটবে?'

'না, বেশী দূর কি আর পারব? যদি দু-চারশ' গজের মধ্যে থাকে, কি মাইলটাকের মধ্যে—। ঐ আগের বাঁকটার আড়ালে থাকলেও এখান থেকে টের পাওয়া মুস্কিল, বুঝলেন না?'

বলতে বলতেই সে বর্ষাতিটা গুছিয়ে গায়ে দিয়ে টর্চ নিয়ে নেমে পড়ল। তারপর শুধু তার হাতের আলোটা ছাড়া আর কিছু দেখা সম্ভব নয়, দেখা গেলও না। পিছনের সেই নিবিড় কালো আঁধার আর দৃষ্টিনাশা প্রবল বর্ষণের মধ্যে তার টর্চের আলোটা একটি সূক্ষ্ম রেখার মতো এঁকে বেঁকে যেতে যেতে ক্রমশ সূক্ষ্মতর হয়ে হয়ে একসময়ে সেই অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। অতঃপর নিঃসীম নিশ্চিহ্নতার মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে গেলাম আমি। এমন কি গাড়িটার অস্তিত্বও হাত দিয়ে অনুভব করতে হচ্ছে—দেখার কোন উপায় নেই।

কোথাও এতটুকু আলো নেই। ওপরে আকাশেরও কোন অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না। আকাশে অরণ্যে পথে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। যেন মনে হচ্ছে সৃষ্টির আদি যুগে, জীব সৃষ্টিরও আগে যে প্রলয়ঙ্কর বর্ষণের কথা ইতিহাসে পড়ি, হঠাৎ সেই যুগেই গিয়ে পড়েছি আমি—একটি মাত্র জীবিত প্রাণী। শুধু মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের ফলে এক একবার বর্তমান সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছি—সামনে পিছনে বিসর্পিত টারম্যাক রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। তাও শুধু ঐ রাস্তাটাই, তাছাড়া তো সেই দুদিকে নিরন্ধ্র কা এবং ওপরে স্লেট রঙের ক্রুদ্ধ আকাশ। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। মানুষ তো দূরের কথা—অপর কোন প্রাণীর চিহ্ন পেলেও বাঁচতাম। সে সময়ে মনে হচ্ছিল একটা বাঘ-ভালুকের দেখা পেলেও মন্দ হ'ত না। তবু বিশ্বাস হ'ত যে আমি বেঁচে আছি।

চুপ ক'রে স্থানুর মতো বসে থাকা—তার ওপর এই অপরিসীম শারীরিক ক্লান্তি, তাই কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি টের পাইনি। একেবারে হঠাৎ কানের কাছে একটা কাশি কিম্বা গলা খাঁকারির শব্দ পেয়ে ধড়মড়িয়ে চমকে জেগে উঠলাম।

'কে, কে—বাহাদুর? প্রশ্ন করি বটে কিন্তু গলাটা নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত শোনায়।

আর প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নের ব্যর্থতা ধরা পড়ে; কারণ গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁচে যে টোকা দিচ্ছে সে বাহাদুর নয়। অত কাছে বলে তার সাদা পোশাকটা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল—বাহাদুরের স্পষ্ট মনে আছে খাঁকি শার্ট ছিল গায়ে—তাছাড়া ঠিক সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকে ওঠায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম সাহেবী পোশাক পরা লোক একজন এবং সম্ভবত সাহেবই।

নিমেষে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। এই বিজন অরণ্যে, লোকালয় থেকে অন্তত সাত-আট মাইল দূরে—ঘোর বর্ষায় সাহেব কোথা থেকে এল?

কিন্তু সে ঐ নিমেষ মাত্র। পরক্ষণেই এই আতঙ্কের ছেলেমানুষীটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। নিশ্চয় সাহেবও এই পথে যাচ্ছিল—আমার গাড়ি অন্ধকারে এমন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খোঁজ করতে নেমেছে। ওদের জাতে এ ভদ্রতা খুব আছে।

আশ্বস্ত হয়ে—বোধ হয় আনন্দের চোটেই তাড়াতাড়ি জানলাটা ইঞ্চি দুই নামিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দমকা ঝোড়ো বাতাস আর খানিকটা জল ঢুকে যায় ভেতরে। সেই সঙ্গে পুরোপুরি ইংরেজী কণ্ঠে প্রশ্ন আসে Well can I do anything for you gentleman? হামি আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারি?'

সে কে কোথা থেকে এল এবং তার গাড়িই বা কোথায়—এ সব খবর নেবার কথা মাথাতেই এল না। এতক্ষণে একটা মানবকণ্ঠে শুনে এবং বলিষ্ঠ ইংরেজকে

হাতের কাছে পেয়ে মনের আনন্দে গল-বল-ক'রে— সব দুঃখ খুলে বললাম। অবশ্যই সংক্ষেপে—কারণ ঐটুকু খোলা দিয়েই জল এসে রীতিমত ভিজিয়ে দিচ্ছিল আমার।

সব শুনে সাহেব একটা প্রবল সহানুভূতিসূচক স্‌ স্‌ স্‌ শব্দ ক'রে বলল, 'দেখি কি ব্যাপার ইঞ্জিনের—'

তারপর আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকাটা খুলে ফেলল। সেই অন্ধকারে সেই মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে কি দেখল আর কি করল কে জানে—একটু পরেই ঢাকাটা আবার বন্ধ ক'রে সামনের দরজাটা খুলে ভিতরে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

এতক্ষণের নীরব মৃতপ্রায় যন্ত্র যেন কোন্ মায়াবী জাদুকরের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে গর্জন ক'রে উঠল, রুদ্ধগতি গাড়ি কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

'নাও, এখন পারফেক্টলি অল রাইট হয়ে গেছে—। চল বরং তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আলিপুরে যাবে তো?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। অনুমতির অপেক্ষাও করল না।

প্রথমটা খুশীই হয়েছিলাম, কি হচ্ছে ভাল ক'রে তলিয়ে না বুঝে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলাম। কিন্তু একটু খানি যাবার পরই সবটা যেন ভাল ক'রে মনে পড়ে গেল।

'কিন্তু বাহাদুর? বাহাদুর যে পড়ে রইল!'

দাঁতে দাঁত চেপে সাহেব বলল, 'চুলোয় যাক বাহাদুর। সে তার ব্যবস্থা ক'রে নেবে এখন। তার ভাবনা ভাবতে হবে না, তুমি তোমার ভাবনা ভাবো।'

সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা জটিল সংশয় দেখা দিয়েছিল মনে। বললাম, 'কিন্তু তোমার গাড়ি কোথায়? তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? সে গাড়ির কি হ'ল? কৈ দেখলাম না তো!'

'আঃ, তুমি বড্ড পরের জন্যে মাথা ঘামাও বাবু, আগে নিজে বাঁচো তার-পর পরের চিন্তা ক'রো!'

এই বলে একটু শব্দ ক'রে হাসল সে।

সামান্য হাসি, অতি ক্ষীণ একটা ধাতব শব্দের মতো—কিন্তু তাতেই বুকের মধ্যেটা যেন কেমন অকারণ আতঙ্কে গুরগুর ক'রে উঠল।

আর সেই সময়েই আর একটা কথা মনে পড়ল। বাইরে প্রলয়কাণ্ড চলছে, এ রকম বর্ষণ, এত বড় বড় জলের বিন্দু আমরা শহরের লোক দেখা-তো দূরে থাক কল্পনাই করতে পারি না। এই বৃষ্টিতে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে তো ভিজে ন্যাতা হয়ে যাবার

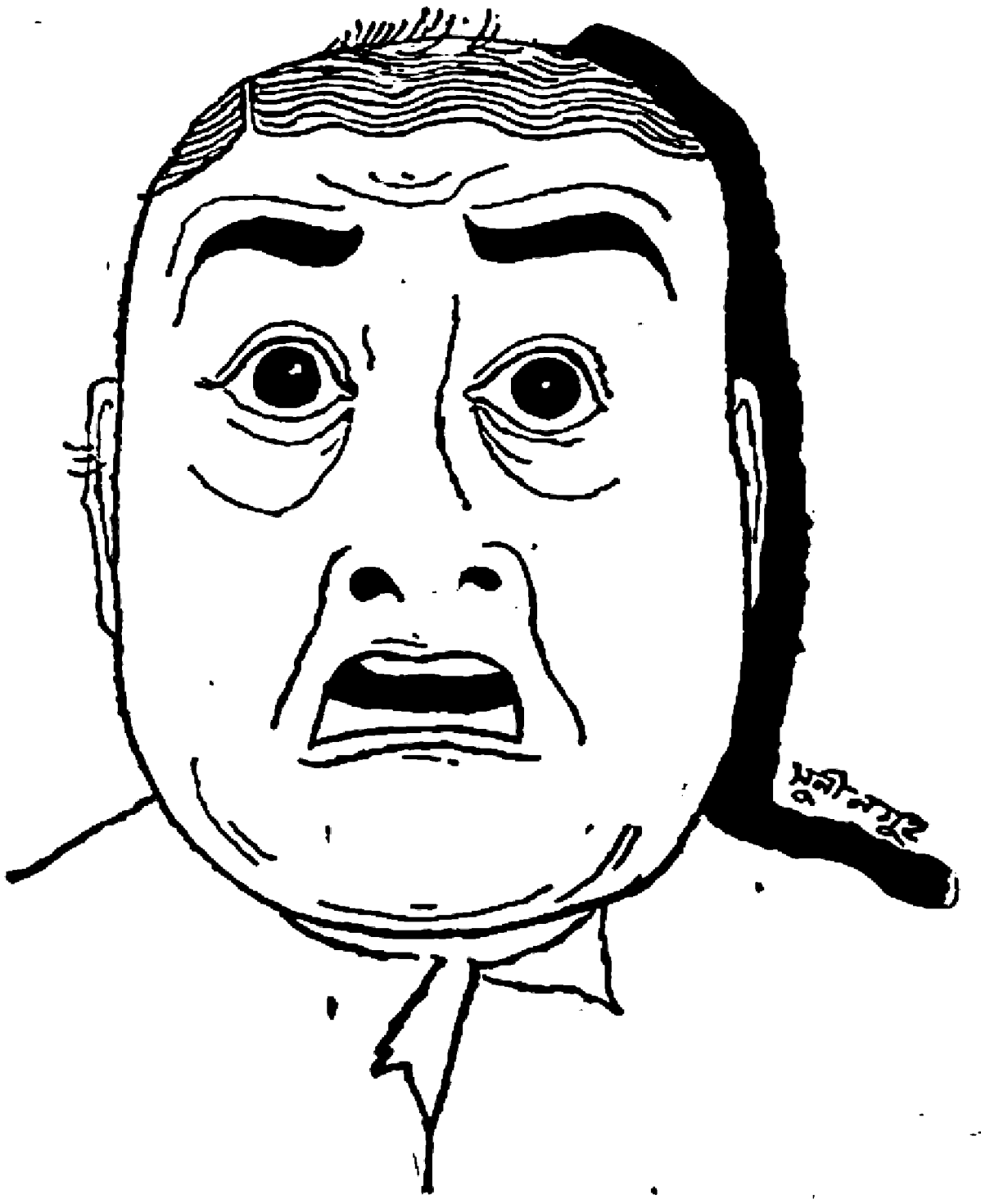

"....প্রাণপণ চেষ্টায় বিকট চিৎকার করে উঠলাম, থামাও থামাও"

কথা, কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে সে রকম জলের আভাস তো টের পাচ্ছি না—

কথাটা ভাবছি এমন সময় আর একবার বজ্রগর্জনের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে গেল সে বিদ্যুৎ। তারই আলোতে স্পষ্ট দেখলাম—আমারই চোখ থেকে বোধ হয় মাত্র এক হাত দূরে, দেখার কোন অসুবিধাও নেই—তার সাদা পোশাক নি-ভাজ ইস্ত্রির সমস্ত গৌরব নিয়ে অনাদৃতই রয়েছে।

একটা দিক-দিশাহারা আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য না রইল কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়বার ক্ষমতা আর না রইল কথা কওয়ার শক্তি। বিমূঢ় জড়ের মত বসে রইলাম। তারপরই বোধ হয় প্রাণ-পণ চেষ্টায় বিকট চিৎকার ক'রে উঠলাম, 'থামাও, থামাও। গাড়ি থামাও, এক্ষনই। আমি আর যাব না, আমি নেমে যাব!!

কোন উত্তর এল না সামনে থেকে। শুনতে পেলে কিনা তাও বোঝা গেল না। কিন্তু গাড়িও থামল না, বরং মনে হ'ল যেন তার গতি বেড়ে গেল আরও।

কি করব? দরজা খুলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ব?

কিন্তু সে তো নিশ্চিত মৃত্যু!

ওর গলাটা টিপে ধরব?

উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই পেলাম—সে সাহস হবে না।

তবে?

তবে যে কি করব সেইটেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। কিছুই ঢুকল না মাথায়। অসহায়ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম শুধু!

হু হু ক'রে ছুটে চলতে লাগল গাড়ি। এত জোরে যে, হেডলাইটের তীব্র আলোতেই সামনের গাছপালা গুলো একাকার আবছা মেঘের মতো।

মনে হ'তে লাগল। কিছুই বোঝা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে বেগ এত বাড়ল, যেন মনে হ'ল চাকাগুলো আর মাটি স্পর্শ ক'রে চলছে না, এরোপ্লেনের মতো বাতাসে ভর দিয়ে ছুটছে।

কি একটা বলতে চেষ্টা করলাম আবারও—পারলাম না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোন মতেই স্বর ফুটল না তাতে। ঘামে সমস্ত কাপড় জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, হাতে পায়ে কোন জোর নেই।

তবে কি অন্তিমযাত্রাতেই চলেছি।

জীবনের এপারে কি কোথাও এ-চলার শেষ হবে না?

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই কি প্রকৃতির এ প্রলয়ায়োজন?

কত কি এলোমেলো চিন্তা মাথাতে আসতে লাগল। কত কি নিরুত্তর প্রশ্ন।

ভয়ে কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি?.....

অসাড় অনড় হয়েই বসে আছি, অকস্মাৎ সামনে দূরে আর একটা কী সাদামতো নজরে পড়ল।

বহু দূরে। কি পদার্থ, গরু কি মানুষ কি অন্য কোন বস্তু, কিছুই ঠাওর হ'ল না। কিন্তু সাহেব আর একবার হেসে উঠল। সেই মৃদু অথচ কঠিন ধাতব শব্দ পাওয়া গেল একটা।

আবারও কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গে। শির্‌শির্ ক'রে উঠল সমস্ত দেহটা।

কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি আরও এগিয়ে গেছে। সেই সাদামতো পদার্থটা কাছে এসেছে। আর বুঝতে কোন বাধা নেই। দেখতেও না—আলোটা সম্পূর্ণই ওর ওপর পড়েছে।

মেয়েছেলে!

তরুণী বাঙ্গালীর মেয়ে একটি। ঘরোয়া ধরণের শাড়ি পরে স্থির অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, পথের ঠিক মাঝখানে। এই দিকেই চেয়ে আছে।

আরও কাছে আসতে বোঝা গেল, বেশ সুশ্রী মেয়ে, ভদ্র বংশের তো বটেই।

কিন্তু গাড়ি যে সোজা ওর দিকেই ছুটে চলেছে!

আরে, ও যে নড়ে না।

'সাহেব হর্ণ দাও—দেখতে পাচ্ছ না?'

নিজের অজ্ঞাতসারেই কণ্ঠে স্বর ফুটেছে কখন—উৎকণ্ঠার আতঙ্ক গেছি ভুলে। নিজের অবস্থার কথা মনে নেই আর, এই আসন্ন সর্বনাশ, শোচনীয় দুর্ঘটনাটাই প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠেছে তখন।

সাহেব আর একটু হাসল শুধু।

মেয়েটাই বা সরছে না কেন?

ও কি তাহ'লে মরতেই চায়?

এই গহন বনে ও-ই বা এল কোথা থেকে?

তবে কি—

কিন্তু আর কিছু ভাবার সময় নেই তখন। আর কোন সময়ই নেই। ওকে বাঁচাবারও না। গাড়ি সোজা নক্ষত্র বেগে ওর দিকেই এগিয়ে চলেছে। ওর ওপরই এসে পড়ল যে!

আর সামান্য, আর চার হাত।

আর না। আর বাঁচানো গেল না।

মেয়েটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির সামনে— নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে।

আতঙ্কে দুঃখে ক্ষোভে প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠলাম।.....

প্রচণ্ড নাড়া খেল গাড়িটা, তীব্র ঝাঁকানি লাগল একটা—বোধ হয় ঐ মেয়েটার দেহে ধাক্কা খেয়েই—তারপর সেও আর্তনাদের মতো একটা দারুণ শব্দ ক'রে গেল থেমে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত সেই প্রবল ধাক্কাতেই হেডলাইট দুটোও গেল নিভে।

তারপর সব আবার চুপচাপ। আবার সেই নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু একটানা বৃষ্টির ঝিমঝিম শব্দ। আর মধ্যে মধ্যে দূরাগত মেঘ গর্জন, গুরুগুরু গুমগুম।

তখন কিছু ভাবছি না ঠিক, কিছু করার তো উপায়ই নেই। সব শক্তি গেছে নিঃশেষ হয়ে, সব চেতনা গেছে হারিয়ে। চুপ ক'রে বসে আছি শুধু—

এমন সময় আবারও গাড়ির ঠিক পাশে কার একটা কাশির শব্দ হ'ল। একটা যেন সূক্ষ্ম আলোর রেখার মতোও কি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল এক নিমেষে!

ব্যস্ আর আমার কোন জ্ঞান নেই। ঠিক কি ভেবেছি কি করেছি তা আর আজ বলতে পারব না—তবে নাকি বিকট একটা চিৎকার ক'রে দরজা খুলে

"দ্রুত সমাপ্তি পথে"

একটি অমানুষ মানুষের চলমান জীবনোপাখ্যান

উত্তম কুমার

অরুন্ধতী

মুক্তিচিত্র প্রাঃ লিঃ এর

শিউলি বাড়ি

মুখ্য ভূমিকায়:

তুষি বিশ্বাস · রঞ্জনা · দিলীপ রায় · জহর রায় · তরুণ কুমার

• পরিচালক: অজয় বিশ্বাস

লাফ দিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়—অন্তত বাহাদুর তাই বলেছিল!

'বাবু বাবু ও কি করছেন? এই যে আমি, আমি বাহাদুর। চিনতে পারছেন না আমায়? ভয় পেলেন নাকি?'

হয়তো বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে, হয়তো বৃষ্টির জলে অথবা বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে—কিসে জানি না, যেন প্রকৃতিস্থ হলাম একটু।

ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'বাহাদুর? তুমি কোথা থেকে এলে? কেমন ক'রে এলে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তো বহু দূর চলে এসেছি, কি ক'রে ধরলে আমায়?'

'কি বলছেন বাবু যা তা? ভয়ে পাগল হয়ে গেলেন নাকি? এই জন্যেই তখন আগে বাজিয়ে নিয়েছিলাম যে থাকতে পারবেন কিনা!...আপনারা শহরের লোক, আপনাদের দৌড় তো আমি জানি!...নিন উঠুন গাড়িতে!'

বাহাদুরের বিদ্রূপে ও তিরস্কারে আরও অনেকটাই প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলাম। লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দোর খুলে গাড়িতে উঠে পড়লাম। কিন্তু এটুকুতেই ভিজতে আর কিছু বাকী রইল না।

বাহাদুরও উঠে বসল গাড়িতে। বর্ষাতিটা খুলে নিচে ফেলে দিয়ে বলল, 'আরও আপনার ভাবনাতেই আমি বেশী দূর যেতে পারলাম না। কত—বড় জোর পনেরো কুড়ি মিনিট তো গেছি। তাতেই এত ভয় পেয়ে গেলেন?'

স্পষ্ট অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ তার কথায়।

কিন্তু পনেরো কুড়ি মিনিট! লোকটা বলে কি? সত্যিই কি আমি ভয়ে পাগল হয়ে গেছি?

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করি, 'ওদের পাত্তা পেলে?'

'না। তারা এতক্ষণে ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়েছে!' তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বাহাদুর, 'আমারই দুর্ভোগ। এখন সারা রাত এইখানে বসে কাটাই, কালও আট মাইল না হাঁটলে উপায় হবে না। এক যদি কোন চলতি ট্রাক কি লরী এসে পড়ে তো তবু বাঁচোয়া।'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বাহাদুরকে বলি, 'একবার স্টার্টটা দেখবে এখন চলছে কিনা?'

'মাথা খারাপ নাকি বাবু। তখন খুব ধস্তাধস্তি করলুম তাই চলল না, এখন তো সব ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে!'

ওর ভাবভঙ্গী দেখে বার বারই মনে হচ্ছিল যে আর কিছু না বলাই উচিত। তবু কি মনে হ'ল—প্রায় মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম, 'তবু একবার দ্যাখোই না। আমি বলছি—একবার চেষ্টা করো। তোমার তো কোন কষ্ট নেই—এটুকু তো বসে বসেই পারবে!'

বিরক্তি চাপবার কোন চেষ্টা করল না বাহাদুর, তবে কথাটা শুনল। বোধ হয় আমাকে অপ্রতিভ করবার জন্যই—পরে অনেক বেশী অপমান করতে পারবে এই ভরসায়। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে সুইচটা টিপে ক্লাচে হাত দিল—

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অনড় অচল যন্ত্রটা যেন প্রবল গর্জন ক'রে উঠল, গাড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে। ইঞ্জিন যে স্টার্ট নিয়েছে সে সম্বন্ধে আর কোন রকম সন্দেহের অবকাশ রইল না।

'আরে! বহুত তাজ্জব বাত!'

একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি ক'রে চমকে ওঠে বাহাদুর। অবাক হয়ে বলে, 'এ কি ব্যাপার বাবু? আপনি কি কিছু ক'রেছিলেন? আপনি কি জানেন এ সব মেরামতির কাজ? তাহ'লে তখন বললেন না কেন?'

'বলছি বলছি। তার আগে তুমি এখান থেকে একটু এগিয়ে যাও দিকি!'

এবার আর বাহাদুর কোন আপত্তি করল না, বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি ছেড়ে ছিল।

খানিকটা চলবার পর, মনে জোর পেলুম খানিকটা, মনের মধ্যে কিছু পূর্বের অভিজ্ঞতাটাও ভেবে একটু গুছিয়ে নিতে পারলুম। তখন ইঙ্গিতে ওকে থামতে বলে একে একে সব বললুম।

শুনতে শুনতেই যে বার কতক শিউরে উঠল ও, তা এই অন্ধকারেই টের পাওয়া গেল। দু হাত নিজের কানে ও নাকে ঠেকিয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করল কাকে, তারপর রীতিমত কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'জয় রামজীকি, জয় শিউজীকি! মা কালী আর আপনার গুরুজীর বহুত কৃপা তাই আজ প্রাণে বেঁচেছেন। নইলে এই আঁধেরা রাত আর আপনি একা—আপনার তো অপঘাত হবারই কথা।...হ্যাঁ ওরা এখানেই থাকে, আমি শুনেছি বহুত বার তবে কথাটা মনে ছিল না। নইলে আপনাকে ছেড়ে যেতাম না। অবশ্য আমি কখনও দেখি নি, আর দেখবই বা কি ক'রে—আমি তো এত রাত্রে কখনও গাড়ি চালাইনি এ-পথে।...ওরা এই রাত দুটো-তিনটের সময়ই নাকি পথে বেরোয়!'

'কিন্তু ওরা কারা? এমনভাবে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? এখানেই বা এল কি ক'রে? একজন তো দেখলাম সাহেব—তার সঙ্গে ও বাঙ্গালীর মেয়ে? সে-ও কি অপদেবতা? যা দেখলাম সবই মায়া? আচ্ছা গাড়ি তুমি যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলে সেখানেই পেলে?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করি অনেকগুলো।

'ঠিক সেখানেই পেয়েছি বাবু। একটা বড় শিরীষ গাছ চিহ্ন করা ছিল। ওখানটার মস্ত বাঁক বলে সরকার থেকে সাদা দাগ দিয়ে দিয়েছে কাঠের গুঁড়িতে।

তারপর একটু হেসে শুরু করল, 'হ্যাঁ বাবু, ওরা দুজনেই ভূত। শুনবেন ওদের গল্প?'

প্রশ্ন করল বটে তবে সম্মতির অপেক্ষা করল না।

বাহাদুর যা বলল তা সংক্ষেপে এই :

ঐ জুয়েলাটার এর আগে একটা বড় চা-বাগান ছিল, ডাইনীমারা চা-বাগান। সাহেবের বাগান, সাহেবই ম্যানেজার থাকত। বেশী দিনের কথাও নয়, চল্লিশ বছর আগে ঐ সাহেব আসে এদেশে, রোল্যান্ড সাহেব, নতুন ম্যানেজার হয়ে। মালিকের ভাগ্নে, সুতরাং ঠিক সাধারণ মাইনে করা কর্মচারীর মতো নয়—মালিকের মতোই যা-খুশী তাই করত।

অত্যন্ত মদ্যপ আর লম্পট ছিল লোকটা। এখানে এসে চা-বাগানের মেয়েদের কারুরই সর্বনাশ বাকী রাখে নি। কিন্তু ওদের নিয়েই চলছিল, ভদ্রলোকদের দিকে হাত বাড়ায় নি। হঠাৎ ওখানকার বড়বাবুর মেয়ে রাণী সাহেবের চোখে পড়ে গেল। সাহেব পাগল হয়ে উঠল; রাণীকে তার চাই। তিনি লোক দিয়ে বড়বাবুকে বিস্তর টাকা কবুল করলেন—একটা রাত পেলেই চলবে তাঁর, তার জন্য হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছেন। বড়বাবু ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক, প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন শুরু হ'ল নানা রকমের জুলুম। পাহাড়ে দেশ হ'লে কিম্বা আগেকার দিন হ'লে জোর ক'রেই কাজ উদ্ধার করত সাহেব কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সোজাসুজি জোর করতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে জব্দ

করবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে বিরক্ত হয়ে বড়বাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যেতে চাইলেন। শিকার হাতছাড়া হয় দেখে সাহেব এক মহা শয়তানী করল, তহবিল তছরুপের দায়ে জড়িয়ে ও'কে গ্রেপ্তার করল। সাহেবের টাকা ছিল, আর সে সময় এদেশে সাধারণ কেরাণীদের মধ্যে ও জিনিসটির তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। টাকা খাইয়ে বড়বাবুরই জন দুই অ্যাসিস্টান্টকে সাক্ষী খাড়া করল। খাতাপত্রও রাতারাতি পাল্টে দেবার ব্যবস্থা হ'ল।

প্রথমটা বড়বাবু অত ভয় পান নি। শেষে গতিক দেখে প্রমাদ গুণলেন। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কলে পাঠালেন, সব ফেলে রেখে কোন মতে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে পালাতে—তাঁর অদৃষ্টে যা আছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু যে জন্যে এত কাণ্ড সেই মেয়ের ইজ্জৎটাও না যায় শেষ পর্যন্ত।

ওর স্ত্রী সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তবে তাও যে সম্ভব হবে না, গোড়া থেকেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে রাণীর জন্য এত, সেই রাণীই সব ওলট পালট ক'রে দিলে।

সে এবার ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিলে। সটান সোজা সাহেবের বাংলোয় গিয়ে বললে যে সে নিজেই এসে ধরা দিতে প্রস্তুত আছে যদি সাহেব তার বাবার নামে নালিশ তুলে নিয়ে সসম্মানে মুক্তি দেয় এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মাইনের টাকা সব মিটিয়ে দিয়ে আরও দু হাজার টাকা বেশী দেয়।

সাহেব তখনই রাজী হয়ে গেল। শুধু বললে, 'জামিন?'

রাণী জবাব দিলে, 'জামিন আমি! আমি আমার মার নামে দিব্যি গেলে যাচ্ছি—এ কথার নড়চড় হবে না। সন্ধ্যার মধ্যে তুমি তোমার কাজ শেষ কর আমি রাত আটটার মধ্যে তোমার বাংলোয় হাজির হব!'

সাহেব তো মহা খুশী, আনন্দে শীস দিয়ে উঠল।

তবে সে-ও বাহাদুর ছেলে। সেই দিনই অবশিষ্ট ক ঘন্টার মধ্যেই ওদের চুক্তির তার শর্ত নিঃশেষে পালন করলে। এমন কি সকলের সামনে বড়বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে। জানালে সে অনুতপ্ত।

সকলেই সেই কথা জানল, এমন কি বড়বাবুও। কারণ রাণীর এই ব্যাপার কেউ জানত না। তবুও বড়বাবু যাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন, এখানে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয়। কে জানে মাতালটার মতি বদলাতে কতক্ষণ?

কেউই কিছু জানল না। তখন এদিকে বিজলীর আলো হয়নি, হ'লেও কিছু রাস্তায় আলো থাকত না। কালো কাপড় পরে বেরিয়ে যখন সাহেবের বাংলোয় গিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে এসেছিল রাণী তা কেউ টের পায় নি। ওর কথামত সমস্ত ঝি চাকরকে সে সময়টা সরিয়ে দিয়েছিল সাহেব, কথাটা ছড়াবে সে সম্ভাবনা ছিল না।

সাহেব খুব খুশী, ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে বলে নিশ্চিন্তও। খুশী মনেই ফূর্তি করতে সহরে গিয়েছিল। বহু রাত্রি পর্যন্ত ক্লাবে চেঁচামেচি হল্লা ক'রে মদ খেয়ে বাগানে ফিরছিল সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে রাণীর মনে এই ছিল!

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক ঐ জায়গাটাতেই, আমাদের গাড়ি যেখান ছিল। রাণী একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ওরই অপেক্ষায়। পুরো স্পীডে গাড়ি আসছে এমন সময় পথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। সাহেবের তখন মদে আচ্ছন্ন দৃষ্টি, যখন বুঝল এবং চিনতে পারল তখন আর ব্রেক কষবার সময় ছিল না, ওরই গাড়ির চাকার তলায় পিষে গেল রাণী।

এরপর যে কি হ'ল—যেন একেবারে জন্তু হয়ে গেল সাহেব। তারপর বেঁচেও ছিল মোটে সাত-আটটা দিন। একদিন গভীর রাত্রে সেই বড় গাছটারই একটা ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল সে। তারপর থেকেই নাকি ওরা দুজন এখানে আছে। দৈবাৎ কোন দিন রাত্রে একা এপথে কেউ গেলে ওদের দেখতে পায়—বেশ বড় বড় কটা দুর্ঘটনাও ঘটেছে এখানে। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুর হয়ে গেছে গাড়ি—অকারণেই বলতে গেলে।

'তারপর থেকেই এখানকার চা-বাগানটা নষ্ট হয়ে গেছে' জানালো বাহাদুর, 'অনেকে চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ নাকি টিকতে পারেনি। এমন সব উপদ্রব হ'তে লাগল যে বাঙ্গালী তো বাঙ্গালী, সাহেবরা পর্যন্ত পালাতে পথ পেলে না—বাগান ছেড়ে। তবু তো সেই গলায়-দড়ি গাছটা ওরা কেটে পুড়িয়ে দিয়েছিল—কিছু কিছু যাগ হোমও করেছিল। কিন্তু সাহেবের বাগান সাহেবেরা তো আর ও সব করবে না, তা সম্পত্তি থাক আর যাক।...গেলই অবশ্য, এমনি পড়ে পড়েই যন্ত্রপাতি সব গেল নষ্ট হয়ে, বাড়িঘর গেল ভেঙ্গে। সকলকার মনেই এমন ভয় ঢুকে গেল যে অত দামী দামী জিনিস পড়ে পড়ে নষ্ট হ'ল তবু কোন চোর পর্যন্ত এল না চুরি করতে। এখনও জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করলে হয়ত সে-সব জিনিস খুঁজে পাবেন।'

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল বাহাদুর, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে বসে রইল সে।

আমি ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'এবার গাড়িটা ছাড় বাহাদুর, রাত তো পুইয়ে গেল প্রায়। চারটে বাজে, এখনই ফরসা হয়ে যাবে। যা দেশ তোমাদের!'

'এই যে ছাড়ি বাবু!' সে আবারও স্টার্ট দিয়ে বললে, 'তবে একটা কথা বাবু, আপনার কিন্তু সত্যিই খুব বরাত জোর। আপনার কোন অনিষ্ট তো করেই নি—উলটে গাড়িটা সত্যিই খুব ভাল সারিয়ে দিয়ে গেছে। খাসা হাত ব্যাটার, তা মানতেই হবে!'

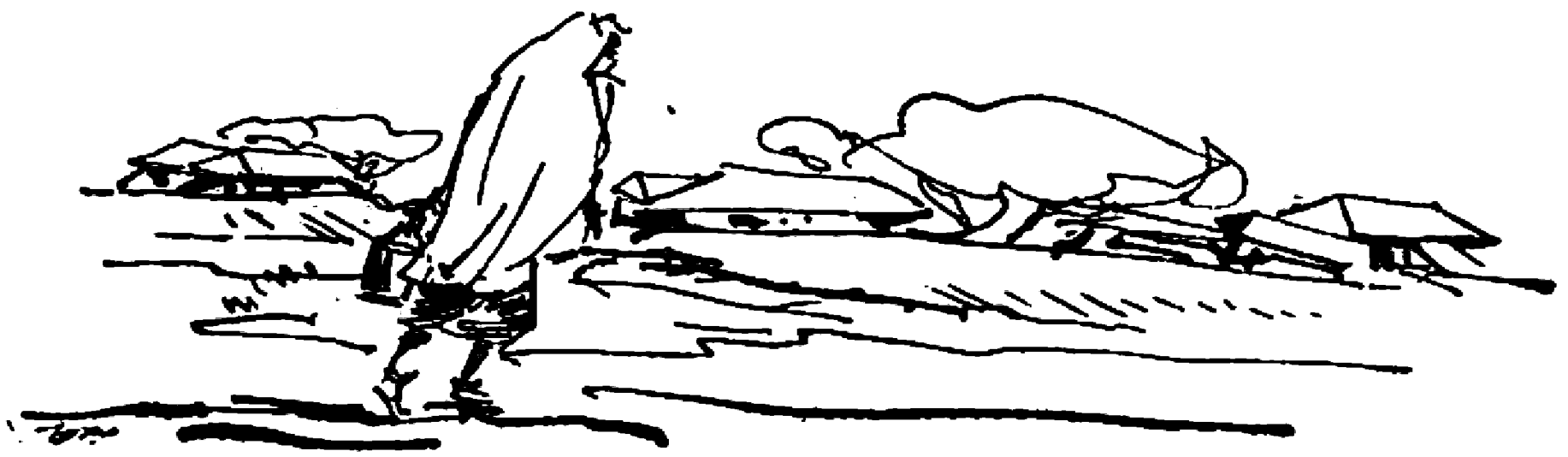

বোধনবস্ত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দোতলার বারান্দার কোণে মিট্‌সেফের সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপড়গুলো নুয়ে রাখছিল বাসন্তী। এক নজর তাকিয়েই সুধীর দেখল, জামা-কাপড় বদলে তৈরি হওয়া দূরে থাক, এখনো বৈকালিক গা-হাতই ধোয়া হয়নি তার। তক্ষুনি বুঝে নিল সমাচার কুশল নয়। ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

ইশারায় কারণ, আধা-আধি দরজা ভেজানো সামনের ঘরে কর্তার অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসংশয় সে।

হাসি চেপে বাসন্তী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। তারপর তেমনি ইশারায় বাবার ঘরটা দেখিয়ে কল্পিত কলম দিয়ে শূন্য বাতাসে লিখল কিছু। অর্থাৎ, হবে না। ও-ঘরে হিসেব কষা চলছে—

সুধীর বুঝল। বুকে বিরস বদনে পা টিপে শেষের ঘরে ঢুকে হাত পা ছড়িয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ল। ছুটির দিন। দুজনে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল। হয়ে গেল। না, টিকিট কিনে আনেনি সে। টিকিট আর আগে থেকে কেনে না। কর্তার ওই হিসেবের ধাক্কায় অনেকবার অনেক টিকিট নষ্ট হয়েছে। আজকাল আর সুধীর এ-সব নিয়ে রাগ করে না। বাসুকে বরং এক একসময় জিজ্ঞাসা করে, কর্তার খাবারের সঙ্গে কিছু কবরেজের বড়ি আর মাথার তেলের সঙ্গে কিছু কবরেজি তেল মিশিয়ে রাখলে কি হয়।

বাসু অর্থাৎ বাসন্তী কখনো হাসে, কখনো জবাব দেয়, মাথা আর একটু ঠান্ডা হয় তাহলে, হিসেবটা আরো একটু ভালো খেলে।

বাবা! থাক্‌ থাক্‌—

সকাল সন্ধ্যায় বা ছুটির দিনে খুঁটিনাটি হিসেবের ব্যাপার এ বাড়িতে লেগেই আছে। কিন্তু কর্তা শম্ভুবাবু ঘরের দরজা আবজে হিসেবে বসেন যখন, বাড়ির হাওয়া অন্য রকম। বাসুর দুরন্ত ছোট ভাই বোনগুলোও তখন একটা অদৃশ্য হিসেবের ছকে আটকে পড়ে যায়। সকলকেই তখন হিসেব করে চলতে হয়, হিসেব করে কথা কইতে হয়, হিসেব করে হাসতে হয়। তখন কোনো কিছুর আধিক্য হিসেবের গন্ডী ছাড়িয়ে বাড়তি খরচ করে ফেলার মতই অশোভন।

বাসুর ধারণা, এই হিসেবের ধকলটা সব থেকে বেশি যায় তার ওপর দিয়েই। কখন মৃদু গম্ভীর ডাক আসে সেই ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। বাবার হাতে কাগজ পেন্সিল দেখলেই বুক দুরু দুরু। ডাক তো হামেশাই আসে। ওকে ছাড়া বাবা ডাকবেনই বা কাকে। কোন্‌ ব্যাপারে কত খরচ হল না হল জিজ্ঞাসা করেন। সে তবু এক রকম জবাব দেওয়া যায়, কারণ খরচ তো হয়েই গেছে। খরচ বেশি হয়েছে শুনলেও বাবা মুখের ওপর খুব যে রাগ করেন বা কটু কথা বলেন তা নয়। গলা ফাটিয়ে রাগারাগি চেঁচামিচি বরং মায়ের সঙ্গে করতেন। ওকে শুধু বলেন, একটু বুঝেশুনে চলিস, অফিসের কাজ তো হয়ে এলো, ক'টা দিন আর-

কিন্তু বাসুর সব থেকে বিপদ, বাবা যখন জিজ্ঞাসা করেন, কেন্ ব্যাপারে কত লাগবে বা লাগতে পারে। কিচ্ছু লাগবে না, এমনিতেই সব হয়ে যাবে বলতে পারলে বোধহয় সব থেকে খুশি হত বাসু। বাবা চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন না। ঠাণ্ডা সুর, ঠাণ্ডা প্রতীক্ষা। কিন্তু তাইতেই সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম বাসুর। থতমত খেয়ে এক-এক সময় এহেন একটা শীর্ণ অঙ্ক বলে বসে যে বাবাও হেসেই ফেলেন। কিন্তু অখুশি হন না বোঝা যায়। বলেন, তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত—নে, এই টাকা রাখ্, এর মধ্যে চালিয়ে নিস্—

যা চাওয়া হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি দেবার তৃপ্তি লাভ করেন শম্ভুবাবু। কিন্তু বাসুর সব থেকে মুশকিল হয়, এই বেশি অঙ্কটাও যখন নির্ধারিত সময়ের আগেই শূন্যে মিলিয়ে যায়। তখন নিজে আর সামনে আসে না বড়। ভাই বোন কারো মারফৎ আবেদন পেশ করে, টাকা ফুরিয়ে গেছে, আরো কিছু লাগবে। বাবা টাকা দেন, কিন্তু তার পরেই ভয়ানক গম্ভীর। বাসু প্রাণ-পণ চেষ্টা করে বাবা যা দেন তার থেকে কিছু বাঁচাতে। কিন্তু তার হাতে এলে টাকাগুলোর যেন পাখা গজায়। কোথা দিয়ে কি হয় হদিসই পায় না। তার ওপর বাবা আবার এক সময় ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, খরচটা বেশি হল কিসে। বাসু বোবা তখন।

মায়ের ওপরেই ভারি রাগ হয় বাসুর, অভিমান হয়। ওকে জব্দ করার জন্যেই যেন মা অসময়ে দুনিয়া পাড়ি দিয়েছে। মা মারা যাবার পর এই চার চারটে বছর কি করে কাটল সে-ই জানে। কবরেজের তেল খানিকটা বাবার বদলে ওর মাথায় পড়লে ঠিক হয়। তাও তো চলছে এখনো, ছ' মাস বাদে কি হবে ভাবতে গেলে এখন থেকেই বাসুরও মাথা গরম হয়ে যায়।...ছ' মাস বাদে বাবার চাকরি শেষ। এখনই যা, তখন কি আর মুখের দিকে তাকানো যাবে।

...অবশ্য আরো ছ'মাস হয়ত বাসু এ-বাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবে না। ওদিকে তো এখন থেকেই হাঁ করে দিন গুনছে একজন। বাসুর পরের ভাইটা সবে কলেজে ঢুকেছে। ওটার অবস্থাই কাহিল হবে আর কি। বাবা বাসুকে আজকাল ধমক ধামক না করলেও ভাই বোনগুলোকে ছাড়েন না।

যাই হোক, খরচের সমস্যায় পড়লে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে টাকা ফুরোলে বিড়ম্বনাটা বাসুর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সুধীর অন্তত বোঝে। কি মাসে দুই একদিন আগে অন্তত টাকা ফুরোবেই। তার জেরায় পড়ে সমস্যাটা ফাঁস হয়ে যায়। গোপনে সদাই-পত্র করে সুধীরই তখন চালিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ হত বাসুর, আপত্তি করত। সুধীর উল্টে চোখ রাঙাতো, মাসের মধ্যে যে কুড়িদিন রাতে খাই এখানে তার খরচা ধরলে কত হয়? কম পড়বেই তো, সে-টাকা তো আর কর্তা হিসেব করে ধরে দেন না তোমাকে। বাসুর রাগ দেখে হাসে কখনো, বলে, দুদিন বাদে তো নির্বিবাদে পকেট ফাঁক করবে—এখন থেকেই অভ্যেস হোক।

অভ্যেস হয়েছিল। মাসের শেষে সুধীন নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করত, কি অবস্থা?

বাসু জবাব দিত, অবস্থা ভালো না, ডাক্তার লাগবে।

কিন্তু একবার ধরা পড়ে গেল। আর ধরা পড়ে দুজনেরই অবস্থা কাহিল। সেবারে কর্তা যেন কিছু কমই দিয়েছিলেন মেয়ের হাতে। শেষের দিকে অফিস থেকে বাড়তি টাকা পাবেন কিছু। ভেবে রেখেছিলেন, টাকাটা পেলে বাকিটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু খেয়াল করে সেটা আর বলেননি মেয়েকে।

তৃতীয় সপ্তাহ শেষ না হতে মেয়ের চক্ষু স্থির। ট্রাঙ্কের তবিলের দিকে চেয়ে কান্না পাচ্ছিল তার। কি দিয়ে কি হয়ে গেল টাকাগুলো মাথা খুঁড়েও ঠাওর করতে পারল না। সমাচার অবগত হয়ে সুধীর আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল, আছে গৌরী সেন, তোমার ভাবনা কি!

বাসুর মেজাজ খারাপ।—যাও ভালো লাগে না, বাবা এমনিতেই দুজনকে সমান উড়ন-চণ্ডী ভাবে আমাদের।

সুধীর প্রতিবাদ করল।—কথাটা ঠিক হল না, ...আমাকে উড়ন-শিব ভাবেন বোধহয় আর তোমাকে উড়ন-চণ্ডী।

ঠিক দুদিন বাদেই বাবার ঘরে ডাক পড়ল বাসন্তীর। জিজ্ঞাসা করলেন, হাতে কি আছে রে, আর কত লাগবে?

একটু অবাক হলেও সুবোধ মেয়ের মত বাসু বলল, আর লাগবে না বাবা, কুলিয়ে যাবে—

কিন্তু শুনে বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।—কুলিয়ে যাবে কিরে, মাস চলে যাবে?

বাসু ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

ফলে হাতে যা আছে এনে দেখাতে হল তাঁকে, এ-পর্যন্ত কত খরচ করেছে না করেছে সব দাখিল করতে হল। কারণ এ-রকম সুবাহিত অঘটনই বা শম্ভুবাবু বিশ্বাস করবেন কি করে! বলা বাহুল্য, মেয়ের হিসেবের সঙ্গে টাকার অঙ্ক আদৌ মিলল না। বাসুর প্রাণান্ত শঙ্কট।

শেষে বিরক্ত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকাতেই শম্ভুবাবুর চোখে একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল মনে। সুধীরকে অনেকদিন এটা সেটা হাতে করে নিয়ে আসতে দেখেন, সখ করে রাতের বাজারও যে এক একদিন করে নিয়ে আসে তাও দেখেন। শম্ভুবাবু এ-সব তেমন পছন্দ করেন না, কিন্তু সুযোগ পাবে ভেবে কিছু বলেন না।

সুধীরের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস?

মেয়ের মনে হচ্ছিল মাটি দুফাঁক হলে তার মধ্যে ঢুকে বাঁচে।

শম্ভুবাবু হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর যথার্থই রেগে গেলেন।—আর কত বেশি দিলে তোর চলবে? তুই এভাবে অপমান করিস আমাকে?

ভাবী জামাইয়ের কাছ থেকে কত নেওয়া হয়েছে জেনে নিয়ে টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

কিন্তু হিসেব করা বন্ধ হল না। ছ' মাস বাদে রিটায়ার করবেন, দিনের পর দিন হিসেবের জটিলতা বাড়তেই থাকল।

সম্ভাব্য তহবিলের আয়তনটা টানলে বাড়বে না, সেটা মোটামুটি নির্দিষ্ট। অতএব ব্যয়ের খসড়াটাই সূক্ষ্মতর কিস্তার লাভ করছে ক্রমশঃ।...একুশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স আটাশ হাজারে দাঁড়াবে। সরকার হাতে না নিলে তিরিশ হাজারই হত, তা ওনারা তো যতে হাত দিয়েছেন তাই কাঁকরা। গ্র্যাচুইটি পাবেন চোদ্দ হাজার—হল বিয়াল্লিশ। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডে জমেছে বাইশ হাজার—মোট চৌষট্টি। ব্যাঙ্কে হাজার দেড়েক আছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়—বুড়ো বয়সের অসুখ বিসুখ আছে, অনেক কিছু আছে। সর্বসাকুল্যে শেষ সম্বল ওই চৌষট্টি—এ ছাড়া পেনশন বলতে এক পয়সাও নেই।

আগের দিন হলে শম্ভুবাবুর আর ভাবনার কি ছিল। টাকার দাম তো দিনকে দিন নয়া পয়সার দিকে গড়াচ্ছে। ...পাঁচটি সন্তানের মধ্যে সবার ছোট দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে নমো-নমো করে সারতে হলেও আট হাজার করে লাগবে। তিনি থাকুন আর না-ই থাকুন টাকা তো লাগবেই। সেই দিনের বাজারটা অনুমান

করতে পারছেন না বলেই মোটামুটি আট হাজার করে ষোল হাজার ধরে রেখেছেন। তার ওপর ওদের বি-এ পর্যন্ত পাস করিয়ে তুলতেও খুব কম করে আরো দু' হাজার দু' হাজার চার হাজার। লেখাপড়া না শেখালে ভালো বিয়ের আশার ছাই আজকাল, বড় মেয়েকেও দু' বছর হল বি. এ পাস করিয়ে ছেড়েছেন তিনি। গেল কুড়ি। ছোট দুই মেয়ের ওপরে দুই ছেলে। একটি আই. এ পড়ছে, আর একটি ইস্কুলের-মাস্তা-মাস্তি। আগে তাদের পড়াশুনার বায় বাবদ একটা মোটামুটি হিসেব ধরে-ছিলেন। সম্প্রতি বছর গুনে খরচের ছক কেটেছেন। তাতেও দেখা গেছে একজনের তিন হাজার আর তার ওপরের জনের দু' হাজার লাগবে—ছেলেদের মোটামুটি ভালো করেই মানুষ করার ইচ্ছে তাঁর। গেল পঁচিশ। বড় মেয়ের বিয়ের খরচটা একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ—তবে তাতেও পাঁচ ধরেছেন। হল তিরিশ। তারপর মফঃস্বলের আদ্যিকালের পুরেনো ভাড়াটে বাড়িতে আছেন বলেই এই ভাড়ায় থাকতে পারছেন। তাও প্রতিমাসে বাড়ি-ওয়ালা ভাড়া নেবার সময় খোঁজ নেয়, কবে পর্যন্ত বাড়িটা ছাড়া পাওয়া সম্ভব।

ধারে কাছে জমি একটা দেখেই রেখেছেন শম্ভুবাবু—টাকাগুলো হাতে পেলেই ওটা কিনবেন। তারপর মাথা গোঁজবার জায়গাও করবেন একটা। কিন্তু যে বাজার, কিছু না কিছু না করেও হিসেব করে দেখেছেন বাইশ হাজার লাগবে জমি আর বাড়িতে। তাও যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে পারেন। তিরিশ আর বাইশে বাহান্ন। হাতে থাকলো বারো। এই বার হাজারে ছেলে দুটো মানুষ না হওয়া পর্যন্ত সংসার নির্বাহ জামা-কাপড়, ডাক্তার, ওষুধ,—সব। শম্ভুবাবুর চোখে বারো হাজার টাকা বারো হাজার নয়া পয়সার মতই প্রায়। অনেক হিসেব করেও বারো হাজারকে তের হাজারে টেনে তুলতে পারছেন না তিনি, বরং মনে মনে জানেন, ওর থেকে আরো কমই থাকবে হাতে। তাছাড়া টেনেটুনে (ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ বাদে—সেটা আগেই ধরা আছে) মাসে আড়াইশর সংসার চালালেও চার মাসে হাজার টাকা, বছরে তিন হাজার টাকা—চার বছরে বারো হাজার খতম।

তারপর? তারপর কি হবে?

যত দিন যায়, এই তারপরের চিন্তায় মাথা গরম শম্ভুবাবুর।

এবারে বড় মেয়ের বিয়ের হিসেবের প্রসঙ্গ। সেটা একেবারে সমূহ বলেই ফর্দ করে টাকার অঙ্ক ফেলতে পেরেছেন তিনি। তবে তারও অদল-বদল হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিয়ে আরো ছ'সাত মাস আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এ-বাড়িতে সুধীরের যাতায়াত কলেজে পড়তে। তার বাবা আর শম্ভুবাবু বাল্য বন্ধু ছিলেন। ছেলেটাকে পথে ভাসিয়ে বন্ধু অকালে চোখ বুজেছিলেন। সুধীর পড়াশুনায় ভালো বলে কলেজে বিনে পয়সায় পড়তে পেরেছিল। শম্ভুবাবুর নির্দেশে রোজ সন্ধ্যায় সুধীর তখন এ-বাড়ির এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে পড়াত। বাসুরও পড়ার কথা তার কাছে, কিন্তু পরীক্ষা না এলে সে বিশেষ পড়ত না—কারণ তাকে পড়াতে গেলেই শেষ পর্যন্ত ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে বসত। তবে পরীক্ষা এলে, বিশেষ করে উঁচুর দিকের পরীক্ষার সময় বাসুই আবার সুধীরকে একটু তোয়াজ করে চলত। যাই হোক, ছেলেমেয়ের পড়ানোর বিনিময়ে শম্ভু-বাবু সুধীর আর তার বিধবা মায়ের খরচটা এক রকম চালিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশি লাগতও না তখন।

এম-এ'তে খুব ভালো রেজাল্ট হওয়ার দরুন সুধীর, মফঃস্বলের এই সরকারী কলেজে সহজেই লেকচারারের কাজ পেয়েছিল। বরাত জোরে আবার এরই মধ্যে প্রমোশন পেয়ে প্রফেসারও হয়ে বসেছে। শম্ভুবাবু বাসুর সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাবটা তার মায়ের কাছে তার আগেই করে রেখেছিলেন। সুধীরের মা আনন্দে কেঁদেছিলেন সেদিন। মাঝে ভাদ্র আশ্বিন না পড়লে বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু ছেলের বিয়ে দেখা কপালে ছিলই না ভদ্রমহিলার। শরীর বরাবরই রুগ্ন—আচমকা সাত দিনের জ্বরে চোখ বুজলেন তিনি। গুরুদশার দরুন এক বছরের মত বিয়ে পিছিয়ে গেল।

সুধীর কলেজ হস্টেলে একটা ঘর নিয়ে থাকে এখন। চারটি ভাবী শালা-শালিকে পড়াবার অছিলায় এখনো প্রতি সন্ধ্যায় হাজিরা দেয়। পড়াতে বসেও। কিন্তু পড়ানো যা হয় সেটা সকলেই জানে। শম্ভুবাবুও জানেন। গল্প-গুজব করে, সিনেমা দেখে, নয়ত বেড়িয়ে আর প্রায়ই রাতের আহারটা এখানেই সেরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে হস্টেলে ফেরে সে।

শম্ভুবাবুর গোড়ার ফর্দে মেয়ের বিয়ের খরচের অঙ্কটা দু'হাজারে উঠে-ছিল। কিছুদিন আগে কাট-ছাঁট করে সেটা সাড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি এক আঁচড়ে সেটা পাঁচে নেমেছে। খরচ বাবদ সুধীরের হাতে তিনি দেড় হাজার নগদ দেবেন ধরে রেখেছিলেন। সেটা কেটে এক করেছেন। ফলে পাঁচশ টাকা কমেছে। দেড় হাজারই দিতেন, কিন্তু সুধীরের হাতে টাকা দেওয়া আর টাকা জলে ফেলা এই দুইয়ের মধ্যে খুব তফাত দেখেন না তিনি। মাইনে-কড়ি আজকাল কম পায় না, কিন্তু কটা পয়সা হাতে রাখে সন্দেহ আছে শম্ভুবাবুর। প্রফেসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা টাকার একটা ইন্সিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন। সুধীর তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, কিছু কম করলে হত, মাসে অতগুলি টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া.....

শম্ভুবাবু কমাননি, কিছু বলেনও নি। কিন্তু অবাক হয়েছিলেন। ছেলেটা টাকাগুলো নিয়ে করে কি।

বাবার অনুপস্থিতিতে ঘর গোছাতে এসে প্রায় সব হিসেবই বাসুর চোখে পড়ে। উল্টেপাল্টে দেখে আবার রেখে দেয়। নিজের বিয়ের খরচের ফর্দটাও সে অনেকবার দেখেছে। প্রত্যেকটা হিসেবের তালিকায় সুধীরের খরচ বাবদ দেড় হাজার ধরা দেখেছে। এই শেষের তালিকায় সেটা কেটে হাজার করাটা তার চোখ এড়ালো না।

রাতে হাসতে হাসতে সুধীরকে জানালো খবরটা। বলল, আগের সব লিস্ট-এ বিয়ের খরচ বাবদ তোমার নামে দেড় হাজার টাকা ধরা ছিল, নতুন লিস্টে দেখলাম সেটা কাটা গিয়ে হাজার হয়েছে।

খরচ বাবদ হাত পেতে এক পয়সাও নেবে না সেটা সুধীরই জানে শুধু। আর মনে মনে বাসুও জানে হয়ত। কিন্তু শুনে সুধীর ছদ্ম-চিন্তার ছায়া টেনে আনল মুখে। বলল, বিয়ের দিন পর্যন্ত উল্টে হাজার টাকা চাইবেন না তো শেষে? তারপর হাসতে হাসতে বলল, ওই হাজারটাও তুমি বরং কেটে দিয়ে এসো—হাজার টাকার হিসেব দিতে গিয়ে মাথার চুল সাদা করবে কে?

ভাবী জামাইয়ের খরচের হাত দেখে শম্ভুবাবু অনেক সময় ভিতরে-ভিতরে গজগজ করেন। মেয়েটাও হয়েছে তেমনি, কোথায় একটু রাশ টেনে চলার পরামর্শ দেবে তা'না উল্টে এক কাঠি ওপর দিয়ে চলে। কিন্তু এ নিয়ে সরাসরি সুধীরকে এ পর্যন্ত তেমন কিছু বলেন নি।

CENTRAL LIBRARY

ফটো : সুধাংশুমোহন চক্রবর্তী

কড়ি ও কোমল

ফটো : অমিত মুখোপাধ্যায়

সেদিন বলতে হল। বলা দরকার বিবেচনা করলেন শম্ভুবাবু।

এ-বাজারে অফিস-ফেরত রান্না-ঘরের চৌকাঠের ওধারে রুপোর তালের মত চকচকে প্রায়-গোল মস্ত একজোড়া গঙ্গার ইলিশ দেখলে খুশিতে কার না ভিতরটা উপছে ওঠে? কিন্তু শম্ভুবাবু আঁতকে উঠলেন একেবারে। ট্রেন থেকে নেমে খেয়াঘাট পর্যন্ত আসার পথে শস্তা তরি-তরকারী পেলে মাঝে-মাঝে কিনে নিয়ে আসেন তিনি। পরদিনের বাজারের অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। সেদিন একটা গাড়ি আগেই ফিরেছিলেন আর হাতে করে নিয়েও এসেছিলেন কিছু। থলেটা রান্নাঘরে মেয়ের হাতে দিতে গিয়ে এই দৃশ্য।

বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাসুর অবস্থা কাহিল। এই দুর্মূল্যের বাজারে একজোড়া এতবড় মাছ আনার জন্যে ও নিজেই সুধীরকে বকাবকি করেছে। তারপর বাবা ফেরার আগেই কেটেকুটে কিছু রেঁধে আর কিছু সাঁতলে রাখবে ভেবেছিল। তাহলে ক'টা মাছ এসেছে আর কতবড় মাছ তা অন্তত গোপন করা সম্ভব হত।

একেবারে বমাল সমেত ধরা-পড়া গোছের মুখখানা হল বাসুর।

শম্ভুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন খানিক। এ মাছ কে এনেছে জিজ্ঞাসা করার দরকার হল না। দামও তিনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। ..... একজোড়া পনের-ষোল টাকার কম নয়। কেনা দূরের কথা, কেনার ইচ্ছেটা কেমন করে হয় তাই আশ্চর্য।

কত হয়েছে এ দুটো?

বাবার মুখের অবস্থা দেখেই বাসুর মুখ শুকনো। কণ্ঠস্বর শুনে প্রমাদ গুনল। মাথা নাড়তে চেষ্টা করল একটু, অর্থাৎ সঠিক জানে না।

জানারও দরকার মনে করিস না তাহলে? ওর টাকা-পয়সা আজকাল খুব বেশি হয়ে গেছে, কেমন?

এরপর মাছ পাতে দিতে গেলে বাবা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কিনা বাসুর সেই ত্রাস। তাড়াতাড়ি দুদিক বজায় রাখতে চেষ্টা করল সে। —আমি মন্দ বলেছি। বলল, পরীক্ষার খাতা দেখার অনেক-গুলো টাকা পেয়ে গেল হাতে, তাই.....

ক' লক্ষ টাকা পেয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখে?

বাসু নিরুত্তর। শুকনো জিবে করে শুকনো ঠোঁট দুটো একবার ঘষে নিল শুধু।

শম্ভুবাবু ওপরে উঠে গেলেন। খানিক বাদে সুধীরের ডাক পড়ল তাঁর ঘরে। বাসু ভয়ে ভয়ে তাকে ইশারা করল, যা বলেন চুপচাপ শুনে এসো লক্ষ্মীটি, বাবার মেজাজ খুব খারাপ—

মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে ভাবী শ্বশুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুধীর। এদিকে বাসুই বা নিশ্চিন্ত থাকে কি করে? তাড়াতাড়ি সে-ও দোতলায় উঠে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বাবার নির্দেশ কানে এলো, বোসো—

সুধীর বসল।

শম্ভুবাবু বললেন, তোমার বাবা নেই, থাকলে তিনি যা বলতেন আমি তাই বলছি ভেবো। .....এখন থেকে তুমি যদি একটু বুঝেশুনে চলতে না শেখো আর শিখবে কবে? দুদিন বাদে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছ, এ-সব কথা তোমাকে আমার বলে দিতে হবে কেন?

জবাব নেই। জবাব চানও না। বললেন, এ-বয়সে একটু-আধটু খরচ করার ইচ্ছে সকলেরই হয়, তা' বলে হাতে টাকা এলে পাগলের মত খরচ করতে হবে? মাছ কেনার ইচ্ছে হয়েছিল, একটা কিনতে পারতে, আরো ছোট কিনতে পারতে—চোখের নেশাকে এত প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার কি!

থামলেন একটু, একেবারে নয়। রোজ বলা যাবে না যখন একদিনেই ভালো করে সমঝে দেওয়া দরকার। —মাছের জন্যে নয়, কথাটা তোমাকে আমি অনেক দিনই বলব ভেবেছি। তুমি এভাবে খরচ করবে কেন? অভাব কাকে বলে তুমি খুব ভালো করেই জানো, দুর্দিনে পড়লে ক'জন পাশে এসে দাঁড়ায় তাও দেখেছ—তোমার অন্তত একটু ভেবে চিন্তে চলা দরকার। .....আচ্ছা যাও, খারাপ কথা কিছু বলিনি, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার বোঝা উচিত।

বুদ্ধিমান ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তার মুখের দিকে চেয়ে বাসুর মুখে কথা নেই, চোখেও ভাষা নেই। সুধীর নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। বাসুর হঠাৎ বাবার ওপরেই রাগ হয়ে গেল। বাবার সবেতে বাড়াবাড়ি। তার-পর এই লোকটার ওপরেও রাগ হল, সব জেনে-শুনেও যা করার করবেই, বেশ হয়েছে!

শম্ভুবাবু সকালে খেয়ে যান। ফেরেন সন্ধ্যায়। মাঝে সামান্যই টিফিন করেন। কাজেই রাতের রান্না হলেই বাসু সবার আগে তাঁর খাবারটা গুছিয়ে ওপরে নিয়ে আসে। সেদিনও দিয়ে এলো। তিনি খেতে বসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একদিক হল, এরপর আর এক দিক সামলানো আছে। ..... সেই থেকে বিনুর পড়ার ঘরে মুখ গোঁজ করে বসে আছে, দেখেছে।

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে আসতে নীচে এসে ভাই-বোনদের আগে বসিয়ে দিল। এও চুক্তিবদ্ধ নিয়ম একটা। সুধীর যে-দিন খেয়ে যায়—সকলের খাওয়া হয়ে গেলে ওরা একসঙ্গে বসে দুজনে। ভাই-বোনদের খাওয়া হতে বাসুর ইঙ্গিতে পরের বোনটা গিয়ে তাড়া দিল, সুধীরদা চটপট, দিদি ভাত বেড়ে রেডি—

সুধীর উঠে এলো।

—বোসো। বাসু ভাতের থালা রাখল।

মুখ কালো করে সুধীর মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বসবে না।

খাবে না? বাসুর মুখ লাল হয়ে উঠছে।

সুধীর মাথা নাড়ল। না।

বাসু ঝাঁঝিয়ে উঠল, দেখো ভালো হবে না বলছি, সব ফেলে ছড়িয়ে একা-কার করে দেব আমি!

সুধীর তবু গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে।

—বসবে না?

—বসতে পারি.....এক সর্তে।

সর্তটা অনুমান করছে বাসু। বলবে ইলিশ মাছ খাবে না। জবাব না দিয়ে রুদ্ধ চোখে চেয়ে রইল শুধু।

সুধীর বলল, জামাইকে কোনো শ্বশুরে এভাবে বকে না। তাও জামাই হইনি এখনো —আরো বেশি আদর পাবার কথা। তার বদলে অপমান! গুনে গুনে মোটা-মোটা ছটুকরো মাছ দাও যদি তবে বসব—তার কমে রাগ যাবে না।

বাসু হেসে ফেলল। এতক্ষণের গুমোট এক মুহূর্তে তরল। বলল, আচ্ছা, বোসো—

সুধীর গম্ভীর মুখে গ্যাট হয়ে পিঁড়িতে বসল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ের দোতলার খবরটি তারা কেউ জানে না। সুধীর খেতে বসছে টের পেয়ে শম্ভুবাবু দোতলা থেকে নীচে নেমে আসছিলেন। তিনি চটি পরেন না। ছেলেটাকে কটু কথা বলা হয়েছে, তাই একটু অনুতাপ হয়েছিল বোধহয়। খাবার সময় সামনে গিয়ে দাঁড়ালে খুশি হবে, স্নেহ বুঝবে। কিন্তু নীচের কথা-বার্তা কানে আসতে

সিঁড়ির বাঁকে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। খাবে না-শুনে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। সর্ত শুনে সোজা আবার ওপরে উঠে গেছেন। তাঁর সমকে দেওয়াটা যে এমন নিষ্ফল হতে পারে, ভাবেন নি।

ঘরে বসে চুপচাপ দুর্যোগের ছায়া দেখছেন তিনি। অসময়ে চোখ বুজলে ওই জামাই-ই ভরসা। .....সে-ই দেখা-শুনো করবে, ছেলে-মেয়েগুলো ভেসে যাবে না। কিন্তু আজই প্রথম মনে হল, এর হাতে দেখাশুনোর ভার পড়লে সেই অঘটন আরো অনেক আগেই ঘটে যাবে। নিজেরা সুদ্ধু সদলবলে ভাসবে।

শম্ভুবাবু ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চাকুরে। কলকাতায় অফিস। ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন। আগে খেয়া নৌকোয় গঙ্গা পার হতে হয়। এপারের খেয়া-ঘাটের লাগোয়া বাসা তাঁর। এদিকের লাইনে সোজা ট্রেনেও কলকাতায় যাওয়া যায়। কিন্তু তাহলে দশ মিনিট হেঁটে বাস ধরতে হয়, তারপর তিন মাইল ঠেঙিয়ে স্টেশান। বেশি বর্ষায় বা দুর্যোগে তাই করেন। নইলে বার-মাস খেয়া পারাপারটাই পছন্দ। ও-পার থেকে অবশ্য সাত-আট মিনিট হাঁটলে স্টেশান। তবু এদিকে হাঁটা আর বাস ঠেঙানো থেকে অনেক ভালো।

জানা না থাকলে তাঁর বেশবাস দেখে নৌকোর যাত্রীরা কেউ বুঝবে না প্রায় হাজার টাকা মাইনের চাকুরে তিনি। পুরনো কোটের এক পকেটে থলেটা টোপলা হয়ে থাকে। অন্য পকেটে হলদে ছোপ-লাগা টিফিন-বাক্সটার মাথা উঁচিয়ে থাকে। পান চিবুতে চিবুতে খেয়ানৌকায় উঠে বসেন। বেশির ভাগ দিনই গঙ্গুর নৌকোয় ওঠেন। প্রায় প্রত্যহ। তাঁর যাওয়া আসার সময় ধরেই গঙ্গু মাঝি তার পারাপারের সময় ঠিক করে নিয়েছে। গঙ্গু আর শম্ভুবাবু ছেলে বেলার বন্ধু। একেবারে সেই ছেলে বেলার। একসঙ্গে খেলা হত, মাছ ধরা হত, পাখির বাসা পাড়া হত, ফল চুরি করা হত। গঙ্গুর বাবাও মাঝি ছিল। নতুন বয়সের গোড়া থেকে গঙ্গু বাপের পেশায় হাত পাকিয়েছে।

গঙ্গু আগে নাম ধরে আর তুই করে ডাকত। এখন তুমি বলে আর শম্ভুবাবু বলে। শম্ভুবাবু কত বড় চাকুরে আর কেমন গণ্যমান্য ব্যক্তি সেটা সে জানে। আর পাঁচজন যাত্রীর কাছে গল্পও করে। দিনান্তে খেয়া পারাপার তো আর কম-বার করতে হয় না তাকে। শম্ভুবাবুর এতবড় ভক্ত আর কেউ না।

শম্ভুবাবু আজও মনে মনে পছন্দই করেন লোকটাকে। হেলাফেলা করে না। যাত্রীর ভীড় না থাকলে গল্প-গুজব করেন। গল্পটা ফেরার সময়েই জমে ভালো। তবে লোকটার পয়সার খাঁইটা তেমন পছন্দ নয় শম্ভুবাবুর। তিনি নৌকোয় উঠলেই অন্য যাত্রী থাক না থাক গঙ্গু জিজ্ঞাসা করে, নৌকোটা ছাড়ি শম্ভুবাবু, কি বলো?

অর্থাৎ দুই-একটা পয়সা বাড়তি দিলেই আর অন্য যাত্রীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে না। রিজার্ভ যাত্রীর মতই নিয়ে যাবে। কিন্তু বলার উদ্দেশ্যটা অনুক্ত থাকে। হাঁ বলা মানেই বাড়তি পয়সা বার করা। শম্ভুবাবু প্রায়ই জবাব দেন, হাতে সময় আছে, তাড়া নেই কিছু —একটু দেখ, দু-চারজন এসে পড়বে। আবার সপ্তাহে দুই-একবার দেনও পয়সা। এটুকু বাদ দিলে অসম-পর্যায়ের এই দুটি মানুষের মধ্যে অদৃশ্য একটু হৃদ্যতা আছেই।

গঙ্গু মাঝি শম্ভুবাবুর ঘরের খবর রাখে, আর নিজের-ঘরের খবরও তাঁকে বলে। হাজার টাকার মাইনের চাকুরের সঙ্গে কোন্ মাঝি এত গল্প করার সুযোগ পায়? শম্ভুববাবুর মুখখানা ইদানীং বেশ শুকনো সেটা সে-ও লক্ষ্য করেছে। কথায় কথায় কারণও বুঝে নিয়েছে। ফলে তারও মন খারাপ। এতকালের এত বছরের দেখা-সাক্ষাতে ছেদ পড়ে যাবে। অবসর নিলে শম্ভু-বাবু ছ'মাসে একবার কলকাতা যাবেন কিনা সন্দেহ।

রিটায়ারমেন্টের আর মাস দুই বাকি।

মাকে একটু আশার আলো দেখা গিয়েছিল। কাজের চাপের দরুন পুরনো পদস্থ অফিসারদের আরো এক-বছর করে চাকরির মিয়াদ বাড়ানো হবে শুনেছিলেন। ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান সরকারের কবলে গিয়ে না পড়লে সেই রেওয়াজ তো ছিলই। দু'চার-ছ' বছরও এক্সটেনশন পাওয়া যেত।

জন কয়েক অফিসারের চাকরির আয়ু ছ'মাস বা এক বছরের জন্য বাড়ল ঠিকই। কিন্তু শম্ভুবাবুর কিছু হল না। কারণ শম্ভুবাবু হৈ-চৈ করে নিজের কাজের গুরুত্ব জাহির করতে জানেন না, কোট-প্যান্ট টাই ঝুলিয়ে গট-গটিয়ে চলা ফেরা করেন না, অল্প বয়সী ওপরওয়ালাদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন না।

অন্ধকারে হঠাৎ একটু আলো ফললে আবার নিভে গেলে অন্ধকারটা আরো বেশি লাগে। শম্ভুবাবুরও সেই রকমই লাগছে। শুভার্থীজনেরা তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন, আর কেন মিছি-মিছি খেটে মরা, এই দুটো মাস ছুটি নিয়ে নিলেই তো হয়—তাঁর ছুটি তো সব হেজে-পচে গেল। শম্ভুবাবু জবাব দেন না, এই নিরবচ্ছিন্ন ছুটির শূন্যতাই যে তাঁর বুকে চেপে বসে আছে সে আর কাকে বলবেন তিনি।

শরীর মন ভাল ছিল না সেদিন। কোন দিনও থাকে না। মাথাটা ভার-ভার, কপালটার রগদুটো টিপ-টিপ করছে। ট্রেনটারও যেন ঝিমুনি ধরেছে। এখনো আধ ঘণ্টার ধাক্কা। বিরক্তির একশেষ।

স্টেশনটা দেখে নিয়ে চোখ বুজে আবার জানালায় ঠেস দিলেন। কিন্তু চোখ বুজলেই যত রাজ্যের হিসেব কিলিবিলিয়ে ওঠে মগজের মধ্যে। এই ক'মাসে হিসেব যেন তাঁকে আরো পেয়ে বসেছে। নাওয়া-খাওয়া এমন কি ঘুমের মধ্যেও অদৃশ্য একটা হিসেবের হিজিবিজি কাটা-ছেঁড়া চলতে থাকে। এ-ধকল আর যেন সহ্য হয় না। সর্বদা ক্লান্তি একটা,আর সেই ক্লান্তির তলায়-তলায় হিসেব। শম্ভুবাবু এখন ক'টা দিনের জন্যে অন্তত হিসেব ভুলতে চান।

যাক্, স্টেশন এলো। শম্ভুবাবু নামলেন। বাইরে এলেন। সন্ধ্যা গিয়ে প্রায় রাত তখন। ফাঁকা রাস্তায় একটু হাঁটলেই মাথাটা ছাড়বে ভেবে-ছিলেন। খেয়াঘাট পর্যন্ত হাঁটা-পথটা একেবারে কম নয়।

কিন্তু রাস্তার অবস্থা দেখেই শম্ভু-বাবু বিরক্তিতে অস্ফুট কটূক্তি করে উঠলেন। বিয়ের মিছিল চলেছে একটা। বাঙালীর নয়। যতদূর চোখ চলে ঠাসাঠাসি ভিড়। গোটা রাস্তাটা আলোয়-আলোয় একাকার। এরই মধ্যে আবার গাড়ি-ঘোড়া, বাদ্য-বাজনা, ব্যান্ড পার্টি। দু'ধারে সারি সারি আলোর ত্রিভুজ, মাঝে বড় বড় আলোর ঝাড়।

দম-বন্ধ ভীড়ের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে শম্ভুবাবু এক সময় খেয়াঘাটে এসে দাঁড়ালেন।

ঘাটের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সাগ্রহে মিছিল দেখছিল গঙ্গু-মাঝি। শম্ভু-বাবু তার গা ঘেঁষে নেমে গেলেন তাও খেয়াল করল না। অতএব শম্ভুবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা বিরক্তিতে ডাকলেন, যাবে নাকি হে?

নৌকোয় উঠে বসলেন শম্ভুবাবু। আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই। আরো স্বল্প-ক্ষণ মিছিল দেখে গগন্ নৌকোয় আসতেই শম্ভুবাবু বললেন, ছাড়তে বলো, আর ভালো লাগে না—

নৌকো ছাড়া হল। খানিকটা এগিয়ে গগন্ পাল খাটিয়ে দিল। জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ, ফুরফুরে বাতাস। গগনের জোয়ান সাকরেদের হাতে হাল। নৌকো কোনাকুনি স্রোতের মুখে আপনিই গাঙ পাড়ি দিচ্ছে। শম্ভুবাবু বাইরের পাটাতনে বসেছিলেন। তামাকের কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে গগন্ কাছেই এসে বসল। শম্ভুবাবু ভিতরে ভিতরে বিরক্ত আবারও, এক্ষুনি বকর বকর সুরু হবে।

হল। গগন্ বলল, মিছিলটা দেখলে শম্ভুবাবু, জবর আলো দিয়েছে, না?

শম্ভুবাবু নিরুত্তর।

কবে কোথায় এর থেকেও ঢের ঢের বড় আলোর মিছিল দেখেছিল, গগন্ সেই গল্প ফেঁদে বসল। নৌকো তখন মাঝ-নদীতে।

খানিক আপন মনে তামাক টেনে গগন্ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ও-রকম আলো দিয়ে সাজাতে ওদের কত টাকা আন্দাজ লেগেছে?

জানি না।

গগন্ একটু কাছে ঘেঁষে সাগ্রহে চাপা গলায় বলল, ছেলেটার বিয়েতে আমারও ওমনি একটু করার ইচ্ছে আছে, বুঝলে? .....অতটা না হোক, একটু কিছু করা—কিন্তু ছোঁড়াটাকে বদ মতলব দিচ্ছে তার ইয়ার বন্ধুরা, আমি যেখানে বলি সেখানে বিয়ে করতে নারাজ। আমার কথা না শুনলে কিছু করব না। তবে শোনে যদি, দেখ'খন.....

অর্থাৎ সকলের দেখার মতই একটা কিছু করবে গগন্ মাঝি। সেই সম্ভাবনার আনন্দে তার কালো মুখ হাসি-হাসি দেখাচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে শম্ভুবাবু আর এক-দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, ওর সিকি করতেও বহু খরচ।

মনের মত একজনের কাছে যে-ভাবে মনের কথা ব্যক্ত করা চলে সেইভাবেই চাপা আনন্দে বলল গগন্ মাঝি, সেকি আর জানি না। আছে—

শম্ভুবাবু সবিস্ময়ে ঘাড় ফেরালেন এবার। যে-ভাবে আছে বলল, তাতে দুনিয়ার যত টাকা সব তার হাতে আছে মনে হয়। জিজ্ঞাসা করলেন, কি আছে? ও-রকম মিছিল করার মত টাকা আছে?

জ্যোৎস্নায় আর কল্কের আলোয় গগন্ মাঝির কালো মুখ রহস্যময় দেখাচ্ছে। কিন্তু ভিতরের আনন্দটা ভাগ করে দিতে না পারলে ভালো লাগে না। গলার স্বর আরো খাটো করে গগন্ বলল, ও-রকম কেন, ইচ্ছে করলে একটা দিন অন্তত এই গোটা সহরটাই আলোর রোশনাইয়ে শাদা করে দিতে পারি—রেখেছি কিছু, তুমি বোলো না যেন আবার কাউকে!

শম্ভুবাবু তাজ্জব। লোকটার মাথার ঠিক আছে কিনা বুঝছেন না। —কি রেখেছে? কি আছে তোমার?

গগন্ মাঝি হাসছে মিটি-মিটি। সত্যিই যেন গুপ্ত ধনের ভাণ্ডার আছে কিছু তার আয়ত্তে। শম্ভুবাবুর মত আপনজনের কাছেও সেটা ফাঁস করতে

চাপা আনন্দে বলল গগন্ মাঝি, সেকি আর জানি না.....।

লজ্জা। বলল, কিছু না থাকলে কি আর এই বয়সে এত নিশ্চিন্দি হয়ে নৌকো চালাচ্ছি, ভগমানের আশীর্বাদে ভালই কেটে যাবে গো। অপব্যয় করা উচিত কাজ নয় বলে, নইলে একটা রাত অন্তত ওদের দেখিয়ে দিতে পারি রোশনাই কাকে বলে—

কালোমুখে এত তৃপ্তি আর এমন আনন্দের ছটা দেখে শম্ভুবাবু ভুলেই গেলেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। অদম্য আগ্রহে নিজেও চাপা গলাতেই বলে উঠলেন, আঃ, কি আছে তাই বলো না—কি করে পারো?

কিন্তু শম্ভুবাবু ঠিক শুনছেন কি? আরো কাছে সরে এসে উদ্দীপনায় ভর-পুর গগন্ মাঝি ফিসফিসিয়ে যা বলছে, ঠিক শুনছেন কি তা! .....ঠিকই তো শুনছেন। আটশ টা-কা আছে গগন্-মাঝির, কড়-কড়ে থোক আটশ—দুপয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে জমিয়েই হয়েছে ওই টাকাটা—হবে না কেন, কখনো অপব্যয়ও করেনি পরিশ্রমেও পিছু পা হয়নি—কেউ জানে না, ছেলে পর্যন্ত না, ছেলের মা-ও না—শম্ভুবাবু এই প্রথম জানলেন, শম্ভুবাবুকে আর বলতে বাধা কি! কিন্তু শম্ভুবাবু যেন কাউকে না বলেন, কারো কাছে গল্প না করে ফেলেন—

শম্ভুবাবু স্থাণুর মত বসে। কতক্ষণ ঠিক নেই। এক সময় খেয়াল হতে দেখলেন, গগন্ মাঝি উঠে নৌকোর পাল খুলছে। নৌকো তীরের দিকে এসে গেছে। জ্যোৎস্না ছাওয়া আকাশটার

দিকে হাঁকালেন শম্ভুবাবু। .....এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়..... দূর! কটা তারা আবার গোনা যায়। হঠাৎ নতুন ধরনের একটা হিসেব উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে শম্ভুবাবুর মগজে। কিন্তু এই হিসেবে যাওনার লেশমাত্র নেই। ..... কত টাকা থাকলে পাঁচটি সন্তানের আর নিজের ভবিষ্যত নিরাকুল ভাবতে পারেন তিনি?

এক লক্ষ, দুলক্ষ, পাঁচ লক্ষ..... কিন্তু সব অঙ্কের পরেও একটা করে অঙ্ক কাছে ভিড়তে চায়। না শেষ নেই। যে পারে না, সে আট লক্ষ থাকলেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না, আর যে পারে সে আটশ ছেড়ে আট টাকাতেও পারে চমৎ। নিশ্চিন্ত থাকার সঙ্গে হিসেবের কোনো যোগ নেই নাকি?.....সেই রকমই যেন লাগছে। হিসেব জিনিসটা আলাদা। ওটা একটা ব্যাধির মত।

মাথাটা কখন ছেড়ে গেছে শম্ভুবাবু টের পাননি। অদ্ভুত হালকা লাগছে। কতকালের কত বছরের একটা হিসেবের নাগ-পাশ থেকে যেন মুক্তি পেয়ে গেছেন তিনি। ভিতর থেকে অনুগুলো সাপ্ত ঢেলে-পরা গরিমা ফেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হোটের পকেট থেকে দুআনা পয়সা গণ্ডা মাঝির হাতে গুজে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন শম্ভুবাবু। গণ্ডার বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে চান না। কিন্তু সিঁড়ি ধরে উঠতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। ওই কোনের দিকটায় কতগুলো লোক হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গণ্ডার ইলিশ কেনা-বেচা হচ্ছে। মাছের দর নয় তো সোনার দর, চিরাচরিত অভ্যস্ততায় ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারলেন না শম্ভুবাবু। পা দুটো ওদিকেই টানছে। আস্তে আস্তে সেখানে এসে পা উঁচিয়ে সকলের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি।

সুধীর সেই থেকে রান্নাঘরে খুনসুড়ি করছে বাসুর সঙ্গে। বাসু ধমকাচ্ছে তাকে, ওদের পড়াতে এসে থাকলে ও-ঘরে গিয়ে পড়ও গে যাও না, এখানে কি—

সুধীর পাল্টা চোখ রাঙাচ্ছে, ধমকাচ্ছে, বিশেষ করে ভাবী স্বামীকে এভাবে ঘর থেকে তাড়ানোর কস্মিনকালে কোনো নজির নেই—

হঠাৎ সন্তস্ত দুজনেই। তারপরেই অনাকৃ বিস্ময়ে হতভম্ব একেবারে।

সুধীরকে একেবারে রান্নাঘরে দেখবেন ভাবেন নি শম্ভুবাবু। তিনিও ধাক্কা পেলেন কেমন একটু। তাঁর হাতে এক-জোড়া ইলিশ, নেহাৎ ছোট নয় একেবারে।

মেয়ের সামনে মাছ জোড়া রেখে বিব্রত মুখে প্রায় কৈফিয়ত দেবার মত করে বললেন, পেয়ে গেলাম...। ভালো করে বেঁধে সুধীরকে দিস বেশি করে।

দুজোড়া বিস্ময় দৃষ্টি এড়ানোর জন্যেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে প্রস্থান করলেন তিনি।

ওরা দুজন দুজনের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। মাঝখানের মাটিতে রুপোর তালের মত চকচকে জোড়া ইলিশ।

যে আলো পল্লীর গৃহ ও উহার চিরায়ত শিল্পে অপরিহার্য্য—

কিষাণ

লন্ঠন সর্ব্বোৎকৃষ্ট

গৌরমোহন দাস এণ্ড কোং

২৩৩,৩৩ চীনা বাজার স্ট্রীট-কলিকাতা-১•ফোন-২২-৬৫৮০

কবিতা

নদী সদাগর পাথুরে পোল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হয়ত সে নদী আছে
কোনদিন ছোঁয়নি যা ঘাট,
ধরেনি পালের ছায়া
দেখে নি কোথাও হাট বাট।

শুধু দূর দূর দেশান্তর
এঁকে বেঁকে পার হয়ে যেতে
আপনার মনে একা একা
মেঘ পাখি নিয়ে থাকে মেতে।

একদিন সে নদীও
সদাগর খুঁজে পাবে কেউ,
তারপর বাঁধ দিয়ে
বেঁধে দেবে তার নীল ঢেউ।

ভাসাবে হাজার নৌকা
ব্যাপারীর বজরা তার বুকে।
গঞ্জ ও নগর সব
বসাবে পাথর ঠুকে ঠুকে।

তখনও সে নদী বুঝি
কিছুতেই মানবে নাকো হার।
আঁধার নিশুতি রাতে
কুয়াশায় ঢেকে চারিধার
গান গাবে ছলছল
—বোবা তার হৃদয়ের গান,
পোলের পাথুরে থামে
বুক ভেঙে হোক খান্ খান!

* * *

চৌকাঠ

অজিত দত্ত

এই চৌকাঠ পেরুলেই ঘন অরণ্য
শ্বাপদকুলের শরণ্য।
বীণাকণ্ঠিনী, কণ্ঠ তোমার কোন্ পর্দায় ওঠে?
ঘোর অরণ্যগর্জন তাতে চাপা পড়ে না তো মোটে।
ওখানে ভীষণ দংষ্ট্রার সারি অহরহ প্রস্তুত,
ক্ষণেক ভোলাবে তাদের এমন নেশা জানো অদ্ভুত?
তোমার প্রণয় এমনি হাল্কা, থামে না বুকের কাঁপা,
অত উজ্জ্বল আলো কই, যাতে তমিস্রা পড়ে চাপা?
যত চুম্বন আলিঙ্গনের মোহজাল পাতো কনো,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বনো।

দম্ভের নেশা পলেই ফতুর এম নি তোমার জাদু!
আমার রক্তে যে-স্বাদ, তোমার প্রেম কই তত স্বাদু?
দিগন্ত-ছোঁয়া কান্তার-মাঝে বিলাস-লীলার হর্ম্য,
সমুখে ত্রিশূল উদ্যত, বুকে প্রণয়লিপির বর্ম!
প্রেমাশ্রু-সাথে মদের মেশালে নেশা জমে বটে বেশ,
তবু সে-নেশার বহ্নিশিখাটি এক ফুঁয়ে নিঃশেষ!
যতই মায়ার নীলাঞ্জনের কালো চোখে ডাকো কনো,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বনো॥

আগুন

বিকু দে

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠো, ঐ তো আগুন!
পথ বেয়ে উঠে চলি,
চড়াই-এর মোড়ে দেখি দিবা আবির্ভাব
শৌখীন বাগানে কার শালপ্রাংশু রুপালি মসৃণ
ইউক্যালিপটস্ বেয়ে ওঠে বহু বুগেনভিলিয়া
লাল তামা কমলা হলদে মিলে
জ্বেলে দেয় উঁচু উঁচু আকাশের টানে লেলিহ আগুনে।

তখন মাঘের শেষ, শীত আর বসন্ত বেজোড়ে
গদ্যছন্দে লেখা, কারণ বাগানে স্মিত তখনও গোলাপ
একটি তোড়ায় বাঁধে মাঘ ও ফাল্গুন।

আবার আজকে দেখি সেই দৃশ্য রক্তের সম্ভারে
সেই সতেজ গৌরব।

উদ্ভিদ্ অমর প্রাণ, চিরন্তন তাদের সম্ভাব।

অথচ হৃদয় বুঝি বর্ষভোগ্য জীবনের ভারে
মাঘফাল্গুনের পাতা, ঝ'রে যায়, কিংবা ফুল,
ম'রে যায় প্রিয়া?

রাত্তিরের হাট ভাঙবে

অরুণ মিত্র

রাত্তিরের হাট এইবার ভাঙবে।
ছোট ছোট বাতির সামনে ছায়ার নিবিষ্টতা,
ফলমূলের পসরার উপর হাতগুলো স্তিমিত হয়,
কথার মাঝখানে কুয়াশা নামে,
গুটিকয়েক ভগ্নী তীর হতে গিয়ে প্রতিবিম্বে ছড়িয়ে যায়।

এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ডাক আসে,
কারো নাম বলে না, কোনো সন্ধান করে না,
কেবল এক দূরত্বের স্বরে শূন্য ধ্বনিত হয়,
আরও অন্ধকারে যাবার জন্যে ব্যগ্রতার এক ভাষা

নোঙর তুলে ভেসে পড়ো,
চলো সেই শহরের কিনার দূরে রেখে
যেখানে নিষ্ঠুর পাথর জ্বলছিল,
সেই মস্ত ক্ষেতের উপর দিয়ে
যেখানে উত্তাপের এত মুহূর্ত জমাট হ'য়ে ছিল;
তারপর হিমের আকাশ জুড়ে
অন্য দেশের রাত।

সমস্ত মুখ ছায়ায় নুয়ে পড়ে,
কেউ আর অন্ধকারকে ঠেকায় না।
হাটের সারা জায়গাটা বাতাস লেগে টলমল করে।

হঠাৎ দেখা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

উৎসব বাড়ির এক দিকে
উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরি-কুকুরে দাঙ্গা।
অন্য দিকে তকমা-পরা ড্রাইভার, বেনারসীর খসখস,
প্যারিস সুগন্ধী আর শানাই
মন বলছে পালাই-পালাই।
সেই শুভক্ষণে
হঠাৎ দেখা।
পা ভারি—চলতে চায় না
জিভ আড়ষ্ট, যেন কোনো কালে কোনো কথা কয়নি
মনে নানা ভাবনার ভিড় :
কয়লার দাম বাকি
অন্তত একটা গেঞ্জি না-কিনলেই নয়
কালকে আপিস অবার্থ, হলেও প্রলয়।
এই শুভক্ষণে
হঠাৎ দেখা।
মন বলছে পালাই-পালাই
উৎসব বাড়ির দেউড়ি থেকে।
এই শুভক্ষণে
হঠাৎ দেখার চাবুক। শরীরের অসহায় ত্বক থেকে
ঘাম ঝরছে।
প্যারিস সুগন্ধী ছড়িয়ে-ছড়িয়ে মিশছে
পচা উচ্ছিষ্টের সঙ্গে।
হঠাৎ হঠাৎ দেখা
হায় ঈশ্বর, কেন নই একেবারে একা?

দুর্মর

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলা দেশের প্রাণ।
'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারাদেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তা'রা।
সাবাস্ বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।
এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ ক'রে বাংলা দেশের প্রাণ॥

৩রা মার্চ, '৪৭

প্রার্থিত স্বজন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে থেকো না হৃদয়। চারপাশে
প্রচলিত শব্দ বর্ণ রক্তের আড়ালে একবার
খুঁজে দ্যাখো কোন্‌খানে প্রার্থিত স্বজন। চেতনার
আদিম সমুদ্রে ঢেউ। দিকে দিকে প্রসন্ন আশ্বাসে
প্রগাঢ় স্থৈর্যের তরী প্রথাসিদ্ধ জীবনের টানে
অস্থির, প্রবহমান। আর দ্যাখো, বৃক্ষের স্বভাবে
পরিশুদ্ধ নির্লিপ্ততা। শাখানদী সমুদ্র-আহ্বানে
ক্ষিপ্রবেগ, আবর্ত-জটিল। অদৃশ্য অনন্য অনুভবে

প্রার্থিত স্বজন আজো কেউ আছে দিনের চিন্তায়
এবং নিসর্গ দৃশ্যে দিকভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষার পাশে
প্রত্যহের আয়ুর গভীরে। দ্যাখো, শব্দময়তায়

সমস্ত সর্জিত দৃশ্যে নিষ্ঠুরতা যেহেতু সবাই
শুধুই কিছুর প্রতিধ্বনি। প্রীত অন্তরঙ্গতায়
কেউই কোকিল নয়, কথাগুলো শুধু প্রতিধ্বনি

তিমিরনিবিড় ঢেউ। রমাদৃশ্যে সাজানো বাগানে
কেউ কেউ সুখী ফুল; কিন্তু তুমি, আমার হৃদয়,
শুধুমাত্র প্রতিধ্বনি হয়ে আর থেকো না এখানে

অস্তিত্বের দীর্ণলোকে। থাকো মগ্ন স্বজন-সন্ধানে
আপন ধ্বনির সেই প্রার্থিত ও নির্ভীক রণনে
যা ঐশ্বর্য, যা আপন, তোমার ক্ষরিত ধমনীর॥

আপত্তিক

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও প্রকৃতি হাসে চিরাভ্যস্ত শাশ্বতিক সেই চেনা হাসি
সকালে সন্ধ্যায় নিত্য মালঞ্চের ক্ষণজীবী কুসুমের মুখে
জীবন তবুও কেন হারায় সর্বার্থ, হয় দুঃখ অবিনাশী?
জরতী পৃথিবী কেন দিন দিন ম্রিয়মাণ অজ্ঞাত অসুখে?

অন্ধবিশ্বশৃঙ্খলার কী এমন অত্যাশ্চর্য দুর্ঘটনামূলে
কে জানে কী ক'রে হলো এ-জগতে অঙ্কুরিত আদিতম প্রাণ—
প্রাণবীজ—প্রাণপঙ্ক—চিৎ কিংবা জড় কোন প্রকৃতির ভুলে—
সেই ভুল আমাদের ধমনীতে বুঝি হয়ে আছে স্রোতস্বান?

মহাশূন্য সীমাহীন এ কথা তো জানা তবু—তারই সব অসীমতা নিয়ে
আমাদের ক্ষুদ্র বুক আত্মিক উত্তাপে গড়ে তার যত আবেগের সীমা—
মেঘে আর কুয়াশায় জগতের সব নীল বিনিঃশেষে গেলেও মিলিয়ে
শিশুর দু'ফোটা চোখে প্রতিভাত হয়ে থাকে আকাশের অগাধ নীলিমা।

কী ভূমিকা আছে বলো আমাদের? প্রকৃতি যে চিরদিনই পুতুল নাচায়
তুমি নাচো, আমি নাচি, সমুদ্র-পাহাড় নাচে, হিল্লোলিত নাচে দূর বন—
বিবর্তন-চক্র ঘোরে জন্মে-জন্মে ন্যাখোনি কি আমাদের 'অনন্ত বাঁচা'-র?
রক্তে তবু খেলা করে এ-সৃষ্টির আদিকাম—কবেকার সমুদ্র-লবণ।

* * *

সমারোহ

চিত্ত ঘোষ

আয়োজনে ত্রুটি নেই, সমারোহ নির্ভুল গণিত
খুঁজে আনি অরণ্যের গন্ধ কাঠ, সাজাই পরিধি
নীলিমায় ন্যস্ত করি উত্তীনতা, রৌদ্রের মঞ্জরী
প্রবল মধ্যাহ্নে ঝরে, তাপে কাঁপে উজ্জ্বল বাতাস।

ধৌত করি মনোভূমি, জলস্রোতে ভাসাই পল্লব
মুক্ত করি অভিলাষ, বোধ, বর্ণ একাগ্র বিন্দুতে
দিন জ্বালি, রাত্রি ঢালি, ভোর বেলা অশ্রু সরোবরে
মুখ রাখি, স্মৃতি দেহ উন্মোচিত করি অন্ধকারে।

ছিন্ন করি নিদ্রার পালক। প্রতিচ্ছবি দেখিনা কখনো
দু দিকে মূর্তির ছায়া, পদধ্বনি, অতর্কিত রোল
কত কাল রক্তে রোগ নিরাময় করবে না, স্বভাব
কত কাল এ জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্নে তোমার উজ্জ্বল অবহেলা।

নিত্য এই মুখচ্ছবি, নিত্য এই নিষ্ফল পাথার ঃ
প্রত্যহের প্রতিধ্বনি প্রত্যহ মিলায় অন্ধকারে—
রক্ত ঝরে কণ্ঠে, বুকে বেদনার নিভৃত পাহাড়
অনসূয়া, কেন আয়োজিত এই নিপুণ দুর্গতি।

স্রোতে, অন্ধকারে

তরুণ সান্যাল

চম্পকেরা প্রতিকূল, অবশিষ্ট কলিগুলি স্থূল
আঙুলের এলোমেলো জাফরি, জল, পাতার আড়ালে,
জল ধুয়ে যায় মূল, জল জল, এবং যে-ফুল
আমাদের সময়ের প্রকৃতির রমণীয় ভালে

লোলুপ উচ্ছিষ্টে ফেটে, কিংবা কুটে কেশদাম ঘিরে
—এসো না হে ফুল্লরাজা, হে ফুল ও ফুলের প্রলয়,
জলস্রোতে শুয়ে আছি, অন্ধকার অসুখে, গভীরে,
ফুল হোক ইন্দ্রপ্রস্থ, কে চায় রে পুষ্পিত বলয়!

জ্যোৎস্না আছে পলাশনে, নতজানু তমালবীথিকা,
কে দোলায় রাধাঅঙ্গ একান্তে, বিপিনে, সর্বনাশে,
ঘিরে আসে বনস্থলি চতুর্দিকে নক্ষত্রের শিখা
কোথায় ঘুমাবো, সখি, চঞ্চল তরঙ্গ কলভাষে

ডাকে, ডাকে, শিল্প হয়ে চকিত নিসর্গপারাবারে—
চম্পকেরা প্রতিকূল, আছি জলে, স্রোতে, অন্ধকারে॥

ছায়াতরু

দিনেশ দাস

ডালপালা কাটা গেল কালের কুঠারে
গুঁড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে।
আমার ধূসর ছায়া শূন্য মাঠে কাঁদে অসহায়,
শিকড় এখনো আছে মাটির গুহায়,
সেখানে এখনো এক সত্তা জাগে স্থূল অন্ধকারে।

আবহাওয়া আমার কাছে অর্থহীন ঃ
শীতে আর নেই পাতাঝরানোর পালা
বিরাম বিহীন।
আমার ছায়ারা কাঁদে
অক্ষোরে, অবাধে ঃ
পুরোনো ভাবনাগুলি এখনো অক্ষত,
ঘোরে পদ্মমেনে ঋতুবদলের মত।

কোন্ দূর পাখির অরণ্য কাঁপে ডানার হাওয়ায়,
সে-বাতাস ঈশ্বরের ভর্ৎসনার মতই শোনায়।
মাটির চেউয়ের নীচে আমার অসাড় প্রাণ নেমে চলে
দিশাহারা ডুবুরীর মতই অতলে—
নেমে যাই ঘুম হতে গাঢ়তর ঘুমের তিমিরে—
আমার ছায়ারা দেখি নেমে আসে আমাকেই ঘিরে॥

* * *

আমার প্রেমিকে

কবিতা সিংহ

দু হাতে যে মুখ নিলে, কোন মুখ? তাহারে চিনিনা
দর্পণে সে মুখ নেই, কারো দৃষ্টিকোণে কারো চোখে
তোমার হাতে যে পদ্ম তার কোনো লাবণ্যের দীনা
বয়স, ব্যাধির হাত ছেড়ে গেছে অমল আলোকে:

কোনো সাধা শিল্পে, কোনো অপমানে কোনো প্রসাধনে
লেজের নরম আভা দিয়ে ঢাকা যৌবনের আরু
চোখ, চুল, ওষ্ঠ ফের, রক্ত ক্লেদ স্বেদ, বিষ ব্রণে
কি প্রেমে ভাসালে বলো হে কোয়ারা! সহস্র সুবাহু

দু হাতে যে মুখ নিলে, সেই মুখ তোমার রচনা
দর্পণে সে মুখ নেই, হৃদয়ে সে মন নেই যারে,
ভালোবেসে ভাসালে এ খেত ভোড়া ফসলের সোনা,
কি ক্ষতি পুতুল বনি, হৃদয়-প্রতিমা জানো যারে?

পরিব্রজ্যা

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এ মাটির স্বর্গে আমি আবাসিক অর্ধ শতাব্দীর
পরিব্রজ্যা তীর্থে তীর্থে আগ্রা থেকে নায়গ্রা অবধি
শুধু একই সুরের সন্ধানে। ঘুরে ফিরে দেখিলাম
একই মন, হৃদয়ের একই খেলা এখানে ওখানে;
জীবনের শাশ্বত সংগীত এক তানে এক লয়ে
সর্বলোকে বাঁধা। রাইন বা সেইন বা টেমস
পটোম্যাক ডার্লিং নাইল ভলগা গঙ্গা সিন্ধু
ইরাবতী—একইরূপ ইহাদের দান দেশে দেশে;
মাতৃরূপা অন্নদাত্রী ধনদাত্রী নদী সর্বকালে
কৃষিধর্মে বাণিজ্যবিস্তারে।
যৌবনের সিংহাসন কণ্টকিত ফণিমনসায়;
সে বিষ-কীটার ঘায়ে, তৃষ্ণাতুর মধুকর মন
সর্বদাই যন্ত্রণা-জর্জর। সিংহদ্বারে প্রায়শঃই
ঝুড়ি ঝুড়ি ঝড় বিষণ্ণতা বয়ে আনে উৎসব
অঙ্গনে। দ্রবীভূত হৃদয়ের রূপাশ্রয় প্রেমাশ্রু
কণিকা; অন্ধকার অন্তর আকাশ দীর্ঘশ্বাস
জমে জমে পুঞ্জীভূত মেঘে। যুগ থেকে যুগান্তর
তবু তার আকর্ষণ ত্রিভুবন জুড়ে। ভাবকবি
হোমারে বা গার্সিলাসোর রবীন্দ্র ঠাকুরে একই
সত্য বারংবার ধ্বনিত ঘোষিত।
তারও চেয়ে কঠিন স্বীকৃতি ঃ প্রগতির রূপরেখা,
তবু—নগর কসাইখানা কদর্য বৈশিষ্ট্য এই বিংশ
শতাব্দীর। তারই সঙ্গে দীর্ঘায়িত আর সেই
আফিসের দুঃসহ সাধনা। ছিন্নভিন্ন উচ্চকিত
বহু অভিলাষ। মোহময় ইন্দ্রজালে আজো জানি
ঘেরা ভবিষ্যৎ। আমার জীবনমঞ্চে সম্ভাবিত
আরো নাট্য যত জানি না আদৌ তাহা সার্থকতাবহ
হবে কিনা। অবশাই অপ্রকাশ ইতিহাস দেবতার
লীলা যতক্ষণ অসংঘটিত। তবু এ মুহূর্তে আমি
এই যাচ্ঞা রেখে যেতে চাই, বেঁচে থেকে অমৃতের
বিন্দু স্বাদ পেয়ে যেন যাই!
বিজ্ঞানের বিজয় যাত্রায় রহস্যের ঘনঘন
যবনিকা পাত। অনুত্তর তবু থাকে অনেক জিজ্ঞাসা।
যখনি প্রবেশ ঘটে অকস্মাৎ মনের গহ্বরে,
চোখে পড়ে মিশরীয় অজান্তা বা মায়া চিত্র মেলা
বিচিত্র বিভাগে। প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা নয় অনর্থক,
সামান্য সান্ত্বনা আনে অতীতের প্রকাশ্য ঘোষণা।
আনন্দ ও উল্লাসেরই পাশাপাশি স্বার্থ-দ্বন্দ্ব
হিংস্রতা-ক্রূরতা, মানুষের জগতের আলো-অন্ধকার।
(আমি কবি কথাচিত্রী সে দুয়েরই সমান সমান)
বিবর্তিত ধর্মচক্র, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটে বার বার।
সমস্যার বহু ভিড়ে নানা ক্ষেত্রে নিজেরে হারিয়ে
অপ্রস্তুত মন। আর এও সত্য কথা বিনিদ্র তপস্যাহীন
আমিতো প্রার্থক। কখনো কখনো ভাবি সংবাদের
তুকাটুকু মেটানোর পর কী কী আর করার থাকে।
সান্ত্বাটা সকালই যদি কুয়াশার চাদর জড়ানো,
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কে জানে কতোটা রৌদ্র কিংবা
পাবো কতোটুকু ছায়া? পরিমিত পরমায়ু নিয়ে
আমাদের এ জীবনও পূর্ণ নয় খণ্ড সত্য শুধু,
নিশ্চিত মৃত্যুর পক্ষে প্রস্তুতির অনির্দিষ্ট কাল;
অজ্ঞাত সে অনন্ত মিছিলে কখনো প্রশান্ত ছবি,
কখনো ভয়াল।

সাগরের দ্বীপ

বীরেন্দ্র মল্লিক

দেখেছ কি সাগরের দ্বীপ?
চারিদিকে থৈ থৈ জল আর জল
শুধু নীল জল,
অন্তহীন বাধাহীন সীমাহীন অকূল অতল,
মেঘের আকাশ তলে আরো এক জলের আকাশ,
তার মাঝে ছোট এক সীমা
মৃত্তিকার!
দেখেছ কি সাগরের দ্বীপ?

হাট আর বাজারের সার,
লোক ও লস্করে ভাই গম্‌গম্‌ করে চারিধার,
কল আর কারখানা,
কি বিচিত্র সুসজ্জিত লক্ষ ইমারত,
সুবিস্তীর্ণ আঁকাবাঁকা কত রাজপথ।
এক ফোঁটা মৃত্তিকার কি দুর্মদ স্বপ্ন তবু!

আমি ত প্রলাপ এক এই মৃত্তিকার!
যদিও নিশ্চয় জানি
আমার বিদ্রোহ সে ত শুধু পরিহাস
নিজেকেই,
নিজেকেই বাঙ্গ করে শুধু বেঁচে থাকা;
শতাব্দী যেখানে বিন্দু
সময়ের সিন্ধুতীরে শুধু মাত্র কয়টি বছর
আলো জেবলে রাখা:
সে-দর্পণে লিখি পড়ি পথ হাতড়াই,
জীবনের এক মানে বুঝি খুঁজে পাই,
'বুঝেছি বুঝেছি সব'
এই দম্ভে কতবার সকলেরে বোঝাবারে যাই;
সীমিত এ শীর্ণ পরিসরে
আদিগন্ত আঁধারের করি অনুবাদ
লভি এক পরিতৃপ্তি পরম প্রসাদ।

ওদিকেতে ঢেউ তুলে সিন্ধু হাসে
খলখল শুধু খলখল,
বালুকাবেলার পরে
শোনা যায় অবিশ্রাম প্রতিধ্বনি তার
ছলছল ছলছল ছলছল।
দেখেছ কি সাগরের দ্বীপ?

জল পড়ে পাতা নড়ে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

উঠলে সজল হাওয়া
শন শন পাইনের বনে—
মাঝরাতে বিছানায়
এখনো কি উঠে বস।

এবং আঁধার বাতায়নে:
নোয়ানো বকুল শাখে
একটি কি পাখি ডাকে,
নদী বয় যে-কাঁদনে
হঠাৎ নয়নে?
সেই আমি এবং সে তুমি
কত-না নিশুতি মৌসুমী
বার বার হয়েছি যে পার!
যখন ঝড়ের হাহাকার,
আকাশ মেঘের পারাবার,
বিদ্যুৎ থেকে থেকে চমকেছে—আর।
চমকেছে, চমকেছে শ্রাবণের রাত:
সেখানেই নামে না কি নায়েগ্রা প্রপাত?
ভিজে চামেলীর ঝাঁঝে
ঝাঁ ঝাঁ করে ঘর:
কথা না বলাই সব কথার উত্তর,
তারই মাঝে কখন যে নিয়তির মত
এসেছ নিবিড় হ'য়ে কাছে।
অন্ধকারে একমুঠো আলোর আকাশ:
কী-আশ্চর্য বাঁধভাঙা চাঁদ উঠিয়াছে।

ও-মুখে রাখব না কি মুখ:
যখন প্রহরগুলি গুণেছি উৎসুক,
তুমিই দিয়েছ আগে সে তীব্র যৌতুক:
শাঁখের মতন দুটি বুক,
এ দেহে চকিত দেহ মেলে;
ফিসফাস কাণে-কাণে বলেছ কি যেন গানে:
'এলে? তাব সত্যিই এলে?'
আসে শ্রাবণের রাত,
এসে কত ভেসে চলে যায়—
জল পড়ে, পাতা নড়ে কামিনী-কেয়ার।
মেঘ করে, ঝড় বয়,
বৃষ্টি দেয় জানলায় টোকা—

কোথায় পুরোনো কাঠে বাসা বাঁধে পোকা;
'ভাসে'র রজনী গন্ধা ঝরে ঝরে যায়:
এখন কোথায় তুমি অনামিকা রায়!

* * *

মধ্যরাত্রে কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দূরে কারা কথা বলে সপ্রতিভ বিমল জ্যোৎস্নায়?
বিশাল স্তম্ভের মত ছায়া এসে পড়ে আছে
আমার শিয়রে
দূরে নদী: স্টীমারের গম্ভীর শব্দের মূর্চ্ছনায়
মনে হয়, কবরের থেকে উঠে ঐ যে কারা যেন
পৃথিবীর বেঁচে থাকা মানুষের জন্য আজ রাতে
মেতেছে মহতী শোক সভায়।

ওরা সব হেসে উঠলো, দগ্ধ কুসুমের গন্ধ জোৎস্নার সরব
কয়েকটি ধূসর রঙ্ কুকুরের ভয়ংকর স্বর
নিস্তব্ধতা ভাঙতে গিয়ে ব্যর্থ ফিরে আসে, কিছুকাল
রমণীকে রক্ত জেনে লক্ষ লক্ষ রক্তের উৎসব
যেন এই পৃথিবীর দীপ্তি নাশ করে
প্রচণ্ড ধিক্কারে হাসে দূরে ঐ কয়েকটি কঙ্কাল।

হাওয়া আসে দূর থেকে, কেঁপে ওঠে স্তম্ভকার ছায়া
ইচ্ছে হয়, শিয়রের পাশে রাখা সুলভ বিদ্যুতে
খণ্ডিত ঘুমের মধ্যে কোন এক চমৎকার অভিধান খুলে
এ সব দুরূহ স্বপ্ন শব্দে গন্ধে ছুঁতে —
আমিও সবার মত পাশ ফিরে রমণীর শরীরের ভাঁজে, বুকে
অধরোষ্ঠে, চুলে
ঘুমোই মুখ লুকিয়ে, দূরে প্রহরীর মত নদী।

* * *

মানুষের মুখ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হয়তো সে মানুষের মুখ
দেখতে পেলে কঠিন অসুখ
সেরে যেতো ভোর: ভোর বেলা
আকাশ-কে পাথরের ঢেলা

মনে ক'রে ঘরের বাতাস
বন্ধ করতি না। বারো মাস
বুক ভোর ভাঙছে অন্ধকার
ভূতগুলি! স্মৃতি, হাহাকার

আজ তোকে মারে! তাকে পেলে
হয়তো সকল শোক ঠেলে
খুলতি তুই স্বপ্নের জানালা
দরজাগুলি: সন্ধ্যার নিরালা

ধুয়ে দিয়ে সকল যন্ত্রণা
হয়তো ক'রতো তোকে সোনা॥

আগমনী

অনিল ভট্টাচার্য

শিব-লোকের দেউল ছেড়ে
আয় মা মাটির পূজার ঘরে
আঁধার পথে আয় মা উমা
আলোর লীলা কমল করে॥

আনন্দিনী পাষাণী মেয়ে
তোমার চরণ পরশ পেয়ে
আগমনীর ছন্দ-গীতে
আনন্দেরি করণা ঝরে॥

শেফালিকা কুন্দ-কলি
থল কমলের বনের পথে
এস রূপের দুলালী গো
অরুণ সোনার আলোয় রথে—

মায়ের মত আয় শিবানী
জানিস না কি তুই ভবানী
ধূলা-মাটির জীর্ণ-কুটির
মাকে পেয়ে স্বর্গ গড়ে॥

* * *

প্রেমের হোমাগ্নি

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

মনের শূন্যতা ল'য়ে বিশ্বের নয়নে
অনিমেষ চেয়ে থাকি কিসের আশায়,
কে দেখায় বিশ্বরূপ মোহিনী মায়ায়;
ধরিতে বাসনা তা'রে জীবনে মরণে।
সীমার মাঝারে তাই অসীম চরণে—
তীর্থে তীর্থে গিয়া কাঁদি প্রেমের পূজায়,
যেথায় প্রকৃতি দেবী আভাসে জানায়;
শুভ ফল সাধনার কুসুম চয়নে।

আশা নিরাশায় যার জীবনের দিন,
অনন্ত চলার পথে আলোকে আঁধারে।
ভ্রমি, একা "হিমাচলে" বিষাদে মলিন,
বিরহ ব্যাকুল হিয়া ব্যথার পাথারে।

প্রেমের হোমাগ্নি একী উজলে হৃদয়,
জীবনে মরণে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।

মোছেনা সমস্ত ছবি

রাম বসু

মোছে না সমস্ত ছবি
অভিজ্ঞতা অমোঘ নিষাদ
রক্তাক্ত সর্বাঙ্গ; নিশীথিনী
তুমি পরিণত নারী
ছিঁড়ে ফেলে নিষ্ফল নির্মোক
আমাকে ডুবিয়ে দাও নিগূঢ় অতলে।

ঝরে গেছে কপালের বিশাল গোলাপ
নিষ্পত্র গাছের নিচে শায়িত নিরতি
রক্ত, ভস্ম, বার্থতার স্তূপে
জোড়ায় জোড়ায় ওড়ে তন্ময় জোনাকি।
শিকড়ের সাম্রাজ্যের চিহ্নিত বেদীতে
স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন সব করেছি অর্পণ।

নিঃস্ব নগ্ন দৃশ্যে আমি সুন্দর রিক্ততা
দূরতর সংকেতের ভারে অবনত
তৃষ্ণার নিষাদ দাহ বিহঙ্গ বুকের
রোমাঞ্চিত করে স্বচ্ছ দৃষ্টির আকাশ।

অনিশ্চিত বলে এত বিপন্ন সংঘাত
তুমি নৈশ নিশ্চয়তা
নিটোল সঙ্গীতে গাঁথো গ্রহ, বিশ্বলোক
এলোমেলো খোঁচাগুলি সমতল বোধে, করুণায়
কুহক ঐক্যের দিকে অবিরল সত্তার প্রবাহ।

আমি মগ্ন নিবেদিত তোমার ভিতরে
সমগ্রতা অস্তিত্বে এখন
কেন্দ্রের উপলমণি আকীর্ণ কাঁকরে।

*

অজস্র গুলমোর

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কেউ শুধু সুখ খোঁজে, দুঃখ নিয়ে কেউ শান্ত থাকে।
বরঞ্চ সুখেই থাকো, এসোনাক দুঃখের দাহনে,
বাক্‌পটু চটুল যুবা স্তাবকেরা জুটুক মৌচাকে
কলাপী-বাহারে ওরা কলরব করুক প্রাঙ্গণে।

ততক্ষণ আমি যাই—ছুটে যাই বাগানের দিকে,
বুক ভরে নিই হাওয়া, পান করি বস্তুর ভিতরে:
কী নিবিড় মুক্তি ওরে! সব স্বত্ব ছেড়ে কি প্রান্তিকে
তাকে পাবে—যে আনন্দে এ বাগান ভরেছে গুলমোরে?

মখমল ত্বকের স্পর্শে স্পর্শাতুরা কামিনীকে নয়,
মানুষীর চোখে আমি ধ্রুবতর আরো কিছু খুঁজে
ভোগবতী পারে এসে, ডুবে গেছি আকণ্ঠ সবুজে;
হাড়ের প্রার্থনা নয়, আরো এক চূড়ান্ত বিস্ময়
রোদ্দুরের শিখা হয়ে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে
ফুটেছে আমার রক্তে পুঞ্জ পুঞ্জ অজস্র গুলমোরে।

আসন্ন

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ও কে মাউথ-অর্গান
বাজায় প্রকাশ্য রাজপথে?
লঘু সুরে কাকে অর্ঘ্যদান
করবে অদূরভবিষ্যতে?

জানালায়-জানালায় রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায়
মেয়েরা দাঁড়িয়ে শোনে সুর;
যেমন আঙুলে ওর অর্ধভাগ, বাকি কাজ ওষ্ঠাগ্রে ঘনায়,
তেম্‌নি দু'দিকে দুই ফুটপাত,
যথাক্রমে জীবনের এবং মৃত্যুর।

যে-কোনো মুহূর্ত ওকে দুই বিকল্পের একদিকে
নিয়ে যাবে, তিনকোণা পার্কের বুকের নাগালে
নিকটস্থ বাড়িটার পর্দা-টানা জানলার আড়ালে
একা এক সপ্তদশী সেই লঘু সুরের শক্তিকে

এখনো উপেক্ষা করছে; শ্রবণের গর্ভে তিলে-তিলে
অবৈধ শিশুর মতো সে-সুরের স্বরলিপি বাড়ে,
ফাটলে-ফাটলে জল—তবু ভাবে অকূলপাথারে
গুরুজন বাতিঘর, মরবে না স্বাখাত সলিলে॥

*

শিল্পের ধমনী

মণীন্দ্র রায়

জন্মের চেয়েও মৃত্যু দয়াময়ী। কারণ মৃত্যুই
স্মৃতি, চলমান তৃষ্ণা, শরীরের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে।
এবং জীবন, সে তো প্রতিদিনই বিদেশবিভূঁই,
যদি-না সে অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় ভালোবেসে।

আমি তাই দুঃখ খুঁজি, যে আমার নিরতির মতো
কেন্দ্রশায়ী চেতনায় ব'সে আছে স্তব্ধ অনালোকে।
অগ্নিহীন দীপে তার অঙ্গারিত বাসনার ক্ষত
বুঝি-বা আমারই স্পর্শে জ্বলে শুধু শিখর ঝলকে।

জন্মে আমি কী পেয়েছি? জননী ও জায়ার হৃদয়,
স্তনোর সুনিদ্রা আর বন্যতর ঘুমের আসব।
বরং মৃত্যুও ভালো: প্রতিদিন বাঁচার সময়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত বলে করি অনুভব।

কারণ যা নেই তাই স্মৃতি, তাই সুপের পিপাসা;
এবং তৃষ্ণাই শান্তি, কারণ সে গতির সরণি।
অনেক মরণে ম'রে তবু যদি মেটে এই আশা,—
আমিও বেতালসিদ্ধ, ছুঁয়ে যাব শিল্পের ধমনী॥

CENTRAL LIBRARY

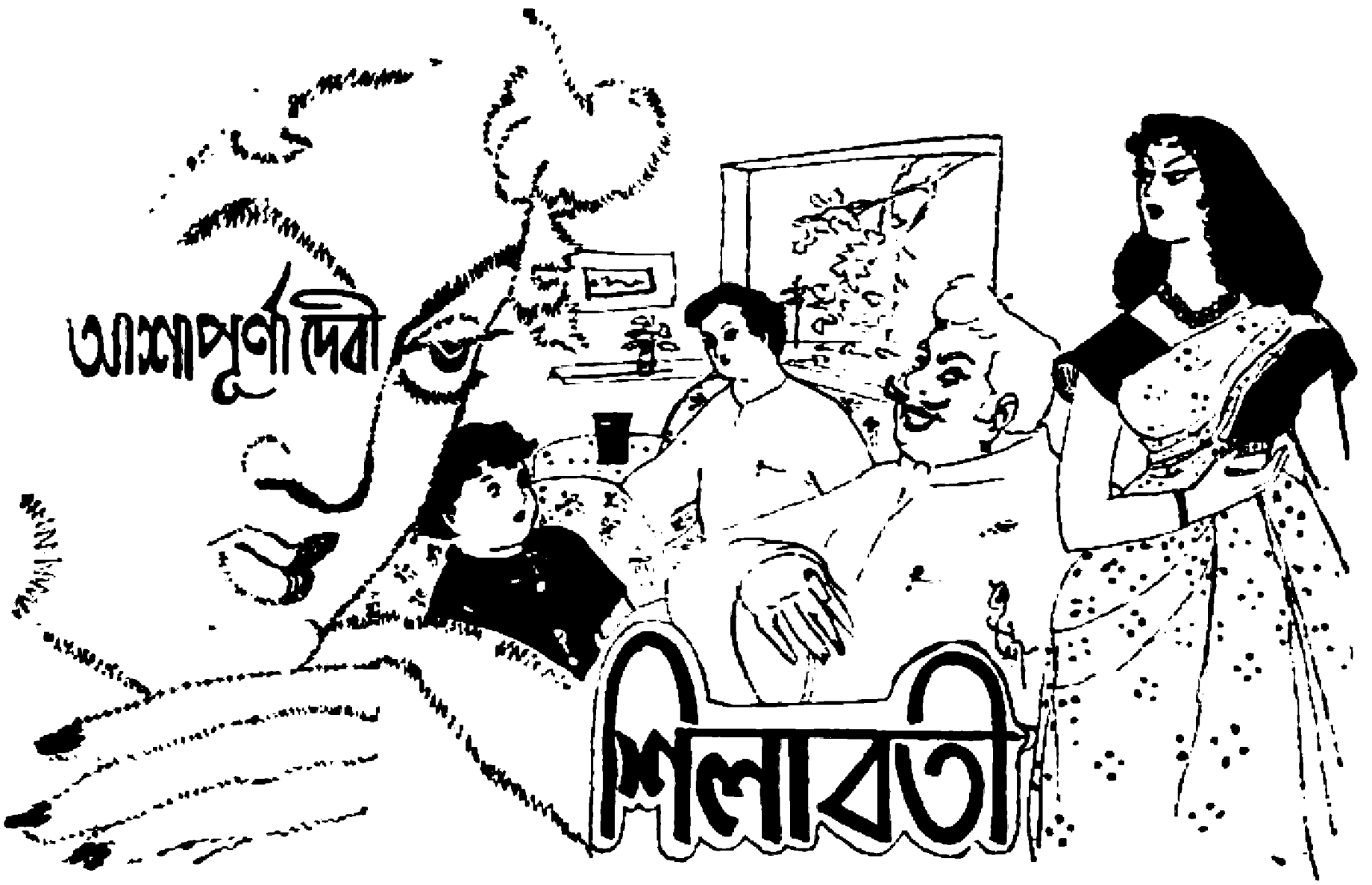

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে আর একবার দেখে নিল অশোক।

হ্যাঁ, ঠিক পথেই চলছে গাড়ী। আশা হচ্ছে এতক্ষণে। ঠিকানাটা লেখা আছে, কিন্তু দেশটা অজানা, পথটা অজানা। উপায়ের মধ্যে পথচারিদের প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে করে জেনে নেওয়া। তাই বা এদিকে তেমন পথচারি কই? ডাক্তার সাহেবের বাংলো তো তেপান্তরের মাঠে! শহর ছাড়িয়ে প্রায় সীমান্ত রেখায় সৈনদের ছাউনি, তারই কাছ ঘেঁসে মিলিটারী ডাক্তারের কোয়ার্টার্স।

কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা দু' একর জমির মাঝখানে রাজকীয় বাংলো। বিস্তীর্ণ সেই কম্পাউণ্ডে ফুলের কেয়ারি, ফলের বাগান, আর দেশী-বিলেতি যাবতীয় আনাজ পাতির ক্ষেত। ডাক্তার সাহেবের ক্ষেতেতে যা আনাজ পাতি ফলে সে নাকি একজিবিশনে দেবার মত। হবে না কেন, ভাল বীজ, ভাল সার, উচিত মত তোয়াজ, যথোপযুক্ত জল। যেটা এদিকে প্রায় দুর্লভ।

কম্পাউণ্ডের মধ্যেই বিরাট ইঁদারা, তাতে ইলেকট্রিক পাম্প বসানো, পাইপ চালিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

এ সব তথ্য সরবরাহ করে এক দেহাতি বুড়ো।

এটা হাটতলা।

এটাও প্রায় পল্লীর সীমান্তে, বসতি শেষ হয়ে যেখানে ধু-ধু প্রান্তর সুরু হয়েছে, বড় হাটটা সেখানেই বসে। সপ্তাহে একদিন।

আজ হাটবার নয়, হাটের চালাটা যেন সদা বিপত্নীকের হৃদয়ের শূন্যতা নিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দু'-একটা ছাগল ওই চালার ছায়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে ওখানে দু'-একটা মানুষ আর কুকুর রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর কাছ থেকে সরে এসে এই ছায়ায় নেতিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

দেখে কে বলবে দুদিন আগেই ঠিক এই সময় এইখানে লোক ধরছিল না, হাটের হট্টগোল কথাটার তাৎপর্য কি তা' টের পাওয়া যাচ্ছিল। আনাজ-পাতি থেকে সুরু করে হাঁস মুরগী মাছ মাংস বাসনপত্র কাপড় জামা জুতো ছাতা কুলো ডালা কলসী কুঁজো—কি না আসে এখানে! সন্ধ্যা অবধি বেচাকেনা চলে। আজ সব ফাঁকা।

অশোক মনে মনে একটু হাসল বুঝি বা। ভাবল—আমারও এখন শূন্য হাটেরই পালা কি না!

হাটতলাতেই প্রকাণ্ড এক ইঁদারা।

জনসাধারণের প্রয়োজনেই বোধ করি। জল দেখে গাড়ীটা থামিয়েছিল অশোক। অনেকক্ষণ চলে চলে গাড়ীটা গরম হয়ে উঠে জল খাই জল খাই করছিল।

বুড়োটা ছিল ইঁদারার ধারে। ওর কাছেই জল চাইল অশোক, আর চাইল মিলিটারী ডাক্তার এম এন দত্তর আস্তানার সন্ধান।

তা' বুড়ো শুধু আস্তানার সন্ধানই দিল না, দিল ওই সব তথ্য—যতক্ষণ অশোক গাড়ীতে জল নিল, নিজে মুখে মাথায় জল দিল, আর গাড়ীতে বসে থাকা বছর তিনেকের ছেলেটাকে নামিয়ে তার মুখ চোখ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিল।

বেলা চারটে বাজে, তবু কি অসম্ভব রোদ। সঙ্গের ফ্লাস্কের জলটা তো খেতে খেতে কখন সাবাড়। স্টেশন থেকে ন' মাইল দূরে ওর গন্তব্যস্থল। তাও অজানা। ঘুরতে হয়েছে অনেক।

যাক আর ঘুরতে হবে না। বুড়ো আশ্বাস দিয়েছে আর একটু গেলেই পাওয়া যাবে।

এ সাহেব তো নতুন এসেছে, বুড়ো জানায়, এ হচ্ছে বাঙালী সাহেব। এর আগে ছিল এক পাঞ্জাবী সাহেব, তাদের অনেক ছেলেমেয়ে, ভারী দুরন্ত। ওই দু' একর জমির মধ্যবর্তী বাংলোও কখনো নিথর থাকত না। বাগানের সব

ফল তরকারি খেয়ে ছি'ড়ে শেষ করতো। খেতোও তেমনি! বুড়ো সব জানে।

এ ডাক্তার সাহেবের তো বাচ্চা টাচ্চা কিছুই নেই, মেমসাহেবের মন বহুৎ খারাব। অত বড় বাগান অত বড় বাড়ী, মেমসাহেব যেন কয়েদীর মত থাকে ওখানে।

বেরোয় না? বেরোবে কখন? ডাক্তার সাহেবের সময় কোথা? আর এখানে বেড়াবার জায়গারই বা কোথা?

বাগানের এত ফল তরকারি, খাবার লোক নেই!

কে খাবে? শুধু তো সাহেব আর মেমসাহেব। চাকর বাকর আর কতই খাবে?

বিক্রী করে বুঝি সাহেব?

আঃ ছি ছি ছি, সাহেব কি ছোট-লোক?

তা'হলে সবই বিলোয়?

বিলোয়! বিলোবে আবার কা'কে? আছে কে ধারে কাছে? পড়শী বলতে তো গুর্খা সৈন্যদল। তা' ওরা এ সব খায় নাকি? খাবার মধ্যে মাংস ডিম আলু পিয়াজ। বড়জোর টমেটো কি লেটুস শাক।

মেমসাহেবের ঢালা হুকুম চাকর বাকর মালি জমাদার যত পারে উঠিয়ে নিয়ে বিলিয়ে আসুক গ্রামে, ওদের আপন জনকে। সাহেব টের না পেলেই হ'ল। তা' উঠিয়ে ওরা আনে, বুড়ো হেসে হেসে বলে তবে আপন জনকে বিলোতে নয়। আনে হাটবারে।

মেমসাহেব বোঝেন সবই, কিছু বলেন না। ভারী মায়ার শরীর। সাহেবের মত কড়া নয়।

বুড়ো সব জানে, সাহেবের হেড মালি যে বুড়োর ভাইপো।

গাড়ীর স্টার্ট দিল অশোক।

বুড়ো বলল 'পাশ' না হলে চলবে না। গেট পাশ আছে তো?

অশোক হাসল। ছাড়পত্র তার নেই। কিন্তু তার নামটাই কি ছাড়পত্রের মর্যাদা পাবে না, শিলপে লিখে যদি পাঠিয়ে দেয়?

তা' মর্যাদা পেল বৈ কি।

না পেলে খানিকক্ষণ পরেই ডাক্তার সাহেবের ড্রইংরুমে হাতখানেক পুরু গদি আঁটা সোফায় ডুবে অমন আরাম করে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে কি করে অশোককে?

ওর তিন বছরের ছেলেটাকে তো প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ওই নরুকোমল খাদের মধ্যে থেকে।

ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ড্রইংরুমে এলেন মেমসাহেব, সঙ্গে সুসজ্জিত ভৃত্যের হাতে সুদৃশ্য বেতের ট্রেতে অতি সৌখিন কাচের গ্লাসে ঠাণ্ডা শরবৎ।

বাচ্চা ছেলেটা অধীর আগ্রহে দু' হাতে চেপে ধরেই মুখ ডোবালো গ্লাসটায়। তেষ্টায় কাতর হয়েছিল সে।

তেষ্টা অশোকেরও পেয়েছিল বৈ কি। বাচ্চা ছেলেটার চেয়ে কিছু কম না। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল টুটুর মতই অমনি গ্লাসটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়টা গলায় ঢালে।

কিন্তু বড়রা কে কবে ঠিক ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পায়? করলে গহিয়া ভূত অসভ্য, কিউকেল কি না বিশেষণ দেওয়া হয় তাকে।

অতএব ইচ্ছে পূরণ হ'ল না।

বরং উজ্জয়িনীর ওই শরবতের চাইতেও ঠাণ্ডা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে উল্টো কথাই বলল সে। বলল, 'তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমি সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছি তোমার এই শরবৎটা খাবার জন্য।'

উজ্জয়িনী মৃদু হেসে বলে, 'এসে যখন নামলে তখন কিন্তু ঠিক ওই কথাটাই মনে হল। ভয়ানক পিপাসার্ত হয়ে ছুটে এসেছ।'

'মনে হল।'

সহসা অদ্ভুত এক পাল্টানো গলায় গভীর সুরে বলে ওঠে অশোক, 'সত্যি তোমার তাই মনে হ'ল উজ্জয়িনী?'

'হল তো! মরুপথিকের মত দেখাল যে।'

'সত্যি বড় কষ্ট হয়েছে। অশোক ফের সুর পাল্টে নিয়ে সহজভাবে বলে 'একে অজানা জায়গা, তায় তেমনি রোদ। অথচ এখন দেখ, তোমার বাগানে নেমেছে অপরাহ্নের স্নিগ্ধছায়া। আগুন বাতাস প্রায় মলয় বাতাসে পরিণত হয়েছে।'

'বোধ হয় আমার গুণে।' উজ্জয়িনী হাসে।

'তা' সেটা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পার না। বলে এবার শরবতে চুমুক দেয় অশোক।

'ডাক্তার সাহেব কোথায়?' অশোকই আবার কথা বলে।

'বাড়ীতেই।

'বাড়ীতেই?'

'হ্যাঁ দিবানিদ্রার জের চলছে।'

'বল কি, এখনও? এই পড়ন্ত বেলায়?'

'তাতে কি? কারো কারো রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে তোলবার আশ্চর্য কৌশল জানা থাকে।'

'তোমায় দেখে কিন্তু মনে হয় না। ডাক্তার সাহেবের তেমন গুণ আছে।

'দেখে যা মনে হয়, তাই কি সব সময় ঠিক? চোখ কি সব সময় সত্যি খবর দেয়?'

'তা' বটে! ডাক্তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবেন বোধ হয় কি বল?'

'হওয়াই স্বাভাবিক। আমিই তো প্রথমে মনে করেছিলাম না ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখছি।' দিবাস্বপ্ন।

'আমার অবশ্য চিঠি দিয়েই আসা উচিত ছিল', অশোক বলে, 'কিন্তু তার সময় ছিল না, সিদ্ধান্তটা আকস্মিক।'

'সিদ্ধান্ত!'

অশোক মৃদু হেসে বলে 'তা' সিদ্ধান্তই বলা চলে। শুধু তোমাকে একবার দেখতে পাঁচশো মাইল দূর থেকে ছুটে এলাম বলতে পারলে শুনতে ভারী সুন্দর হ'ত অবশ্যই, কিন্তু সুন্দর কথা জীবনে ক'টাই বা বলতে পাই আমরা বল?

উজ্জয়িনী চট করে টুটুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কি খাবে বল তো টুটুবাবু?'

টুটু গম্ভীরভাবে বলে, 'শরবৎ খেয়ে তো পেট ভরেই গেল।'

'ওরে বাস! কি বিজ্ঞ ছেলে! হেসে ওঠে উজ্জয়িনী—'তা' তোমার ডাক-নামটাই তো শুধু জানলাম, পোষাকী নাম কি বাবু?'

'প্রিয়বাদী রায়?'

'বাঃ ভারী সুন্দর নাম তো! কে রেখেছে?'

'জানি না তো' টুটু অজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করেই তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, 'যখন নাম হল, তখন আমি খুব বাচ্চা ছিলাম কিনা। দেখতেই পাইনি।'

'ছেলে—বুদ্ধিতে তোমার হারাবে এর পর।' উজ্জয়িনী হাসে। 'আচ্ছা প্রিয়বাদী, তোমার বাবার নাম কি বল তো?

টুটু ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাবার নাম তুমি জানো না?'

'কই না তো?'

'বাঃ তবে বাবা তোমার বাড়ী এল কেন?'

'কেন এল তাইতো ভেবে পাচ্ছি না।'

টুটু পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দেয় 'বাবার নাম অশোক রায়।'

'অশোক? শুধু অশোক?' উজ্জয়িনী নিরিহ স্বরে বলে 'না বোধ হয়। বোধ হয় চণ্ডাশোক।'

'যোৎ, এমন ভুল ভুল বলছ কেন?' টুটু ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

অশোক গভীর স্বরে বলে, 'ভুল নয় রে টুটু ঠিক।'

'তবে তুমি নিজের নাম ভুল বল কেন?'

'ভুল করাই আমার স্বভাব যে!'

'ঠিক ঠিক। তাই তুমি খালি রাস্তা ভুল করছিলে।' টুটু হাততালি দিয়ে ওঠে।'

'রাস্তা আবার ভুল করলে কখন?' উজ্জয়িনী প্রশ্ন করে।

'করলাম? জীবনের প্রারম্ভে।'

'সেই খবরটা দেবার জন্যেই কি এত দিন পরে এত ক্লেশ স্বীকার করে আসা?

'নাঃ সেটা দেবার মত খবর নয়।'

'তবে বল শুনি এত দিন পরে হঠাৎ আমার জন্য কোন অসুন্দর কথা উপহার নিয়ে এলে!

'অসুন্দর কথা?'

অশোক অবাক হয়, বোধ করি ক্ষণপূর্বের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে।

'যাঃ ওই যে তুমি বললে সুন্দর কথা বলবার ভাগ্য নিয়ে আসনি।'

'ওঃ তাই। কিন্তু উজ্জয়িনী, আমি আজ কোন কথা নিয়ে আসিনি, এসেছি একটা ভিক্ষে নিয়ে।'

'পরিহাসেরও একটা সীমা থাকে অশোক!' আরক্ত মুখে বলে ওঠে ঠাণ্ডা চেহারা মানুষটা।

'তা থাকে।' অশোক প্রায় হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু ধৃষ্টতার বোধ হয় সীমা থাকে না। তাই এই ছেলেটাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি উজ্জয়িনী, একে তুমি নেবে বলে, তোমার কাছে রাখবে বলে।'

'ছেলেটাকে আমি নেব বলে, আমার কাছে রাখব বলে!' উজ্জয়িনী অশোকের কথাটাই উচ্চারণ করে বলে, 'আমি আবারও তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি অশোক, পরিহাসের সীমা থাকা উচিত।'

'বিশ্বাস কর উজ্জয়িনী, এটা অন্ততঃ পরিহাস নয়।'

'তাহলে তার মানে হয় ভিক্ষা চাওয়ার ছলে ভিক্ষা দিতে এসেছ?' উজ্জয়িনী সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'কাল আমাকে যা দিতে পারোনি, তুমি তাই দিতে এসেছ আমায়?'

'না উজ্জয়িনী তা নয়। সত্যিই বিশ্বাস কর বিপদে পড়ে প্রার্থী হয়েই এসেছি তোমার কাছে। অফিস এক বছরের জন্যে আমাকে বাইরে পাঠাতে চাইছে। এই দীর্ঘকাল মাতৃহীন শিশুটাকে কার কাছে রেখে যাবো ভাবতে গিয়ে বারে বারে শুধু তোমার কথাই মনে এল। এত নিশ্চিন্ত আর কার কাছে রেখে হবো বলো?

কল্পনার অগোচর প্রস্তাব।

অশোককে দেখে তার আসার কারণ নিয়ে অনেক কথা ভেবেছে উজ্জয়িনী, শুধু ভাবতে পারে নি সত্যি কারণটা।

তাকাল ছেলেটার দিকে।

রোগা পাতলা, তবু যেন ননী দিয়ে মাজা গড়ন। টিকলো নাক, উজ্জ্বল চোখ, ঠোঁটের রেখায় সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন বৈশিষ্ট্য একদা উজ্জয়িনীকে উদ্‌ভ্রান্ত করতো, উন্মনা করতো, স্বপ্নের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

যেন একটি ছোট মাপের অশোক!

উজ্জয়িনী চোখ তুলে বলল, 'শুধু এক বছরের জন্যে! যদি একেবারে নিয়ে নিই, যদি আর ফেরত না দিই?'

অশোকও সেই চোখের ওপর চোখ রেখে বলে 'যদি সত্যিই তেমন ভাগ্য ওর হয়, ছেলের দখলস্বত্ব নিয়ে তোমার নামে নালিশ ঠুকতে ছুটব না।'

'তা হয়তো করবে না,' উজ্জয়িনী বলে 'না করাটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে যে তোমার মন একেবারে মোহমুক্ত উদাসীন, সে নজীর জানা আছে। তবু জিগ্যেস করছি অশোক, তোমার প্রস্তাবটা কি সত্যিই বাস্তব?'

অশোক শান্ত সুরে বলে, 'তোমার কি একেবারে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে? তা যদি হয় তো তোমাকে পীড়ন করবো না, তবু তোমার কাছে রাখতে পেলে সত্যিই স্বস্তি পেতাম উজ্জয়িনী।'

উজ্জয়িনী বিষণ্ণ হেসে বলে, 'মরু-পথের পথিকের হাতে একপাত্র জল ধরে দেওয়া, তাকে পীড়ন করা নয় অশোক! তবু ভেবে দেখ, আকাশের চাঁদকে যদি হঠাৎ কেউ তোমার পকেটে জায়গা দিতে বলে, সে প্রস্তাব কি চট করে বাস্তব বলে মনে হবে তোমার? সে সৌভাগ্য বিনা দ্বিধায় হাত পেতে নিতে সাহস হবে?'

'দ্বিধা যদি শুধু ওইটুকুই হয়, তাহলে বলছি উজ্জয়িনী ও দ্বিধা ত্যাগ করতে পারো। যাকে আকাশের চাঁদ ভেবে ভয় পাচ্ছো, আসলে সে একটু ধুলোর মাণিক বৈ আর কিছু নয়। দুঃখী, বেচারা একেবারে দুঃখী! জ্ঞান হয়ে যে মা দেখেনি, তার থেকে হতভাগ্য আর কে আছে বল? বাপ বড়-জোর নিজের প্রাণের আকুলতা দিতে পারে, শিশুর প্রাণের অভাব পূর্ণ করতে পারে না। জীবনের কয়েকটা দিন দাও না ওকে সেই পূর্ণতার স্বাদ? তোমার পক্ষে তো সেটা খুব শক্ত হবে না? জানি তো তোমার মন কত কোমল, আর এ ও জেনেছি সে মন তোমার এখনো মরে যায়নি। হয়তো চেষ্টা করলে ওকে আমি কোন শিশু বোর্ডিংয়ে রাখতে পারতাম, হয়তো মোটা টাকা খরচা পাঠালে ছেলে রাখবার মত আত্মীয়স্বজনেরও অভাব হ'ত না, কিন্তু আমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে ওর মনে যে অভাবের সৃষ্টি হবে, তার পূরণ কোথায় হবে বল?'

উজ্জয়িনী ওই সুকুমার অথচ বুদ্ধি উজ্জ্বল ছোট্ট মুখটির দিকে তাকায়, তাকায় তার ছোট ছোট নরম আঙুলগুলির দিকে, সোনালি সোনালি চুলে ভরা সুডৌল মাথাটির দিকে, আর অজানিত এক আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় মনটা ভরে ওঠে।

অশোক মাতৃহীন শিশুর মনের অপূর্ণতার কথা বলছিল না?

ওই ছোট্ট মানুষটিকে বুকের ভিতরে ভরে নিলে কি শুধু ওরই প্রাণের পূর্ণতা?

একটা অতৃপ্ত ক্ষুধায় জর্জরিত হাহাকারে ভরা শূন্য নারী হৃদয়ের পূর্ণতা নয়?

একটি শিশু!

ফুলের মত, মাখনের মত, ছোট্ট একটুখানি পাখীর মত কোমল এতটুকু স্পর্শ স্বাদ। এক টুকরো স্বর্গের মালিকানা লাভের সুখ। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে আকাশ থেকে এসে পড়া এক ঝলক আলোর রং।

একটি শিশু!

উজ্জয়িনী তার থেকে বঞ্চিত।

শুধু এখনো পর্যন্তই নয়, ভবিষ্যতের কল্পনা থেকেও বঞ্চিত।

মিলিটারী ডাক্তার এম এন দত্ত উজ্জয়িনীকে দু একর জমি ঘেরা রাজকীয় বাংলো দিতে পারবে, অনেক ফুল আর অনেক ফলের বাগান দিতে পারবে, সুসজ্জিত ভৃত্য, সুশীতল পানীয়, আরাম আয়েস আড়ম্বর অলঙ্কার, সব কিছুই দিতে পারবে,

পারবে না শুধু ওইটুকু। ওই স্বর্গসুখ, ওই স্পর্শসম্বাদ। উদ্‌খল কর্মজীবনের অমিতাচারে জীবনের মূলধন হারিয়ে বসে আছে সে।

নিজেকে হারিয়েছে বলেই বুঝি এম এন দত্তর ওই মুঠোয় চাপা মানুষটাকে নিয়েও এত হারাই হারাই ভয়। প্রহরী রেখে স্বস্তি হয় না ওর, তার ওপর আবার নিজে প্রহরা দিতে আসে আকস্মিক আবির্ভাবের কুটজাল ফেলে।

এই প্রাণ হাঁপানো পরিবেশের মধ্যে একটি শিশু কি দুর্লভতর! দিনের সমস্ত অর্থহীন অবকাশ ভরে উঠতে পারবে একটি সঙ্গীতের ছন্দে।

এক বছর!

অনেক দিন আর অনেক রাত দিয়ে গড়া সে জিনিসটা! এই আশাতীত সৌভাগ্যের ভার বইতে পারবে তো উজ্জয়িনী?

আর তারপর?

যদি মাতৃহারা শিশুটা মাতৃস্নেহ রসে বিভোর হয়? যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সেই পরম পাওয়া টুকুকে!

অশোক বলেছে 'ছেলের দখলি সত্ব নিয়ে নালিশ ঠুকতে ছুটবো না তোমার নামে।'

তবু কথা আছে। কথা থাকে।

রুদ্ধ গলায় বলে উজ্জয়িনী 'আমার ওপর এত বিশ্বাস কবে থেকে জন্মাল?'

'বিশ্বাস? সে কি নতুন করে জন্মাবে? আমার জিনিসকে তুমি যত্নে রাখবে, এটা তো একটা প্রশ্নের অতীত কথা।'

'আরো আগে কেন এলে না অশোক!' উজ্জয়িনী আরো রুদ্ধস্বরে বলে, 'যখন এতটুকু ছিল, যখন শুধু এক মুঠো ফুলের মত ছিল, যখন প্রথম চোখ মেলে শুধু আমাকেই দেখত। ওর মা ভেবে ফেলে চলে গেছে! তখন কেন দিলে না? এখন ও কি আমাকে চিনতে চাইবে? ভালবাসতে চাইবে? অনেক দূরে চলে যাবে ভুলি, হয়তো তোমার জন্যে কাঁদবে।'

'বাঃ কাঁদবে কেন?' টুটুই কথার মাঝখানে বিজ্ঞের মত বলে ওঠে, 'বাপী তো এরোপ্লেনে চড়ে হুস্‌ করে আকাশে উড়ে বিলেত চলে যাবে, আমি এতটুকু ছেলে আমি কি পারি তা?' যখন বড় হব তখন তো নিজে একলাই যাবো বিলেতে লেখাপড়া শিখতে। এখন তোমার কাছেই থাকব। বাপীকে চিঠি লিখতে শিখিয়ে দেবে তুমি।'

এতক্ষণ মন দিয়ে দু'জনের বাক্য বিনিময় শুনে এটুকু বুঝেছে টুটু আলোচনাটা তাকে নিয়েই।

'এ সব পাঠ বুঝি আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে?' উজ্জয়িনী হাস্যস্ফুরিত মুখে বলে, 'খুব তো চালাক দেখছি। কিন্তু টুটুর বাপীকে চিঠি লেখা শেখাই এত বিদ্যে কি আছে আমার?'

'বারে, তুমি তো বি-এ পাশ, তোমার আবার বিদ্যে নেই?'

উজ্জয়িনী এক জোড়া কালো পাখীকে নীল আকাশে স্থির রেখে বলে, 'আমার সম্বন্ধে আর কি কি তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ছেলেকে?'

'ছেলের কাছেই টের পেয়ে যাবে। অপরাধের প্রমাণপত্র তো রেখেই যাচ্ছি।'

'টুটু আমার কাছে থাকতে পারবি?'

'পারবো না কেন, তুমি তো আমার মাসী হও।'

'মাসী হই একথা তোকে কে বললে?'

'বাপী বলেছেন। আবার কে বলবে!'

'তা' সত্যি, এমন ভাহা মিথ্যে আর কেই বা বলবে? কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি পাগল নাকি? এখনো পর্যন্ত টুটুকে কিছু খেতে না দিয়ে—'

আহা—টুটু তো তোমার কাছেই থাকছে, খাইও যত পারো। আমাকে বরং আপাতত: বিদায় দাও ট্যাক্সী ড্রাইভারটার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট আছে সন্ধ্যের মধ্যে স্টেশনে ফিরে যেতে হবে।'

'তোমাকে একটুনি বিদায় দেব? আমার কাছে খাবে না কিছু?'

হতাশ শোনায় উজ্জয়িনীর কণ্ঠ।

'তোমার কাছে তো খেলাম। ভয়ঙ্কর তেষ্টার সময় শীতল পানীয়, আর কিছু চাই না।'

'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করবে না?'

'করা উচিত বটে' অশোক চিন্তিত মুখে বলে 'কিন্তু তিনি তো এখনো দিবানিদ্রায়। এদিকে দিবা অবসানের ঘণ্টা বাজতে চাইছে।'

'আচ্ছা একটু বোস। দেখি।'

উজ্জয়িনী ক্ষিপ্র লঘু পায়ে আবার ভিতর ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকে যায়।

'টুটু থাকতে পারবি?'

ছেলেকে একান্ত সন্নিকটে টেনে নেয় অশোক।

টুটুর এখন বীর পুরুষের ভূমিকা, তাই জল টলটল চোখে সতেজ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'কতবার বলবো, পারবো! মাসীকে তো আমার খুব ভালই লেগেছে। ঠিক আমার ছবির মার মতন ভাল। আচ্ছা—অন্য সব ছোট্ট ছেলে নেই বাপী এ বাড়ীতে?

'এই তো, তুই-ই তো রইলি!'

'আমি তো আগে ছিলাম না।'

'তোর মাসীরও আগে কিছু ছিল না।'

'তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসে মাসীকে আর আমাকে নিয়ে যাবে, তাই না বাপী?'

'বাঃ মাসীকে নিয়ে যাব কেন? ও তো এদের বাড়ীর লোক।'

'তখন আমাদের বাড়ীর লোক হবে।' টুটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, মাসীকে যে আমার ভাল লেগেছে।'

'মুফতে একটা ছেলে পাওয়া যাচ্ছে?' সদা ঘুম ভাঙা চোখে হাই তুলে ডাক্তার সাহেব বলেন, কথাটার মানে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

উজ্জয়িনী বলে—'মা-মরা ছেলে।' ছেলের বাপ বিদেশে যাচ্ছে বছর খানেকের জন্যে, তাই কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রেখে যেতে চায়।

ডাক্তার আর একবার হাই তুলে বলেন, 'চাওয়াটা উত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকেই 'বিশ্বস্ত' বলে ঠাওরালো, এমন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন বাপটি কে বল দিকি?'

উজ্জয়িনী স্থির স্বরে বলে, 'অশোক।'

'আরে তাই বল। ডাক্তার হে হে করে হেসে উঠেন, 'এতক্ষণ বলতে হয়। চাপছো কেন?'

'চাপবো কেন।' উজ্জয়িনী বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার শোনবার সময় হলে তো? সন্ধ্যে অবধি ঘুমুচ্ছো! ভদ্রলোক যে কি ভাবল—'

কিছু না কিছু না। বরং আমার সম্বিবেচনার তারিফ করল।' ডাক্তার তাঁর কাইজারি প্যাটার্নের গোঁফটা পাকাতে পাকাতে বলেন, 'নিরবচ্ছিন্ন রসালাপের মধ্যে গিয়ে পড়ে ছন্দ পতন ঘটালে অভিসম্পাত দিত।'

উজ্জয়িনী তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, 'সব সময় অসভ্যতা করার মানেটা কি, তুমিই জানো। ছেলেটাকে রাখবো, কি রাখবো না?'

'আরে ছি ছি সে কি! এই কি একটা প্রশ্ন হল? রাখবে না মানে? সে বেচারা মা-মরা ছেলেকে এমন একটি

বিশ্বস্ত হৃদয়ের কাছে সঁপে দিতে এসেছে।'

'দেখা করবে অশোকের সঙ্গে।'

'আহা আমার আবার দেখা করার কি আছে?'

'বসিয়ে রেখেছি দেখা করার জন্যে। বাড়ীতে এল ভদ্রলোক—'

'আরে এর পর তো আসবেই মরবে মরবে। আসতেই থাকবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখে যাচ্ছে যখন।'

পাগলের মত কথা বলছো কেন? বললাম না ও বিলেত যাচ্ছে।'

'ও হো হো, আমি আবার একটু মনে রাখতে পারি কম। চল চল।'

চটি পায়ে গলান ডাক্তার।

অশোক উঠে নীরবে হাত তুলে নমস্কার করলো।

ডাক্তার কিন্তু হৈ চৈ করে উঠলেন, 'কি মশাই শুনলাম নাকি এই অভাগার দর্শন আশায় অপেক্ষা করছেন। ডেকে দিতে হয় এতক্ষণ? বহু দিন পরে দেখা! অবশ্য আমার সঙ্গে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এইটুকুই শুধু বলে অশোক।

'তারপর মশাই, বছর খানেকের জন্যে নাকি বিলেত চলে যাচ্ছেন? আপনি তো বেরসিক! যাবার বেলায় এত দিনের নিভু নিভু আগুনকে আবার জ্বালিয়ে যেতে এলেন! এখন এই এক বছর আপনার প্রেয়সী বিরহানলে জ্বলতে থাকুক!

অশোক উঠে দাঁড়াল। বুঝতে দেরী হয় না লোকটা এই দিনের বেলাতেও নেশার ঘোরে রয়েছে।

ওর ওই কাইজারি গোঁফ মণ্ডিত গোল মুখ, চুলে ভরাট ছোট্ট মাথাটা, রক্তাভ চক্ষু, সব কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখল অশোক, আর তাকিয়ে দেখল উর্ব্বশীর ফ্রীজিডেয়ারে রাখা সরবতের মত নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা চেহারাটা। তারপর দু' হাত জোড় করে বলল ছেলেটিকে আপনাদের আশ্রয়ে রেখে গেলাম! মস্ত একটা উৎপাত করা হচ্ছে বুঝতে পারছি—তবু—'

'আহা হা উৎপাত কিসের—' ডাক্তার সহৃদয়তার গলে পড়েন, 'আপনার বান্ধবীটি বেঁচে যাবে। বুঝতেই পারছেন বাজা মেয়েছেলের সামনে মাতৃহীন শাবক, যেন দুর্ভিক্ষপীড়িতের সামনে রাজভোগ রসগোল্লা! কি ব'ল মিসেস, উপমাটা ঠিক দিইনি? আচ্ছা আপনারা বসুন; আমি—'

'আর বসবো না, আমি এবার উঠছি—' নমস্কারের ভঙ্গীতে বলে অশোক, 'কাল সকালে আমি তা'হলে আর একবার আসছি উর্ব্বশীনী, টুটুর জিনিসপত্র নিয়ে। সবই তো স্টেশনের ক্লোক্‌রুমে পড়ে আছে।'

ডাক্তার হাঁ হাঁ করে ওঠেন 'তার মানে আপনিও এখন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পড়ে থাকতে চললেন! আ ছি ছি! মিসেস্ তুমি তোমার অতিথিকে অন্ততঃ একটা রাতের জন্যে নেমন্তন্ন করছো না কি বলে?... ও আপনার জিনিস আনতে কাল সকালে যাবেন মশাই, আজ থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, বান্ধবীর আদর-যত্ন খান। মিসেস্ তুমি বল।'

'না না; আমার কাজ আছে—' উর্ব্বশীনীর পাথরের মত মুখের দিকে তাকায় অশোক, 'এখন যেতেই হবে।'

ডাক্তার হতাশ-নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'যেতেই যদি হয়, কি আর করা! কী নাম আপনার ছেলের?'

'টুটু বলি। ভাল'—

উত্তর শোনেন না ডাক্তার, শুনতে চানও না। অকারণে হেসে বলে ওঠেন, 'একটা আশ্চর্য মজা দেখেছ মিসেস, অশোকবাবুর ছেলের মুখটা অবিকল তোমার মত।'

'অবিকল আমার মত! উর্ব্বশীনী ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'তার মানে? আমার মত কেন হতে যাবে?'

ডাক্তার হা-হা করে হেসে ওঠেন—'কেন হতে যাবে' একি একটা কথা হল মিসেস? জগতে কত ভৌতিক দৈবিক আকস্মিক নানা কাণ্ড ঘটে যায়, কে তার কারণ নির্ণয় করতে যাচ্ছে?'

'না, ও মোটেই আমার মত দেখতে নয়,' উত্তেজিত উর্ব্বশীনী উত্তর দেয়।

'আহা চটে উঠছ কেন? এতে চটবার কি আছে?' ডাক্তার দরাজ গলায় বলে ওঠেন 'ছেলের আপনার কত বয়েস হল অশোকবাবু, বছর তিনেক বোধহয়! তাই না মিসেস? যে বছর আমি জাপান গেলাম এক বছরের জন্যে, তুমি কলকাতায় বাপের বাড়ী থাকলে—'

উর্ব্বশীনী হঠাৎ খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে বলে, 'তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? আমি কলকাতায় থাকাকালীন সেখানে যত ছেলেমেয়ে জন্মেছে, সবাই আমার মত দেখতে হবে?'

'আহা সবাই কি আর?' ডাক্তার হা হা করে হাসেন। 'বললাম তো দৈবিক, আকস্মিক—কত কি ব্যাপার আছে জগতে!'

মাতালের প্রলাপোক্তি! অশোক এই প্রলাপোক্তির অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না, শুধু আর একবার ভাবে—লোকটা কী বেহেড্! এই দিনের বেলাতেও—।

তারপর বলে, 'টুটুসোনা, যাচ্ছি তা' হলে? লক্ষ্মী হয়ে থেকো। কাল তোমার জিনিসপত্তর—'

কথা শেষ করতে পায় না অশোক, সহসা ওর কথার ওপর তীক্ষ্ণ একটা হাসির লহর ছড়িয়ে পড়ে। লহরে লহরে হেসে বলে উঠে উর্ব্বশীনী, 'আরে তুমি কি সত্যিই ওকে রেখে যাচ্ছ না কি? কী কাণ্ড! পাগলা-টাগলা হয়ে গেছ না কি বলত? আমি মনে করছি 'রেখে যাব রেখে যাব' করে ক্ষ্যাপাচ্ছো ছেলেকে! সত্যি রেখে যাবে ভাবলে কি করে—তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

গোধূলির আলো মিলিয়েছে, তবু একেবারে অন্ধকার নামেনি। এম এন দত্তর বিরাট বাগানের গাছপাতাগুলোকে আলাদা করে আর চেনা যাচ্ছে না বটে, তবু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উর্ব্বশীনীর দৃষ্টিটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে কেন, কিছু কেন দেখতে পাচ্ছে না সে?

গাড়ীর ধুলোয়? যে গাড়ীটা এই একটু আগে চলে গেছে দ্বিতীয়বার ফিরে আসবার সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত করে দিয়ে।

কিন্তু এখানে ধুলো কোথা?

বাগানের মাঝখানের ফুলের কেয়ারি করা রাস্তায় তো দুবেলা জল পড়ছে।

এম এন দত্তর এলাকা পার হয়ে মেঠো রাস্তায় পড়ে যদি ধুলো উড়িয়েই থাকে, সে ধুলো কি এত দূর উড়ে আসবে?

টুটুর জন্যে খানা পাকাবার নির্দেশ দিয়ে এসেছিল উর্ব্বশীনী বাবুর্চিকে। সে এখন পরিপাটি করে টেবিলে লাগাচ্ছে সেই খানা।

ওটা নামিয়ে ফেলতে হবে।

আবার খানিক পরেই নতুন করে টেবিল সাজানো হবে বহুবিধ আহার্যের আয়োজনে ঝলমলিয়ে। সেখানে মুখোমুখি খেতে বসবেন সাহেব আর মেমসাহেব।

কাস্ট হোমিয়ার
মোজা ব্যবহার করুন
২৬১, গোপাললাল ঠাকুর রোড,
কলিকাতা—৩৬
রেজিঃ ৭৬৬

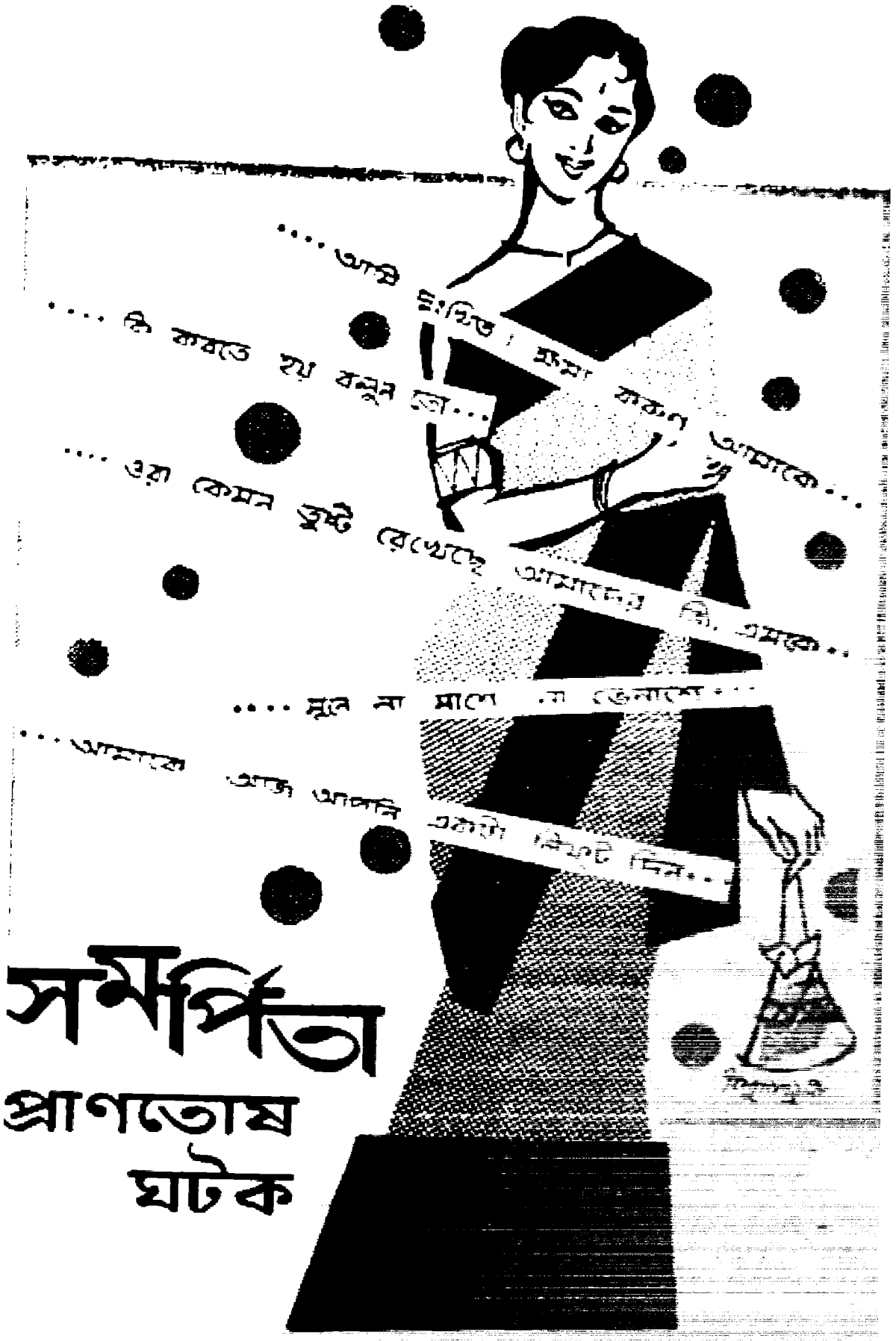

সমর্পিতা

প্রাণতোষ ঘটক

অনেক মেয়ের আসা যাওয়া। যেমন দীর্ঘপোষাক, তেমনি অদ্ভুত কায়দা।

হালফ্যাশনের আধুনিকাদের হাসির ফোয়ারা ওঠে ক্রেমাদের ম্যানেজারের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে। প্রসাধনী সুগন্ধের আমেজ ছড়িয়ে থাকে। সদ্যের বাহারে চোখ ঝলসে যায়। ঝিলমিল পাৎলা শাড়ী নানা রঙের। পরণে আঁটসাঁট খাটো ব্লাউস। লজ্জা নিবারণ হয় না। যার চোখ পড়ে তারই লজ্জা বরং। হিল-উঁচু জুতো সিমেন্টের মেঝেয় শব্দ তোলে মৃদুমন্দ। কেরাণীদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। নিরাসক্ত চোখে দেখে প্রায় সকলেই। মেয়েরা আসে হাসতে হাসতে, যখন ফিরে যায় তখনও তাদের মুখে হাসি। সত্যিকার না নকল হাসি, মনে থেকে বলা যায় না।

ফুটে ওঠে। দেখতে থাকে, কাজ ঠিক ঠিক চলছে না বাধিত হচ্ছে।

সহসা বাঘের আবির্ভাব হয় যেন। ছেলে আর মেয়ে কেরাণীদের বুক দুরু দুরু করতে শুরু হয়। কখন যে বাঘ কাকে কামড় মারবে, কেউ বলতে পারে না। একটা ইনডিসিপ্লিন কিছু দেখলেই সুব্রতর তিরস্কার, লাঞ্ছনা, ভর্ৎসনা শুনতে হবে। স্নাবিংএর চেয়ে যাকে ধরবে তাকে কাঁদিয়ে দেবে সে। দয়ামায়ার লেশ নেই যেন। হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার। পদে পদে অপমান আর অসম্মান। স্থান কাল পাত্র বিচার করতে চায় না।

বৈকালিক সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ে, যখন অফিসে অফিসে ছুটির পালা, তখন নেতাজী সুভাষ রোডের তেরোতলা আকাশ-চাঁছা ম্যানসনের সুউচ্চ এক কক্ষে কলকাতার ব্যবসামহলে বিখ্যাত মেহেরা এন্ড টমসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত সান্যাল, যাকে সকলে বাঘের মত ডরায় উচ্চ আসনের প্রতিপত্তি আর দাপটে সদাই গম্ভীর থাকতে থাকতে হঠাৎ হাসির হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। বিলম্বিত, ধীরা ঝর্ণা, শ্রাবণ-ধারার কোথায় বইতে থাকে হঠাৎ যেন। দেখলে তখন চেনা যায় না সুব্রতকে। না দেখলে চোখে বিশ্বাস করা যায় না।

বেপরোয়ার মত। কারও ধার ধারে না। কাউকে তোয়াক্কা করে না। কুসুম-কোমল পেলব হাতে হাত ভিড়িয়ে সুব্রত শিষ দিতে দিতে অফিস ত্যাগ করে। এক একদিন একেকজন। আজকে যে কালকে সে নয়। প্রত্যহিক নিত্য নতুন রেশিপির পাকাপাকি ব্যবস্থা থাকে আগেভাগে।

গঙ্গার অন্য প্রান্তে, হাওড়া-শালিমারের ওপরের আকাশে তখন দিবাকরের অস্তমান লাল সূর্য। নেতাজী সুভাষ রোডের তেরোতলা থেকে দেখা কলকাতা শহরের বিরাট জলে। রুপালী রঙের হাওড়া ব্রীজে রক্ত আভা। মুঠো মুঠো সিঁদুর কারা যেন ছড়িয়ে দিয়েছে। শেষরশ্মি পড়েছে রঙিন।

সায়াহ্নের পাংলা অন্ধকারে তাই বাঘের মুখে হাসি ফোটে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় এক একদিন। রুমাল বেগল বেরিয়ে যায়, শিকার সঙ্গে নিয়ে। মাংসের লোভে লোভে।

কানাকানি হয় অনেক রকম। ফিরেও দেখে না সুব্রত। কানে তোলে না তুচ্ছ কথা। পুরুষ মানুষেরই প্রয়োজন হয় নারীকে। এই না কি চিরকালের রীতি। সেই শুরুর আমল থেকে।

সুব্রতর পৌরুষের বলিষ্ঠতার রূপ-কাষ্ঠে পড়লো টাইপিষ্ট ছায়া চৌধুরী।

সেদিন হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে শিকারী বিড়ালের মত লক্ষ্যহীন পদক্ষেপে চুপি চুপি এগোতে থাকে সুব্রত। যারা তাকে দেখতে পায় তারা আর মুখ তোলে না খাতা থেকে। কলম থামায় না। নিঃসাড়ে কাজ চালিয়ে যায় নতমুখে। সুশীল সুবোধ ছাত্রছাত্রী যেন সব। পরীক্ষার্থী।

সকলেই অনুমান করে, এখনই একটা বড় রকমের ঝড় উঠবে অফিস-হলে। জেনারেল ম্যানেজার স্বয়ং হাতেনাতে একজনের ফাঁকি ধরে ফেলেছেন। হয়তো অনেক দিন থেকে ছিলেন তাকে তাকে। আজ এসেছে এক সুবর্ণসুযোগ। হেলায় যা হারাণো যায় না। ফেপসোলের পদধ্বনি অশ্রুত থেকে যায়। এক পা এক পা এগিয়ে চলে সুব্রত। হাতের পাইপটা ঠোঁটে হেলিয়ে দেয়। মুখে হিংস্র হাসি ফুটেছে। নরদানবের মত দুই হাতে এখনই যেন শিকারের টুঁটি চেপে ধরবে।

একজনের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লো সুব্রত। চলতে চলতে থামলো হঠাৎ। স্রেফ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে শিকারকে। এখন খানিক খেলাবে চরম আঘাতের আগে।

সহকর্মীদের কেউ যে সাবধান করবে ঐ অসাবধানীকে, তারও উপায় নেই। সুব্রতর চোখে ধরা পড়লে চার্জে জড়িয়ে দেবে। চার্জশীট দিয়ে দেবে কড়া।

আর যেন সবুর সহ্য হয় না। সুব্রত কথা বললে কাঁজালো সুরে, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে। বললে,—অফিস আর ড্রইং রুম এক নয় মিস চৌধুরী। ভুলে গেছেন বোধ হচ্ছে।

শিউরে শিউরে উঠলো টাইপিষ্ট। যমের কণ্ঠস্বর কানে এসেছে যেন।

সামলাতে সময় নেয় কিছু। ছায়া চৌধুরী নিজেকে সামলে হাতের কাজ শুরু করে ভয়ে ভয়ে। খট খট খট—

নরম নরম হাত, নাচতে থাকে যেন টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে। চাঁপার কলির মত আঙুল, যন্ত্রের বুকে শব্দ তোলে দ্রুতলয়ে।

একজন কেরাণীর সঙ্গে কি একটি কথায় হাসাহাসি করছে তখন ছায়া, এমন সময়ে তার পাশের দেশ থেকে বেরিয়েছে সুব্রত। বন থেকে যেন বাঘ বেরিয়েছে।

—আঁচল যে লুটিয়ে পড়ছে ধুলোয়।

আবার কথা বললে জেনারেল ম্যানেজার। সপ্তমে সুর। সকলে যেন শুনতে পায়, তাই সজোরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। কথার শেষে মুখে পাইপ তোলে।

পিঠ থেকে লুটানো আঁচল সামলায় ছায়া চৌধুরী। সলজ্জায়। তার হাসি হাসি মুখে নামে শ্রাবণের কালোমেঘ। সঙ্কোচের জড়তায় কাঁপছে সে। অপরাধের কলঙ্ক-চিহ্ন ফুটেছে যেন মুখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছায়া, বুক-ভাঙা। অনুশোচনার।

জোরালো কণ্ঠ গর্জে ওঠে তার কানের কাছে। সুব্রত সুর চড়িয়ে বললে, আবার,—দেখছি, আজকাল ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী ফাঁকিবাজ। মাথা খাচ্ছে ছেলেদের। লজ্জা শালীনতা বলতে কিছু আর রইলো না।

—আই এ্যাম সরি সার। বেগ ইওর পার্ডন।

কাঁপা কাঁপা কথা বললে ছায়া। অপমানের যাতনায় আর স্থির থাকতে পারে না। ক্ষমা চাইলে যদি আর শুনতে না হয় কাটা কাটা কথা, তাই বললে ভয়-কাঠ গলায়।

আমি দুঃখিত। ক্ষমা করুণ আমাকে।

দোষ-স্বীকার আর ক্ষমা-প্রার্থনা শুনেও ক্ষান্ত হয় না জেনারেল ম্যানেজার। কর্ণপাত করতে চায় না কথায়। সুব্রত বললে,—মুখে বললে চলবে না মিস চৌধুরী। লিখে জানাতে হবে। রেকর্ড রাখতে হবে আমাকে। ফর সাম ফিউচার রেফারেন্স।

তার মানে কালো খাতায় নাম উঠে যাবে। ব্ল্যাক লিষ্টের আওতায় থাকবে ছায়া চৌধুরী।

—আমাকে ক্ষমা করুন।

শেষবারের মত বলে টাইপিষ্ট, মিনতির সুরে আবেদন জানায়।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা নয়। সুব্রত মার্চের ভঙ্গীতে পা ফেলতে ফেলতে নিজের কামরায় চলে গেল। গরমের দেশ থেকে শীতের রাজত্বে।

খট খট খট খট—

কাজ শুরু করেছে ছায়া। কেউ দেখতে পায় না পিছু থেকে, তার চোখ ছলছল। কোমল বুকের স্তর কাঁপছে থরথরিয়ে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। এখনই যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে অবাধ কষ্টে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। পাশেই পড়ে আছে ছায়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। রুমালখানা বের ক'রে চোখ মুখ মুছবে, সাহস হয় না যেন।

সন্দেহের দৃষ্টি পড়বে, ছায়ার অস্বস্তি হবে।

সারা অফিস হলে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে। সুব্রতর কথার চাপা একটা প্রতিবাদ মেয়ে মহল থেকে পাক খায়। মেয়েদের সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধ মন্তব্য। সমগ্র নারী জাতির অপমান।

কলিং বেল গোঙানি ধরে। তীব্র আওয়াজে অফিস হল কেঁপে ওঠে যেন। লাল আলো জ্বলেছে। সুব্রতর দুয়োরের শীর্ষে।

বেয়ারা দেখা দিতেই জি এম বললে টেবলে পাইপ ঠুকে,—স্টেনোগ্রাফার।

মেয়েদের প্রতিবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। যে যার কাজে মন দেয়। সংসারের ভরণ পোষণের ভার ঘাড়ে পড়েছে। চাকরী গেলে অনাহারে মরতে হবে। যাকে বলেছে সে প্রতিবাদ জানাক। পরের জন্য মাথা ব্যথা কেন।

ডিক্টেশন দিতে থাকে সুব্রত। সাংকেতিক অক্ষরে লিখে যায় স্টেনোগ্রাফার। একটিও আজেবাজে কথা নয়। আইন বাঁচিয়ে চিঠি লিখতে হয়। টাইপিস্টের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যেন মিথ্যা প্রমাণ না হয়। পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, ভেবে ভেবে বলতে থাকে সুব্রত। অকাঠ্য যুক্তির সঙ্গে কড়া ভাষা মিশিয়ে।

আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করুন। ছায়া চৌধুরীর উক্তিগুলি মনে পড়লে দাঁতে দাঁত চাপে সুব্রত। প্রতিহিংসার জ্বালা ধরে যেন মাথায়। সহানুভূতির বিবেচনা উঠে যায় মন থেকে। সুব্রত যেন পাষাণ। নির্দয় নিষ্ঠুর।

—মিস চৌধুরী।

নাতিউচ্চ কণ্ঠে ডাক দেয় স্টেনোগ্রাফার। পিছনে দাঁড়িয়ে। হাতে তার প্যাড আর পেন্সিল। মুখে হতাশা।

চোখ ফেরাতেই ছায়ার হাতে ধরিয়ে দেয় স্টেনোগ্রাফার, প্যাডের কাগজ। বলে,—জেনারেল ম্যানেজারের আদেশ, এই চিঠিখানি সব আগে টাইপ হওয়া চাই। দেরী হ'লে চলবে না। তিন কপি চাই।

চিঠির খসড়া হাতে নিয়ে কাগজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে পড়তে থাকে ছায়া চৌধুরী। তারই বিরুদ্ধে অভিযোগ। কাজে অমনোযোগ, গাফিলতি, অফিসের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ হওয়ার লিখিত প্রতিবাদ। উত্তর চাই এক সপ্তাহের মধ্যে।

হাত কাঁপতে থাকে ছায়ার। মাথায় ঝিমঝিম শুরু হয়। বক্ষে কম্পন। চিঠির খসড়া তো নয়, যেন আত্মহত্যার বিষ রয়েছে তার হাতে। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। কেউ বাঁচাতে পারবে না। ছায়াকে লেখা চিঠি, ছায়াকে টাইপ করে দিতে হবে, এমনই ট্রাজিডি।

একখানি আয় ও ব্যয়ের স্টেটমেন্ট কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী, টাইপের কাজে ব্যস্ত ছিল ছায়া। স্টেটমেন্ট রেখে দিয়ে চিঠিতে মন দিতে হয় তাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কার্বন কাগজ খুঁজতে থাকে ছায়া। তিন কপি চাই।

এক কপি পাবে ছায়া। এক কপি যাবে সরকারী লেবার অফিসারের কাছে। এক কপি থাকবে রেকর্ডে। খট খট খট খট—হাত চলতে থাকে টাইপিস্টের। আড়ষ্ট আঙুল, চলতে চায় না। থেমে যায় বার বার। চোখে ঝাপসা দেখে। চিঠির খসড়া, মনে হয় হিজিবিজি লেখা। ভাষা দুর্বোধ্য। বিষয়বস্তু অর্থহীন প্রলাপ যেন। তবুও টাইপ করতে হবে। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে। একটি শব্দ বাদ না পড়ে।

—আমাকে দোষ দেবেন না। আমি নিরুপায়। জানেন তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ফিসফিস কথা বললে স্টেনোগ্রাফার। সমবেদনার সুরে। ম্লান হাসি মুখে।

—তবু আমি ক্ষমা চেয়েছি। দোষ স্বীকার করেছি। রেহাই নেই তাতেও। ছায়া বললে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। কাঁপা কাঁপা কথা।

স্টেনোগ্রাফার ইদিক সিদিক দেখে আবার ফিসফিস বললে,—আপনি যে বড্ড বোকা আর ভাল মানুষ! দেখছেন তো চাকরী রাখতে হ'লে করতে হয় কি কি।

—কি করতে হয় বলুন তো? শুধোয় ছায়া, কিংকর্তব্য হারিয়ে।

হেসে ফেললে স্টেনোগ্রাফার। পেন্সিল কামড়ে ধরে দাঁতে। বলে,—কি আর বলবো বলুন। দেখতে পাচ্ছেন তো মিস দাস, মিসেস সেন, মিস ডরোথি পার্কারকে! ওরা কেমন তুষ্ট রেখেছে আমাদের জি, এমকে। যখন যা বলছে তাই হচ্ছে। মাইনেও বেড়ে চলেছে ওদের। ধাপে ধাপে।

লজ্জায় লাল ফুটে ওঠে ছায়ার ফর্সা গালে। চোখের পল্লব নত হ'তে থাকে ধীরে ধীরে। কেমন একটা ঘৃণার উদ্রেক হয় মনে। মন সায় দিতে চায় না। দেহ সাড়া দেয় না। দেহ আর মন বিদ্রোহের সুর তোলে যেন।

চিঠি টাইপ করতে থাকে ছায়া। যেন নিজের মৃত্যুর সার্টিফিকেট, নিজেই লিখছে। ঝাপসা দেখছে চোখে।

খট খট খট খট—

সাংকেতিক ভাষা অস্পষ্ট আর দুর্বোধ্য ঠেকছে। তবুও হাত চালাতে হয়। চাঁপার কলির মত আঙুল, নাচতে থাকে কী-বোর্ডে। এখন আর তাল নেই, ছন্দ নেই। বেসুরো শব্দ তোলে টাইপরাইটার। যন্ত্রটাও যেন অসম্মতি জানায়।

না না না। পারবে না ছায়া, ওদের অনুকরণ করতে। মিস দাস, মিসেস সেন, মিস ডরোথি পার্কারকে জীবনের আদর্শ, কল্পনা করতেও পারে না যেন। শুনতে পাওয়া যায়, মিস দাস না কি একবার কি এক দুরারোগ্য গোপন ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে। মিসেস সেনকে তার স্বামী না কি পরিত্যাগ করেছে। তার নামে আদালতে মামলা চলছে তার স্বামীর পক্ষ থেকে। সেপারেশন চাইছে মিসেস সেনের সাত-পাকে-বাঁধা স্বামী স্টুয়ার্ট সেন। প্রধানতম অভিযোগ 'ব্রিগামি'। স্বামী জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতেও অন্য পুরুষদের সঙ্গ চাওয়া কেন? শোনা যায় মিস ডরোথি পার্কার, ভূখ্যাত পল্লীর মেয়ে। দিনে চাকরী করে। আর রাত্তিরে?

একটা একটা দুঃস্বপ্ন, ছায়ার চোখে ভেসে ওঠে। হাতের তালু হিম হয়ে যায়। কণ্ঠ শুকিয়ে যায় কম্পিত আতঙ্কে। বুকের মধ্যে বিবেকের দংশন। ছায়া পারবে না, নীচে নামতে। স্বর্গ থেকে নরকে, যেতে চায় না সে। থাক তার ভাঙ্গা পাথরচাপা। দরকার যদি হয়, চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে দেবে। ভাঙবে তবু মচকাবে না। অনাহারে থাকতেও সে যেন প্রস্তুত। এমন কি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যায়।

ভাসা ভাসা মনে পড়লো ছায়ার। চাকরীতে এসে প্রথম দিকের একটা তুচ্ছ ঘটনা।

ছুটির ঠিক মধ্যমুহূর্তে ডাক পাঠালেন জেনারেল ম্যানেজার। প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠার একটি স্টক রিটার্ণ, এগিয়ে দেয় সুব্রত। বলে,—মিস চৌধুরী, ভেরী ভেরী আর্জেন্ট, আজই চাই। প্লীজ, বি ইট'।

মৌমাছির মত ক্ষুব্রকৃতি কব্জি-ঘড়ি তুলে ধরে ছায়া। ম্লান হাসির সঙ্গে বললে,—এ যে অনেক। সময়ও অনেক নেবে। রাত আটটা বেজে যাবে শেষ হ'তে। শুধু ফিগার আর ফিগার। স্টক রিটার্ণ অঙ্কের ব্যাপার, যদি ভুল হয়ে যায় তাড়াতাড়িতে? কাল ফার্স্ট আওয়ারে দিলে চলবে না স্যার?

—কাল ফার্স্ট আওয়ারে আমাকে ব্যাঙ্কে পাঠাতেই হবে। ম্যানেজিং

ডাইরেক্টরের নির্দেশ। কথার শেষে মুখে পাইপ তোলে সুব্রত। ধূম্রমান পাইপ, ঝুলিয়ে ধরে কুকুরদাঁতে। বলে,—স্টক-রিটার্ণের শেষ দিন আগামীকাল। ব্যাঙ্কে ওভারড্রাফ্‌ট বন্ধ ক'রে দিতে পারে, সময়ে না পেয়ে।

—মিস দাসকে বলুন। আমি যে অনেক দূরে থাকি। ছায়া একটা কারণ শুনিয়ে বলে। যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়। লাজুক হাসি তার মুখে।

—মিস দাস চলে গেছেন আজ, এক ঘন্টা আগে।

—মিসেস সেনকে বলতে পারেন স্যার। উনি তো আছেন এখনও।

—তিনি আবার ফিগার টাইপ করতে পারেন না। ঘোঁয়া মাখানো একটা একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। রিভলভিং চেয়ারে এলিয়ে পড়ে সুব্রত। বলে,—মিসেস সেন ভীষণ ভুল করেন। রিটাইপ করাতে হয়, হুইচ ইজ এ্যাবসোলিউটলি ইমপশিব্‌ল্‌।

—মিস পার্কারকে ডেকে দিই তবে স্যার? ছায়া বললে সন্ত্রাসের সুরে। বললে,—আপনি ডেকে বললে মিস পার্কার—

—উঁহুঁ। ডাইনে বামে মাথা দোলায় সুব্রত। তার এ্যালবার্ট চুলের চূর্ণকুন্তল লাফিয়ে পড়ে কানের পাশে। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বিজাতীয় সুরে বলে,—নো নো। সি ইজ টু-উ-উ-উ স্লো। রাত্রি কাবার হয়ে যাবে।

অগত্যা আর ডাক পড়তে পারে না ছায়া ভিন অনকে। কেমন একটা সন্দেহের চাউনি ফুটে উঠলো ছায়ার ডাগর ডাগর চোখে। দেখলো এক নজরে জেনারেল ম্যানেজারের মুখখানা। দেখলো, কি আছে সেখানে। কি লেখা আছে সেই মুখে—যা মনে মনে টাইপ ক'রে নিতে থাকে যেন ছায়া। সুব্রত তাকিয়েও আছে নির্লজ্জ দৃষ্টিতে। দেখছে ছায়া চৌধুরীকে। তার আপাদমাথা দেখতে দেখতে সুব্রতর এক জোড়া চোখ শুধু নয়, সুব্রতর মনের চোখও যেন থমকে থাকলো ছায়ার ঈষৎ ভারী বুকে। দক্ষিন ভারতীয় লাল চেলীর ব্লাউসে শ্বাসের উত্থান পতন। ছায়ার গলায় সোনার সরু হার, চিক চিক করছে ঘরের নিওন আলোয়। হারের আবেষ্টন থেকে পাহাড়ী ঢল নেমে এসেছে দুই দিকে। চুলীর লকেট সেখানে মিশেছে, সেখানে যেন একটা তীরের ফলার মত ত্রিকোণের সৃষ্টি হয়ে আছে।

চোখে চোখ রাখতে পারে না ছায়া। লজ্জায় অন্য দিকে তাকায়। সাহসে বুক বেঁধে বলে,—কাল ব্যাঙ্কে সাব্‌মিট করা হবে কখন স্যার?

—ধরুন বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে?

—ব্যাঙ্কিং আওয়ার্স বেলা দু'টো পর্যন্ত, তার মধ্যে দিলে চলবে না? আমি বেলা বারোটার মধ্যে আপনার টেবলে পৌঁছে দেবো, যদি আপনি অনুমতি দেন। অনেক দূরে স্যার থাকতে হয়। বাসে যেতেও প্রায় দেড় ঘন্টা টাইম লাগে।

—যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়ী আজ আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কোথায় থাকা হয় শুনি? আই ক্যান হ্যাভ ইউ এ লিফ্‌ট।

—কলকাতা থেকে বেশ দূরে?

—কোথায়? মনে না মার্শে না ভেনাশে? যেতে হয় কিসে? স্পুংনিকে? হেসে হেসে কথা বলে সুব্রত। ঠোঁট বেঁকিয়ে। ব্যঙ্গের সুরে।

হাসতে চেষ্টা করে ছায়া। পারে না। হাসি যেন সাড়া দিতে চায় না। বলে,—থাকি সোনারপুরে। ঠিক আছে, আমি টাইপ শেষ ক'রেই যাবো।

চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বললে ছায়া। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাতে-লেখা তিন পৃষ্ঠার স্টক-রিটার্ণ টেবল থেকে তুলে নিয়ে। বিদেশী কি সেন্টের গন্ধ রেখে যায় ঘরে। ছায়ার সঙ্গে মেশানো যেন, এই বিশেষ একটা মিষ্টি সুগন্ধ। ফরাসী এসেন্স।

—বেয়ারা। বাইরে পা দিয়েই ডাকলো ছায়া। বিরক্তির সুরে। হিল উঁচু জুতোর ঠক্‌ ঠক্‌ শোনা যায় শুধু প্রায় শূণ্য অফিস-হলে। বেয়ারাদের পাত্তা নেই আর ছেলে মেয়ে কেউ নয়। বেয়ারা কটা আছে এখনও। বড়সাহেব না উঠলে তাদের ছুটি হবে না।

নিজের চেয়ারে আসন নিতে হয় আবার। টাইপরাইটারের রোলার ঘুরিয়ে দিতে দিতে বলে,—বেয়ারা, এক পেয়ালা চা এনে দিতে হবে। এক স্লাইস রুটি।

কথার শেষে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পার্স বের করে ছায়া। চা আর রুটির দাম দিয়ে দেয়। খট খট খট খট —

কাজে লাগতে হয় আবার, দিনের শেষে। সূর্যাস্তের পরে। বাইরে পাংলা অন্ধকার নেমেছে। গলার অনা তীর অস্পষ্ট হয়ে গেছে। হাওড়া ব্রীজ আর দেখা যায় না। দেখা যায় ব্রীজের দুই মাথায় জোড়া জোড়া লাল আলো জ্বলছে। দানবের রক্তচক্ষু যেন।

খাদ্য চাই সামনা যা হোক। লোভাতুর বক্ষের বুকে সারাদিন ঘা মেরে মেরে নরম আঙুল কটা ব্যথা করছে এখন। হাত চলতে চাইছে না আর। বাহু কনকন করছে। নির্দিষ্ট সময় কাজ করেও কাজ থেকে মুক্তি নেই। ছুটির পরেও ছুটি মিললো না এখনও।

খট খট খট খট—

স্পীড তুলেছে ছায়া। ধীরে সুস্থে টাইপের সময় নয় এটা। অস্ফুট অভিমানে ছায়া হাত চালায় দ্রুতলয়ে। বিরক্তির চাউনি ফুটে থাকে মুখে। বাঁকানো ভুরু যেন সরল হতে চায় না আর। সেই সাড়ে দশটা থেকে একভাবে বসে টাইপ করতে করতে এখন পেটে-কোমরে মৃদু মৃদু ব্যথা লাগছে। কন-কন করছে থেকে, থেকে ছায়ার মেরুদণ্ড। চোখে-কাপসা দেখছে মাঝে মাঝে।

শীতার্ত ঘরে তখন সুব্রত বিদেশী থ্রিলার খুলে পড়ছে। হাতে কাজ না থাকলে সুব্রত রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ে সময় কাটায়। ডজন খানেক চিকেন স্যাণ্ডুইচ্‌ আর এক পেয়ালা চা, শেষ হয়ে যায় পড়তে পড়তে। এক হাতে খোলা বই, অন্য হাতে খাওয়া। চুরি, ডাকাতি, খুন জখম, হাতাহাতি মারামারি আর প্রতি কথায় রিভলভার দাগছে যখন তখন—পড়া ধরলে আর ছাড়া যায় না যেন। পরিণতিতে না পৌঁছে কৌতূহল আর আগ্রহ থামে না। বিচিত্র চরিত্রের পুরুষ আর নারী ডিটেকটিভ কাহিনীতে। যাকে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্দোষী, শান্তশিষ্ট—হয়তো দেখা যায় শেষে, সেই খুন করেছে। ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি সে।

সময় যে কত এখন, জানতে পারে না সুব্রত। একাগ্র মনে পাতার পর পাতা পড়ে চলেছে। পাইপ ধরাতে ভুলে থাকে কতক্ষণ। পাইপের মিনমিনে আগুন নিভে যায় বার বার। রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হয় সুব্রতকে।

কাগজ রেখে যায় বেয়ারা। খেয়াল হয় না যেন। সুব্রতর মন আর চোখ থ্রিলারের পাতায় আবদ্ধ। টেবলে কাগজ রেখে দিয়ে যায় বেয়ারা। ভারী কাগজ-চাপার তলায়।

যখন খেয়াল হয় অনেক দেরী হয়ে গেছে। বই পড়া শেষ হতেই গভীর এক ঘুম থেকে যেন উঠে পড়লো সুব্রত। ছিল সে অন্য এক জগতে, পৃথিবীতে এই মাত্র এসেছে। কলিং বেল টিপতে থাকে হঠাৎ। হাত-ঘড়ি দেখতে দেখতে। দেখলো রাত আটটা বেজে গেছে।

বেয়ারা এসে দাঁড়ালো চকিতের মধ্যে সুব্রত বললে,—টাইপিস্ট মিস চৌধুরী।

• —চলা গিয়া টাইপিস্ট। বেয়ারা বললে সসম্ভ্রমে। নম্রকণ্ঠে।

—কুছ কাগজ দে গিয়া? শুধোয় সুব্রত। বাগ্র আগ্রহে। কথার শেষে চোখ

ঠিক আছে, আমি টাইপ শেষ করেই যাবো।

পড়ে নিজের টেবলে। দেখতে পায় টাইপড্ কাগজ, স্টক-রিটার্ণ। ক্রিস্টালের কাগজ চাপার তলায়। মেজাজ বিগড়ে যায় সুব্রতর। বেয়ারার কথা শুনে। টাইপিস্ট চলে গেছে। স্টক-রিটার্ণ হাতে তুলে নিয়ে মূলালিপির পাশাপাশি ফেলে মিলিয়ে নিতে থাকে সিগারেগুলি কাঁচা-মালের পরিমাণ আর মূল্য। এ্যাকচুয়াল

—কাল এই রিটার্ণ সই হোনা মাংতা। বহুৎ জরুরী হ্যায়। সবের সাড়ে দশ বাজে কা ভিতর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকো টেবল মে দেনা পড়েগা। দেখো, ভুলো মাৎ।

—কভি নেহি সাব্। বেয়ারা বলে ভয়ার্ত সুরে। সুব্রতর উদ্যত হাত থেকে নিয়ে নেয় জরুরী কাগজ।

—টাইপিস্ট কাহাকে নিকালা? প্রশ্ন করলে সুব্রত। পাইপের তামাকের চটচটে কণা আঙুল দিয়ে পকেটে পুরতে থাকে। ঠোঁট চেপে চেয়ারে।

—পাকা, সাড়ে সাত বাজে।

—কুছ বোলা?

—নেহি সাব। কুছ নেহি। এহি কাগজ দে গিয়া থা। গলার টাই আলগা করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সুব্রত। মিথ্যা আর কালক্ষেপ কেন? অহেতুক সময় নষ্ট কেন? পাখী উড়ে গেছে।

সুব্রতর চোখ কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্রোধের আভরণ্ড তার নিরাশ মুখে। আশার ছলনাটুকু পড়েছে। বেয়াদপ মেয়েটা বসিয়ে রেখে পালিয়ে গেছে। মেহেরা এণ্ড টমসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত সান্যালের প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে ছায়া চৌধুরী। এমনই তার দুঃসাহস। সোনারপুর, কত দূরে! গাড়ীতে লিফ্ট দেওয়ার স্বপ্ন সার্থক না হওয়ার আপশোসে সুব্রত দাঁতে দাঁত চাপে। রগে গর গর করতে থাকে। হাতের মুঠো কঠোর হয়ে ওঠে।

কেমন একটা অপমানের অনুভূতি সুব্রত যেন জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। অন্যদিন লিফটম্যানের সেলামের প্রতিদানে মাথা দোলায়, ফিরেও দেখেনা সেদিন। অন্যমনে ফিরে যেত। ফাঁদ পাতাই সার হ'ল।

আজ মনে পড়ছে ছায়ার। সেদিনের একটা একটা ঘটনা আর কথা, ভেসে উঠছে তার ছল ছল চোখ। কানে ভাসছে জেনারেল ম্যানেজারের একেক উক্তি। ছায়াকে সেদিন মোটরে লিফ্ট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন জেনারেল ম্যানেজার। আজ মনে হয়, সেদিন ভুল হয়ে গেছে বিরাট একটা। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ভাবতে পারেনা না ছাড়া। ভাবেনা না একবার, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে এই একটি ভুলের ফলে। অন্য অন্য মেয়েরা কেমন চতুরা আর বুদ্ধিমতী। তাই তারা আছে জেনারেল ম্যানেজারের সুনজরে। ভাল খাতায়। কালো খাতায় নয়। মিস নাথ, মিসেস সেন, মিস পার্কার—এরা তো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। কাজের মধ্যে হাসছে, কথা বলছে এর তার সঙ্গে। হাসতে হাসতে কাজ করছে। ফাঁক পেলেই ফাঁকি দেয়। চি. এম দেখেও দেখতে পান না। দেখেও মাইনে বৃদ্ধির সুপারিশ করেন ডাইরেক্টরদের মিটিং-এ। কোম্পানীর একটা অডিনারী মিটিং-এর এজেণ্ডায় নাম তুলিয়ে রাখেন আগে-

ভাগে। বছরে বছরে ওদের বেতনের হার বেড়ে চলে চন্দ্রকলার মত। আয় ছায়া পড়ে থাকে পেছনে। সবচেয়ে কম দিয়ে সবচেয়ে বেশী কাজ পায় কোম্পানী। ছায়ার ভাগ্য এমনই।

আজ তাকে চার্জশীট টাইপ করতে হচ্ছে—যা সে নিজেই হয়তো পরমুহূর্তে গ্রহণ করবে হাত পেতে। খট খট খট—

মাঝে মাঝে চোখে ঝাপসা দেখছে ছায়া। চিঠির অসড়া দুর্বোধ্য ঠেকছে যেন। সাঙ্কেতিক ভাষা পড়তে পারে না সহজে। মনে হয় সরল আর বক্র রেখায় হিজিবিজি কেটেছে স্টেনোগ্রাফার। কিউবিজম ছবি এঁকেছে যেন হাসির ছলে।

জোড়া জোড়া চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি-বন পড়ছে ছায়ার পিঠে। সহকর্মীদের সহানুভূতির, সমবেদনার নীরব আশ্বাসের চাউনি থেমে আছে : ফিরে বেরুতে পারে না ছায়া। মিসেস সেন হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন বান্ধবীর দুরবস্থায়। মিস পার্কার হায় হায় করতে থাকে। মিস দাস কেমন যেন নির্বিকার। তার চোখ দুটি কষ্টকরুণ।

খট খট খট খট—

আত্মহত্যার বিষ নিজের হাতে তৈরী করে যেন ছায়া। নিজের চার্জশীট নিজেকেই টাইপ করতে হয়। নিজেকে হাসাকর ঠেকে। সজোরে একবার হাসতে পারলে যেন সকল জ্বালার লাঘব হয় ছায়ার। অট্টহাসি হাসবে, নিজেকে ধিক্কার দিতে।

বেল্ বাজালো ছায়া। একবার মাত্র। বেয়ারা আসতেই তার হাতে ধরিয়ে দেয় টাইপড্ কপি। বলে,—জি, এম-কে দিয়ে এসো।

যায় আর আসে। সুব্রত খস খস সই করে দেয় চিঠির শেষে। এক লহমায় দেখে নেয় চিঠির আদ্যোপান্ত। যথাযথ আছে, না বাদ গেছে কিছু। টাইপের ভুল। বেয়ারার হাতে চিঠি ফিরিয়ে দেয় সুব্রত। বলে,—মিস্ চৌধুরীকে দেনা হায়। এ্যাক্‌নলেজমেন্ট লে লেও। পুরা সহি। আউর আজকো তারিখ।

সই করে ছায়া। না বলতেই পুরো নাম লিখলো প্রাপ্তিপত্রে। কেউ দেখতে পায় না পিছন থেকে। চিঠিখানা খুলে পড়ে না আর ছায়া। দু'কোটা গরম জল, চোখ ঠিকরে চিবুকে নামতে থাকে। কান্না আসে, অপমান আর জল-মরনে। সামান্য দোষে, নগণ্য এক ত্রুটিতে এ কি শাস্তিভোগ! লঘুপাপে গুরুদণ্ড যেন। না কি জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিশোধের একটা নমুনা মাত্র। ভাগ্যে আরও যে কি আছে, কে জানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো আবার। নীরব অনুশোচনায়। ছায়া বেশ জানে, আর কখনও, আর কোনদিন আর ডাকবে না সুব্রত। লিফ্‌ট দেওয়ার প্রস্তাব আর কদাপি করবে না।

ছায়ার মাথায় ঝিম-ঝিম শুরু হয়েছে। এই অফিস হল, জানলার বাইরের শূন্যে আকাশ, এই নেতাজী সুভাষ রোড, রৌদ্র-উজ্জ্বল হাওড়া ব্রীজ—সবই যেন বোঁ বোঁ ঘুরছে, পাক খেয়ে খেয়ে। সারা কলকাতা যেন ঘূর্ণায়মান দেখছে চোখে।

আবার মনে হয় ছায়া রয়েছে এখন হাসপাতালে। জোছার সাদা খাটে। কি এক অস্ত্রোপচার হয়েছে তার দেহে। নিজেকে যেন ঠেকছে দুর্বলতম। শরীরে রক্তকণার চিহ্ন নেই। অপারেশনের পরের অবস্থা এখন তার। থেকে থেকে কোথায় যেন তীব্র বেদনা বোধ করছে। তার নাকের কাছে অক্সিজেনের টিউব। গ্যাসের চেম্বার দাঁড়িয়ে আছে স্টীলের ফ্রেমে। একটা রকেটের মত দেখছে ছায়া। মুখোসধারী নার্সদের দেখায় যেন গ্রহান্তর-যাত্রী।

আর ভাল লাগছে না এক মুহূর্ত, অফিসে থাকতে। ইউনিয়নকে একবার জানালে কেমন হয়। ভাবছে ছায়া। এখন খানিক মুক্ত বাতাস চাই। কাজের ভীড় থেকে কোথাও একটু ফাঁকায়। আকাশ-ছোয়া এই তেরোতলা অফিস-ম্যানশনের ছাদে উঠে যেতে পারে ছায়া। সারা কলকাতা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে আসতে পারে সে। বৃত্তাকার কলকাতা। সেই টালার ট্যাঙ্ক থেকে ওদিকে চৌরঙ্গীর শেষ বরাবর ছাড়িয়ে কল-কাতার আধুনিক দক্ষিণাঞ্চল।

কিন্তু ঐ ছাদে উঠলে ছায়ার মাথা ঘুরতে থাকে যেন। একদিন তারা সখ করে গিয়ে দেখে এসেছে। ছাদের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে কাঁপ দিতে ইচ্ছা হয় যেন মনের অবচেতনায়। ছাদ থেকে সোজা নীচে। নেতাজী সুভাষ রোডে পড়বে দেহটা। হাজারো লোকের ভীড় জমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। বিরাট বিরাট বিজনেশ ম্যাগনেটের বিশাল বিশাল মোটর দাঁড়িয়ে পড়বে সহসা। ট্রাফিক বন্ধ থাকবে কতক্ষণ।

—দিদিমণি। বেয়ারা ডাক দেয় পাশ থেকে। অফিসের একজন পুরানো বেয়ারা। ভাল মানুষ।

চোখ না ফিরিয়ে সাড়া দেয় ছায়া। বলে,—কি বল'।

—আজ তো চা চাইলেন না এখনও? জল-খাবার, তাও নয়।

—না। তুমি এই চিঠিখানা নিয়ে, এমকে দিয়ে এসো। ছায়া একটি চিরকুট দেয় বেয়ারার হাতে। বলে যেন ফিস-ফিসিয়ে। কানে কানে।

—আগে চা দিই আপনাকে। তার-পর। অভ্যাস আছে আপনার, চা না খেয়ে মাথা ধরবে।

—না, আগে দিয়ে এসে চা দাও। হেসে ফেললে ছায়া। কষ্টমলিন হাসি। কি খেয়াল হয়েছে কে বলবে, ছায়া চির-কুট পাঠালো দু' ছত্রের। লিখেছে সরল ইংরেজীতে—যার মর্মার্থ : মহাশয়, আপনি অফিস ত্যাগের পূর্বে আমাকে একবার ডাকতে অনুরোধ জানাই। আপনার বিশ্বস্ত ইত্যাদি—

বেয়ারা চা দিয়ে যায়। বলে,—জি, এম বলেছে তোমাকে ডাকবে। যেন চ'লে যেওনা সেবারের মত।

হলভর্তি অফিসে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই।

কাউন্টার আর ডিপার্টমেন্টে ছেয়ে গেছে যেন। টেবলের পর টেবল। চেয়ার সারি এখানে সেখানে। স্টীলের সেফ্, র‍্যাক আর আলমারীরা। রাশি রাশি ফাইল আর লেজার। কেরাণীদের কালো কালো মাথা। মেয়েদের খোঁপা। রঙীন শাড়ী। খাকিপোষাকের বেয়ারা এক দল। কড়িকাঠে ঝুলন্ত বিজলী পাখার লাইন। সাদা রঙ। পাখনা-মেলা শ্বেতবলাকা যেন এক সার। দেওয়াল-ঘড়ি চলছে অদূরে। গোলাকার ঘন্ত, সভ্য মনুষ্যজাতিকে চালনা করছে।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে সওদাগরী কেরাণীদের। আসতে যেমন, যেতেও তেমন। ঠিক টাইমে আসার অফিসের কর্তৃপক্ষের যেমন কড়াকড়ি, ঠিক টাইমে যাওয়াতে তেমনই কেরাণী-দের প্রবল ব্যস্ততা। চারটের পর থেকেই ঘড়ির সঙ্গে ভাব জমে যেন। প্রণয়ের সম্পর্ক। বারে বারে দেখাদেখি তাই।

হঠাৎ পিছু ফিরে তাকায় একবার ছায়া। দেখলো, জনতা কোন হাওয়াতে এখন। তার যত সব সহকর্মী? দেখলো অফিস হল খাঁ খাঁ করছে প্রায়। দেওয়াল-

CENTRAL LIBRARY

লিনোকাট

শিল্পী—সুব্রত ত্রিপাঠী

—আজ আমি সার পার্শ আনতে
ন গেছি। আমাকে আজ আপনি একটা
ফ্রি দিন। শরীরটা সুস্থ বোধ করছি
।

সুব্রতর মুখাকৃতিতে পরিবর্তন
সে হঠাৎ। কি এক মানবতার তাগিদে
লে,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সিওরলি।
ই মাস্ট্, অফিসের বাইরে আই অ্যাম
ট্ ইওর সার্ভিস।

তখন কলকাতার আকাশে সন্ধ্যাতারা
উঁকি ঝুঁকছে।

জেনারেল মার্চেন্টের [illegible]
গাড়ির এক কোনে [illegible]
পাখীর মত। [illegible]
চোখে। [illegible]
গাড়ির [illegible]
চৌরঙ্গী [illegible]
বলে,—[illegible]
না।

[illegible]
বুকে [illegible]
খুশী।

হেস্টিংস ও তাঁর প্রণয়িনী

বিশু মুখোপাধ্যায়

১৭৬৯ সালে বাংলার শাসনকর্তারূপে ওয়ারেন হেস্টিংস আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এই আসার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত কারণই ছিল প্রধান। তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভবন 'ডেলসফোর্ড'টি কিনতে চান, এবং তার জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাটির উপর হেস্টিংসের অত্যন্ত মমতা ছিল। তাঁর জন্মের আগেই দেনার দায়ে বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়; হেস্টিংসদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল। সে কারণ, এই বাড়িটির পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন হেস্টিংসকে সর্বক্ষণই পীড়া দিত। এবার ভারতবর্ষের উপার্জন থেকে অর্থ জমিয়ে তিনি ঐ বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করবেন স্থির করেছিলেন।

হেস্টিংস তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বহু আঘাত পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সবচেয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের মৃত্যুতে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে হেস্টিংসের জীবনে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিখ্যাত সেনানায়ক রবার্ট ক্লাইভের ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তনের পর, হেস্টিংস তাঁর সমসাময়িক সহকর্মীদের অর্থলালসা দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

দ্বিতীয়বার ভারতে আসার মুখে হেস্টিংস ভারতের শাসন ব্যাপারে বিশেষ কোন উন্নতির আশা দেখতে না পেলেও, এবার শাসনকর্তা হিসাবে তিনি এই সঙ্কল্প নিয়েই আসেন যে, ভারতে পৌঁছে যেমন কোরেই হোক এবার অবিবেচক মনোফাখোরদের তিনি সায়েস্তা করবেন।

এই ভারত-যাত্রায় কলকাতায় আসার পথে জাহাজে এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে হেস্টিংসের কঠিন হৃদয়েও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এই সুন্দরী মহিলাটির নাম মারিয়ান—তিনি তাঁর স্বামী কার্ল-এর সঙ্গিনী। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও, সুচতুর হেস্টিংসের বুঝতে দেরি হয়নি যে, এঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কেমন যেন একটু আলগা ধরণের, এবং এ কথার সত্যতা আলাপের কয়েকদিনের মধ্যেই মারিয়ানের স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল হেস্টিংসের কাছে। তাছাড়া তিনি এ কথাও জানতে পেরেছিলেন যে, কার্ল তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্যের সুযোগ নিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবসা করেন।

মারিয়ানের জীবনের এই রহস্য হেস্টিংসকে যথেষ্ট কষ্ট দিলেও, তিনি মারিয়ানের উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করতে পারলেন না। ভালবাসার ধর্মই এই। এরপর মারিয়ান নিঃশব্দে একদিন হেস্টিংসের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে, কার্ল গোপনে তা লক্ষ্য করে হেস্টিংসের উপর দোষারোপ করেন যে, হেস্টিংস তাঁর স্ত্রীকে গোপনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মারিয়ান আন্তরিকতার সঙ্গে এই অভিযোগের প্রতিবাদ করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হলেন না। এ ব্যাপারে হেস্টিংসও কার্লকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, এমন কোন কথাই তিনি ক্ষমা করতে রাজী নন, যাতে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এই সময় জাহাজে কয়েক দিনের জন্য হেস্টিংস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মারিয়ান কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে, আন্তরিক সেবা-যত্নে হেস্টিংসকে সুস্থ করে তোলেন। নারী হৃদয়ের এই মোহিনী শক্তি হেস্টিংসের হৃদয়কেও অভিভূত করে ফেলে। এই ঘটনার পর মারিয়ানের উপর হেস্টিংসের অগাধ বিশ্বাস ফিরে আসে এবং উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হেস্টিংস মনে মনে মারিয়ানকে জীবনের শাশ্বত সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন—কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব?

যে জাহাজে হেস্টিংসের জীবনের এই অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ সংক্রামিত হয়েছিল, সে জাহাজখানি মাদ্রাজ বন্দরে না দাঁড়িয়ে, সরাসরি বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। শান্ত সমুদ্র, বিস্তৃত জল-রাশির উপর প্রখর সূর্যের দীপ্তিমান প্রভা। গ্রীষ্মের খর-উষ্ণ আবহাওয়ায় তাঁরা প্রবেশ করছেন; জলের দিকে তাকানো যায় না—চোখ যেন ঝলসে যায়।

হুগলী নদীতে প্রবেশ করে, গঙ্গার দু'ধারের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। চতুর্দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, ভগ্ন কুঁড়েঘর পরিবেষ্টিত ফলতার জনশূন্য দ্বীপ। হেস্টিংসের মনে পড়ে গেল এই সে-দিনের কথা—তাঁকে একদিন ঐ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল সিরাজের রক্তচক্ষুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

হেস্টিংস ও মারিয়ান পাশাপাশি বসেছেন নানা গল্প হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। হেস্টিংস মারিয়ানকে বীভৎস অন্ধকূপ হত্যার গল্প বললেন,—কিভাবে তিনি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন সে-কথাও জানালেন। ব্যক্তিগত জীবনের বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল হেস্টিংসের মানস-পটে।

মারিয়ান হেস্টিংসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও যুদ্ধ করেছিলেন?' হেস্টিংস মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তিনি আরও বললেন, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকেই সেদিন সশস্ত্র ঘাড়ে করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। সংখ্যায় আমরা শত্রুদের তুলনায় কম ছিলুম, তাছাড়া জঙ্গলে যুদ্ধ করা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়—তবুও আমরা জয়ী হয়েছিলুম!'

কলকাতা এক বৃহৎ চিত্তাকর্ষক শহর—ক্লাইভের নতুন কেল্লা ছিল শহরের প্রধান আকর্ষণ। জলপথে তাঁরা বিস্তৃত নদীর বিপুল জলরাশির উপর দিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। বিস্তীর্ণ পথগুলি গাড়ি-ঘোড়ায় পূর্ণ। গাড়ির টুং-টাং শব্দ, চালকদের চীৎকার, পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ আর ভিক্ষুকদের কাতর ক্রন্দন—এই সব মিলে-মিশে এক অপূর্ব 'সিম্ফনির' সৃষ্টি হয়েছে। শহরের মধ্যবিন্দুতে লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত একটি মনোরম পার্ক। তারই সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। আর সেই জলাশয়ের চারপাশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলি অফিস-কাছারী। পুরাতন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ তখনও নবাগত পথিকদের কলকাতার যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কলে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী হেস্টিংসকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এই কর্মচারীদের নায়ক ছিলেন রিচার্ড বারওয়েল। তিনি অন্তরঙ্গভাবে প্রথমেই এগিয়ে এসে হেস্টিংসের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বারওয়েলের কথাবার্তার মধ্যে একটা টান।

হেস্টিংস মারিয়ান ও কার্ল-এর সঙ্গে বারওয়েলের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারী যুবক ইলিয়টকে নির্দেশ দিলেন যে, উপস্থিত কার্ল এবং মারিয়ান অতিথি হিসাবে তাঁর গৃহেই বাস করবেন। এই নির্দেশ দিয়েই হেস্টিংস বারওয়েলের সঙ্গে লাট-প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। যেতে যেতে হেস্টিংস বারওয়েলকে প্রশ্ন করলেন, 'এখন এখানকার খবর কি?' উত্তরে বারওয়েল বললেন, 'আপনি যখন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল; তবে এখনও এমন অনেক বাজে দুষ্টু লোক আছে, যারা ভারতীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। হেস্টিংস বললেন, 'ভারতীয়রা শিশুর মত সরল, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া প্রকৃতই অন্যায়।'

বারওয়েল হেস্টিংসের এই উক্তিতে চিন্তিত হলেন। তিনি অপলক দৃষ্টিতে হেস্টিংসের দিকে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, 'ভারতের শাসন ব্যাপারে আপনি কি কোন মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবছেন?—ক্লাইভের কথা সম্ভবতঃ আপনার স্মরণ আছে, তিনি লোভী বণিক-সম্প্রদায়কে তাড়িয়েছিলেন, ফলে দেশে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ও দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল। আমি আশা করি সে ভুল আর আপনি করবেন না?'

'না।' হেস্টিংস দৃঢ়ভাবে বললেন, 'কেউই ভুল করতে চায় না।'

বারওয়েল আবার বললেন, 'দেখুন, আমরা সবাই এদেশে এসেছি লাভের জন্যে, কে কি পেল-না-পেল সেদিকে আমাদের নজর না রাখাই ভাল।'

'আমিও তো তাই বলছি, কিন্তু ডিক্ (বারওয়েলের ডাকনাম), ভুলে যেও না, ব্যবসায় ন্যায্য মুনাফা এক বস্তু আর লুটে অন্য বস্তু।' উত্তর দিলেন হেস্টিংস।

বারওয়েল বললেন, 'আমরা যদি লুটতরাজের সুযোগ না নিই, তবে অপরে সে সুযোগ অবশ্যই নেবে।'

'অপরে অন্যায় করবে বলে আমরাও অন্যায় করব, এটা কোন যুক্তিই নয়। ধর এই নিরীহ লোকগুলি (ভারতবাসী) সহস্র বৎসর ধরে পরের দাসত্ব করে আসছে, আমরা তা জানি, কিন্তু তাই বলে দাসত্ব ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে।'

সদর রাস্তা ধরে গাড়িখানি সোজা গবর্ণমেণ্ট হাউসে গিয়ে প্রবেশ করল। হেস্টিংস বললেন, 'ইংলণ্ডে থাকাকালীন আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট ভেবেছি। আমার বিশ্বাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি ভারতীয়দের কোন উন্নতিবিধান না করে, তাহলে আমাদের সরকারের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত। আমি পার্লামেন্টারী কমিশন-এ সাক্ষী দেওয়ার সময় একথার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছি।' আলাপ করতে করতে দুজনেই তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে বাইরে এলেন, তারপর বড় বড় সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দু'ধারের ভারতীয় নফররা মাথা নীচু করে তাঁদের সেলাম করে যেতে লাগল।

এই সময় বারওয়েল হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,—আপনাদের জাহাজ ছাড়বার পরই আর একখানা জাহাজ লণ্ডন থেকে এখানে রওনা হয়। আপনাদের জাহাজ খানিকে পেছনে ফেলে সেই জাহাজখানি এগিয়ে এসেছে। তাতে কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্তর এসেছে। আমি সেগুলি আপনার ডেস্কে রেখে দিয়েছি।'

হেস্টিংস কালবিলম্ব না করে চিঠিগুলি দেখবার জন্য সোজাসুজি অফিসঘরে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর চিঠিগুলি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ একখানি চিঠি পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল, রঙীন মনের ছাপ ঝলমল করে ফুটে উঠল চোখে-মুখে। হ্যাঁ, তাঁর স্বপ্ন এবার সত্যিই সফল হতে চলেছে। চিঠিটি আর কিছুই নয়, একটি জরুরী ঘোষণা। ঘোষণাটি হচ্ছে : 'বাংলার গভর্ণরের পদ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে আইনসভা স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। এই শাসন পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং সেই পরিষদ হেস্টিংসকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন।' কিন্তু তখন কি কেউ জানত যে এই আশীর্বাদের মধ্যেই হেস্টিংসের জীবনের মর্মন্তুদ ইতিহাস লুকিয়ে আছে?

বারওয়েলের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস এই ঘোষণার কথা বললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালেন যে, 'এই ঘোষণার অর্থ হচ্ছে : এতদিন যা ছিল আমার জীবনের স্বপ্ন তা আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে বসেছে। গভর্ণর জেনারেলকে নিয়ে এই উচ্চ পরিষদে পাঁচজন সদস্য থাকবে। আমরা দুজন (বারওয়েল ও হেস্টিংস), আর

তিনজন আইন সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে প্রেরিত হবে।

এই তিনজনের মধ্যে ইতিপূর্বেই দুজন যে জাহাজে এই ঘোষণাপত্র এসেছে, সেই জাহাজেই এসে পৌঁছেছেন।

সেদিন বৈকালেই নব-নিযুক্ত দুজন সদস্যকে ডাকলেন গভর্ণর জেনারেল। এই দুজনের মধ্যে একজন হলেন জেনারেল ক্লেভারিং, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক মধ্যমেজাজী জেনারেল। তিনি ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও আসেননি এবং ভারতের সব কিছুকেই ঘৃণা করেন। দ্বিতীয় জন হলেন কর্ণেল মনসন। ইনি লর্ড মনসনের পুত্র, দুর্বল প্রকৃতির লোক, ভারতের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পূর্ব থেকেই তিনি জেনারেলের প্রভাবে প্রভাবিত।

প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গতানুগতিক আলাপ-আলোচনা হল। এরপর হেস্টিংস যখন জানতে পারলেন যে, তাঁরা সবাই তাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, তখন পরের দিনই তিনি তাঁদের সকলকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন এবং প্রসঙ্গত বারওয়েলকে বললেন, 'আমি অনেক দিন মেরিকে দেখিনি, তাকে দেখবার জন্য আমি উৎগ্রীব হয়ে আছি।'

পরের দিন সন্ধ্যায় সকলেই একত্রে ভোজসভায় মিলিত হলেন। মিসেস বারওয়েল সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্না স্ত্রীলোক; তিনি এই আসরে কৃত্রিম ভর্ৎসনা করে হেস্টিংসকে বললেন, 'ডিক্, এখন আর ফটিয়ে বেড়ে পারবে না—এই বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা স্কটল্যান্ড ফিরে যাব আশা করছি।' এই ভোজসভায় মারিয়ান এবং কার্লও উপস্থিত ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের অতিথি হিসাবে।

জেনারেল ক্লেভারিং-এর স্ত্রীর মুখশ্রী গম্ভীর, সংযত ও ওজস্বিনী। কিন্তু তাঁর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এ থেকে মনে হয় বহুমেজাজী স্বামীকে সব সময় শান্ত রাখার জন্য তিনি মনের দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কর্ণেল মনসন-এর স্ত্রী অ্যানে মনসন স্বল্পবয়সী মহিলা—শিকার সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল অত্যধিক। এই ভোজসভায় মেয়েদের মধ্যে সকলেই মারিয়ানকে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। কার্ল একজন সামরিক পদস্থ কর্মচারী, এই সংবাদ জানার পর বারওয়েল কার্লকে প্রশ্ন করলেন, 'তিনি সেনানিবাসে বাস করেন না কেন?'

আমার স্ত্রীর সঙ্গে একত্র থাকার অনুমতি কি আমি পেতে পারি না?' কার্ল জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্লেভারিং উত্তরে বলে বসলেন, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে; সব কিছুই এখন বড় ঢিলেঢালা হয়ে গেছে দেখছি।'

এইসব কথাবার্তার মধ্যে মারিয়ান লক্ষ্য করলেন, জেনারেলের মুখে কোন বিরক্তির ভাব নেই।

লাট-ভবনের সন্নিকটে একশ' গজ দূরে মারিয়ান ও কার্লের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। লাল রঙের বাড়ি, বড় বড় ঘর আর সেই ঘরে অনেকগুলি ক'রে জানালা। বেশ খোলামেলাই বলা যায় বাড়িটিকে। জাহাজে এক সঙ্গে আসবার সময় হেস্টিংস মারিয়ানকে বলেছিলেন যে, তিনি ব্যারোনেস হলেও ভারতবর্ষে তাঁকে দরিদ্রের মত থাকতে হবে। কিন্তু এখন হেস্টিংস তাঁকে খুলেই বললেন যে, তাঁর আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ এখন থেকে তিনি গভর্ণর জেনারেল হিসাবে বছরে পঁচিশ হাজার পাউন্ড করে পাবেন।

এই কথা শোনার পর মারিয়ান হেসে বললেন, 'হেস্টিংসের ডেলস্-ফোর্ডের স্বপ্ন তাহলে সফল হতে চলেছে বলুন? হেস্টিংসের এই বিরাট পরিবর্তনের জন্য তিনি নিজেই নিজের পথ পরিষ্কার করে এসেছিলেন। পার্লামেন্ট কমিশনে সাক্ষী দেবার সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে, সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা যদি স্বল্প বেতন পায়, তাহলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কারণ, তারা সকল সময়েই সচেষ্ট থাকবে নিজেদের আয় বাড়াবার জন্যে।

কলকাতা মারিয়ানকে মুগ্ধ করল। বিরাট শহর, বহু মাইল বিস্তৃত; বিচিত্র আয়োজন আর প্রাসাদতুল্য সব বাড়ি। কোন কোন বাড়ির বয়স একশ' বৎসরেরও অধিক। ইংলণ্ডে এত বড় জমকালো বাড়ি সাধারণতঃ দেখা যায় না। প্রত্যহ খুব ভোরের দিকেই মারিয়ান, হেস্টিংস ও কার্ল একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুতেন। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপে মারিয়ানের মুখ তামাটে হয়ে যেত; অবশ্য শীতের হিমশীতল বাতাস মারিয়ানের কাছে খুবই মনোরম মনে হত—তার মন ডুব দিত ইংলণ্ডের বসন্তকালীন আরামদায়ক স্মৃতির মধ্যে।

কার্ল ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ অভিযানেচ্ছু ঘোড়সওয়ার। তিনি নির্বিচারে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যেতেন। বড় বড় গর্ত ও বিপজ্জনক সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেতেন এক লাফে। কখনও কখনও নীচু গাছের নীচে এসে, ঘোড়া সমেত লাফিয়ে উঠে গাছের ডালপালা ভেঙে ফেলতেন। অপর দিকে মারিয়ান ও হেস্টিংস ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলতেন পাশাপাশি একসঙ্গে। সর্বদাই তাঁদের এই একসঙ্গে থাকাটা সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই দৃশ্য দেখে দুষ্টু লোকেরা নানা রকম গল্প করত, একটু-আধটু অশ্লীল কানাঘুষাও যে না হত তা নয়। ক্রমশঃ কার্লের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। তিনি শহরের নানা বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। কখনও তিনি সহরের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নাচগান হইহুল্লোড় করতেন, আবার কখনও বা ঘুরে বেড়াতেন নিঃসঙ্গ একাকী।

সকালের দিকে হেস্টিংস ও মারিয়ানের ঘোড়ায় চড়া ছিল যেমন প্রাত্যহিক নিয়মের মত, তেমনি সন্ধ্যার দিকে প্রত্যহ তাঁরা গাড়িতে করে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। নানা বিচিত্র দৃশ্য তাঁদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলত। বহু দেব-দেবীর মন্দির, পীঠস্থান ও যেখানে হিন্দুরা মৃত দেহগুলি দাহ করার জন্য নিয়ে আসত—এমনি সব শ্মশান ঘাটের সিঁড়ি ও স্থানগুলি তাঁরা অবাক হয়ে দেখতেন। শ্মশানভূমির নীলাভ ধূসর রঙের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে যেত, আর মেয়েরা তাদের প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় বুক চাপড়ে কাঁদত—এই করুণ দৃশ্য তাঁদের মনকে পীড়া দিত। কখনও তাঁরা চলে যেতেন সেই সুদূর প্রান্তরে, যেখানে ঊর্ধ্বাকাশে তারকারাজি টিপটিপ করে জ্বলত, আর নীচে জোনাকী-গুলি তাদের অকিঞ্চিৎকর নীলাভ স্বপ্ন-আলো নিয়ে নেচে বেড়াত। সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য-ঘেরা পরিবেশের মধ্যে মারিয়ান হেস্টিংসের কাছে ঘেঁষে বসতেন; তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলতেন, 'এ জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে—প্রেমের যে একটা রহস্য আছে, সে রহস্যের দ্বার যেন এখানে খুলে গিয়েছে।

হেস্টিংস উত্তরে বলতেন, 'মানুষ যখন অন্তরে সুখ অনুভব করে তখন বাস্তব থেকে সবই ভিন্ন মনে হয়। মুহূর্তের জন্য তাঁর মন মারিয়ানের দিকে ছুটে যেত, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত;

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংসে কেমন যেন হয়ে যেতেন, একটা করুণ বিষাদের সুর ধ্বনিত হ'ত তার কানে—নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিতেন তিনি।

সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদের প্রথম সভায় পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজন উপস্থিত ছিলেন, কারণ পঞ্চম ব্যক্তি তখনও এসে পৌঁছননি। হেস্টিংস এই সভায় প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা প্রথমে সারা ভারতবর্ষের একটা পূর্ণাঙ্গ জরিপ করবেন। সম্পূর্ণ ফরাসী ভূখণ্ডের ন্যায় একটা বৃহৎ ভূখণ্ড আমাদের অধিকারে এসেছে, কাজেই সর্বাগ্রে তার পরিমাপ করা বিশেষ প্রয়োজন। আর এই জরিপ-কার্য যখন সম্পূর্ণ হবে তখন যোগ্য ভারতবাসীর উপর প্রতি জেলার শাসন-ভার অর্পণ করা হবে।

হেস্টিংসের এই প্রস্তাবে ক্লেভারিং বাধা দিয়ে বললেন, 'এ ভাবে কাজ করলে আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাব। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এ ছাড়াও আমার আরও একটা আপত্তি আছে,—আপনি ভারতীয়দের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করার কথা বলছেন, সেটা কিরূপ?'

'ভারতীয়রা যদি যোগ্য হয় তবে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করবার পক্ষে আপত্তি কি?' হেস্টিংস প্রশ্ন করলেন।

'আপত্তি হচ্ছে এই যে, আমরা এদেশ জয় করেছি, আমরা এদেশের রাজা; সুতরাং সমস্ত বড় চাকরী আমরা আমাদের হাতে রাখব।' উত্তরে ক্লেভারিং বললেন।

'এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের কাজে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। দুশ্চিন্তের ইংরেজ এই বিশাল দেশের উপর এভাবে প্রভুত্ব করতে সক্ষম হবে কি?' হেস্টিংস বললেন।

'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।' জেনারেল জবাব দিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও বললেন যে, 'ভারতবাসীরা শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারক। আপনি তাদের এক বিন্দুও বিশ্বাস করতে পারেন না। আমি সর্ব ক্ষেত্রেই ইংরেজ নিয়োগের পক্ষপাতী।'

হেস্টিংস বাধা দিয়ে বললেন, 'ইংরেজরাও নানাবিধ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে ও প্রতারণা করছে, জেনারেল। অবশ্য তাদের মাথায় সাদা পাগড়ী নেই তাই তাদের মুখ কালো নয়।'

'একি মারাত্মক কথা আপনি বলছেন?' জেনারেল জোরের সঙ্গে বলে ইলিয়টের দিকে তাকালেন। ইলিয়ট হেস্টিংসের পেছনে বসে সমস্ত আলাপ-আলোচনা নোট করছিলেন। জেনারেলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল, যে সব নিরপরাধ বাঁশ টানা-পাখা টানছিল তাদের উপর। তিনি অগ্রহুক তাদের এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজের পৌরুষ বজায় রাখলেন।

হেস্টিংস বললেন, 'সে যাই হোক, আমি প্রস্তাব করি আমরা শীঘ্রই ভারত-ব্যাপী জরিপের কাজ আরম্ভ করব, সময়সাপেক্ষ হলেও, যতটা পূর্ণাঙ্গ হয় সে দিকে আমরা নজর রাখব।'

জেনারেল বললেন, 'জরিপের কাজ আপনি আরম্ভ করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই, কিন্তু আপনার অন্যান্য প্রস্তাব আমি সমর্থন করি না। তারপর মনসন-এর দিকে চেয়ে বললেন, 'মনসন, তুমি আমার সঙ্গে একমত?'

মনসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বারওয়েল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'আমি গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

ক্লেভারিং চীৎকার করে উঠে বললেন, 'তাহলে দেখছি ভোট দুই-দুই সমান হয়ে গেল,—এ তো এক অচল অবস্থা!'

'ভুলে যাবেন না, আমার একটা কাস্টিং ভোট আছে।' হেস্টিংস জোর দিয়েই বললেন কথাগুলি।

'কোম্পানীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়াটা খুব বড় বাহাদুরী নয়, হেস্টিংস —আমি কোম্পানীর পরিচালকদের নিকট এর প্রতিবাদ জানাব।' এই বলে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ক্লেভারিং সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে খাওয়ার টেবিলে জেনারেল ক্লেভারিং আবার সেই কথা তুলে চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না—যেমন করেই হোক হেস্টিংসকে আমাদের নিবর্ত্ত করতেই হবে। কিন্তু কি করে যে তা করা সম্ভব তা আমরা জানি না। তবে যে নতুন লোকটিকে আইন পরিষদ শাসন-পরিষদে পাঠাচ্ছে, তার যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চিত আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন।'

মনসন সম্মতি জানাল।

নানা ধরণের কথার সঙ্গে এই সময় লেডী অ্যানে বলে বসলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের গভর্ণর জেনারেল সুন্দরী যুবতী মারিয়ানের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ?—তাঁরা একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদিনই সকালে বেড়াতে যান এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকেন না।'

এই কথা শোনা মাত্রই ক্লেভারিং খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মারিয়ানের সঙ্গে আমার খানিকটা ঘনিষ্ঠতা আছে না...'

লেডী অ্যানে বললেন, 'আমার কথা হচ্ছে গভর্ণর জেনারেলের মত পদস্থ ব্যক্তির এ ধরণের আচরণ অশোভন। কারণ, এখানে আমরা সামান্য মুষ্টিমেয় ইংরেজ সহস্র সহস্র মাইল দূরে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করছি।'

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্বেই উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠলেন জেনারেল, 'এ ভয়ঙ্কর ভীষণ অন্যায়।'

এদিকে হেস্টিংস ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন, আর অপর দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় হেস্টিংসের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হেস্টিংসের শাসন-সংস্কার বণিক সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা অনেকখানি সীমাবদ্ধ করল এবং ব্যবসায় তাদের লাভের অঙ্ক অনেকখানি হ্রাস পেল।

বণিক সম্প্রদায় যখন হেস্টিংসের শাসন ক্ষমতা কোন প্রকারে খর্ব করতে সক্ষম হ'ল না, তখন তারা গভর্ণর জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করতে লাগল। মারিয়ানের সঙ্গে হেস্টিংসের অন্তরঙ্গতা ভাব অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল এবং হেস্টিংসের নৈতিক জীবন কলঙ্কিত করার জন্য তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগল। এমন কি, গভর্ণর জেনারেলের অপসারণের জন্য বিলেতে পরিচালক-বৃন্দের নিকট দরখাস্ত করাই উচিত বলে সাব্যস্ত করল।

বারওয়েল এই ঘটনায় বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি একদিন দ্রুত লাটভবনে উপস্থিত হয়ে হেস্টিংসকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ওয়ারেন একটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেবেন? ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অবশ্য উচিত নয়, তবে বহুদিন আপনার সঙ্গে একসঙ্গে আছি, সেই কারণে একমাত্র দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসাবেই এ প্রশ্ন করা যায়,—তা না হ'লে এ প্রশ্ন আপনাকে করতে আমি মোটেই সাহস করতাম না।'

'কি এমন কথা ডিক?' হেস্টিংস ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করলেন।

'প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।' বারওয়েল হেস্টিংসের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যারোনেসের প্রসঙ্গ নিয়ে লোকে আপনার সম্পর্কে যে কথা বলে তা কি সত্য?'

হেস্টিংস হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন। সামনের টেবিলের উপর হাত চাপড়ে বললেন, 'না, কখনও না; তারা মিথ্যা কথা বলে!'

বারওয়েল হেস্টিংসের এই উত্তরে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এ আমি জানি ওয়ারেন, তারা এখন সত্য-মিথ্যা বিচার করে না—তবে তাদের এই রকম বিশ্বাস।'

এই কথায় হেস্টিংস উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'তাদের নিজেদের ঘর নিজেরা সামলাক।'

বারওয়েল তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল সংযত করে বললেন, 'আমি দুঃখিত ওয়ারেন, তবে তারা যে-সব মেয়েমানুষ রাখে তারা সবই দেশী এবং অধিকাংশেরই জাতের ঠিক নেই। উপরন্তু তারা বাজারের বাইরে থাকে, শহরে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ মেলে না, আর আমাদের জাতের মেয়েদের কাছ থেকে তাদের সব সময় আলাদা করে রাখা হয়।'

হেস্টিংস শুনে বললেন, 'আমি স্পষ্টই বলছি বারওয়েল, তারা যা বলছে সবই মিথ্যে।'...

বারওয়েল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'মিথ্যে হোক, কিন্তু আপনি যা মনস্থ করেছেন,— জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের মঙ্গল, আপনার নিজের পৈতৃক বাস্তুভিটার পুনরুদ্ধার—এ সবই কি ঐ মেয়েটার জন্যে আপনি নষ্ট করতে চান?'

হেস্টিংস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন বারওয়েলের দিকে। বারওয়েল বললেন, 'হেস্টিংস, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আপনি মারিয়ানকে সরিয়ে দিন।'

'মারিয়ানকে সরিয়ে দেব!' হেস্টিংস কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হাঁ, তাকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিন।' বারওয়েল উত্তর দিলেন।

'মাদ্রাজ যেতে এক মাস সময় লাগে, দু'মাস লাগবে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে, যদি অবশ্য জাহাজ থাকে... না ডিক, আমি এ চিন্তা করতেও পারি না!' ধরা, ভারী গলায় বললেন হেস্টিংস।

'ওকে সরিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।' বারওয়েল আবার বললেন।

'না তা কখনই সম্ভব নয়!' হেস্টিংসের গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

বারওয়েল আর কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। তিনি শুধু মনে মনে একবার ভাবলেন যে, হেস্টিংসের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও গভীর ভালবাসার ক্ষেত্রে কিভাবে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। প্রেম অন্ধ।

এক মাস পরে শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে ফ্রান্সিস ফিলিপ কলকাতায় পদার্পণ করলেন। অল্পবয়স্ক যুবক, সুশ্রী, সুসজ্জিত, বলিষ্ঠ চেহারা। তিনি জাহাজ থেকে অবতরণ করেই চতুর্দিকে তাকালেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কোন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীই আসেন নি। তার কারণ কোন্ জাহাজে তিনি আসবেন এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সংবাদ কারু জানা ছিল না।

মাটিতে নেমেই একটি লোককে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গভর্ণর জেনারেল এখানে আসেন নি?' লোকটি তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, কই গভর্ণর জেনারলকে তো এখানে দেখছি না।'

'সদস্যদের মধ্যেও তো কারুকে দেখছি না—কি সুন্দর ব্যবস্থা!' ফ্রান্সিস বিরক্ত হয়ে বললেন।

একটি অল্পবয়স্ক যুবক এগিয়ে এল তাঁর কাছে, এসে বললে, 'আমি কি আপনার জন্যে একটা ফিটন্ গাড়ি নিয়ে আসব—আপনি কি গভর্ণর জেনারেলের কুঠিতে যাবেন?'

'না। তবে ফ্রান্সিস ফিলিপের থাকার জন্যে কোন বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, দয়া করে বরং সেই খবরটা একবার নেবার চেষ্টা করো।'

'এখুনি খবর নিচ্ছি।' লোকটি বললে।

—আর হেস্টিংসকে এ খবরও দিয়ো যে, ফ্রান্সিস ফিলিপস্ এসে পৌঁচেছেন, কিন্তু তাঁর অভ্যর্থনার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি—এটা ভদ্রতা নয়।'

ফ্রান্সিসের আগমন-বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হেস্টিংস ফ্রান্সিসের বাড়িতে গেলেন। তিনি দেখলেন, ফ্রান্সিস পেছনে হাত দিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বিরক্তিতে ভরা সেই মুখের কাছে এগিয়ে হেস্টিংস করমর্দনের জন্য হস্ত প্রসারিত করলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

ফ্রান্সিসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হেস্টিংস বললেন, 'আপনার আগমনের সংবাদ যদি আমরা পূর্বে জানতাম, তাহলে আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অবশ্যই আমরা জাহাজ-ঘাটায় যেতাম। অন্যান্য সদস্যরাও আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারলে খুশিই হতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন সংবাদই আমরা পূর্বে পাই নি।'

কিন্তু ফ্রান্সিসের রাগ তাতে কমল না, তিনি বললেন, 'হেস্টিংস দয়া করে আপনি এখানে না এসে যদি জাহাজ-ঘাটে যেতেন, তাহলে আমাকে এখানে একাকী কষ্ট করে আসতে হ'ত না।' এবং এই কথা বলেই তিনি পেছন ফিরে দেখলেন, তাঁর দরজার সামনে জেনারেল ক্লেভারিং ও মনসন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ফ্রান্সিস তাঁদের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন এবং হাসামুখে বললেন, 'আরে... কর্ণেল না জেনারেল ক্লেভারিং?' বলেই তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁদের দিকে।

'আমি জেনারেল ক্লেভারিং, আর ইনিই আমার সঙ্গে কর্ণেল মনসন।' ব'লে তাঁরা পরস্পরে করমর্দন করলেন।

হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, 'আপনি আমার জন্যে যে বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন তা আমি মোটেই পছন্দ করি না—স্থানীয় দৃশ্যটা মোটেই মনোরম নয়। আসবার সময় রাস্তায় আমি অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখেছি।'

'আপনার নিজের পছন্দমত বাড়ি পরিবর্তনের স্বাধীনতা আপনার আছে।' হেস্টিংস বললেন।

'বাড়ি পরিবর্তনের অধিকারকে স্বাধীনতা বলা যায় না।' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য সদস্যরা পুরাতন কেল্লার একটি বৃহৎ ঘরে উপাসনার জন্য জমায়েত হলেন। সেণ্ট অ্যানের গির্জাটি ধ্বংস হওয়ার পর থেকেই এই ঘরটি রবিবারের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হ'ত। ফ্রান্সিস নিজের আসন থেকে গভর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য সদস্যদের আশে-পাশে সুন্দরী, সুসজ্জিতা মহিলা ও ধনী বণিকদের হাবভাব দেখতে লাগলেন। ঠিক তাঁর পেছনেই একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা বসে ছিলেন। ফ্রান্সিস বার বার মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন। মহিলাটি আর কেউ নয়,

নেই রূপসী, লীলাময়ী, চটুল-চপল মারিয়ান।

গীর্জার কাজ শেষ হওয়ার পর, ফ্রান্সিস বাইরে যাবার সময় দরজার পাশে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর মারিয়ানকে লক্ষ্য করে যেন নিজের মনেই বললেন, 'এই গীর্জায় আমার কোন আকর্ষণ নেই—তার চেয়ে আমার মনে হয়, শহরের অন্যান্য আকর্ষণ অধিকতর মনোরম।'

থাকতে না পেরে, পাশ থেকে মারিয়ানও কথা বলে ফেললেন। বললেন, 'আমার স্বামী কার্ল এ বিষয়ে আপনাকে অনেক কিছু সংবাদ দিতে পারবেন।' কথা কটি কোন রকমে যেন উগ্‌রে দিয়েই মারিয়ান এগিয়ে চলে গেলেন।

হেস্টিংস মারিয়ানের সমস্ত গতি-বিধিই লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর সমস্ত মুখটা যেন অধিকতর রক্তিম হয়ে উঠল,—মনে হ'ল, কে যেন হঠাৎ তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্তরে যন্ত্রণাবোধ করলেও, মুখে তিনি এমন ভাব করলেন যেন কোন কিছুই ঘটেনি। শান্তভাবেই এগিয়ে চললেন কোন দিকে না তাকিয়ে—গীর্জা-প্রত্যাগত ধার্মিক ব্যক্তিদের ভঙ্গিমায়।

পরিষদের প্রথম দিনের সভা যেদিন বসল, সে দিনই ফ্রান্সিস হেস্টিংসকে বাধা দিলেন। মিড্‌লটনকে অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে বৃটিশ রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করবেন ব'লে হেস্টিংস প্রস্তাব করায় ফ্রান্সিস অসম্মতি জানালেন। এ ব্যাপারে ক্লেভারিং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি মনে করলেন তাঁরই কৌশল যেন সার্থক হতে চলেছে।

হেস্টিংস ভারতবর্ষের প্রধান শাসন-কর্তা হলেও, পরিষদের সংখ্যাধিক্য-স্বীকৃত কোন মতামতকে নাকচ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। উভয় পক্ষ সমান হলে, একমাত্র কাস্টিং ভোটই তিনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু ফ্রান্সিস ক্লেভারিং-এর গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ায় বিরোধীদলের স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য হ'ল।

হেস্টিংস ফ্রান্সিসের এই ব্যবহারে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন।

জেনারেল ক্লেভারিং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে—সবই ঘটেছে তাঁর এবং মনসনের ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, হেস্টিংসের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ অতঃপর পুনর্বার বিবেচনা করা হোক।'

ভোট গ্রহণ করা হ'ল। হেস্টিংস পরাজিত হলেন। যদিও তিনি প্রতিবাদ জানালেন এবং বললেন, 'এ সব করতে গেলে অনেক জরুরী কাজের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তাতে বিরোধী পক্ষের কেউই কর্ণপাত করলেন না।

তিনজন বিরোধী সদস্যের প্রত্যাবর্তনের পর বারওয়েল চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এ এক স্থায়ী অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল; আমাদের এখন আর কোন কিছুই করবার নেই।'

হেস্টিংস এতক্ষণ এক দৃষ্টে টেবিলের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'বারওয়েল, সারা ভারতে আজ যেন ঘোষণা করা হ'ল—হেস্টিংসের ক্ষমতার অবসান ঘটেছে, তার শাসনের যবনিকা পড়ে গেছে, এবং নতুন যে বাস্তিটি ভারতবর্ষে এসেছেন, এখন তাঁরই জয়-জয়কার।' হেস্টিংসের জীবনের পট পরিবর্তন হ'ল।

মারিয়ান এ সংবাদ শুনলেন। তিনি দেখলেন হেস্টিংসের মুখমণ্ডলে চিন্তার বলিরেখা—তিনি যেন কিছুই দেখছেন না, কিছুই বলছেন না। তাঁর মুখ বিবর্ণ, ঠোঁট দুটি যেন চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে।

মারিয়ান নতজানু হয়ে হেস্টিংসের পাশে এসে বসেন। তাঁর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হেস্টিংসের লম্বা লম্বা স্পর্শকাতর আঙুলগুলির উপর হাত বুলোতে থাকেন। সে এক করুণ দৃশ্য। হেস্টিংস ধীরে ধীরে মারিয়ানের মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এই জন্যেই কি আমি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলুম!' একটা অস্পষ্ট মৃদু হাসি তাঁর চোখের কোণে চকিতে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'আপনি কি পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন?' মারিয়ান প্রশ্ন করলেন।

দৃঢ়তার সঙ্গে হেস্টিংস জবাব দেন, না।' তারপর বলেন, 'আমি যদি করি তাহলে ওদের বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায়, ওরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে।'

মারিয়ান সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হেস্টিংস, তোমার দিন আবার আসবে।' হেস্টিংস মাথা নীচু করে মারিয়ানের হাতের আঙুলগুলি নিজের ঠোঁটের উপর চেপে ধরলেন।

অল্পকালের মধ্যেই ক্ষমতা পরিবর্তনের সংবাদ শহরের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। যেখানেই লোকজন জমায়েত হয়, তারা এই ক্ষমতা পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করে। ফ্রান্সিস ও তাঁর মিত্রবর্গ এই সংবাদ প্রচারের সুযোগ নষ্ট করলেন না। ফ্রান্সিস প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে লাগলেন যে, শীঘ্রই হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেলের আসন থেকে পদত্যাগ করবেন; কারণ তাঁর এখন আর করণীয় কিছুই নেই। ফলে, যে-সব লোক হেস্টিংসের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল, তারা এখন আর হেস্টিংসের কাছে যায় না—এমন কি তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপনও করে না। সংসারের এই স্বভাবসিদ্ধ চিরাচরিত নিয়ম এখানেও প্রকাশ পেল।

মহিলা মহলের ধারণা হ'ল, মারিয়ানের সংস্পর্শে আসার জন্যই হেস্টিংসের এই অধঃপতন। তাঁরা সকলেই প্রকাশ্যে তাঁর ভাষায় হেস্টিংসের আচরণের নিন্দা করতে লাগলেন। এক-মাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই এ ধরনের অশোভনীয় আচরণ সম্ভব। তাঁরা মারিয়ানকে 'ভ্রষ্টা' আখ্যা দিতেও কসুর করলেন না।

বারওয়েল তাঁর বন্ধু হেস্টিংসকে পুনর্বার অনুরোধ করলেন, 'মারিয়ানকে আপনি কিছু দিনের জন্যেও কোথাও পাঠিয়ে দিন।'

'মারিয়ানকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে আমার অবস্থার কি পরিবর্তন হবে?' হেস্টিংস জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাহলে অন্ততঃ মারিয়ানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধ করুন।' বারওয়েল বললেন। তিনি আরও বললেন, 'ওয়ারেন, আপনি একবার ভেবে দেখুন, আজ আপনার সবই নষ্ট হতে বসেছে—যে 'ডেলসফোর্ড' আপনার জীবনের স্বপ্ন, সেই বাস্তুভিটের কথা একবার ভেবে দেখুন।'

হেস্টিংস তাঁর পুরাতন বাস্তুবাটীর ছবির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বাড়িখানির সংস্কার সম্ভবতঃ এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। হেস্টিংস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এলো-মেলো বহু স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল। বারওয়েলের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস বললেন, 'মারিয়ানের এই অপমানের আমিও অংশীদার না হয়ে, তাকে কি একাকী, বান্ধবহীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে পরিত্যাগ করতে পারি?'

'না, আমি তা বলছি না।' বারওয়েল বললেন, 'তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে না দেখলে আমার বিশ্বাস ফ্রান্সিসেরও মনের পরিবর্তন হবে।'

CENTRAL LIBRARY

"স্বপ্নের যাদুকাঠির....."

ছবি: সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

র ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে একটির
র একটি আঙুল চুম্বন করলেন। লোকে থাকব না!' মারিয়ান বলেন
ারিয়ান তাঁর বিষণ্ণ মুখখানিকে কিন্তু আমার ভালবাসা!'
হস্টিংসের মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন।
ারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কিছুই
খা যাচ্ছে না। সেই গভীর অন্ধকারের
ধ্যে হেস্টিংস কেবলমাত্র মারিয়ানের
চোখের জলের স্পর্শ পেলেন।

'হে আমার প্রিয়,' মারিয়ান বললেন, তুমি আমার অন্তরতম—তুমি আমার অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে থাক,—এখন আর আমাদের কিছুই করবার নেই!'

'আমি এখন সব সময়ে একটা জিনিস ভাবছি মারিয়ান,' হেস্টিংস গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভারতবর্ষে এসে আমি একটি শিক্ষা লাভ করেছি, একটি সত্য উপলব্ধি করেছি, সে হচ্ছে 'ধৈর্য'। কালের পরিমাপ দিন গুনে বা সপ্তাহ মেপে হয় না —শতাব্দীর গর্ভে সে সত্য নিহিত আছে!'

স্বয়ংবৃতা

চাকরিটা পেল বটে বিপাশা, কিন্তু বেশ স্বস্তি অনুভব করছে না। মেয়ে শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের জায়গা, তার জন্যে বয়স জানতে চেয়েছে, ফটো পাঠাতে বলেছে, বিবাহিত কি অবিবাহিত—তাও জানাতে বলেছে। এইটেই কেমন বোধ হয়, তার ওপর আছে মাইনেটা। টাইপিস্টের পোস্ট, কি আর এমন, তার জন্যে আরম্ভই করছে নব্বই পঁচাত্তর টাকা দিয়ে পরে উঠবে চারশ পর্যন্ত।

চাকরিটা পেলে যেভাবে তাতেও মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করছে। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা নয়, কিছু নয়, একেবারে নিয়োগ পত্র, 'জরুরী' ছাপ মারা। যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়, এই ভয়।

অবশ্য, যা আশঙ্কা করছে তা ছাড়া অন্য কারণও হতে বাধা নেই। হয়তো স্বাস্থ্যবতী কর্মক্ষম টাইপিস্ট চায়, হয়তো অভিজ্ঞতায় দেখেছে বিবাহিতা হলে তার স্বামী-সংসার, ছেলেপুলে নিয়ে বাধের অনেক, কাজে ব্যাঘাত হয়। এ সবও সম্ভব, তবু কেমন যেন একটা হরিষে-বিষাদের ভাবই আসছে, চিঠিটা সকাল থেকে পকেটে পড়ে। কম্পানীর নামে কোথাও যেন কোনও কম্বেওলার; সেখানেও একটা অপরিচয়ের আশঙ্কা।

তবু নিজে, যা নিতে প্রস্তুত হওয়া ঠিক। বছর কয়েকের মধ্যে জীবনে হঠাৎ এতো বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে।

গ্রামের মেয়ে। বাবা কলকাতায় একটা সওদাগরি অফিসে মেসে থেকে কাজ করতেন, হঠাৎশেষে একদিনের জন্য বাড়ির অতিথি। বিপাশা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলে কলকাতায় একটা কলেজে ভর্তি করে দিলেন হোস্টেলে থেকে আই-এ পড়তে লাগল। বেশ চলছিল, তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ছুটি-ছাটার ওপর যে কটা মাস মাইনে পাওয়া গেল, তার জেরে পাসটা করে ফেলল বিপাশা। তার পরই ছাত্রী থেকে একেবারে গৃহী-সংসারীর পর্যায়ে উঠে পড়ল। বাড়িতে মা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, দুটি ভাই স্কুলে পড়ছে, একটি আগামী বৎসর স্কুল ফাইনাল দেবে, উপার্জন এক পয়সা নেই।

হোস্টেল সুপার রেবাদিদির সহায়তায় একটা গার্লস স্কুলে নীচের দিকে সেক্রেটারির কাজ জুটিয়ে নিল। ক্রমে দুটি টুইশনিও। অনেকটা সামলে আনছিল, এই সময় রে বা দি দি একটা মফঃস্বল স্কুলে ভালো কাজ পেয়ে চলে যাওয়ায় আবার একটা সংকট উপস্থিত হোল।

অনেক খুঁজে পেতে মেয়ে হোস্টেল একটা পেল বিপাশা। চার্জ বেশি, আরও টুইশনি না জোগাড় করতে পারলে বাড়ি—কলকাতা দুদিক সামলানো যাবে না, কিন্তু একটা বড় সুবিধা হোল, জীবনের একটা বড় দিক-চক্রবাল খুলে গেল বিপাশার দৃষ্টির সামনে। গুটি দশ মেয়ে একটি ছোট পার্কের সামনে মেস করে রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটি স্কুল-কলেজের ছাত্রী, বড় বোনের সঙ্গে থেকে পড়ে, বাকি সবাই অন্য স্তরের। দুটি নার্স, একটি মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, বাকি সবাই চাকরে, রেলে আছে, গভর্ণমেণ্টে আছে। দিন কতক দুদিক সামলাতে বেশ বেগ পেতে হোল, কিন্তু সবাইকে দেখে শুনে মনে আশা জাগল, বেশ সাহস বাড়ল। এক সময় বেটা বড় খারাপ বোধ হোত, বেশি বয়সে অপেক্ষাকৃত নীচু ক্লাসের ছাত্রী হয়ে থাকা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলেই সেটা হয়েছিল। সেটাও এ পরিবেশে বেশ মানানসই-ই হয়ে গেল। বিপাশা এখানে জন-চারেকের বিপু দিদি, জন-তিনেকের সমবয়সী। সুন্দরী সে বেশই সেটা চাকরির ইতিহাস থেকেই টের পাওয়া যায়। এর ওপর আর একটা যে গুণ ছিল, চাপে প'ড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেটাও আবার স্ফুর্ত হয়ে উঠল আস্তে আস্তে মেলা-মেশার সঙ্গে; বড় আমুদে মেয়ে বিপাশা, একটু হৈ-চৈ, হাসিখুশী নিয়ে থাকতে, জীবনটা হাল্কাভাবে নিতেই ভালোবাসে। হোস্টেলে সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। বেশ চলল। জীবনের সঙ্গে ব্যাপকতর পরিচয়। সঙ্গিনীরা মেডিকেলে পড়ছে, রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করছে; নিজেরও পা বাড়াতে ইচ্ছা হয়।

রাইটার্স বিল্ডিঙের নন্দিতা দিদিই ওকে পরামর্শ দিল—'তুমি শর্টহ্যাণ্ড টাইপটা শিখে নাও।' স্কুলে ভর্তি হয়ে ভালোভাবেই শিখে ফেলল বিপাশা। তারপর এই চাকরিটাও পেয়ে গেছে; স্কুলের পরশটি থেকে একেবারে দু'শ পঁচাত্তর।

হরিষে-বিষাদ। হর্ষের যেটুকু বা ছিল, গ্রহণের বলয়গ্রাসের মতো বিষাদ তার প্রায় সমস্তটুকুই গ্রাস করে ফেলেছে। সকালের স্কুল-কলেজ, অফিসের ব্যস্ততার মধ্যে সবার মুখেই প্রশ্ন—'বিপু দিদির আজ মুখটা এমন ভার ভার কেন?..... গাঁয়ের খবর ভালো তো বিপাশা, বাবা ভালো আছেন তো?.....স্কুলে কিছু হয়নি তো? প্রাইভেট স্কুল, হলেই হোল।'

মেডিকেলের ছাত্রী সমবয়সী মনীষা বলে,—'সিক্সথ চেল করছে বিপা। বলিস তো একটা ওষুধ লিখে দি, কিনে নে গিয়ে।'

একে একে সবাই চলে গেল। হস্টেল খালি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনিশ্চিতভাবে বসেই রইল বিপাশা নিজের ঘরে। অনেক ইতস্তত করল, শেষ পর্যন্ত একটা চিন্তাই ওর সব সংশয় কাটিয়ে ওকে সংকল্পে দৃঢ় করে তুলল। যারা ভালোর দিকে, দুদিন আগে চিঠি পেয়েছে, তাকে বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তারে। এখন সমর্থ নয়, তবে আশা করছেন মাস খানেকের মধ্যে হয়ে উঠবেন যাত্রার উপযোগী।

একটা উৎসাহ এসে গেছে। পারতে হবে, ছায়াকে ভয় করলে চলবে না, এগিয়ে দেখতে হবে কায়াটা আসলে কি। যে বাপ-মায়ের ছেলে নেই উপযুক্ত, তাব মেয়েকে হতে হবে ছেলে। এ যুগ সেটা সম্ভব করেছে।

কুলুঙ্গিতে একটি কালীঘাটের কালীর পট থাকে, পায়ের কাছে দুটো ক'রে ফুল রেখে দেয় রোজ, কোথাও বেরুলেই সামনে একটু দাঁড়িয়ে যায়।

আজ দাঁড়াতে গিয়ে একঠায় অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল বিপাশা।

ভাবছে। তারপর স্থির করেই ফেলল। কালীঘাটটা একবার ঘুরেই যাবে, ভালো-মন্দর দায়িত্বটা আর নিজের ওপর নিয়ে উঠতে পারছে না। অনেকটা ঘুর-পথ হয়ে যাবে, দেরি হয়ে যাবে; তা যাক। চাকরিটা যদি তাইতেই না হয় তো বুঝবে হওয়ার ছিল না।

বেরিয়ে পড়ল বিপাশা।

সন্ধ্যায় সময় হোস্টেলে ফিরল যে, তাও কালীঘাট হ'য়েই। গাটা একটু ছমছম করছে, তবু তারই মধ্যে বাসার কাছে যতই এগুচ্ছে মুখে একটা কৌতুকের ভাবই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

উঠানে পা দিতেই প্রথমে সদুর সঙ্গে দেখা হোল। হোস্টেলে সবার ছোট স্কুলের ছাত্রী।

'এই যে বিপু-দি, আজ এত.....'

তারপরই থমকে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত প্রশ্ন করল—'কে আপনি?

'আমি বিপাশার দিদি।'—উত্তরটা প্রস্তুতই ছিল বিপাশার, প্রশ্ন করল—'আছে সে বাড়িতে?'

সদু উত্তর না দিয়ে দুড়দুড় ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বিপাশা চাপা গলার আওয়াজ শুনল—'ও মেজদি, বিপুদির দিদি এসেছেন! দাঁড়িয়ে আছেন নীচে!'

কমলা হোস্টেলের সবচেয়ে সিনিয়ার মেম্বার, সদুদের মেজদিদি থেকে আরও সবারই। 'বিপুর দিদি! কৈ বলে নি তো কখনও!'

—একটু নীচু গলায় বলতে বলতেই বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল,—'নীচে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে আসুন। বিপু এখনও ফেরেনি।'

বিপাশা গিয়ে সামনে দাঁড়াতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে আরম্ভ করেছিল—'আপনি বিপুর.....'

'পোড়া কপাল! দিদি পাব কোথায়?'—হেসেই উঠল বিপাশা।

আরও অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কমলা বলল,—'মরণ! তা রঙ্গ করবারও তো একটা সীমা থাকবে?.....কপালে সিঁদুর কেন—'

'বিয়ে হলে সিঁদুর থাকবে না? হিঁদুর মেয়ে...'

'বিয়ে!!'

—আর সবাই মুখবাক হয়েই দাঁড়িয়েছিল, কমলার সঙ্গে চিৎকার করেই উঠল একরকম। কমলা বলল,—'তুই বলা নেই কওয়া নেই—খামোকা বিয়ে করলি কোথায়।'

প্রশ্নের বান ছুটল। মনীষা বলল,—'তা বর কৈ?'

'থামো, এতগুলো সোঁদা মেয়ের মধ্যে নিয়ে আসি তাকে!

'তা ইস্কুলে.....'

'তাই তো ছেড়ে দিলাম স্কুল। মাগীর দল, লোকে যে দেখে-শুনে একটা বিয়ে করবে..... তা একি অবিচার! বিয়ের কনে, একটু যে ডেকে বসিয়ে আদর অভ্যর্থনা করবে.....'

কমলাই বলল,—'ভেতরে আয়। সদুকে বলল,—'ঠাকুরকে শীগ্গির চা করে দিয়ে যেতে বল আগে, দুখীরাম গিয়ে খাবার নিয়ে আসুক—নোন্তা, মিষ্টি মিলিয়ে টাকা খানেকের.....'

'আমরা হাঁ করে দেখি।' একটু আড়ালে মুখ ঘুরিয়ে ছায়া বলল, মনীষা নাকি সুরেই অনুযোগ করল—'একে তো বিয়েও হোল না!'

একটা হাঁসি উঠে আসরটা জমে উঠল। কমলা ড্রয়ার খুলে মাথা ঘুরিয়ে আন্দাজ করে নিয়ে তিনটে টাকা বের করে হাতে

গাছের ছায়া

ফটো : সংগ্রহ থেকে

ফটো : অমিত সাহা

ফটো : [illegible]

ফটো : [illegible]

ফটো : [illegible]

ফটো : [illegible]

ফটো : [illegible]

ফটো : [illegible]

না, ভাবলাম—যেতে-যেতে মাথাটা আগে একটু পরিষ্কার ক'রে নি।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় আফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। ভাড়া চুকিয়ে লিফ্‌টে করে চারতলায় উঠে গেলাম।"

"কপালে ঐ এক ধ্যাবড়া সিঁদুর নিয়ে!"—মনীষা চোখ বড় বড় ক'রে প্রশ্ন করল।

"এক ধ্যাবড়া আর কোথায়, এ্যাঁ কমলাদি'?" সাক্ষী মানল বিপাশা। "ট্যাক্সিতে ব'সে আড়্‌লে রুমাল জড়িয়ে আমি ততক্ষণে দিব্যি মানানসই করে নিয়েছি তো। একেবারে মিহি, আধুনিক, আছে—কি-না আছে সে আর ইচ্ছে ক'রে করলাম না। একটা মংলব ততক্ষণে এঁটে ফেলেছি তো।"

"মতলবটা শুনতে পাই না?"—মনীষাই প্রশ্ন করল।

"একটা প্রোকেট্‌শ্‌ন্‌ তো।"

—কমলাই বলল, বাধা দেওয়ার জন্য একটু ধমকের টোনেই। বিপাশাকে বলল—"হ্যাঁ, তারপর?"

"জায়গাটা লোয়ার চিৎপুরের পেছন দিকটায়। একদিকে বৌবাজারের বাঙালী পাড়া, একদিকে চিনে-পট্টি, ইম্‌প্রুভমেণ্ট ষ্ট্রীস্টে জায়গাটা পরিষ্কার করছে, নতুন প্যাটার্ণের উঁচু উঁচু বাড়ি সব উঠছে এখানে-ওখানে। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে একটা করিডোর দিয়ে আফিসটার সামনে এলাম। আমাদের আফিসে বার করেক গিয়ে একটা আন্দাজ হয়ে গেছে তো, গা'টা একটু যে ছমছমে করছে না, এমন নয়, তবু সহজভাবেই ঢুকে গেলাম। একটা বেশ বড় হলঘর, তাইতেই আফিস, অনেকগুলো লোক—নিজের নিজের টেবিলে কাজ করছে....."

"ঘেমে ঘেমেও যাচ্ছে তাদের হাত..."—মনীষা কথাটা ব'লে মুচকি হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল একটু। বিপাশা অনুযোগ করল—"দ্যাখো কমলাদি'! না, আমি বন্ধ করলাম!..... বেশ হোল, চা-খাবারও এসে গেছে।"

নিজের নিজের প্লেট আর চায়ের কাপ-পিরিচ গুছিয়ে নিতে একটু যে বিরতি এসে গেল তাতে মন্তব্য উঠল কিছু কিছু—

"সত্যিই বড় একটা রিস্‌ক্‌ নিয়েছ কিন্তু বিপু, বেশ, বলো, সবটা শুনি আগে।..... ভয় নেই, দেখো তোমরা, ও মা-কালীই ছিলেন নিশ্চয়।.....সাহস আছে তোর বিপা, আমার তো শুনেই হিমির মতো হয়েছে।.....ইস্‌! ভীমি যাবে! আজকালকার যুগে। তুমি ঢুকেছ। এবার আমায় টেনে নিও বিপাদি, আমি একবারে হলের মাঝ-খানটায় গিয়ে ব'সে হাঁক দোব—'কোই হ্যায়!"

—শেষেরটা চম্পার। মোটা শরীর, একটু নড়লেও এমন ক'রে থিয়েটারি ঢঙে বুক চিতিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, একটা হাসির হর-রা উঠে গেল। নন্দিতা চারে চুমুক দিয়ে বলল,—"মরণ!"

কমলা বলল—"তুই বল্‌ বিপু, চুপ করো সবাই।"

"সবাই টেবিলে যে-যার কাজ করছিল"—একবার বক্র দৃষ্টিতে চাইল বিপাশা মনীষার দিকে, বলল—"কার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, কার চালু রইল, অত গ্রাহ্য না করে আমি গটগট করে টেবিলের সামনে গিয়ে বললাম—"আমি মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব।"

'কি দরকার?'

চিঠিটা বের করেই রেখেছিলাম, বললাম—'এই এপয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা তাঁর আফিস থেকে পেয়েছি।'

মিথ্যে বলব না, লোকটা একবার চাইল আমার কপালের দিকে, একটু যেন বলতেই যাচ্ছিল কি, সামলে নিয়ে একটা আর্দালীকে ডেকে তার হাতে একটা স্লিপ্‌ দিয়ে বলল—'চেম্বার-মে।'

আমায় বলল—'আপনি যান ওর সঙ্গে।'

হলের এক পাশে কাঠের একটা মাঝারি গোছের চেম্বার। লোকটা এগিয়েই গিয়েছিল একটু, আমি পৌঁছ-বার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বেশ খাতির ক'রেই সেলাম দিয়ে বলল—'অন্দর যাইয়ে।'

মাঝামাঝি একটা স্প্রিঙের কপাট, ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি..."

"ভক্‌ চড়কগাছ!"—মন্তব্যটা ক'রে হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মনীষা। বিপাশা বলল—"তা সত্যি বলছি কমলাদি', সিনেমা বলো, থিয়েটার বলো, অমন মুখের ভাব আমি আর কোনখানেই দেখিনি—এত আশ্চর্য হয়ে গেছে...আর

"আর এত নিরাশ!"

—মনীষাই আবার বিপাশা আবার অনুযোগ করতে কমলা বলল—"নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস মণি!"

"বাঃ, আর সে-বেচারির দুঃখ কেউ বুঝবে না!"—এবার মাথায় একটা বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে মনীষা বলে উঠতে আবার একটা হাসির দমক উঠল। বাদ গেল না বিপাশাও। তার মাঝেই—"আঃ, শোনই না!" বলে আরম্ভ করল—

"বেশ মোটা-সোটা, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, মুখে ফ্রেণ্চকাট দাড়ি—পাক ধ'রেছে দাড়ি-গোঁফে, গায়ে খদ্দরের লম্বা পার্শি কোট। হ্যাঁ, শৌখীন বৈকি; বেশ ছিমছাম, বুক-পকেট থেকে একটা নীল রুমালের কোণ বেড়িয়ে রয়েছে। একটা হাল্কা গন্ধও রয়েছে ঘরটাতে। ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানে; সেটা আমি সোজা বলে যাচ্ছি। একটু যেন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে—

'আপনি?'

চিঠিটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম—'এই লেটার অফ্‌ এাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট পেয়েছি আপনার আজ।'

চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে চোখ তুলে বললে—'কিন্তু আপনি তো বিবাহিত, আমি কুমারী টাইপিস্ট চেয়েছিলাম।'

বললাম—'একরকম কুমারীই, তাই দরখাস্ত করেছিলাম।'

'তার মানে?'

'কোর্টে রেজেস্টারি করে বিয়ে। আমরা বাঙালীরা ওটাকে তো বিয়ের মধ্যে ঠিকমতো ধরি না।'

"কী ধড়িবাজ মেয়ে বাবা!"—ছায়া মুখটা গোল করে বলে উঠল। মনীষা বলল—"আহা, পেঁচিয়ে কাটা বেচারিকে!" ক্ষণে আশা ক্ষণে নিরাশা?

বিপাশা ঠোঁটে একটু হাসি টিপে নিয়ে বলল—"একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং-প্যাডের ওপর তারমুখটা টিপে ঘোরাল একটু, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—"কিন্তু আপনার কপালে সিঁদুর রয়েছে তো।"

বললাম—'ওটা একটা প্রসাধন মাত্র, পাকা বিবাহের মূল্য নেই ওতে।'

হাঁ করে চেয়ে রইল একটু.....

মনীষা বলল—"বোধ হয় রুজ-লিপস্টিক্‌ খুঁজছিল বেচারি।"

"নাঃ, আমি এই ছেড়ে দিলাম কমলাদি'।" —টেবিলে হাতদুটা একবার আছড়ে ফেলে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে বসল বিপাশা। ছায়া বলল—"থাক্‌ ওসব, আমি জিজ্ঞেস করছি—তোমার একটুও ভয় করছিল না বিপা, আশ্চর্য!"

"না, ভয় কি আর করছিল! তা, বলতে দেবে তবে তো।"

নন্দিতা বলল—"তোরও যে অন্যায় রাগ বাছা। বিয়ে করে এলি, বাসর জাগতে পারল না কেউ বর-কনে নিয়ে; দুটো কথা বলেও সাধ মেটাবে না?"

বিপাশা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল, ওরা একেবারে হকচকিয়ে গেছে, বলল—"যেও না, যেও বরের সঙ্গে বাসর জাগতে, কার কত বুকের পাটা দেখব একবার....."

বলতে বলতেই হাতের আঁচলায় মুখ ঢেকে হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

কমলা বলল—"দ্যাখো কী জ্বালা! নিজের কথায় নিজেই হেসে লুটি-কুটি—কি ব্যাপার বলবি তো?"

হাসিতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। মুছে নিয়ে একটু গুছিয়ে বসে আবার আরম্ভ করল বিপাশা—হাসিটা খুক্ খুক্ করে বেরিয়েই পড়ছে মাঝে মাঝে—

"বলে—ভয় করবে না! ভয়ে পা দুটো কাঁপছে জুতোর মধ্যে, বোধ হয় পড়েই যাই, এই সময় তো ব্যাপারটা হোল। একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করছে—'তা, আপনার হাজ্‌ব্যাণ্ড কে? কোথায় থাকেন তিনি?'.....সত্যি কথা বলতে কি, একেবারে ধাঁধায় পড়ে গেছি, অতটা তো ঠিক করা ছিল না। ধাঁধায় পড়েই এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাতে—যেন লজ্জায়ই বলতে চাইছি না—হাজ্‌ব্যাণ্ডের ওপর নজর পড়ে গল.....উফ্! সে সে....."

এবার হেসে একেবারে উল্টে পড়ল বিপাশা। সামলাতেও দেরি হোল, তার ওপর হাসির মধ্যেই ভেঙে ভেঙে বলে চলল—"জানলার মধ্যে দিয়ে চোখ পড়ে গেল কমলাদি' নীচে, দুশো গজ দূরে একটা বক্সিং boxing শেখবার আখড়া—দুজনে ঘুষোঘুষি করছে—জন ছয়েক চারিদিকে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা করছে বক্সিং হাতে গান্দা গান্দা বক্সিং গ্লভ boxing glove পরা—একজন ছেলে-মানুষই। যাকে দেখিয়ে দিলাম হাজ্‌ব্যাণ্ড বলে, নিশ্চয় বক্সিং মাস্টার—দুষমন কালো—গাঁট্টা-গোঁট্টা—এই বুকের ছাতি—এই হাতের মাস্‌ল—ঘামে চক্‌চক্ করছে—শেখাচ্ছেই, তবু অত দূর থেকেও মনে হচ্ছে চোখ দুটো যেন জ্বলছে—মাঝে মাঝে হুম্ হুম্ শব্দও আসছে ভেসে—ফটাস ফটাস করে এক-একটা ঘুষির আওয়াজও। মিস্টার চুড়িওয়ালা?—সে যা মুখের চেহারা, ফটো তুলে বাঁধিয়ে রাখবার মতন—আমি দেখিয়ে দিতে সেই যে নজর গেছে ওদিকে, আর ঘাড় ফেরাতে পারছে না... উফ্!—উফ্! বাবাগো!"

হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়, সেই সঙ্গে—"বলিস কিরে! তাকে নিজের সোয়ামী ব'লে চালিয়ে দিলি!..... একটু

নতুন জীবনের নতুন প্রয়োজন

পূরণ করতে নবজাতকের জননীকে পুষ্টিকর টনিকের ওপর নির্ভর করতে হয়।
সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ
ভাইনো-মল্ট
ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, হজমক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনে

ভাইনো-মল্ট

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং, লিঃ

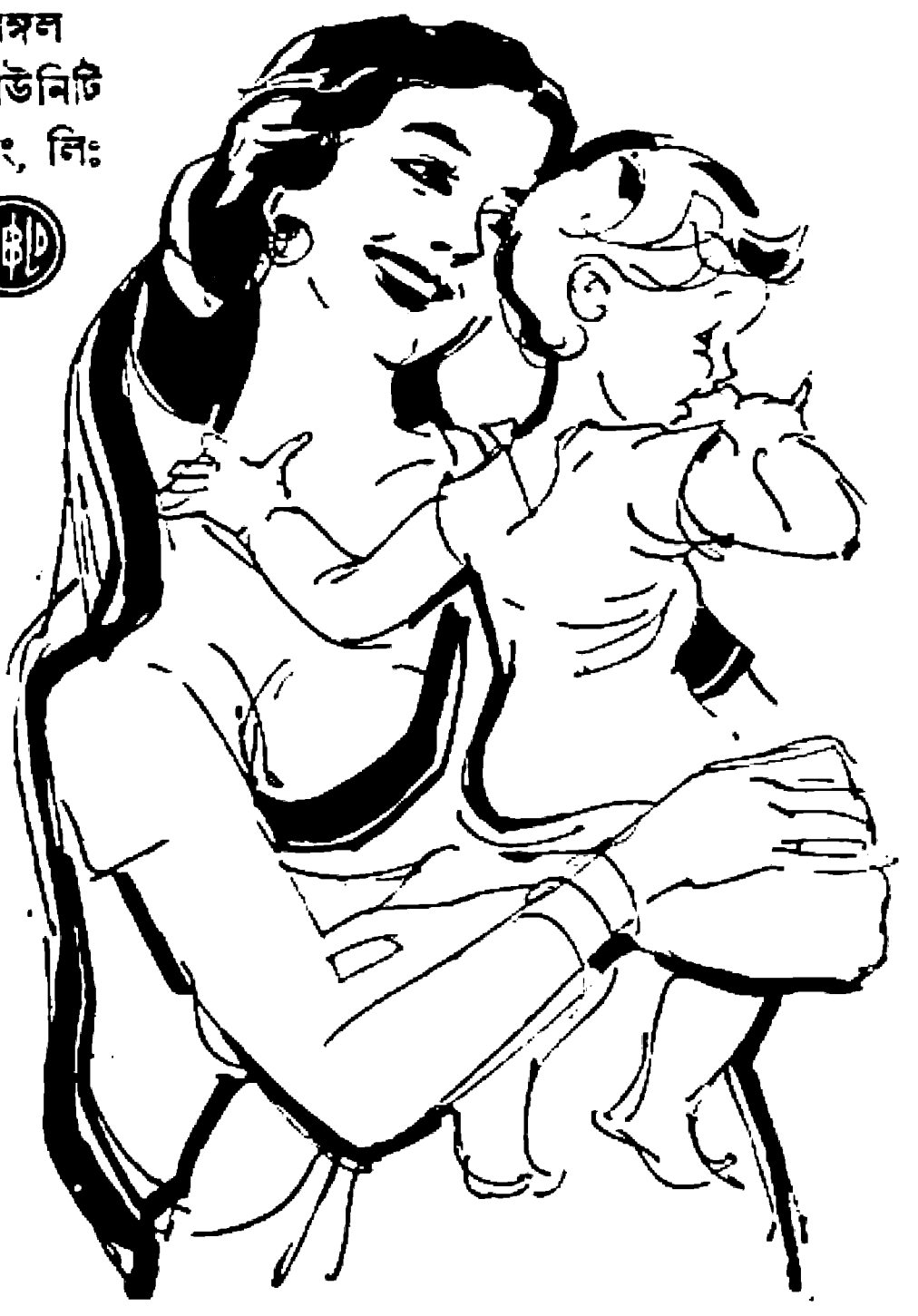

বাহল না তোমার বিপদটা..... এক উল্কট স্বভাবের বাবা। এই কিচেনেম হের পেটে পেটে!...তারপর?....."

"তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রথম কথা—'আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।...তা, কি করেন আপনার স্বামী?'...

বললাম—'ওই বক্সিং লেখান, আর ছোরাছুরি, সেটা ঘরের মধ্যে। জন

"সবটাই তো গোপনীয় স্যার, এমন কি চারজনেক সাকরেদ আছে, তাইতেই চলে যায়, আর...'

—যেন সামলে নিয়েই চুপ করে গেলাম। জিজ্ঞেস করলে—'হ্যাঁ বলুন, আর কি বলছিলেন।'

—ততক্ষণে বেল বুদ্ধিও খুলে এসেছে। বললাম—'সবটাই তো গোপনীয় স্যার, এমন কি আমি যে ওঁর স্ত্রী এ-কথাটাও। আপনি চাকরি দিচ্ছেন, না বললেই নয়, তাই—'

বললে—'আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, এর একটা কথাও বেরুবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।...আচ্ছা, আপনি না হয় নাই করলেন চাকরি.....'

সরিয়ে দিতে চায় তার কি। কিন্তু বললাম না —এখন বুদ্ধি বেশ খুলে আমি যে ওঁর স্ত্রী এ-কথাটাও।" গেছে আমার, জিজ্ঞেস করলাম—'দিতে চান না কাজটা? তাহলে গিয়ে বলি, উনিই পাঠালেন তো।'

জিজ্ঞেস করলে—'চটে যাবেন?'

বললাম—'চটা—তা চটে যদি যান তো নেহাৎ তেমন কারণ না ঘটলে অসন্তুষ্ট করেন না কখনও। এক সেই কালকাটা রায়টের সময় যা.....'

আবার যেন বলতে গিয়ে সামলে নিলাম, এইভাবে থেমে যেতে একেবারে ব্যস্ত হয়ে মুখটা এগিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ, রায়টের সময়—কি বলতে যাচ্ছিলেন?'

বললাম—'সে আরও গোপনীয়, স্যার, তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই—রায়টের সময় কিছু হাত ময়লা করতে হয়েছিল—উনি একলা শেষ করেছিলেন একুশজন—ছোরা, ঘুষি—তারপর সাকরেদরা আরও—'

'একুশ!! একলা!...'—সে যা এক চিৎকার স্থান কাল পাত্র ভুলে।...

আবার একচোট ফুকরে হেসে উঠল বিপাশা, বলল—'নাঃ, পারছি না কমলাদি, পেটে ব্যথা ধরে গেল। মোটামুটি এই ব্যাপার—মেটে কথা চাকরি পাকা—দেখলামও তো খাতিরের বহর, কবার ডাকলেও ডিকটেশন দেওয়ার জন্যে। লেখায়, আর ঘুরে ঘুরে জানলার বাইরে চায়। তবে কে ও কুদৃষ্টির নীচে বসে কাজ করবে বলো কমলাদি? মাস পাঁচ ছয় কোন রকম করে চালিয়ে নেওয়া—বাবাকে একবার চোখ থেকে ঘুরিয়ে আনা পর্যন্ত। তারপর বাবা এসে কাজে জয়েন করলেই শর্মা আবার কলেজে। এই কটা মাস কোন বাধাবিঘ্ন যদি না হয়...'

কমলা অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"হবে না কিছু।"

দিন পাঁচেক পরের কথা। কমলা গিয়ে মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করল, বিপাশাকে তার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে। নমস্কার করে বলল—"আপনার স্টেনোর স্বামীর বোন আমি। দাদা বলে পাঠালেন—তিনি ওকে চাকরি দেওয়ার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। শুনেছেন একটা আলাদা চেম্বারও করে দিয়েছেন ওর জন্যে আপনি। আমায় ধন্যবাদ জানাতে পাঠালেন। হ্যাঁ, একটা অনুরোধ করলেন, কথাটা যেন একেবারেই গোপন থাকে। রাগী মানুষ, নৈলে হয়তো "

ঐ পর্যন্তই ছেড়ে দিল। মিস্টার চুড়িওয়ালা যেন অভ্যাসবশেই একবার বক্সিং-রিংটার দিকে চাইল।

খানিকটা অন্তরঙ্গ আলাপ করে চা-টোস্ট খেয়ে উঠে এল কমলা।

CENTRAL LIBRARY

শাহ আলমের তাবিজ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

টুরিস্ট-দের মৌশুম সুরু হবার আগে-ই ধরনী একবার করে বুড়ো নিকোলাস-এর কিউরিও শপে যায়। ধর্মতলার পেছনের অনেক সরু গলি, অনেক সোজা রাস্তা, অনেক শুঁড়িখানা, শুঁটকি মাছের দোকান, আর্মেনিয়ান, ইহুদী, চীনে, গ্রীক—নানা জাতের মানুষের জংগলের মধ্যে নিকোলাসের কিউরিও-র দোকান। সরু গলিটাতে ঢুকে, ছাই রঙের মস্ত ব্যারাক বাড়ীটার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এখানে নানা জীবন থেকে ছিটকে পড়া, নানা জাতের মানুষের বিচিত্র পেশা ও নেশার একটা জগৎ আছে। মাসে একবার পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়ায়। জুয়া, বে-আইনী মদ চোলাই, অবৈধ ব্যবসা, দুটো-একটা ছোরা-ছুরি জখমের কেস যখন যা পায় তুলে নিয়ে চলে যায়। দুপুর বেলাটা সব চুপচাপ। ফর্সা রঙ, নোংরা হাত পা, কটা চুল, পানসে চোখের বাচ্চাগুলো পাথর বাঁধানো ফুটপাথে খেলা করে। মেয়েরা ঝগড়া করে। রাস্তার ওপর শুঁটকি মাছ শুকোয়। একটা বুড়ো বসে কাগজের ফুল বানাবার জন্যে কাঁচি দিয়ে রঙীন কাগজ কাটে, তার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হয়।

একেবারে অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একতলার প্যাসেজ থেকে দুটো সিঁড়ি নেমে নিকোলাসের দোকান। সরু সিঁড়িটা দিয়ে নামবার সময় একটা নিশ্বাস আটকে আসবার ভয় হয়। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই ঘরটার উচ্চতা, প্রশস্ততা, ধরনীকে প্রত্যেকবারই বিস্মিত করে। মাথার ওপর ঘি রঙের চীনে ড্রাগনটার মুখ থেকে বাল্বটা আলো ছড়ায়। শেল্ফে, আলমারীতে অজস্র মূর্তি, বাসন, রুপো ও তামার গহনা, ফুলদানী। মেঝের কার্পেটটা সবুজ। টেবিলের রেক্সিনটা সবুজ। টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে বুড়ো নিকোলাস চোখে চশমা লাগিয়ে সামর লেদারের টুকরো দিয়ে কোন একটা আশ্চর্য, দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পরিষ্কার করে। ধরনী বলে,

—ওটা কি ক্লাইভের দোয়াতদানী?

ছোটখাটো, ছিমছাম মানুষটি নিকোলাস। কানের লোমগুলো কোঁকড়া। আঙুলের গাঁটে গাঁটে লোম। ছাইরঙের কর্ডের প্যান্ট গ্যালিস দিয়ে পরা। সিল্কের সার্টের কলার খোলা। গলায় একটা রুপোর তাবিজ। চশমাটা নামিয়ে নিকোলাস একটু বেদনাতুরা দৃষ্টিতে তাকায়। ধরনী তাকে ঠাট্টা করছে, ভাবতে তার কষ্ট হয়। তারপর, হাতের জিনিষটা সযত্নে নামিয়ে রেখে সে বলে,—

—না। হেনরী লরেন্সের ওষুধের গ্লাস। কোন্ সাল বেন? হ্যাঁ আঠার শ' সাতান্ন। লরেন্স-এর সংগে লুকিয়ে যে মুসলমান হাকিম দেখা করতে এসেছিল, আসলে সে ছিল তুর্কীর পাশা-র গুপ্তচর, যাকে বাহাদুর শাহ ফর্মাণ দিয়েছিল..... ...

আর ধরনীর মনে হয়, সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গল্পের জাদুকরের সংগে কথা বলছে। এমনি করে তার কথায় ভুলবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে-ই সে নিকোলাস-এর দোকানে বিদেশী টুরিস্টদের নিয়ে ঢুকেছে। এর সমস্তটা বানানো, সমস্তটা একটা উচ্চস্তরের সেল্সম্যানশিপ, তা জেনে-ও এই বুড়ো গ্রীক-এর দোকান থেকে টুরিস্টরা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ডুয়েল লড়বার পিস্তল, বার্নিয়ার-এর চামড়ার ঝোলা, ট্যাভার্নিয়ার-এর নসিদানী, আকবরের আলবোলার নল, শিবাজীকে যে মদ সরবরাহ করতো তার নিজের ব্রান্ডি খাবার জাগ, মিউটিনির খবরে লর্ড ক্যানিঙ-এর মাথা গরম হলে, সেই মাথা ঠান্ডা করবার গোলাপজলের শিশি, থ্যাকারের ছোটবেলার ছাতা, অবিশ্বাস্য সস্তা দামে কিনেছে।

ধরনীর কাছে নিকোলাস নিজে-ই একটা অদ্ভুত আকর্ষণের চরিত্র। গল্প বলার কায়দাকে আয়ত্ত করবার জন্যে, সে বসে বসে নানারকম বই পড়ে। এ দেশে দুই পুরুষের বাস। ঝরঝরে বাংলা বলতে পারে। তা ছাড়া, ধরনী দেখেছে নিকোলাসের একটা সহৃদয়তা আছে। সে বুঝেছে, যারা এই সব সীসে, তামা, কাঁচের টুকিটাকি কিনছে, তারা তার গল্পবলার কায়দাটুকুর-ই নাম দিছে। সে নিজেই ধরনীকে বলেছে—'Old man Nicholas all over World Many City many Nicholas. All know. No pretention.'

ধরনী যখন গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যান্ড বা ফিরপোর লবি-তে এই সব গল্প করেছে, কোন কোন টুরিস্ট-এর ভাল লেগেছে। টুরিস্ট-রা শীতকালে ভারত দর্শন করতে আসে। রিয়াল ইন্ডিয়া বলতে যা বোঝায় কলকাতায় তার কিছু নেই। বেনারসের মতো শ্মশান, বা গঙ্গার ঘাট নেই, হরিদ্বারের মতো সাধু-সন্ন্যাসী, আগ্রা দিল্লীর মতো ধ্বংস-স্তূপ, মথুরার মতো ডিভাইন টেম্পল নেই।

ধরনী যখন নিকোলাসের মতো, নিকোলাসের ভংগীতে, কলকাতার ইতিহাস, নবাবী আমলের শেষ আর কোম্পানী রাজত্বের প্রথম দিনের আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য রূপকথা বলেছে, তারা আকৃষ্ট হয়েছে।

তাদের ধরনী নিকোলাসের দোকানে এনেছে। আর, নানা বই, নানা গল্প কাহিনীর খাজাঞ্চি নিকোলাস বারবার-ই তাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। একবার, একই টুরিস্ট সীজনে, তিনজনের কাছে হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বীর একমাত্র পিস্তল বিক্রী করে সে মুস্কিলে পড়েছিল। সে রকম ভুল নিকোলাস বারবার করে না। বয়স হবার সংগে সংগে সন তারিখটা একটু গোলমাল হয়ে যায়। অ্যামেরিকানরা 'মুভিল মিনিয়েচার' পছন্দ

করবে, ইংরেজরা 'কোম্পানী রেজিম'-এর স্মৃতিচিহ্ন। সে বিষয়ে কিন্তু ভুল হয় না। নিকোলাস ধরনীর একটা আবিষ্কার।

নিকোলাস নিজেই যখন ধরনীকে ডেকে পাঠাল, ধরনী একটু অবাক হয়েছে। নিকোলাস ত তাকে ডাকে না, সে-ই বারবার যায়। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে লেখা, আর টুরিস্টদের সঙ্গী হয়ে এদিক-সেদিক ঘোরা, এ ছাড়া কোন বাঁধাধরা কাজ ধরনী জোগাড় করতে পারেনি।

নিকোলাসের ছেলে এসেছিল ধরনীকে ডাকতে। নিকোলাসের দোকানে পৌঁছে ধরনী অবাক হলো। নিকোলাস-কে এত উত্তেজিত সে কোনদিন দেখেনি। মনে হলো, এতদিনে উত্তেজিত হবার মতো সে কোন দামী জিনিষ পেয়েছে, যা রাবিশ নয়, জঞ্জাল নয়। যার নিজের কোন দাম নেই বলে নিকোলাসকে গল্পের জাল বুনে তাতে মূল্য আরোপ করতে হয়। উত্তেজনায় নিকোলাস বাংলা ইংরেজী মিশিয়ে ফেলল। বললো,

—ট্রেজার ফাইন্ড্। নো হোকাস-পোকাস।

—কি ট্রেজার?

—সি।

দেখল ধরনী। অতি পুরনো, বিবর্ণ একটা চামড়ার কেস। আর একটা তাবিজ। সোনার চেনে, সোনার তাবিজে, একটা সবুজ পাথর। পাথরটা ঘিরে ফার্সীতে কতকগুলো অক্ষর।

—কি এটা?

—শাহ আলমের সিসিং জুয়েল। ম্যান্, তুমি চামড়ার কেসে নামটা পড়তে পারছ?

প্রথম নামটা পড়া গেল না। তারপর L...n...all...ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে ধরতে বোঝা গেল।

নিকোলাস গড় গড় করে বলে গেল। কাল দুজন গ্রীক খালাসী এসেছিল। তেহেরাণের কোন্ দোকান থেকে চোরাই-মাল, চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়ে তাদের হাতে চলে আসে। এই তাবিজটা অলকুণে। তারা নিজেই দেখেছে দোকানদার কেমন করে ব্যবসা নষ্ট করেছে, তারপর আত্মহত্যা করেছে। তাদের আর একজন সঙ্গী মারা গেছে এডেনে। তারা নিজেরা দাঙ্গাবাজি করে দুদিন জেলে আটক থেকেছে, অস্ট্রেলিয়ার জাহাজ তাদের ফেলে চলে গেছে। একজন বন্ধুর কাছে নিকোলাসের খবর পেয়ে তারা এসেছে। দুজন গ্রীক খালাসী মোগলবাদশা-র খাস এমারেল্ড বিক্রী করতে সাহস পায়নি।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমায় ডেকেছ কেন?

—তুমি জুয়েলারের কাছে এর পাথরটা যাচাই করবে। তুমি তোমাদের কাগজের লোকের কাছে এর ইতিহাসটা জানবে। সি ম্যান, তুমি লেখাপড়া জান। তুমি ওল্ড্ ফ্রেন্ড্।

নিকোলাস যে ভাবে কাগজের লোকেরা সবজান্তা হয়, তাতে ধরনীর হাসি পেল। বললো—আমি তাদের কি বলব?

—ম্যান, তুমি শাহ আলমের জুয়েলের কথা জান না?

না। ধরনী জানে না। সে ঔরঙ্গজেব, শাজাহান, এই সব নাম মনে করতে পারে।

—ম্যান, শাহ আলম দিল্লীর বাদশা ইন্ সেভেন্টিন্ এইটিজ্। ব্লাইন্ড এম্-পায়র। জুয়েল ফেট্।

—বুঝলাম। এখন বল।

নিকোলাস গড় গড় করে শাহ আলমের ইতিহাস বলে গেল। মহাদাজী সিন্ধিয়া যখন শাহ আলমের কাছ থেকে, নিজে পেশোয়ার মুখপাত্র হবার সনদ আদায় করলেন, তখন শাহ আলম বৃদ্ধ। ঔরংজেবের সময় থেকেই দিল্লীর সম্রাটদের অর্থাভাব। আর ঔরংজেবের নাতির নাতি দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে বাদশাজাদা বাদশাজাদীদের নিত্যকার খাবার মেলে না। চাকর-বাকর মাইনে পায় না। দিল্লীর জাঁকজমকে যেমন ধুলো তেমনই অযত্নের ছাপ। হঠাৎ কোন মাননীয় অতিথি এসে হুমকি দিলে দরবার সাজাবার জন্যে ফটোকাটা ছাড়া একটা নতুন কানাও পাওয়া যায় না।

শাহআলমের দুই উজীর পরস্পরকে খুন করেছেন। অন্তত তাঁদের হাতে যে খুন হবেন না, এই ভরসায় বাদশা আপাতত নিশ্চিন্ত। যদি পেটভরে খেতে পাওয়া যায়, আর ঘাতকের হাতে না মরতে হয়, তাহলে বাদশাহ যে কোন শক্তি, সে ইংরেজ, মারাঠা বা অন্য কেউ, তার হাতে দিল্লীর সিংহাসনের ভার দিয়ে বাণপ্রস্থে যেতে রাজী আছেন। মহাদাজী ভরসা দিলেন তাঁকে মাসে আশী হাজার টাকা সংসার খরচা দেওয়া হবে। দিল্লী আগ্রার শাসনভার সিন্ধিয়া-ই নিলেন।

কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনও যেমন খালি থাকে না, তেমনি আর একদল লোকের-ও অভাব হয় না। তারা সিংহাসনের আশেপাশে শয়তানের মতো অপেক্ষা করে। সুবিধে পেলেই একজনকে নামিয়ে আর একজনকে তক্তে বসায়। তাদের ঘুষ দিতে দিতে বাদশা-রা ফতুর। দেওয়ালের পাথরের নিচের গুপ্ত তোষাখানা খালি হতে থাকে, তাদের কোমরের পেটি মোটা হতে থাকে।

এবার, মহাদাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যরা যখন আগ্রায় লড়াই করতে ব্যস্ত, স্বার্থসন্ধী গোলাম কাদের দিল্লীতে হাজির হলো।

নামে-ই বাদশা। এদিকে যে-ই আসে, তাকে 'বাপ্ বাছা' বলে সম্মান জানাতে কসুর করেন না বাদশা। গোলাম কাদেরকে-ও বুড়ো বাদশা যথেষ্ট সম্মান জানালেন।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়।

গোলাম কাদেরের ভাবগতিক দেখে বাদশা মহাদাজীকে চিঠি পাঠালেন। এস-ও-এস পাঁপিয়র এস।

গোলাম কাদের চিঠি বাজেয়াপ্ত করলো। মহাদাজী ইচ্ছে করলেও আসতে পারতেন না। নতুন সৈনাদল না এলে তাঁর অবস্থাও বিপন্ন।

গোলাম কাদের ইতিহাসের অন্ধকার জগতের মানুষ। অত্যাচার, অনাচার, লোভ আর প্রবঞ্চনার মধ্যেই তার জন্ম। তার ধারণা হলো, দিল্লীর প্রাসাদের কোথাও না কোথাও অজস্র হীরে-মুক্তো লুকোন আছে। আর তার সন্ধান যদি কেউ রাখেন ত' শাহআলম-ই রাখেন। প্রথমদিন সে শাহআলমের মাথা কেটে ফেলবে বলে শাসাল। বাদশা আশ্বস্ত হলেন। ফরুখসিয়ার মরেছেন, চোখ উপড়ে নেবার পর অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে। জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া খুলে নেওয়া বা হাত পা কেটে কবন্ধ করে রাখা, এর চেয়ে মাথা কেটে ফেলা অনেক আরামের। কৃতজ্ঞ বাদশা খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালেন।

না। গোলাম কাদের অত বোকা নয়। তা ছাড়া দিল্লীর মোগলদের সে সব ধনরত্ন সবই কি নাদির শাহ নিতে পেরেছিল? সবই কি একে একে গেছে? গুপ্তধনের নেশায় সে নুরজাহানের সেই পান্নার কণ্ঠি, শাহজাহানের সেই মুক্তো-বসানো পানপাত্রের সেট, গোলকুণ্ডার হীরে বসানো ঔরংজেবের কোমরবন্ধ-এর স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে সব জহরতের ত' খবর পাওয়া যায়নি? না কি রক্ত আর মৃত্যুর যে ঢেউ বারবার দিল্লীর সিংহাসনকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে তার ঢেউয়ে-ই ভেসে গেছে সব? শাহজাদা বেগম, শাহজাদীদের করেদে রেখে গোলাম কাদের শাহআলমকে চাবুকে

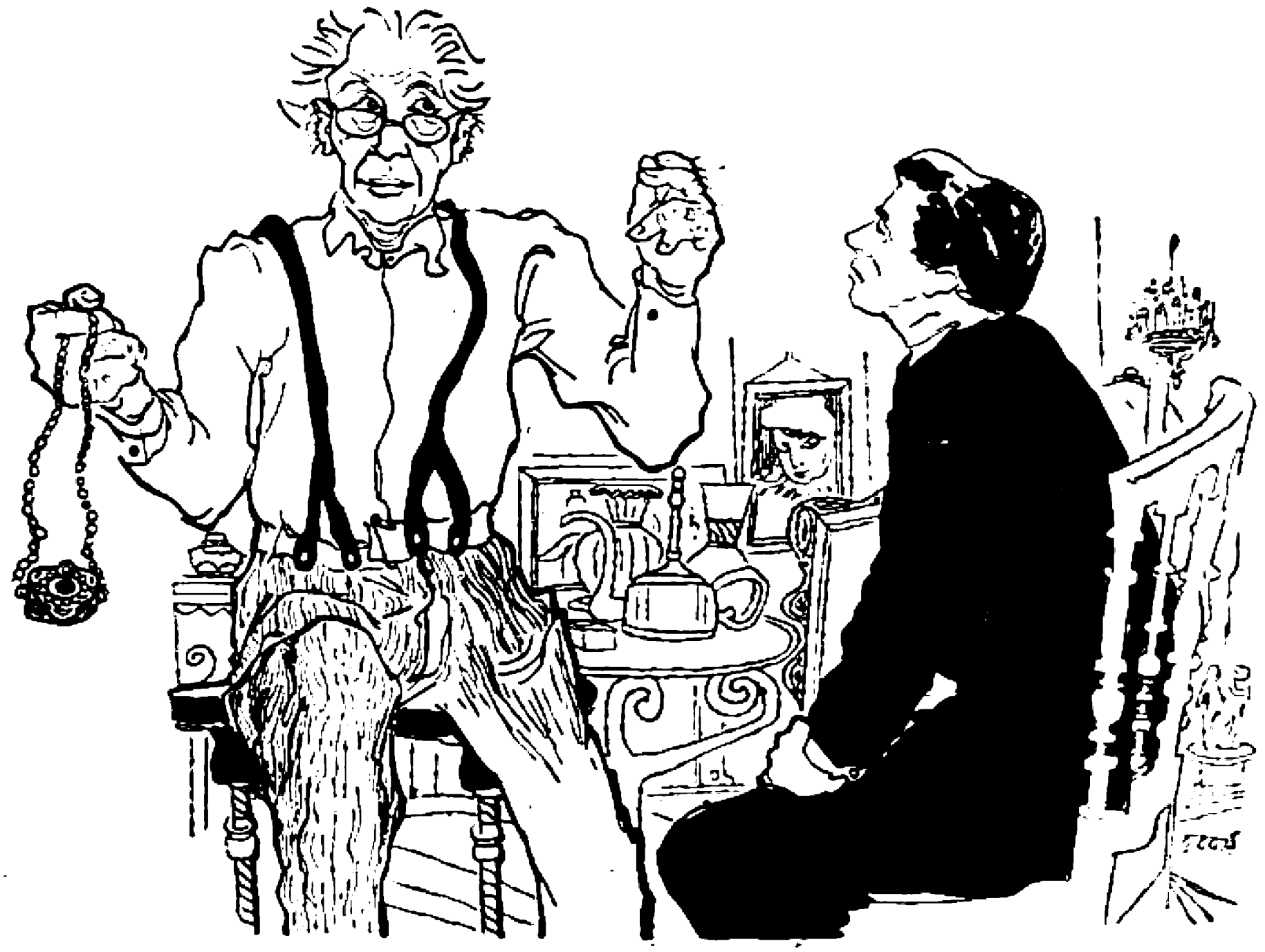

—প্লেজার ফাইন্ড্। নো হোকাস—পোকাস"

মারল প্রথমদিন। তারপর হারেমে ঢুকে বেগম ও শাহজাদীদের গা থেকে গয়না কেড়ে নিয়ে তাদের রাস্তায় বের করে দিল। মরিয়া হয়ে শাহআলম বললেন—আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখ, আমার গায়ে কি লুকিয়ে রেখেছি আমি?

পাঠানরা যখন বাদশার গায়ে হাত দিল, শাহআলম চীৎকার করে তাঁর গলায় হাত দিলেন। পাঠানরা গোলাম কাদেরের আদেশে হাসতে হাসতে ছুরি দিয়ে বাদশার এক চোখ তুলে নিল। বাদশা সহসা গলায় হাত দিয়ে তাঁর তাবিজ ধরে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগলেন। আর এক চোখের ওপরেও নেমে এল ছুরি।

তাবিজ ছিঁড়ে নিল গোলাম কাদের। দুই চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, শাহআলম বিড়বিড় করে কি বলে চলেছেন। সহসা গোলাম কাদেরের হুঁশপিণ্ডটা কোন্ অজানা অলৌকিকের আশঙ্কায় কুঁকড়ে গেল। সে বিকৃত কণ্ঠে বলল—কি বলছ, কি বলছ তুমি?

শাহআলম দুই রক্তাক্ত কোটর গোলাম কাদের-এর মুখের দিকে তুলে ধরে অদ্ভুতভাবে হাসলেন। বললেন—গোলাম, তুই তৈমুর বংশের রক্ষাকবচ ছিঁড়ে নিয়েছিস। এই কবচকে অভিশাপ অনুসরণ করবে। কুকুরের মতো মরবি তুই। এই কবচ যার হাতে যাবে তাকে-ই শেষ করবে। মরলে পরে তাদের আত্মা শকুনের মতো, কুকুরের মতো, জঙ্গলের পশুর মতো কেঁদে কেঁদে ঘুরবে। এবার আমি নিশ্চিন্তে মরব। আমার বংশের অভিশাপ তোর সঙ্গে যাক।

ঠিক তাই হলো। বাদশা-র ধনরত্ন নিয়ে পালাতে গিয়ে গোলাম কাদের মীরাটে, সিন্ধিয়ার ফরাসী কম্যান্ডার লেস্‌তিনো-র হাতে ধরা পড়ে। সিন্ধিয়ার আদেশে লেস্‌তিনো-র সৈনারা গোলাম কাদেরের চোখ নাক কান ছিঁড়ে ফেলে। সেই রক্তাক্ত প্রেতমূর্তি-কে তারা যখন ফাঁসীতে ঝোলায়, গোলাম কাদের হাসতে হাসতে বলেছিল—বহুৎ আচ্ছা। খুব সাবাস। তৈমুর বংশের অভিশাপ এবার সায়েবের সঙ্গে সঙ্গে যাক। ছেড়ে যাক হিন্দুস্তান।

লেস্‌তিনো সেই ধনরত্ন নিয়ে হিন্দুস্তান ছেড়ে পালায়। সিরিয়ায় পৌঁছবার আগেই, মরুভূমিতে শেখরা তার সব কিছু লুঠপাট করে নেয়। গোলাম কাদের মরেছিল ১৭৮১-তে। ১৮১০-তে সিরিয়া শহরে চুল দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ অপ্রকৃতিস্থ জ্বলন্ত চোখ, এক পাগল ফরাসী-কে দেখা যেত। এক বোতল মদ খেতে দিলে সে সিন্ধিয়াকে গালাগালি করতো। দুই বোতল মদ খেলে সে মহারাজা সিন্ধিয়া, না বরেন, কাপ্তেন পেয়্যাঁ, এই সব নাম করতো আর তিন বোতল মদ দিলে সে হামা দিয়ে মাটি আঁচড়ে শাহআলমের তাবিজের তল্লাস করতো। লেডি স্ট্যানহোপ মাঝে মাঝে তাকে খেতে দিতেন। অনেকদিন পরে নেপোলিয়নের এক অফিসার আর এক লেস্‌তিনো-র সঙ্গে ঐ সিরিয়াতেই লেডি স্ট্যানহোপের খুব প্রেম হয়েছিল। নতুন অফিসারটির বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল, ঐ লোকটা তার বাবা, যে ইণ্ডিয়াতে লড়তে এবং ধনী হতে এসেছিল। সে এবং লেডি স্ট্যানহোপ যখন বাগানে বেড়াতেন,

তখন ঘুড়ো লেস্‌ডিনো বিড়বিড় করে তাদের-ই পেছন পেছন তৈমুর বংশের অভিশাপকে তাড়াতে তাড়াতে চলতো।

নিকোলাস বললো—চামড়ার খাপটায় L...n...au পড়তে পারছ? এ নিশ্চয় L-e-s-t-i-n-e-a-u-র নাম। শোন ম্যান, শোন ইয়ং ফ্রেন্ড, তুমি একজন জুয়েলারকে ডাক। আমি এটা যাচাই করাব। ইট এমারেল্‌ড্। তাহলে আমি এটা কিনব। ওরা কাল আসবে।

—কিনে কি করবে?

ধরণী কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

নিকোলাস আস্তে বললো—আই উইল প্রেজেন্ট ইট টু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট।

—হোয়াট?

ধরণী তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

নিকোলাস বললো—মি নো ফুল ইয়ংম্যান। আমি পুওর গ্রীক। অল ওয়েজ ড্রিম অফ্ গ্রেট থিংস। কিছু করতে পারি না। আমি এটা প্রেজেণ্ট করব। তুমি আমার নাম দিয়ে সব গল্পটা লিখে দেবে। কাগজে ছাপিয়ে নেবে।

—তাতে কি হবে?

—কি হবে?

নিকোলাস মস্ত একটা চুরুট ধরাল। বললো—ম্যান, তুমি ভুয়িং নট্ মাচ। এতে তোমার গ্রেট পাবলিসিটি। হয়তো কাগজের লোকরা তোমাকে মস্ত চাকরী দেবে। আমি দেখেছি, তুমি একটা কাজের জন্যে কত চেষ্টা কর। মে বি, ওরা তোমাকে পাত্তা দেয় না। গ্রেট চানস্ পাবলিসিটি। আর ফর মি টু। আমার দোকানে সবাই আসবে। সবাই নাম জানবে।

এমনভাবে বললো কথাটা নিকোলাস যে ধরণী রাগ করতে পারল না। নিকোলাস কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো—আমার মতো অনেক লোক কলকাতায়। আর্মেনিয়া, গ্রীস, প্যালেস্টাইন, দে উইল নেভার নো। এখানে-ও তাদের কোন জগৎ নেই। তোমাদের শহরে, তোমাদের দেশে, আমরা মাঝে মাঝে লস্ট ফীল করি। মে বি, দিস্ গুড্ জেশ্চার অন্ পুওর গ্রীক্‌স পার্ট।

হঠাৎ প্রায় রুদ্ধ স্বরে সে বললো—'আই উইল ফীল ইণ্ডিয়া মাই ট্রু কাণ্ট্রি। আমি তাদের জিনিষ তাদের হাতে দিয়েছি। এটা কোথায় কোথায় কত জায়গা ট্র্যাভেল করেছে। আবার ফেট একে ইণ্ডিয়ায় ফেরৎ দিয়েছে। এখন দ্যাট গ্রেট ডিনেস্টি ইজ ডেড। ইণ্ডিয়ার নিজের সব ট্রেজার দেশের বাইরে। ইংল্যাণ্ড ইচ্ছে করলে তার রাজাদের সব জুয়েলরি দেখাতে পারে। ইণ্ডিয়া হ্যাজ্ নাথিং'। এটাকে সবাই দেখবে। প্রেজেণ্টেড্ বাই নিকোলাস হিপারোদিকাস্, কিউরিও মার্চেণ্ট, কালকাটা, ন্যাচারালাইজ্‌ড ইণ্ডিয়ান। ম্যান, আমি যখন ফ্রিস্কো-তে ছিলাম, তারা এ সব গল্প ডলার দিয়ে কিনে নিত। তুমি বুঝতে পারছ না।

নিকোলাসের দোকান থেকে সতেরো শ' আশী আর আঠারো শ' তেরো-র সময় থেকে, ধরণী উনিশ শো ষাটের কলকাতায় বেরিয়ে এল। রোদ্দুরে চোখ মেলতে অসুবিধে হলো তার, শুটকী মাছের গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে নিতে কষ্ট হলো।

প্রথম সে ইতিহাসের খোঁজ নিতে ডক্টর দত্ত-র বাড়ীতে ছুটেছিল। তিনি ইতিহাসটা সমর্থন করলেন, তাবিজটাকে নয়। নিউমার্কেটে তার পরিচিত সিন্ধী জুয়েলারটিকে নিয়ে নিকোলাসের কাছে যেতে তার দু'দিন দেরী হয়েছিল। কাগজের অফিসে উৎসাহের বশে গল্পটা বলে ফেলেছিল ধরণী। নিজেকে তার মনে হচ্ছিল ভাগ্য নির্দিষ্ট কোন অসাধারণ লোক। তার হাত দিয়ে শাহ-আলমের তাবিজের রহস্য প্রকাশ পাবে। তৈমুর বংশের প্রাচীন সম্পদ দিল্লী বা কলকাতার ম্যুজিয়াম-এ শোভা পাবে। এমন কি, এটা যেহেতু কলকাতায় আবিষ্কার হয়েছে, সে হেতু কলকাতায়-ই থাকবে, এই মর্মে কোন দাবী জানানো যায় কিনা, সে কথা-ও ভেবেছিল ধরণী। নিকোলাসের সম্পর্কে সে একটা অদ্ভুত আত্মীয়তা অনুভব করেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে-ই, সাংবাদিক জগতে নাম করবার মতো সে একটা গবেষণার বিষয়ও খুঁজে পেয়েছিল। সত্যিই ত' যে সব দেশ বিদেশের মানুষ এমনি করে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজের বন্দরে ছিটকে পড়ে, যারা বছরের পর বছর এ দেশেই থেকে যায়, তাদের পেশা নিয়ে, তাদের জীবন নিয়ে সে লিখবে। এবং কোন একদিন বিলেতের বি, বি, সি-তে সে এই সব শ্যাওলার মতো ভাসমান মানুষদের নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, এ রকম স্বপ্নও ধরণী দেখতে পেরেছিল।

সে এবং সিন্ধী জুয়েলারটি যখন নিকোলাসের দোকানে পৌঁছিয়েছিল, তখন রাস্তায় ভীড়। পুলিশের গাড়ী এখানে সেখানে থেমে থাকা, ফিসফিস করে কথা বলা জনতা।

ধরণী দৌড়তে সুরু করেছিল। দৌড়ে ভীড় ঠেলে সে যখন ঢুকতে পেরেছিল, তখন নিকোলাস হিপারোদিকাস, কিউরিও মার্চেণ্ট অফ্ কালকাটা, ন্যাচারালাইজ্‌ড ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে মর্গে যাবার জন্যে তৈরী। কিউরিও লণ্ডভণ্ড। টেবিলে ল্যাম্পটা তখনো জ্বলছে। কাঁদতে কাঁদতে, হাত মোচড়াতে মোচড়াতে নিকোলাসের ছেলে পুলিশ অফিসারকে কথার জবাব দিচ্ছে।

ধরণী পুলিশ অফিসারকে সব কথা বলেছিল। তিনি তার সাহায্য ভালভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে শাহআলম, তাবিজ, লেস্‌ডিনো সব কথা বাদ দিয়ে একমাত্র ঐ গ্রীক খালাসী দুটির প্রসঙ্গকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ। তারাই খুন করেছিল। মেটিয়াবুরুজের শুঁড়িখানায় যাকে ধরা গিয়েছিল, সে স্বীকার করে যে হ্যাঁ, তার সঙ্গীর সঙ্গে সে-ও গিয়েছিল বুড়ো শয়—তানের কাছ থেকে তাবিজটা আনতে। বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের বলে-

যে কোন হাঁপানি ও কাসি
চিরদিনের মত দূর করিতে পারে একমাত্র
মৃত
অরুত গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড নং ২০৪২
অভ্রান্ত আবিষ্কার: কবিরাজ ও মৃত দ্বারা আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত। হাঁপানি ও কাসি, সর্দ্দি, কফ, রক্ত পড়া সাঁ সাঁ করা, বুক পাশ বথা, কাশতে কাশতে বমন হওয়া, বুকে দড় দড় করা, সর্দ্দি বসা ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩০/৭০ বৎসর রোগভোগ করিতেছেন এমন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বৃদ্ধ ও ছোট ছেলে মেয়েদের কুপথ্য করিলেও এই মৃত ঔষধে চিরদিনের মত ভাল হইবেই। ১ কৌটায় উপশম ৩ কৌটায় সম্পূর্ণ নিরাময়। প্রতি কৌটা ৩।৷০ টাকা একত্রে ৩ কৌটা ১০ টাকা। ভিঃপিঃ মূল্য ফেরৎ ডাক খরচ ও পাইকারী দর পৃথক
ভারতীয় আয়ুর্বেদ রিসার্চ
হেডঅফিস: পি ২১ কেলেণ্ডার মেন রোড, কলিকাতা-১০
ব্রাঞ্চ ১২০, লোয়ার সার্কুলার রোড
শিয়ালদহ ষ্টেশনের ফ্লাইওভার ব্রীজ নেক্সট

ন. এটাতে তাদের কোন অধিকার নেই। দিন সে তাদের ভাটি মানি দিয়ে ব।

কিন্তু তার সঙ্গী তখন আর বিক্রটা বিক্রী করতে চায় না। সে মন নিয়েছে। তাদের জাহাজ তৈরী। এই য়ে বুড়োর সঙ্গে হাতাহাতি। আর ড়া যদি নিজে জোর করে পরের নিষ আটকে রেখে, হঠাৎ চোর চোর ন চীৎকার না করতো, তাহলে বোধ তার সঙ্গী ছোরা বের করতো না। র সঙ্গী খুন করেছে, তার সঙ্গী বিক্রটা নিয়ে পালিয়েছে। তার নিজের ন হাত ত' ভাঙা। প্লাস্টার করা। লিশ বলুক, তার পক্ষে কি খুন করা ভব? তার হাতের ছাপ কি কোথাও ছে?

প্রমাণাভাবে এই খলাসীটি মুক্তি য়। তার সঙ্গীর আর কোন খবর ওয়া যায়নি। তবে অনেকদিন পরে, স্ট্রেলিয়াগামী জাহাজে করলা ঘরের শে একজন গ্রীক নাবিকের মৃতদেহ জে পাবার কথা কোন ইংরেজী াজের এক কোণাতে পড়ে ধরণীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সে-ই নিকোলাসের হত্যাকারী।

ধরণী এখনো কোন কাজ পায়নি। এখনো সে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে গডেস্ কালীর টেম্পল, গ্রেট সেইন্ট রামকৃষ্ণর দক্ষিণেশ্বর মার্বেল প্যালেস আর ডায়মণ্ডহারবার ঘোরে। তবে কিউরিও কিনতে সে কখনো যায় না। কিউরিওর কথা বললে সে চুপ করে থাকে। যে ট্র্যাভেল এজেন্ট তাকে কাজ দেয় সে ধরণীর পেছনে সিডাবিউ করে বলে—'নো মোর ফ্যাসিনেটিং স্টোরিজ! দাঁড়াও সীজন্ গেলেই তোমায় বিদায় করে দেব।

শাহআলমের তাবিজের কথা বললে ধরণী মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। তার মনে হয়, কোথায়, কোন্ জায়গায় এখনো তাবিজটা কার হাতে ঘুরছে ফিরছে, কার ভাগ্যে অভিশাপ টেনে আনছে।

—এ প্রসঙ্গে তুমি অমন খাপ্পা হয়ে যাও কেন?

তার ট্র্যাভেলিং এজেন্ট কানুভাই বলে। বলে—সব বাজে কথা। পাথরটা সাচ্চা হতে পারে না। সে বিষয়ে প্রমাণ কি?

ধরণী বোঝাতে পারে না, সাচ্চা না কুটো, সেটা যাচাই হবার জন্যে অপেক্ষা করেনি তাবিজটা, তার আগেই নিকোলাসের পিঠে ছোরা নামিয়ে এনেছিল তাতে-ই অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে ওটা-ই শাহআলমের তাবিজ কান্দাহার, গজনী ও কাবুলের সাতজন পীরের মন্ত্রপূত, তৈমুর বংশের দুর্ভাগ্য অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুত অভিশপ্ত তাবিজ। আর কত মানুষের জীবন যুগের পর যুগ অভিশপ্ত করেছে তাবিজটা, সেই মর্মান্তিক ইতিহাসের ট্র্যাজেডি ধরণীকে স্পর্শ করে না। সে সব কথা সে মনে রাখেনি। শুধু, একজন নিকোলাস হিপারোবিকাস নাচঘরালাইজড ইণ্ডিয়ান-এর একমাত্র স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছে তাবিজটা, সেই জন্যে ধরণী সেটাকে ক্ষমা করতে পারে না।

কানুভাই বলে, ওটা ধরণীর ভাবপ্রবণতা।

॥ ওরিয়েণ্টের সাহিত্য-সম্ভার ॥

অনন্তকুমার ভট্টাচার্য নাবতর্কতীর্থ
বৈজ্ঞানিক দর্শন ২০.০০

প্রথমনাথ বিশী
নীরস গল্প-সঙ্কলন ৩.৫০
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬.০০
নানা রকম ৬.০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড ৫.০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ২য় খণ্ড ৫.০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা ৫.৫০

কল্যাণী প্রামাণিক
দুনিয়া দেখছি ৫.০০
শিশু ভরু (কাব্য) ২.০০
খোকনবাবু (কবিতা) ২.০০

অপরাজিতা দেবী
বিজয়ী ৪.৫০, বাংলার মাটি ৬.০০

ঋষি দাস
শেক্সপীয়র ৮.০০, বার্ণার্ড শ ৬.০০
গান্ধী-চরিত ৬.০০
আধুনিকী (বাংলা অভিধান) ৭.০০

উপেন্দ্রকুমার দাস
ভক্ত কবীর ৫.০০

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বাংলার বাউল ও বাউল গান ২৫.০০
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১২.০০

কবিশেখর কালিদাস রায়
পুরাণ কাহিনী ২.০০, জাতকের গল্প ২.০০, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ৮.০০

কালিপদ বিশ্বাস
নতুন জাপান ৮.০০

কৃষ্ণদয়াল বসু
ছড়া ও ছন্দ ৩.০০

গুরুসদয় মুখোপাধ্যায়
ডিণ্ডিক্রী ২.০০

গোপেন্দ্রনাথ মিত্র
জন্মদিন ০.৫০, গল্প-সঙ্কলন ৩.৫০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
ইস্পাতের স্বাক্ষর ১০.০০
রথচক্র ২.৫০

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
আদ্য সাহিত্য সংস্কৃতি ৬.০০

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
কঙ্কাবতী ৬.০০

নগেন্দ্রকুমার গুহরায়
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৮.০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৩.২৫, বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা ৪.০০, প্রথম জন্মে সমাপ্ত ৩.০০, কাম্রা-হাসির গল্প ৩.৫০

নিখিলরঞ্জন রায়
সমাজ শিক্ষার ভূমিকা ৩.০০
জনশিক্ষার কথা ৫.০০
শিক্ষা-বিচিত্রা ৪.৫০

প্রতিভা গুপ্ত
সমাজ ও শিশুশিক্ষা ৫.০০
সমাজ ও শিশু সমীক্ষা ৮.০০
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ ৬.০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
আত্মচরিত ১২.০০
AUTOBIOGRAPHY 15.00

আচার্য রাজনারায়ণ বসু
আত্মচরিত ৬.০০

রোমাঁ রোলাঁ
রামকৃষ্ণের জীবন ৬.০০
বিবেকানন্দের জীবন ৬.০০
মহাত্মা গান্ধী ৬.০০

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা ১২ ॥

ইতিহাস গবেষকের চোখ এড়িয়ে গেল ...

আদিম মানুষের প্রথম বিলাসিতার কথা আজ থাক। মানুষের বিশেষ ইন্দ্রিয়ের আজ আর গোপনতা নয়। কেবল যেটি প্রতিদিনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—মানুষ আর আজও সবচ—তার ধারাবাহিক ইতিহাস কই? ইতিহাসের পুঁথিতে মুদ্রণেও তোলেনি যেসব উপাদান—দৃষ্টির আড়ালে—সুখের মতোই—অগোচরে রবক।

বৈদিক যুগে আর্যরা বালি ভোগেন, আপন মনে ভাবতে; কিন্তু সত্যি, বালি এবং খবই ছিল তাঁদের প্রথম ব্যবহৃত। তারপর এল ঘর এবং আরও অনেক কিছু। ...কিন্তু বালি মানুষের ব্যবহারে যেকে গেল...আজও। তাইতবে এখনো অনেক মানুষ বালির পানীয় দিয়েই জীবনযাপন করে। বালিশক্ত থেকে উপেক্ষ পর্যন্ত বালি ও গুঁড়ো বালি সহজে সুলভ হয় এবং শারীর ক্রিয়ে সহায়ক হয় বলে প্রসাধনের জন্যই এর বহুল ব্যবহার।

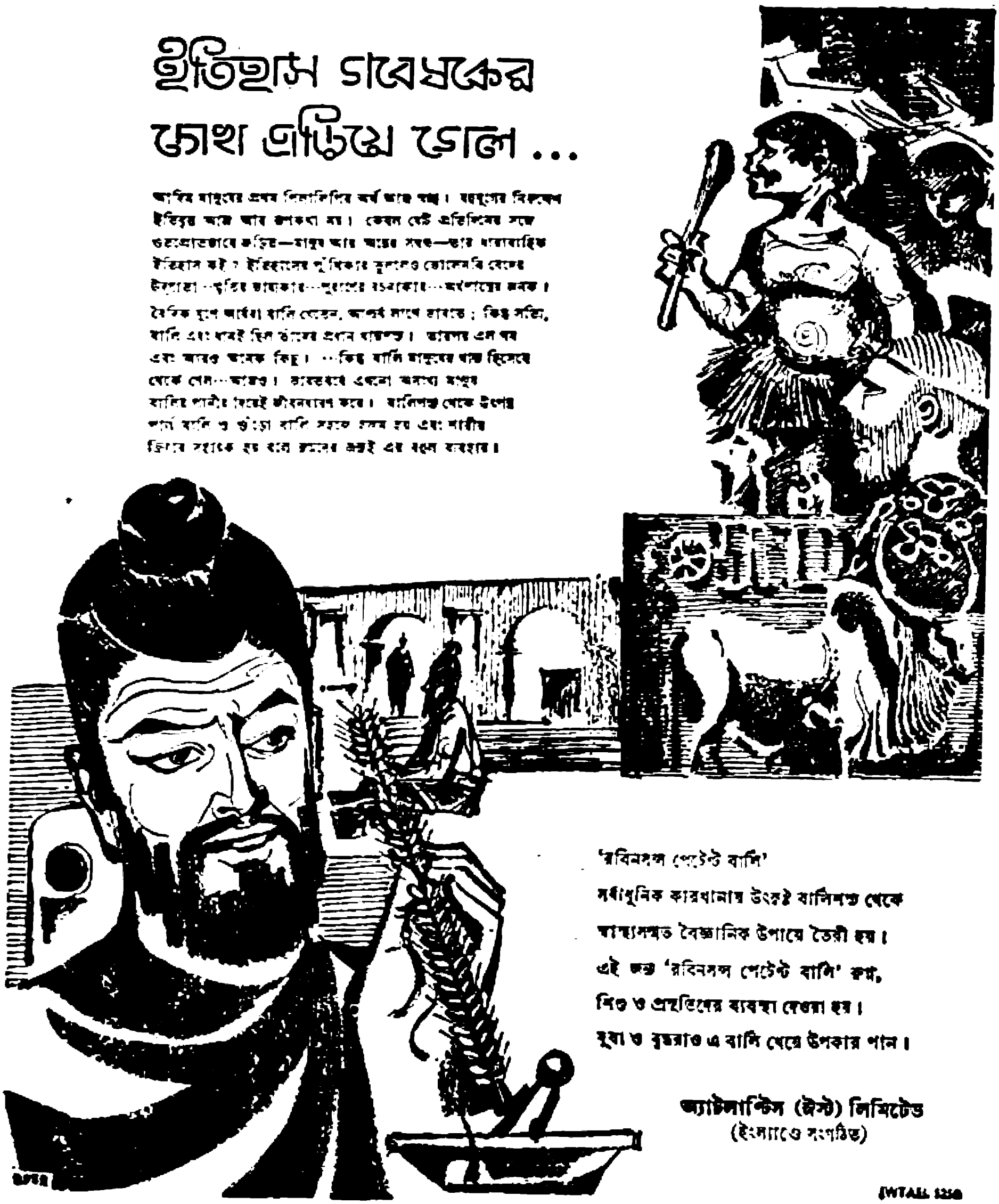

'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি'

সর্বাধুনিক কারখানায় উৎকৃষ্ট বার্লিশস্য থেকে স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী হয়।

এই জন্য 'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি' রুগ্ন, শিশু ও প্রসূতিদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

যুবা ও বৃদ্ধরাও এ বার্লি খেয়ে উপকার পান।

অ্যাটলান্টিস (জেস্ট) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

JWTALL 1250

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রীর চেয়ে বড়

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি স্ত্রী কুলত্যাগ করেছে শুনলেও এতটা অভিভূত হয়ে পড়তেন না ভবেশবাবু সেদিন বাড়ীতে পা দিতেই যখন শুনলেন রামুয়া চাকরটা কাজ ছেড়ে চলে গেছে, আর তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কমলা নিজে!

শুধু একবার 'এ্যাঁ' এই বিস্ময়সূচক শব্দটা মুখে উচ্চারণ করেই তিনি এমন-ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ তাঁর জীবনে আর কিছু নেই বা হতে পারে না। তাঁর কণ্ঠ ভেদ করে যতটুকু শোকোচ্ছ্বাস বেরিয়ে এলো, তাকে আর্তনাদ বললে ভুল হয়, বুঝি তার চেয়েও আরো কিছু বেশী, ভাষা দিয়ে যার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না।

কমলার কানে তা যেন দশগুণ বর্ধিত হয়ে বাজে! স্বামীর সামনে এসে, হাতমুখ ঘুরিয়ে, এক ঝলক উত্তপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বললে, তখনি বারণ করেছিলুম কুকুরকে এত 'নাই' দিয়ে মাথায় তুলো না। আস্তাকুড়ের ফুলে কোনদিন ঠাকুরের পুজো হয় না। যেমন আমার কথা শোনোনি, তেমনি ফলভোগ করো এখন।

সিঁড়ি দিয়ে ভরভর ক'রে নেমে এসে যেন শত্রুপক্ষের ওপর একটা বোমাবর্ষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে আবার ওপরে উঠে গেল কমলা।

ভবেশবাবু কেবল হতবাক নয়, হত-বুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ঠিক তেমনি সেই জায়গাটিতে। তাঁর মাথার মধ্যে সব যেন কেমন ঘুলিয়ে ওঠে। রামুয়া শুধু পুরনো চাকর ছিল না—যেমন বিশ্বাসী তেমনি নির্ভরযোগ্য, তেমনি সকল কাজে সুদক্ষ। একাধারে চাকরকে চাকর, রাঁধুনীকে রাঁধুনী, আবার ম্যানেজার বললেও অত্যুক্তি হয় না। মোটকথা সংসারের যাবতীয় কাজ—জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব কিছু সে একাই করতো। সবচেয়ে বড় কথা, তার হাতে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যেমন ভবেশবাবু, তার চেয়ে বেশী তাঁর স্ত্রী, কমলা!

তাই তিনি বুঝতে পারেন না, অপিসে যাবার আগে পর্যন্ত যে ছিল কমলার একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসের পাত্র, সংসারের সর্বময় কর্তৃত্বের পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিত, হঠাৎ এই কণ্ঠস্বরের ব্যবধানে, এমন কি গুরুতর অপরাধ সে করলে যার জন্যে ভবেশবাবুর অপিস থেকে ফিরতে ঘর সইলো না, তার আগেই দূর করে দিতে হলো রামুয়াকে?

অথচ যদি কেউ আদর নিয়ে তাকে মাথায় তুলে থাকে ত সে কমলা নিজে। বাইরের লোক এসে কতদিন কমলার ছেলে বলে তাকে ভুল করেছে। খাওয়ার পরার চাকর বলে কোনদিন সে এতটুকু অবজ্ঞা করেনি। সরু চালের ভাত, প্রথম পাতে ঘি। চায়ের সঙ্গে টোস্ট, ডিম, যেমন নিজেরা খেতে ভালবাসে ওকেও তেমনি দিতো একটা সমান অংশ। দশ বছরের এতটুকু বালক চাকরী করতে এসেছিল তখন থেকে একুশ বছরের যুবকটি হওয়া পর্যন্ত কোনদিন এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেয়নি কমলা।

বরং ওর এই ভাল খাওয়া ও ভাল জামাকাপড়ের জন্যে অতিরিক্ত খরচপত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ভবেশবাবু ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছেন। কমলা বলেছে, চাকর বলে সে কি মানুষ নয়। তার মনে কি সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই। ভাল খেতে নেই, ভাল পরতে নেই? তাই কমলা নিজে রামুয়াকে দূর করে দিয়েছে শুনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাঁর মনে। তবে কি? কি জানি! মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম'! কমলা বাড়ীতে একা থাকে! ঝিটা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকেন ভবেশবাবু। মাঝপথে হঠাৎ কমলার ঝাঁজালো কণ্ঠস্বর কানে আসতে থমকে দাঁড়ান। ছিঃ ছিঃ তোর জন্যে কি না করেছি ছোটজাত, চাকর বলে, কোনদিন অযত্ন অনাদর করিনি আর এই তার পুরস্কার? বেইমান, নেমকহারাম, কোথাকার!

ভবেশবাবু কমলার ঘরে গিয়ে বলেন, আসল ব্যাপারটা কি বলোত, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না!

কমলা একথার কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে তার মাথার বালিশটা এনে ভবেশবাবুর নাকের কাছে

তুলে ধরলে। তিনি মুখটা সরিয়ে নিলেন। উঁ বিচ্ছিরী তেলের গন্ধ!

কেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হ'লো। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কমলা, হাঁ, আর এই দ্যাখো স্পষ্ট ঘোঁপার ছাপ। বলে আবার বেডকভারের উপর থেকে একটা নতুন ধরণের প্ল্যাসটিকের কাঁটা তুলে এনে ভবেশবাবুকে দেখিয়ে বললে, এটা সেদিন কালীঘাট থেকে কিনে এনে দিয়েছিলুম, ওই ক্লেদাক্ত বিটকে!

কাঁটাটা কেবল দেখালে না কমলা, সঙ্গে ভবেশবাবুর চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দিলে!

এত বড় আস্পর্দা তোমার ওই পেয়ারের চাকরের যে, তাকে শুধু একটা কথা বলেছি, হাঁরে এই জন্যে বুঝি বিশ্বাস করে তোর হাতে ঘরদোরের চাবী ছেড়ে দিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম। আসুক আজ বাবু, তারপর দেখি এর কোন বিহিত করতে পারি কিনা! ব্যাস্, আর যাঁর কোথায়। চাবীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টিনের সুটকেসের মধ্যে, ওর জামা কাপড় জুতো, যা কিছু বাইরের ঘরে ছিল সব ভরে নিয়ে, ঘর ঘর করে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। শুধু ফটকের কাছে একবার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, এত কিসের ভয় দেখান, এর চেয়ে ভাল কাজ আমার ঢের মিলবে!

ঠিকই! ভবেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আজকের দিনে অনেক তপস্যা করলে তবে এ রকম চাকর পাওয়া যায়!

ওগো, না না, তা নয়। আসলে রাগটা হলো, ক্লেদাক্তকে আমি তার আগে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলুম সেইজন্যে! বুঝতে পারছো না, দুই আর দুয়ে চার।

ভবেশবাবু কণ্ঠের ক্রোধ চাপতে চাপতে বলেন, তখনি নিষেধ করেছিলুম, কি দরকার আবার একটা ঝিয়ের—একা সবই ত করছে রামুয়া বরং বাইনে ওর কিছু বাড়িয়ে দাও, তাহলেই ও খুশি থাকবে! তা শুনলে না যেমন আমার কথা। কাড়ের বাঁশ ইচ্ছে করে টেনে নিলে নিজের পেছে?

ওই ত আমার রোগ! মানুষের কষ্ট দেখলে আর স্থির থাকতে পারি না। ভাবলুম এই ঠাণ্ডার দিনে ভোরে উঠে বাসন-কোসন মাজতে জল তুলে ঘরদোর ধোয়ামোছা করতে কষ্ট হয় ওর—কিটা থাকলে বাইরের কাজগুলো সে করে দিলে, ও ঘরের কাজগুলো যেমন আরো ভাল করে করতে পারলে তেমনি অনেকটা পরিশ্রমের ওর লাঘব হবে! আমার যেমন মরণদশা, তাই ওর ভালো করতে গিয়েছিলুম।

দেখো কতদিন তোমায় নিষেধ করেছি, বেশী ভাল করার চেষ্টা করো না। যে চাকর তাকে চাকরের মত থাকতে দাও! তাকে মণিরের পর্যায়ে তুললে সে যদি মনিবের ঘাটে শুতে চায়, তো দোষ কার?

ঘাট হয়েছে! সব দোষ আমার, স্বীকার করছি। বলে খাটের ওপর থেকে বেডকভারটা ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিয়ে কমলা বলে চাকর, মানুষের বাড়ীতে কত আসছে, কত যাচ্ছে, কিন্তু তুমি এমনভাব করছো যেন দেশে রামুয়া ছাড়া আর চাকর পাওয়া যায় না।

এর জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ডগায় এসে পড়ে ভবেশবাবুর কিন্তু সামলে নেয় তাড়াতাড়ি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়! রামুয়ার মত চাকর যে দুর্লভ, তা ভাল করেই জানতো কমলা। আর জানতো বলেই তাকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে এইভাবে। নইলে লঘু অপরাধে এমন গুরুদণ্ড কিছুতেই দিতে পারতো না। ভবেশবাবু অনেকদিন আগে এটা লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর মুখে রামুয়ার সুখ্যাতি শুনলেই কমলার মুখটা যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই রামুয়াকেই যখন তখন উপদেশ দিতো কমলা, বাবুর যেন কোন কাজে এতটুকু ত্রুটি না হয়। কোন অসুবিধে না হয়—সব সময় নজর রাখবি সেদিকে। আমার শরীর খারাপ, ও'র অফিস বেরুবার সময় মুখে মুখে হাতে হাতে সবকিছু করতে পারি না, অনেকদিন হয়ত রান্নাই পুরো হয়ে উঠতো না—সেইজন্যেই তোকে এত মাইনে দিয়ে রাখা, ভুলে যাসনি যেন তা কোনদিন।

কথাটা যেমন সত্যি এবং সাধ্বী রমনীজনোচিত তেমনি, এটাও আরো সত্যি, যে দিন থেকে রামুয়া সেবা ও পরিচর্যার দ্বারা কেবল ভবেশবাবুর অন্তর জয় করেনি, কমলার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল, সেইদিন থেকে খুশির সঙ্গে কেমন একটা বেদনা যেন ফুলের মধ্যে কাঁটের মত তার অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। কথাটা হেঁয়ালীর মত শোনালেও চিররহস্যময়ী নারীর অন্তরের গোপনতম প্রদেশে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করতো সব সময়। কমলা মুখে তা স্বীকার না করলেও, অন্তর্যামী বুঝি তা জানতেন!

বাথরুমে ঢুকে হুড় হুড় করে বহু জল ঢালতে থাকেন ভবেশবাবু, গায়ে, মাথায়, সর্বদেহে তত যেন উত্তাপ বেড়ে যায়। কি জানি কেন, সব আক্রোশটা গিয়ে পড়ে তাঁর কমলার ওপর! এর মধ্যে কমলার একটা সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পায়। নারীর মন জটিল, ও রহস্যাবৃত। 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা'। —এই জন্যে বুঝি মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন!

রামুয়াকে উপলক্ষ্য করে কমলার মুখ থেকে যে সব উক্তি-জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তাঁর কর্ণপটাহে আঘাত করেছে, আজ একে একে সব বিশ্লেষণ করতে থাকেন ভবেশবাবু। সত্যি কমলা শিখিয়ে পড়িয়ে রামুয়াকে এমনি তৈরী করেছিল যে, ভবেশবাবু তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু হাতে হাতে, মুখে মুখে ঠিক ঠিক পেতেন। ঘড়ির কাঁটায় তবু নড়চড় হয় কিন্তু তার কাজের এতটুকু এদিক ওদিক হতো না! ভোরে উঠে 'বেড-টি' দেওয়া থেকে শুরু করে স্নানের গরম জল, সেভিংসেট, কাপড় ও চটিজুতো বাথরুমে রেখে আসা, অফিসের ভাত টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে, যে জামাকাপড় পরে তিনি বেরুবেন, তা ঠিক আছে কিনা তদারক করা, সিগারেটের টিন, দেশলাই, অফিসের কাগজপত্তরের সঙ্গে রুমাল, চশমা ও কাউন্টেনপেন সব ব্যাগের মধ্যে পুরে দেওয়া, বেরুবার আগে খপ্ করে একবার জুতোটা বুরুশ দিয়ে সাফ করা, খাওয়ার পর যাতে বদহজম না হয় তারজন্যে কবিরাজী গুলীর সঙ্গে এক গ্লাস জল এনে হাতে দেওয়া প্রভৃতি কাজে যেমন কোনদিন ভুল হতো না তেমনি আবার ফিরে এলে, দরজায় একবার মাত্র কড়া-নাড়ার শব্দ হলে হয়, যে কাজেই থাক, চোখের নিমেষে এসে দরজা খুলে তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা আগে নিয়ে ভিতরে চলে যায়।

কতদিন এর জন্যে কমলাকে মন্তব্য করতে শুনেছেন, ওঃ বাবুকে দরজা খুলে দেবার বেলা যেন তোর টনক পড়ে, আর আমি কোনদিন বাইরে বেরুলে, কড়া নেড়ে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও তুই শুনতে পাস না। তুমি নিশ্চয়ই কিছু তুকতাক জানো, নইলে আমি ওকে সবসময় ভালমন্দ খেতে দিই, পরতে দিই, তা সত্ত্বেও ও তোমার এত পেয়ারের হয়ে উঠলো কি করে?

ওকেই জিজ্ঞেস করো। বলে মুচকি হেসে স্ত্রীকে বললেও আসল কারণটা কিন্তু তাঁর অজানা ছিল না। রামুয়া ছেলেমানুষ তাই মধ্যে মধ্যে দু'চার আনা বকশিস্ দিয়ে ভবেশবাবু কোনদিন

বলতেন যা আজ সিনেমা দেখিস্, কোনদিন বা বলতেন হোটেলে যা ইচ্ছে খাস্, কখনো বা কিছু না বলেই ওর হাতে আনিটা দোআনিটা গুঁজে দিতেন। তিনি জানতেন, বিড়ি সিগারেট খেতে শুরু করেছে রামুয়া দেশওয়ালী ভাইয়াদের দলে মিলে, তাছাড়া বাঁধা মাইনের চেয়ে 'উপরি' পাওনায় লোভ মানুষ মাত্রেই বেশী!

অবশ্য একেবারে যে ভালোবেসে বিনাস্বার্থে ভবেশবাবু এমন উদার ও মুক্তহস্ত হতেন, তা নয়। রামুয়া তার দৈনন্দিন কর্মসূচীর ওপর যে অতিরিক্ত পরিচর্যা করতো মনিবের, তারি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ বরাদ্দ। মাথা ধরেছে হয়ত তার, মাথাটা টিপে দিলে, হাটু কনকন্ করছে শুনে বেশ করে পা দুটো ডলাই-মলাই করে দিলে। হয়ত অসময়ে বৃষ্টি এসে পড়লো, ছাতি নিয়ে অফিসে যাননি ভবেশবাবু, বাস্ থেকে নেমেই দেখেন ছাতি হাতে করে প্রশান্তমুখে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সে বড় রাস্তায়। শুধু কি এই, আরো অশেষ গুণ রামুয়ার! মনিবের এই বাড়ীটা যেন তার প্রাণ! একটা ফুল কেউ গাছ থেকে তুললে যেমন তার বুকে বাজে, তেমনি কোন ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কেউ কাঁচের বাসনের সেট্ বা অন্য কিছু 'গালিচা', 'সতরঞ্চি' প্রভৃতি সৌখীন জিনিস চেয়ে নিয়ে গেলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার সেগুলো বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ওর চোখে যেন ঘুম নেই। নিজেই দু'বার তিনবার তাগাদা দিয়ে নিজেই এক সময় মাথায় করে নিয়ে আসে এমন কি ভিখিরী মাগন বেশী আসতে দেখলেও তার মাথা গরম হয়ে ওঠে! যেন মনিবের পয়সা তারা লুটে নিচ্ছে মনে করে। দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলে, যা না খেটে খেগে যা। রেশনের চাল সস্তা নাকি!

কমলার আবার এই জায়গাটায় সব-চেয়ে দুর্বলতা বেশী। কেউ 'মা' বলে এসে হাত পাতলে, কিছুতেই তাকে শূন্য হাতে ফেরাতে পারে না। পুরনো কাপড়, টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ওই রামুয়ার হাতে দিয়েই পাঠিয়ে দেবে। এতে রামুয়ার গায়ে জ্বালা ধরে। কমলাকে স্পষ্টই মুখের ওপর বলে, কি হয় এত সব জিনিস ওই বাজে ফুট্ লোকদের দিয়ে?

আহা ওরা গরীব, বলতে নেই ওকথা! জানিস্ হাত তুলে মানুষকে কিছু দেওয়ার জন্যে ভাগ্য করে আসা চাই।

রামুয়া এ সবের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারে না। বাবুর কানে মায়ের এই অতিরিক্ত দান-ধ্যানের কথাটা কৌশলে তুলে দেয়, যাতে তিনি নিজে নিষেধ করেন তাকে।

কথাটা স্বামীর মুখে শুনে রাগ সামলাতে পারে না কমলা। ওকে কি তুমি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছো, আমার বিরুদ্ধে, যে আমার দোষ-ত্রুটি ধরে তোমায় লাগায়?

আরে না-না, রাগ করো না! বলে প্রশান্ত হাসি মুখে টেনে ভবেশবাবু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন। মনিবের পয়সা খরচ হতে দেখলে ওর কিরকম কষ্ট হয়, এটা তারি দৃষ্টান্ত! ও সত্যি-সত্যি আমাদের একেবারে 'আপন' মনে করে।

মুখটা চট্ করে স্বামীর দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দেয় কমলা, আমাকে না। তোমায়?

ওই হলো! আমি, তুমি—আবার আলাদা নাকি!

তাই ত জানতুম। ওর জন্যে এত করে মরি আমি, কিন্তু ও তো দেখি তোমাকেই দেবতার মত শুধু পুজো করে!

ঠোঁটের কোনে হাসি চেপে ভবেশবাবু উত্তর দেন, সে ত তোমার-ই শিক্ষা। পুজোর যা কিছু মন্ত্র সব-ই ত তুমি তার কানে দিয়েছো!

এখন দেখছি ভুল করেছি! স্ত্রীর কণ্ঠস্বরটা এবার কেঁপে উঠতে ভবেশ-বাবুর কানে কেন তা কেমন বেসুরো লাগে।

সত্যি স্ত্রীর কাছে যে সেবা-যত্ন স্বামীর প্রাপ্য অথচ তিনি পাননি; মায়ের কাছে ছেলের যে স্নেহ পাওয়া উচিত কিন্তু অবচেতনের বশে ভবেশ-বাবুর সে আস্বাদ মেটেনি। রামুয়া যেন একলপ্তে তাঁর সেই স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তরে সব ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে! ছোট-খাটো কাজ, আপাতদৃষ্টিতে যাকে তুচ্ছ মনে হয়, তার ভেতর দিয়ে যেন ভবেশবাবুর অন্তরকে সে স্পর্শ করে, নাড়া দেয়। যে মাছটি খেতে ভবেশবাবু ভালবাসেন, বিশেষ করে যে তরকারীটা হয়ত তাঁর কাছে খুব প্রিয়, খুঁজে খুঁজে এবার সে বাজার থেকে এনে সে হাজির করে। অসময়ে এঁচোড়ের ডালনা পাতে দেখে

যে কোনও পরিমাণ
চাউল
বাড়ীতে
পৌঁছিয়া দেওয়া হয়।
পশুপতিদাস
এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
৪৩।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৪
ফোন : ২৪-৪৩৮১

ভবেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন, এ্যাঁ এখন কোথায় পেলি এ!

'লেক' বাজার থেকে এনেছি।

কমলার কণ্ঠ রাগে জ্বলে ওঠে। এ্যাঁ, এর জন্যে তুই এই তিন মাইল পথ হেঁটে লেক্ বাজারে গিয়েছিলি? মিথ্যা করে রামুয়া বলে, না আমার এক ভেইয়া'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম ওই দিকে, এই একবার বাজারে ঢুকলুম, যদি কিছু ভালমন্দ পাই।

এমনি করে 'তপ্‌সে মাছ', 'গঙ্গার ইলিশ্' সংগ্রহ করে আনে, কোনদিন নতুন বাজার থেকে, কোনদিন বা বাগ্-বাজারের খড়ের ঘাট থেকে। শুধু বাবু খেতে ভালবাসে বলে। তাছাড়া জোর করে, পীড়াপীড়ি করে খাওয়ার মায়ের মত।

খেতে বসে ভবেশবাবুর চোখে জল এসে পড়ে। তিনি বেশ জানেন, ওই সব সুদুর্লভ বস্তু, এ তল্লাটে কোথাও আজ-কাল পয়সা ফেললেও মেলে না! তার জন্যে কি পরিশ্রম করতে হয়। আবার ঘোপ-দোরস্ত কাপড়-জামা ভেঙ্গে হয়ত বেরুতে যাচ্ছেন ভবেশবাবু, রামুয়া হঠাৎ এসে পড়ে বলে, এ জামার কাছে কাপড়টা কেমন ময়লা দেখাচ্ছে, একেবারেই মেলেনি! এটা বদলে যান বাবু। এদিকে দৃষ্টি সবচেয়ে যার সজাগ থাকা উচিত, সেই স্ত্রীকে তখন ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁগো, রামুয়া বলছে, জামা-কাপড়ে নাকি মোটে মিল্ খায়নি। জামাটা বেশী ফর্সা দেখাচ্ছে!

কমলা শুধু নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দেয়, যখন ও বলছে, তখন নিশ্চয়ই বদলানো উচিত। বলে তখনি একটা ফর্সা কাপড় আলমারী থেকে বার করে দিয়ে চলে যায়। মনে মনে বলে আদিখ্যেতা!

কোনদিন বা ভবেশবাবু জামা-কাপড় পরে জুতোর ফিতেটা বাঁধছেন, এমন সময় ছুটে একটা ভাব কেটে এনে রামুয়া দাঁড়ায় তাঁর কাছে। স্মরণ করিয়ে দেয়, ডাক্তারবাবু ভাত খাওয়ার পর দু'-তিন দিন যে ভাব খেতে বলেছেন!

সাবানটা মুখে ভাল করে ঘষতে গিয়ে হঠাৎ ভবেশবাবুর চোখের ভেতর কেমন লেগে চিন্তার সূত্রটা কেটে যায়। মনে হয় কে কেন লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে। চোখে-মুখে বার বার জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে যখন জ্বলুনিটা নিবৃত্তি হয় তখন আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে মনটা। হাঁ, সেদিনের ঘটনা ভোলবার নয়। ভবেশ-বাবুর অন্তরে গাঁথা থাকবে চিরদিন।

কমলা বাপের বাড়ী গিয়ে দিন পনেরো থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সঙ্গে সঙ্গে যখন ভবেশবাবু উত্তর দিলেন, বেশ ত যাও না, থেকে এসো, তখন উৎসাহের পরিবর্তে সহসা নিরুৎসাহের মেঘ যেন ঘনিয়ে এল।

কিন্তু তোমাকে এখানে একা কে দেখবে?

কেন? রামুয়া ত রয়েছে! তবে তোমার এতো চিন্তা কিসের। বরং তোমারও ভুল হয় আমার কাজে, কিন্তু রামুয়াকে কি কোনদিন দেখেছো কিছু ভুলে যেতে, বিশেষ করে আমার কাজ!

জানি! বলার সঙ্গে সঙ্গে সহসা কমলার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো, মুখটা থম-থম করতে লাগল! তারপর চোখের জল সামলে নিয়ে বললে, এখন ত আমার সব কিছুতে খুঁত দেখবেই! আমার যাবো মা ত' কি-চাকরের কাজ করার জন্যে আমাকে তোমার হাতে তুলে দেননি! আর আমি ওসব পারি না বলেই ত রামুয়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন করে তৈরী করেছি! তাকে এত আদর-যত্ন করি—শুধু তোমারই জন্যে। তোমারই মুখ চেয়ে, তা তুমি বুঝতে পারো না!

আরে আমিও ত সেই কথাই বলছি!

তা জানি! বলেই সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কমলা। আগে দু'দিনের বেশী তিন দিন বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে চাইলে হাত ধরে কত কাকুতি-মিনতি করতো ভবেশবাবু, অথচ এখন পনেরো দিন থাকবে শুনেও তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে যেমন একবারও অনুরোধ করলেন না, তেমনি বললেন না, আমি কিছুতেই তোমায় ছেড়ে এতদিন থাকতে পারবো না। আসল ব্যথাটা যে কোথায়, তা বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে যান ভবেশবাবু।

এদিকে পনেরো দিন কেটে যাবার পর আরো তেরোটা দিন যখন রাগ করে বাপের বাড়ী বসে ছিলো কমলা এবং ভবেশবাবু তাকে চলে আসবার জন্যে একটা চিঠিও লিখলেন না, তখন অগ্নি-মূর্তি হয়ে একদিন নিজেই হাজির হলো। স্বামীর ঘরে ঢুকে অভিমান স্ফুরিত ওষ্ঠে বললে, আমি মরলুম কি বাঁচলুম একবার খোঁজ নিতেও ত গেলে না?

বালাই, ষাট! তুমি বাপ-মায়ের কাছে বিশ্রাম নিতে গেছো। জানি সুখেই আছো। দু'-দশদিন বেশী রইলে ভালই ত! তাছাড়া আমার যখন কোন অসুবিধে হচ্ছে না এখানে, কেন মিছিমিছি তুমি দুদিন জিরোতে গেছো, আমার তোমাকে টেনে আনি!

তার মানে ঝি-চাকরের কাজটা রামুয়া করে দিচ্ছে বলে আর স্ত্রীকে তোমার সংসারে কোন প্রয়োজন নেই? এই ত বলতে চাও?

ছিঃ ছিঃ—কি যা-তা বলছো। তুমি হলে গিয়ে আমার গৃহলক্ষ্মী!

থাক। আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না! সেইজন্যে লক্ষ্মীকে বিদেয় করে দিব্যি সুখে—স্বচ্ছন্দে ছিলে না? দেখো, আমার কাছে আর চালাকী করো না! তোমরা পুরুষ! তোমরা সব পারো। তোমাদের হাড়ে হাড়ে চিনেছি, জেনেছি! বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেললে কমলা।

ওই রামুয়া যদি চলে যেতো, তা'হলে আবার এই অকর্মণ্য বৌকে মনে পড়তো, তার তোষামোদ করতে জানি। ওই চাকরটা যখন আসেনি, তখন ত এই দাসীকে দিয়েই তোমার সব প্রয়োজন মিটতো, আজ ওকে পেয়েছো বলেই আমাকে এইভাবে ভুলতে পেরেছো!

কি বলছো? তুমি কি ওই চাকর-ঝিয়ের সমান!

তার চেয়েও অধম! রামুয়া যা করতে পারে আমি তা পারি না, না জানি না? কি, একদিনের জন্যেও তুমি আমাকে ডেকে বলোনি, এটা করে দিয়ে যাও! কমলার দু' চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল ঝরে পড়ে।

বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে ভবেশবাবু উত্তর দেন, সে তোমারই ভালর জন্যে!

আমার ভালর জন্যে কেউ ত তোমার মাথার দিব্যি দিতে আসেনি। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কমলার কণ্ঠ।

ভবেশবাবু নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত করে প্রশ্ন করেন, তোমার সংসার, তুমিত ইচ্ছে করলে আসতে পারতে, তোমাকে আবার ডাকতে হবে কেন?

চোখ দুটো এবার হিংস্র হয়ে ওঠে কমলার, তা হয়ত পারতুম। কিন্তু তুমি আরো কত দূর বাড়ো, আরো কত অব-হেলা, হতশ্রদ্ধা করো আমাকে, তাই দেখছিলুম এতদিন! ছি ছি বাবা-মার কাছে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারি না। তাঁরা জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, হাজার হোক চাকর সে কখনো তোর মত দেখা-শুনা করতে পারে! অথচ তোমার একবারও একথা মনে উদয় হলো না যে, আমার সম্মান রক্ষা করার জন্যে,

CENTRAL LIBRARY

কতত তোমার সেখানে গিয়ে আমায় নিয়ে আসা উচিত!

বলতে বলতে সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কমলা।

শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ভবেশবাবুর মনে পড়ে যায়, এর ঠিক কয়েকটা দিন পরেই ক্ষেন্তি ঝিকে নযুক্ত করেছিল কমলা। তিনি প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন, তবু যখন রামুয়াকে কাছ থেকে আরো বেশী কাজ পাওয়া যাবে এই অজুহাতে কমলা তাকে বহাল করলে, তখন তিনি বলেছিলেন অন্ততঃ তাকে একটা বুড়ো কি প্রৌঢ় গোছের লোক রাখলে ভাল হতো!

তারও জন্যে যুক্তির অভাব হয়নি কমলার। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, হাঁ বুড়ো মানুষ বিশ্বাস কি—দুদিন অসুখের দোহাই পেড়ে কামাই করবে, আর মামাকে তার মাইনে গুণে যেতে হবে। ক্ষেন্তির বয়েস কম, ভালই ত। ঝোঁয়ান, খাটিয়ে, অন্ততঃ কামাই করবে না যখন-তখন। ঝি-চাকর রাখতে গেলে, আগে সস্তা দেখা কর্তব্য নয় কি?

এর ভিতরে যদি ভবেশবাবু কমলার কোন দুরভিসন্ধি ছিল মনে করেন, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কমলা হয়ত কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিল। হয়ত তার সেদিনের সেই সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা আজ জয়যুক্ত হলো! কে জানে! স্ত্রীলোকের পক্ষে সবই সম্ভব। নারীমন দুর্জ্ঞেয় জটিল।

ভবেশবাবু স্নান করে বারান্দায় এসে দেখে চা তৈরী করে নিয়ে এলো কমলা।

স্বামীকে চা দিয়ে নিজের পেয়ালাটা হাতে করে এসে সে বসলো তার সামনে। তারপর পেয়ালাতে নীরবে দু-এক চুমুক দিয়ে নিঃশব্দে একবার ভবেশ-বাবুর মুখের রেখাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঝোলালেন সুরে বললে, তুমি রাগ করলে আমার ওপর! আচ্ছা ওই রকম কেলেঙ্কারীর পর কি আর রামুয়াকে বাড়ীতে রাখা চলে? মানুষের চরিত্রটাই সব! সেটা গেলে আর রইলো কি! কোন্ বিশ্বাসে তার ওপর ঘর-সংসারের সবকিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিই বলো?

ভবেশবাবু পেয়ালাটা হাতে করে কি যেন ভাবছিলেন। চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, সেদিকে বুঝি খেয়াল ছিল না। কমলার কণ্ঠস্বরে তার যেন চমক ভাঙ্গল। পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে, একসঙ্গে দু'বার চুমুক দিয়ে স্ত্রীর চোখের ওপর নিজের দুটি চোখ রাখতেই কমলা বলে উঠলো, দেখো ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! রামুয়াকে যে তাড়াতে হলো না, ও নিজে থেকেই চলে গেল—ভালই হয়েছে। কি বলো?

যেন তার এই কথার সমর্থন স্বামীর কাছ থেকে লাভ না করা পর্যন্ত সুস্থির হতে পারছিল না কমলা কিছুতেই।

ভবেশবাবু আরো মুহূর্ত কয়েক তেমনি নীরব থেকে, আবার চায়ের পেয়ালা থেকে একসঙ্গে দু চুমুক চা মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, হাঁ, ভালই হয়েছে।

শুধু তুমি কেন, যে শুনবে, সে-ই ওই কথা বলবে। তা আমি জানি। রামুয়াকে আমি ছেলের মত ভালবাসতুম! বলে অনেকদিন পরে আবার ছেলে-মানুষের মত হেসে উঠলো, অকারণে। বুঝি সেই গম্ভীর আবহাওয়াটাকে সে-হাসি দিয়ে তরল করে দিতে চায়।

গ্রাম:-নিশ্চিন্তমফট

ফোন: ৪৬-৬২৫৮

এ. সরকার

এণ্ড সন্স

এম · বি · সরকার

টাডিশ্যানাল জুয়েলার্স

১৭১-১এ, রাসবিহারি এভিন্যু, কলিকাতা-১১

ওয়েটার একবার বোধ হয় ডেকে-খেয়াল করে নি, এবার এসে খুব ত বাহুমূল ছুঁল। চোখ তুলে ই সেলাম করে বলল, দোকান বন্ধ গয়া সাব।

উঠে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে াম এগারোটা কুড়ি। কুড়ি মিনিট । দোকান বন্ধ হয়েছে। সদরে তালা- কিন্তু খিড়কি খোলা। সে পথ ব অজানা নয়।

বাইরের ফুরফুরে হাওয়ায় নেশাটা গাঢ় হয়ে এসেছিল, হঠাৎ পরে কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম:

গাছের নীচে অন্ধকারে একটা ছায়া। কান্নাটা যেন সে দিক থেকেই আসছে।

সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রোজকার মতন। চেনা ড্রাইভার। ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, বেসামাল হলে হাত ধরে সিঁড়ির কাছ বরাবর তুলে দেয়। এমন কি, বাড়তি পয়সা হাতে তুলে দিলে, ঠিক ফেরৎ দিয়ে দেয়।

ট্যাক্সিতে ওঠবার মুখে আবার বাধা। ছায়াটা এগিয়ে এল। একেবারে পাশে।

উস্কোখুস্কো চুল। চোখের জলে সযত্নে আঁকা প্রসাধন নষ্ট হতে গেছে। স্কার্টটা একেধারে আনকোরা নয়।

"প্লাশ বাবু, আমায় একটু পৌঁছে দেবেন। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

এবার চিনতে পারলাম। শরীরের আর দোষ কি। আমি হোটেলে ঢোকার সময় দেখেছি সামনের টেবিলে মেয়েটি বসে আছে, আর উঠে এল বোধ হয় আমার একটু আগে। এর মধ্যে একবারও প্লাশ খালি ছিল না।

তোমার সঙ্গে কেউ নেই? মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

মেয়েটি বব-করা চুলগুলো নাড়ল, না, ফিলিপ অন্য হোটেলে গিয়েছে। সারা রাতের প্রোগ্রাম।

ফিলিপ?

মেয়েটি একেবারে গায়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। তার স্কার্টের কোণগুলি উড়ে উড়ে আমার প্যান্টের ওপর এসে পড়ছে। সুরা আর সেন্টের মেশানো গন্ধ।

মেয়েটি কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল। ড্রাইভার অধৈর্য হয়ে উঠেছে, চলিয়ে সাব, বহুত দের হো গিয়া।

ট্যাক্সির দরজা খুলে সরে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আগে উঠল, আমি পিছনে।

কোথায় যেতে হবে? ড্রাইভার নয়, আমি জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটিকে।

একিডে প্লীজ। মেয়েটি সীটে হেলান দিতে দিতে বলল।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতে আমি পুরোনো কথার খেই ধরলাম, ফিলিপ কে বললে না?

মেয়েটি চোখ বুজে ছিল। সেই-ভাবেই উত্তর দিল, আমার স্বামী। ওই যে সামনে বসে বেহালা বাজাচ্ছিল।

ভাবতে আরম্ভ করলাম। একটি মেয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান করছিল। শেষ গানের লাইন কটা এখনও মাথার মধ্যে ঘুরছে। Ramona, we meet beside the waterfall পিছনে বসে একজন বেহালার ছড় টানছিল।

ফিলিপ গেল কোথায়?

বললাম যে, সারা রাতের প্রোগ্রাম। হোটেল ম্যাজিস্টিকে। সেই ভোরে ফিরবে।

মেয়েটি হাই তুলল। দু হাত প্রসারিত করে আড়ামোড়া ভাঙতে গিয়েই থেমে গেল। একটা হাত আমার গায়ে এসে লেগেছে।

কিছুক্ষণ কোন কথা হল না। মধ্য-রাতের কলকাতা। এখনও এখানে ওখানে দু' একটা ছুটকো লোক। নিশাচর। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে পুলিশের পরিচিত চেহারাও দেখা গেল।

একটু বসে যাবেন না সন্ধ্যা করে? এক পেয়ালা কফি করে দিই। এ ছাড়া কি-ই বা আপনাকে দিতে পারি।

হাত নেড়ে বারণ করলাম। নীচে থেকে অনাহত হর্ণের শব্দ কানে আসছে। অর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ড্রাইভার যদি ভাড়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যায় তবে এই নিশীথে এমন একটা জায়গায় বিপদেই পড়ে যাব। হেঁটে বাড়ী ফিরতে হবে।

শুভরাত্রি জানিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে এলাম।

ড্রাইভার ছাড়ল না। এ ধরণের রাত্রি-সহচরীদের অস্বীকার দিলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তার একটা বিভীষিকাময় চিত্র এঁকে সামনে ধরল। আমি ভগ্নহৃদয়ে সোনার ডান করলাম।

একটা সুবিধা, বাড়ী ফিরে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয় না। কৈফিয়ৎ নেবার লোক এখনও সংসারে আসে নি। আর কোনদিন আসবে এ সম্ভাবনাও কম। সংসারের কর্ণধার অশ্বিনী। একাধারে পাচক, পরিচারক ও শাসক।

সুরা পান করা নিয়ে অশ্বিনী কম বলে নি। রাত্রে ফিরে আসার পর ঝাড়া এক ঘণ্টা তার উপদেশ শুনতে হয়েছে। ইদানীং আর কিছু বলে না। বিশেষ করে জোর করে আমার প্রসাদ গ্রহণ করানোর পর থেকে।

এখনও মাঝে মাঝে পকেটে একটু জোর অশ্বিনীকে বলি, অশ্বিনীদা এটা রাখো। অশ্বিনী বলি কার আমি আলমারীতে রাখা ব্র্যাণ্ডি আর তিনের কোটোর প্রসাদই একটু কম থাকে। এ সব দিকে নজর দিতে গেলে সংসার চলে না। অন্ততঃ ঘর-ছাড়ার সংসার।

মেয়েটিকে পুরো দেখতাম। রাতে সামনের টেবিলে বসে থাকে। এক মনে বেহালা শোনে, পাশে চুমুক দেয়। নাম শুনলাম তোরা। ফিলিপের সঙ্গে বিয়ে হয় কি, তখনও জানা হয় নি।

কিছুদিন ধরে পাওনাদারের তাগাদা চলছে। শেষটা অবধি পড়ল ব্যাপারটা। উকিল আর কোর্টঘর করতে করতে বিশেষ কিছু সৃষ্টি করতে যাওয়া সম্ভব হয় নি। মেলাটুকু বাড়ীতেই করতে হয়েছিল।

পরে যেদিন বারে গেলাম, ডোরাও নেই, ফিলিপও উধাও। জনা একজন বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

একবার ভাবলাম, ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করি, তারপর মনে হল, কি দরকার ওসব বাড়াতে যাবে। কে কোথায় গেল তার খোঁজ রাখা আমার দায় নয়। তারচেয়ে পরম যত্নে যাদের পালটা মুখে তুললাম।

কিন্তু দেখা একদিন হয়ে গেল।

সিনেমার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। এক বন্ধুর অপেক্ষায়। হঠাৎ ডোরার সঙ্গে দেখা।

আমি লক্ষ্য করি নি, সেই এসে আমার সামনে দাঁড়াল, গুড ইভনিং মিস্টার।

নড্ করে তার দিকে চেয়েই অবাক হলাম। কোটরগত চোখ, বিবর্ণ ওষ্ঠাধর, অস্থিপ্রকট চেহারা। পরণের পরিচ্ছদও যথেষ্ট মলিন।

কি খবর?

ম্লান হেসে বলল, ভাল নয়।

বারে দেখি না যে?

আর যাই না ওখানে। কি করতেই বা যাব।

কোন প্রয়োজন ছিল না। নিছক সময় কাটাবার জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম, এমনি সময় কাটাতে। যে জন্য আমি যাই।

আমি সময় কাটাতে যেতাম না, আমি যেতাম ফিলিপের বেহালা শুনতে। সে আর নেই।

শেষ দিকের কথাগুলো ডোরা বলল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

নেই মানে? একটা চোখ হাতঘড়ির দিকে রেখে আবার জিজ্ঞাসা করলাম। নেই মানে, আমার কাছে নেই।

সেকি? আর একবার চাইলাম ঘড়ির দিকে। বন্ধুর আসার সময় পার হয়ে গেছে। এলে এতক্ষণে আসত। এখন আমার কিছু করার নেই।

আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন? সিনেমায় যাবেন? খুব করুণ কণ্ঠে ডোরা প্রশ্ন করল।

ঘাড় নেড়ে বললাম, না ব্যস্ত মোটেই নেই। এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে বোধ হয় আর আসবে না।

তা হ'লে একটু আসবেন আমার বাসায়?

এলিয়ট রোডে? বিস্ময় প্রকাশ করলাম। এখান থেকে এলিয়ট রোড পর্যন্ত গিয়ে কারো জীবন কাহিনী শোনার আমার আগ্রহ কম।

না, সেখানে তো আর আমি থাকি না। সেটা ফিলিপের বাড়ী ছিল।

তবে কোথায় যেতে হবে?

ডোরা বিগলিত গলায় বলল, এই যে পাশের গলি।

চেয়ে দেখলাম। শীর্ণ গলি। দু পাশে প্যাকিং কেস তৈরীর কারখানা। রাস্তার অর্ধেকটা জুড়ে কাঠ, পেরেক আর লোহার পাত ছড়ানো। শব্দও নেহাৎ কম নয়।

ডোরা এগিয়ে চলল। আমি পিছনে। দোকানীরা একবার চোখ তুলে দেখেই চোখ নামাল। বোঝা গেল এ সব ব্যাপারে তাদের উৎসাহ কম। দৃশ্যটাও বিশেষ অপরিচিত নয়।

গলির মাঝামাঝি। ছোট্ট ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। আধো-অন্ধকারে রীতিমত বিপদজনক।

উঠতে হবে নাকি? একটু সংশয় প্রকাশ করলাম।

বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। আর একটু কষ্ট করুন। এই যে সামনের দরজা। মাথাটা দেখবেন।

মাথাটা দেখা সত্ত্বেও একটু ঠুকে গেল। উঃ বলতে গিয়েই সামলে নিলাম। ছোট্ট নীচু ঘর। এমন আস্তানায় মানুষ থাকতে পারে, ভাবতে পারি নি।

ভিতরে ঢুকব কিনা ভাবছিলাম, মোমবাতি হাতে ডোরা এগিয়ে এল।

আসুন, আসুন।

বহু কষ্টে ভিতরে ঢুকলাম।

সামনে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর রঙীন কাপড় ঢাকা। বোঝা গেল সেটা সেন্টার টেবিলের কাজ করছে। চারপাশে জরাজীর্ণ মোড়া।

দেহের ভার সইবে কিনা ভেবে মোড়ার ওপর বসতে সাহস হচ্ছিল না। ব্যাপারটা বোধ হয় ডোরা বুঝল। কোণ থেকে একটা টুল টেনে এনে মাঝখানে রেখে বলল, আপনি বরং এইটের ওপর বসুন।

বসলাম। বললাম, বল কি বলতে চাইছিলে?

এক মিনিট অপেক্ষা করুন। ডোরা পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল। মিনিট কয়েক, তারপর ফিরল চায়ের কাপ হাতে করে। বোঝা গেল, বাইরের কোন দোকান থেকে ডোরা কিনে এনেছে।

চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললাম, এ সব হাঙ্গামা করার কি দরকার ছিল।

কোন উত্তর না দিয়ে ডোরা সামনের মোড়ায় বসল।

ফিলিপ আইভিকে বিয়ে করেছে।

জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে ডোরা কথাগুলো বলল। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত সুরে।

কে আইভি? চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার খুড়তুতো বোন। স্বামী মারা যেতে আমার কাছেই এনে রেখেছিলাম। সে ফিলিপের কাছে বেহালা শিখত। অনেক রাত অবধি গল্প-গুজব করত দুজনে। আমি ফিলিপকে বিশ্বাস করতাম। অন্য কোন সন্দেহই আমার মনে জাগে নি। তা ছাড়া, বরাবর ফিলিপ আমার আশ্বাস দিয়ে এসেছে, সে আমাকে বিয়ে করবে। হঠাৎ এক রাত্রে বাড়ী ফিরে দেখলাম, ফিলিপ আর আইভি পাশাপাশি বসে আছে। দুজনেই খুব হাসি-খুশী।

আমাকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল। ফিলিপ বলল, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম ডোরা, একটা কথা আছে।

আমি মনে করলাম একটা বড় হোটেলে ফিলিপের বেহালা বাজানোর কাজ পাবার কথা ছিল, সেইটে বুঝি

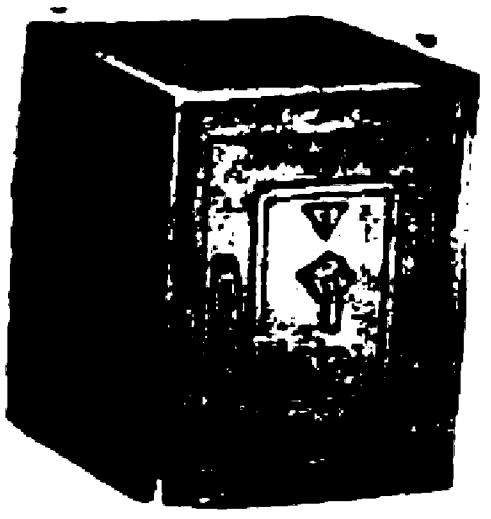

বম্বে সেফ্‌এর তৈরী ষ্টীলের আলমারী ও সেফ্ গৃহের নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

বম্বে সেফ্ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্

প্রাইভেট লিমিটেড

৫৬, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

ফোন : ২২-১১৮১

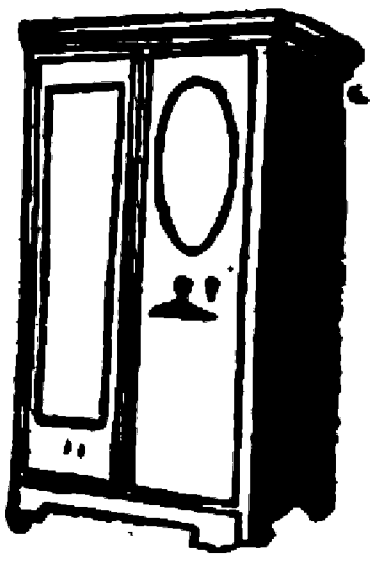

ছি। সেটা হওয়া মানে, দুজনের ও কাছে আসা। পাদ্রীর সামনে কিার করে একজনের আর এক- া ভার নেওয়া।

ফিলিপ কিন্তু অন্য কথা বলল।

াল সকালে আমরা বিয়ে করছি ।। আইভির খুব ইচ্ছা, তুমি বেস্ট হও।

"আসুন, আসুন"

মার হাতে একটা ফুলদানী ছিল, শরীর কেঁপে উঠতে সেটা হাত পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

চু হ'য়ে কাঁচের টুকরোগুলো ড় গিয়ে, হাতে একটা টুকরো ফুটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ল মেঝের স্কার্টে।

ট, রক্ত পড়ছে যে? ফিলিপ । হবার ভান করল।

চুল চেপে ধরে চুপচাপ বসে । ভাবলাম বলি, এ আর কতটুকু তে পাচ্ছ ফিলিপ। এর চেয়ে বেশী রক্তক্ষরণ হচ্ছে তোমার আড়ালে। সমস্ত হৃদয়টা নিঃস্পে-

বিয়ে করে সহজ ধর্মের রথ গড়িয়ে পড়ছে।

ভোর রাতে বাড়ী ছাড়লাম। এ সংসার নিজের হাতে একটু একটু করে গুছিয়ে ছিলাম। যে-টুকু অবসর পেতাম, কেবল সংসারের চিন্তা করতাম। রাত জেগে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে-জুড়ে পর্দা, পুরোনো স্কার্ট দিয়ে চেয়ারের ঢাকনা, ভাড়া করা ফার্নিচার, কিন্তু এমন বহু লোকে নিজের জিনিসেও করে না।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ। ডোরার আর কিছু বলার নেই। যেটুকু বলার ছিল বলেছে। আমারও জিজ্ঞাসা করার কিছু ছিল না।

উঠে দাঁড়ালাম।

চলি ডোরা একটু কাজ আছে।

ডোরাও উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনার কাজ মানে তো 'বার-এ' গিয়ে বসা। তাই না?

হাসলাম, হ্যাঁ তাই। ওখানে বসে কি মনে হয় জানো। পৃথিবীতে ওই যায়গা-টুকুই বুঝি সত্যি, ওই কয়টুকুই আনন্দের। নয় তো আর সবই তো অলীক। মানুষের ওপর আর কতটুকু আস্থা রাখা যায় বল?

ডোরা কি বুঝল জানি না। মাথা নিচু করে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবার চেয়ে দেখলাম। মোমবাতিটা ধরে ডোরা পাষাণ-মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে। না, পাষাণ-মূর্তি নয়, পাষাণ-মূর্তির দু চোখ বেয়ে ওভাবে অশ্রুর ধারা নামে না।

এর পরে পথে আর একবার ডোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

অত্যধিক মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে শরীরে। পেটের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা অনুভব করছি। সেইজন্যই ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি, ওষুধ আনা এসব চলেছে। রসদও ফুরিয়ে এসেছে। এমন সময় ফুরোনো, যখন রসদের সত্যি-কারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

এবার ডোরার সঙ্গে আর একটি যুবক। পোশাক দেখে মনে হল জাহাজের নাবিক।

এবারেও ডোরা আমাকে প্রথমে দেখতে পেল। রাস্তা পার হচ্ছিলাম, পিছন থেকে ডাকল, মিস্টার, মিস্টার।

ফিরে এলাম। ফুটপাতের ওপর।

ডোরা এগিয়ে এসে বলল, আসুন আলাপ করিয়ে দিই। আমার ফিয়াসে আর্থার। আর্থার টমসন। আর ইনি, ইনি—

ডোরা মাঝপথেই থেমে গেল। আমার নাম, পদবী কিছুই জানে না। কোনদিন জানবার সুযোগও হয় নি। তাড়াতাড়ি কথাটা পাল্টে নিয়ে বলল, আমার খুব পুরোনো বন্ধু আর হিতাকাঙ্ক্ষী।

আর্থারের হাতে হাত রাখলাম। নীল চোখ, দীর্ঘ চেহারা। জলের জীব, স্থলে থাকার কয়েকটা দিন প্রাণভরে যারা আনন্দ করে, সেই জাতের। এদের ভাল-বাসাও জলের রেখার মতনই। সহজেই মুছে যায়।

তবু ডোরাকে অভিনন্দন জানালাম। বললাম, তোমার ভাবী জীবন সুখের হোক। এবারে সংসার পাতছো কোথায়?

ডোরা লাজুক হ'য়ে উঠল। অন্যদিকে চেয়ে বলল, এখনও ঠিক করি নি। আর্থার এ চাকরি ছেড়ে দেবে। জল-পুলিশে বদলির চেষ্টা করছে। সেটা হ'য়ে গেলেই আমরা কোথাও বাসা ঠিক করব।

ডোরাকে এত প্রাণচঞ্চল এর আগে দেখি নি। মনের মানুষকে নিয়ে জলের

নাগিন লেক : কাশ্মীর ফটো : সুরেন্দু গাঙ্গুলী

নতুন বাসা বাঁধবে, তাই বুঝি ওর এত উল্লাস।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বহুদিন পরবাসী ছিলাম। পরমায়ুর বিনিময়ে জীবনের শেষ কপর্দক প্রায় হাতছাড়া হয়ে গেছে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছি। একটা মিলে খাতা লেখার কাজ। সকালে বেরুতে হয়, দুপুরে খাবার ছুটি আবার ডিউটি রাত আটটা পর্যন্ত। বাসাও নিয়েছি খিদিরপুরে। মিলের কাছাকাছি। বাসা মানে এক ডালে বহু বিহঙ্গের বাসা। মেসবাড়ী।

বিকেলের দিকে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বহুদিনের নেশা। একদিন আমার কাছে অমৃত ছিল। আজ ডাক্তারের নির্দেশে অমৃত বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছুটির দিন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। ডেউয়ের কলরোল, মাঝি-মাল্লাদের হৈ-হল্লার মধ্যে নিজের ফেলে আসা জীবনের উষ্ণতা ফিরে পাই।

মাঝে মাঝে ভাবি। যে সম্পদ আমার হাতে এসেছিল, তা দিয়ে জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারতাম। নতুন ভাবে। কিন্তু অর্থের সে সমুদ্রে আমি উচ্ছৃঙ্খলতার ডেলা ভাসিয়েছিলাম। বহু কষ্টে নিজের সলিল-সমাধিটুকু বাঁচাতে পেরেছি।

শনিবার মিলের কাজ সেরে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরছি। সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ। মেজাজটাও তাই। হঠাৎ হৈ-চৈ চীৎকারে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গোলমালটা এ ভল্লাটে একটু বেশী। ছোট-খাটো দাঙ্গা লেগেই আছে। মাতাল নাবিকদের চেঁচামেচি। মিলের মজুরদের রেষারেষি, তা ছাড়া মোটর দুর্ঘটনাও কমতি নেই।

পথ-চলতি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার মশাই?

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু ব্যস্ত ছিলেন। চলতে চলতেই বললেন, কি জানি, বোধ হয় কেউ কাউকে ছুরি-টুরি মেরে থাকবে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক যতটা অবিচলিতচিত্তে ঘটনার বিবৃতি দিলেন, ঘটনাটাকে অত লঘু বলে মেনে নিতে পারলাম না। ছুরি-ছোরার ব্যাপার, একটু সাবধান হওয়াই ভাল। অথচ অন্য পথ নেই। বাড়ী ফেরবার ওই একটি মাত্র রাস্তা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। ভীড়ের মধ্যে ছেলে-ছোকরাই বেশী। দু-একজনের হাতে ইঁটের টুকরোও রয়েছে।

কি হয়েছে ভাই? তাদের একজনকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা পাগলী সার।

পাগলী। পাগলীকে নিয়ে এত হৈ-চৈ কেন? অবশ্য মারাত্মক পাগলীও দু-একজন আছে।। মনে আছে একজন আমাকে একবার প্রায় আধ মাইল পথ দৌড় করিয়েছিল।

ভিড়ের মাথার ওপর দিয়েই একবার নজর দিলাম। কিছু দেখা গেল না। ভীড় কাটিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে গেলাম।

পরণে শতছিন্ন স্কার্ট, গলায় রঙীন কাগজের মালা, মাথায় শোলার হ্যাট। এক পায়ে ছেঁড়া মোজা। জীর্ণ জুতো। স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের। সারা মুখে দগদগে ঘা। দুটো চোখ স্ফীত, রক্তবর্ণ।

তবু চিনতে পারলাম। ডোরা।

দু-একটি ছোকরা ঢিল ছোঁড়বার চেষ্টা করতেই তাদের বাধা দিলাম।

কেন, ওকে জ্বালাতন করছ? কেন ঢিল ছুঁড়ছ?

ওকে মারছি না সার, ওর ঘরে ইঁট মারলেই পাগলী ক্ষেপে উঠছে।

ঘর?

এইবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম।

ডোরা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

একটা টেলিগ্রাফের পোস্টের পাশে আরও কতকগুলো বাঁশের খুঁটি পুতেছে। তার ওপর কিছু ঢেউ-টিন আর পুরোনো নারকেল পাতার ছাউনি। তলায় পরিপাটি করে পেতেছে একটা ছেঁড়া মাদুর। একটা ভাঙা প্যাকিং কেস মাঝখানে। তার ওপর ভাঙা কুঁজোর কিছু নোংরা কাগজের ফুল।

ডোরার সংসার। এই সংসারটুকু বাঁচাবার জন্যই সে জনতার নিক্ষিপ্ত ঢিল, ইঁটের টুকরো নিজে বুক পেতে নিচ্ছে।

আর একবার ছোকরাদের বারণ করতে গিয়েই থেমে গেলাম। এদের ধাক্কাতেই ডোরার সংসার বাঁচবে না। আরও বড়ো ইঁটের টুকরো যে ছুঁড়ছে, তাকে আটকাবো কি করে?

CENTRAL LIBRARY

অরণ্য ও আরণ্যক

অমল দাশগুপ্ত

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের সাহিত্যে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে অরণ্য। বিশেষ করে ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই। ঋগ্বেদের সূক্তাংশে, বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে রামের বনবাসে, মহাভারতের অজ্ঞাতবাস পর্বে, কৃষ্ণের অরণ্যলীলায়, কথাসরিৎসাগরের গল্পে, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের পটভূমিতে। অরণ্য ও আরণ্যক জীবকে বাদ দিলে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি অনেকাংশে বাতিল হয়ে যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এমন সমস্ত কথা বলা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, অরণ্য ও আরণ্যক জীবকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সে যুগেও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। আজকাল যাকে আমরা বলি প্রোটেকটিভ বা সংরক্ষিত অরণ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অভয়ারণ্য'। আইন জারি করা হয়েছিল যে অভয়ারণ্যের এলাকার কেউ যদি হরিণ, গোরু বা বাইসন, পাখি ও মাছ বা অন্যান্য জীবকে ফাঁদে ফেলে, নির্যাতন করে বা হত্যা করে তাহলে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। সকল আরণ্যক জীবজন্তুর এক-ষষ্ঠাংশকে এই অভয়ারণ্যের আশ্রয় দেওয়া হত। কোনো কোনো জন্তু বা পাখির ক্ষেত্রে মৃগয়া বা হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কালিদাসের কাব্যে অরণ্য ও আরণ্যক জীবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে নিবিড় ও মাধুর্যমণ্ডিত চিত্র উপস্থিত হয়েছে তা আজও আমাদের মুগ্ধ করে। কালিদাস যদি একালের লেখক হতেন তাহলে একালের পরিভাষায় কালিদাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আখ্যা দিতাম।

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি আমরা আমাদের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণকথা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাই তাহলে এমন কথাও আমাদের মনে হতে পারে, আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোটা অতীতটাই এক কথায় অরণ্যবন্দনা। ঋষির ধ্যানের আলয়কে আমরা নাম দিয়েছি তপোবন, রাজার উপবেশনের আসনকে সিংহাসন। অরণ্যের প্রত্যেকটি বৃক্ষকে আমরা মর্যাদা দিয়েছি, প্রত্যেকটি জীবকে মহিমান্বিত করেছি। শুধু তাই নয়, স্বর্গের দেবদেবীরা পর্যন্ত আমাদের কল্পনায় এই পৃথিবীর অরণ্যচারী এক একটি জীবকেই বাহন করেছেন।

এই কারণেই অরণ্য ও আরণ্যক জীবকে নিয়ে আমাদের দেশে অতুলনীয় সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প পড়েন নি বা শোনেন নি, এমন মানুষ আমাদের দেশে খুব সম্ভবত একজনও নেই। এই দুটি গ্রন্থ পশুপাখির আশ্চর্য এক জগতকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। শেয়াল, সিংহ, হরিণ, কচ্ছপ, কাক, ইঁদুর, বানর, কুমির, উট, হাতি, মশা, বেড়াল, সাপ, পেচা, চড়াই—পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পে এমনি অজস্র পশুপাখির আনাগোনা। গল্পে এরা মানুষের মতোই কথা বলে, মানুষের মতোই সুখে-দুঃখে অভিভূত ও বিচলিত হয়, মানুষের মতোই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার পাতে। পড়তে পড়তে এই পশুপাখির জগতকে আমরা আপন জগৎ বলে ভাবতে সুরু করি। এই আধুনিক বিজ্ঞান যুগের দ্রুত ধাবমান জীবনেও এই সমস্ত গল্পের রস আমাদের কাছে এখনো ফিকে হয়ে যায় নি।

আর-আমাদের কবিরা পাখির কূজন নিয়ে কত যে কাব্য রচনা করেছেন তা সংখ্যায় হিসেবে ধরা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালের শক্তিমান ঔপন্যাসিক বনফুল শুধু পাখিদের নিয়েই একটি উপন্যাস লিখেছেন। তাছাড়া, কাব্য বা সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও, একটা তুলতুলে চড়াই পাখি যখন এক ফালি রোদ সারা গায়ে মেখে আমাদের ঘরের জানলার আলসেতে নাচানাচি করে—সে দৃশ্য আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বস্তুসর্বস্ব মানুষের মধ্যেও খানিকটা খুশির ছোঁয়া বুলিয়ে দেয়।

খুব সম্ভবত এই কারণেই ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীদের এই পশুপাখির জগৎ যতোটা টেনেছে এমন আর কোনো কিছু নয়। সব যুগের সব দেশের শিল্পকর্ম সম্পর্কেই একথা সত্যি। আমাদের দেশে সাঁচী স্তূপে বা অজন্তা গুহায় বা খাজুরাহো মন্দিরগাত্রে এমন নিদর্শন অজস্র ধরেছে যা থেকে বোঝা

যায়. এই পশুপাখির জগৎ মানুষের কল্পনাকে কতখানি উদ্দীপিত করেছে।

অবশ্য চোখ খোলা রাখলে এমনি ধরণের নিদর্শন আমরা জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখতে পাব। আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা এখনো পশুপাখির মূর্তি গড়ি। যে কোনো মেলায় গেলে আশ্চর্য রংয়ে রেখায় উজ্জ্বল পশুপাখির খেলনা-মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল তো রুচিবান মানুষের ড্রইং-রুমেও এই পশুপাখির খেলনা মূর্তি স্থান পেয়েছে।

তার চেয়েও বড়ো কথা, আদিম ট্রাইবাল মানুষ বিশেষ বিশেষ পশু কিংবা পাখিকেই তাদের আদিপুরুষ বলে মনে করত। আমাদের দেশের প্রাচীন পুথিতে পশুপাখি বা গাছ-গাছড়ার নামে বংশ-পরিচয় দেবার দৃষ্টান্ত অজস্র। ঋগ্বেদে একদল মানুষকে বলা হয়েছে অজ বা ছাগল। আরেক দলের নাম শিগ্রু বা সজনে। মৎস্য তো আছেই। রামায়ণ-মহাভারতের এমনি কয়েকটি নাম—পাঁচা, বিছে, কাক, আখ, বেল, শেয়াল, গাধা, গোসাপ, মুরগি, হাতি, ভেড়া, শূয়োর, বাঘ, পংগপাল, হাঁস, মাগুর মাছ, খরগোশ, ঘোড়া, তাল, শাল, বাঁশ, জাফান ইত্যাদি। বৈদিক-সাহিত্যের কয়েকটি ঋষি-নাম : কৌশিক, মাণ্ডুকেয়, গোতম, বৎস, শুনক। কৌশিক মানে পাঁচা, মাণ্ডুকেয় মানে ব্যাংয়ের বাচ্চা, গোতম মানে ষাঁড়, বৎস মানে বাছুর, শুনক মানে কুকুর। নৃতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেই জানেন, যে বিশেষ জন্তু বা গাছের নাম থেকে বংশের পরিচয় থাকে তাকে বলা হয় টোটেম। এই আদিম টোটেম-বিশ্বাসকে আমরা বহুদূর পেছনে ফেলে এসেছি বটে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই টোটেম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সমস্ত আচার-কানুন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি।

যাই হোক, বৈদিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, অরণ্য ও আরণ্যক জীব আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রবন্ধে ভারতের অরণ্য ও আরণ্যক জীব সম্পর্কে কিছু তথ্য নানান সূত্র থেকে সংগ্রহ করে এক সঙ্গে উপস্থিত করছি।

আয়তন

ভারতের মোট আয়তন ১২,৬৬,১০০ বর্গমাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই দেশটির বিস্তৃতি প্রায় ২০০০ মাইল। পূবে থেকে পশ্চিমে প্রায় ১,৭০০ মাইল।

ভারতের প্রাকৃতিক গড়ন সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় যা কয়েকটি দীর্ঘতম নদীর উৎস। দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, যার উত্তরে জঙ্গলঢাকা পাহাড়, পূবে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর। আর হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে রয়েছে ১২০০ মাইল লম্বা গাঙ্গেয় সমতলভূমি, যার পশ্চিমে রয়েছে ভারতের মরুভূমি অঞ্চল।

এই বিরাট ও বিচিত্র দেশটিতে ২,৮০,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়ে আছে অরণ্য। প্রতি বছরের প্রায় ৫৫ কোটি ঘনফুট কাঠ এই অরণ্য থেকে পাওয়া যায়। প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ এই অরণ্য থেকে জীবিকানির্বাহ করে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই অরণ্য থেকে সরকারী কোষাগারে আয় হয়েছিল ২০২০ লক্ষ টাকা।

এ থেকে শতকরা হিসেবটাও বার করা চলে। ভারতের মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ২২-৩ ভাগ হচ্ছে অরণ্য। তবে যেহেতু ভারতের সব অঞ্চলে অরণ্যের বিস্তৃতি সমান ভাবে হয় নি, কাজেই আঞ্চলিক ক্ষেত্র এই শতকরা হিসেবটা অনেকখানি ওঠানামা করে। ত্রিপুরায় মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ অরণ্য, আসামে শতকরা ৪৪ ভাগ।

এইসব অঙ্কের হিসেব দেখে এমনিতে মনে হতে পারে, কোনো একটি দেশে এত বেশি অরণ্য থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কয়েকটি উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে, এমন কি অরণ্য-সম্পদেও ভারত কতখানি দীন। সোভিয়েত ইউনিয়নে মাথাপিছু অরণ্য রয়েছে ৩-৫ হেক্টর (১ হেক্টর= ২-৪৭১ একর), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১-৮ হেক্টর আর ভারতে মাত্র ০-২ হেক্টর। এমন কি অরণ্যজাত উৎপাদনের পরিমাণও ভারতবর্ষে অনেক কম। অঙ্কের হিসেবে আসা যাক। ফ্রান্সে অরণ্যজাত উৎপাদনের পরিমাণ একর প্রতি ৫৬-৮ ঘনফুট। জাপানে ৩৭-০ ঘনফুট, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৮-০ ঘন-ফুট আর ভারতে মাত্র ২-৫ ঘনফুট।

অরণ্যের তাৎপর্য

অরণ্য শুধুই শোভা বর্ধন করে না, শুধুই কতকগুলো প্রয়োজনীয় উপকরণ (বাঁশ, লাক্ষা, আধা, রজন, ভেষজ ইত্যাদি) সরবরাহ করে না, অন্য এক-দিক থেকেও দেশ ও জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে।

অরণ্য একদিকে যেমন ভূমিভূক্ত আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে জমিকে উর্বরা করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি আব-হাওয়াকে করে তোলে অনুকূল। এক-একটি গাছ যেন এক-একটি পাম্প। এই পাম্প মাটির তলা থেকে জল টেনে তুলছে আর বাতাসকে করে তুলছে আর্দ্র। আজকাল আমাদের দেশের অনেক অংশে আবহাওয়া যেন আচমকা পালটে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটা ঘটেছে গাছপালা কেটে ফেলার দরুণ।

অরণ্য ঢালু জমির ক্ষয় রোধ করে। বৃষ্টির জল যখন পাহাড়ে জমি দিয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে তখন তা তোড়ের মুখে অনেকখানি জমিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পাহাড় যদি জঙ্গলে ঢাকা থাকে তাহলে গাছের শেকড় জমিকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে যে বৃষ্টির জল সহজে আর সেই জমিকে আলগা করতে পারে না। তাছাড়া গাছের মোটা শেকড় অনেকখানি বৃষ্টির জল শুষে নেয় এবং সেই জলের সঞ্চয় শেষ পর্যন্ত হয়তো বা ঝরণা বা ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে অরণ্যের সাহায্যে সারা বছর ধরে জলের যোগান অব্যাহত থাকে ও বন্যার আশঙ্কা কমে।

এবারে উল্টো ছবিটাও কল্পনা করা চলে। ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় যেখানে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই, এই অবস্থায় বৃষ্টির জল জমির উপরিভাগের সারাংশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বালি আর কাঁকরে পাহাড়ের নিচের জমিও হয়ে ওঠে অনাবাদী, অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা, অল্প অনাবৃষ্টিতেই খরা। অরণ্য না থাকলে দেশের চেহারা যে কী নিষ্করুণ হয়ে ওঠে তার একটি দৃষ্টান্ত মেসোপটেমিয়া। এককালের এই উর্বর ও সমৃদ্ধ দেশটি এখন একেবারেই মরু-ভূমি হয়ে উঠেছে। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ারও একই অবস্থা। ভারতে নিবরণ্য-করণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঞ্জাবের শিবালিক। তিনশো বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন এখানে নূরজাহানের জন্যে নূরপুর দুর্গটি তৈরি করেছিলেন তখনো এখানে এত ঘন অরণ্য ছিল যে, পাথর পক্ষে পুরো-পুরি ডানা মেলা সম্ভব হত না। মাত্র তিনশো বছরের মধ্যেই সেই ঘন অরণ্যের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের ঢালু গা বৃষ্টির জলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষয় হয়ে চলেছে।

অবশ্য ভারত সরকার বর্তমানে অরণ্য-সংরক্ষণ সম্পর্কে অতিমাত্রায়

জাগ। অরণ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের নো প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় রচ করা হয়েছে ৯৫০-৫ লক্ষ টাকা, বতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ২৪ াটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনান্তে প্রায় ম-পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। ৯৫০ সাল থেকে এই উদ্দেশ্যে বন-হোৎসবও শুরু হয়েছে।

কিন্তু এত অর্থ বরাদ্দ ও এত য়োজন সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে রণ্য-সম্পদের দিক থেকে আমাদের শ যে খুব বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে তা লা চলে না। কারণ একদিকে অরণ্য ম্পদ রক্ষার জন্য এত বিপুল আয়োজন ত্ত্বেও অন্য দিকে জমিকে আবাদী রার প্রচেষ্টায় ও বাঁধ নির্মাণের কর্ম-াণ্ডে বিস্তৃত অঞ্চলের অরণ্য লোপ াচ্ছে। দৃষ্টান্ত অজস্র। তেরো মাইল ম্বা হিরাকুদ বাঁধের পেছনে যে বিস্তৃত র তৈরি হয়েছে তার ফলে উড়িষ্যার কটি প্রাচীনতম অরণ্য অঞ্চলের বলুপ্ত ঘটেছে। তেমনি অবলুপ্ত য়েছে উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলের তরাই ঙ্গল। কবিনি নদী পরিকল্পনাটি মাপ্ত হলে মহীশূরের পঞ্চাশ মাইল রের সুবিস্তৃত বাঁশের জঙ্গলটিরও আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কুমায়ুন পাহাড়ের রামগঙ্গা নদীর বাঁধ কবেটে সংরক্ষিত অরণ্যের অনেকখানি অংশকেই জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে, এমন আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি আসামের বিখ্যাত কাজীরঙ্গা সংরক্ষিত অরণ্য থেকেও টুকরো টুকরো অংশ হাসিল করার চেষ্টায় কোনো বিরতি নেই। এই দূরদৃষ্টিহীন নিবরণ করণের মারাত্মক ফল দেখা দিয়েছে ভারতের আরণ্যক জীবের ক্ষেত্রে। এমন কি কোনো কোনো পশু একেবারে নির্বংশ হবার মুখে। যেমন, ভারতীয় চিতা, এককালের এই বিখ্যাত ভারতীয় পশুটি এখন লুপ্তপ্রায়। এবং এ ব্যাপারটি যদি চলতে থাকে তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরো বহু ভারতীয় পশুর একই অবস্থা দাঁড়াবে। কিন্তু এ আলোচনা তোলবার আগে ভারতের আরণ্যক জীবের কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

ইতিপূর্বে ভারতের প্রাকৃতিক গড়ন সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, এই বিপুল ও বিচিত্র দেশের আবহাওয়া সর্বত্র একই ধরণের হওয়া সম্ভব নয়। হয়ও নি। একদি তিব্বত সীমান্তে হিমালয় অঞ্চল জু রয়েছে চির-তুষারের রাজত্ব, অন্যদি রাজস্থানের মরুভূমি। বিকানিরে গ্রী কালে উত্তাপের মাত্রা ১২০ ডি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়, অ দার্জিলিং-এ শীতকালে তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নেমে আ জয়সলমারে সারা বছরে ৫ ইঞ্চিও বৃ হয় না, অথচ চেরাপুঞ্জিতে প্রায় ৪০ ইঞ্চি। কাজেই, স্বাভাবিক কারণে ভারতের এই আবহাওয়াগত তারত উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগতেও বৈচি এনেছে।

ভারতে স্তন্যপায়ী জীব আ ৫০০ রকমের। জীববিজ্ঞানের ভাষা বলা হয় স্পিসিস বা প্রজাতি। অর্থা ৫০০ বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী তেমনি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আ ৩,০০০ আর পোকামাকড় ৩০,০০০ তাছাড়া আছে নানা প্রজাতির সা সরীসৃপ ও উভচর জীব। সব মিলি ভারতীয় আরণ্যক জীবের যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে তা যেমনই বর্ণাঢ্য, তেমনি সুসমৃদ্ধ।

CENTRAL LIBRARY

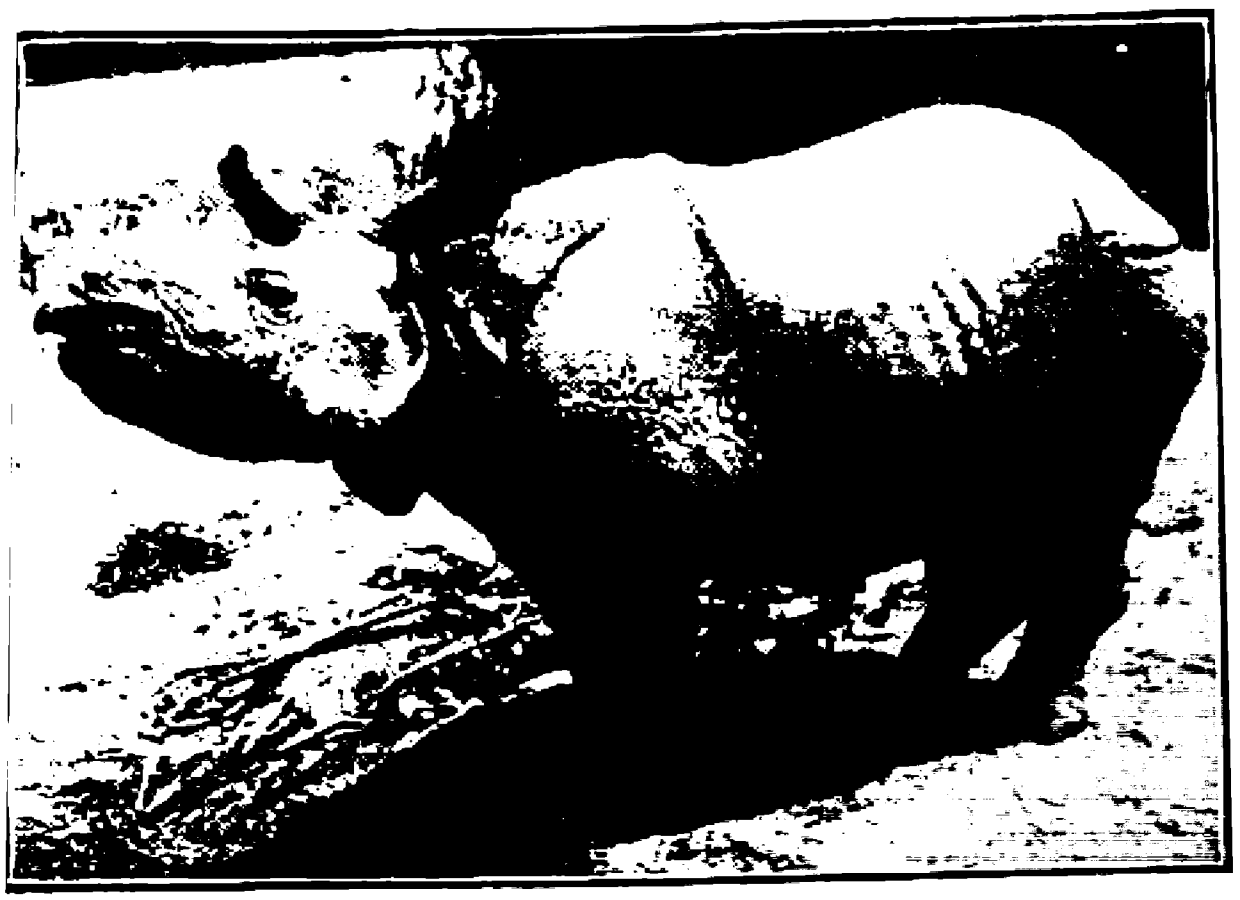

লে বন্য পশুরা আশ্রয় নিয়েছে উত্তরের মালয়-পাদদেশের তরাই জঙ্গলে, শ্চিমের আরাবল্লী পর্বতে ও দক্ষিণের লভূমিতে।

এই অঞ্চলের পশুদের মধ্যে য়েছে—

(ক) হিমালয়ের পাদদেশে বাঘ, তাবাঘ, সম্বর, ভালুক, কাকর, গণ্ডার আসামে ও বাংলায়। চিতল, হরিণ ও র শিংওলা বন্য ছাগল;

(খ) মধ্যবর্তী এলাকায় কৃষ্ণসার, লিগাই, নুলোর, সজারু, ইত্যাদি;

(গ) আরাবল্লী পাহাড়ে ও দক্ষিণের লভূমিতে বাঘ, চিতাবাঘ, সম্বর, কাকর, চতল ও ভালুক।

ক্ষিণাত্য

এই মালভূমিটি ঘিরে রয়েছে সারি ারি পাহাড়। উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা, ুরে পূর্বঘাট ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। াবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত অনুসারে এই ঞ্চলটিকে তিনটি এলাকায় ভাগ করা লে—

(ক) পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, মালাবার পকূল ইত্যাদি সমেত পশ্চিম উপকূল, যখানকার বৃষ্টিপাত বছরে ৮০ ইঞ্চি বা ারও বেশি;

(খ) বোম্বাই, ইন্দোর, নাগপুর ত্যাদি সমেত গোদাবরীর উত্তরের মাল-ভূমি, যেখানকার বৃষ্টিপাত বছরে ৪৫ থেকে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে;

(গ) পূর্ব উপকূল, যেখানকার বৃষ্টিপাত ২০ থেকে ৩০ ইঞ্চির মধ্যে।

এই অঞ্চলের বন্য পশুদের মধ্যে আছে বিভিন্ন জাতীয় ছাগল, বন্য বেড়াল, শেয়াল, নকুল, হায়েনা, নেকড়ে, কাঠ-বেড়াল, খরগোস ইত্যাদি। বাইসন, সম্বর, ভালুক ও বন্য কুকুরও পাওয়া যেতে পারে। আর আর্দ্র এলাকাগুলিতে আছে হরিণ, মহিষ ও হাতি। এ ছাড়াও পশ্চিম উপকূলের দিকে হাতি, বাইসন, নকুল, উদ ও আরো কয়েক ধরনের পশু

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

বন্য ভেড়া ও ছাগলের বাস প্রধানত হিমালয় অঞ্চলে। এমন কি হিমালয়ের দশ হাজার ফুট উঁচুতেও কয়েক জাতের ভেড়া দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন তিব্বতী ভেড়া। উঁচুতে প্রায় চার ফুট (মাটি থেকে গর্দান পর্যন্ত) আর চারশ ইঞ্চি লম্বা শিঙ। আবার আরেক জাতের ভেড়া আছে যাদের শিঙের বাহার আছিয়ে নেবার মতো। শিঙের হাতির দাঁতের মতো, অনেকটা ঘড়ির মতো পাক খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে ছড়িয়েছে, লম্বায় প্রায় ৩৫ ইঞ্চি। উরিয়াল ও নীলগাই সুন্দরবনের দিকে যাদের মাকারি, শিঙের দিক থেকেও কাছাকাছি। ছাগলও নানা জাতের—যেমন, ঝাড়িয়ার (৬৫ ইঞ্চি লম্বা), প্রায় তিন ইঞ্চি মিহি), সিরুয়ি (৩৩ ইঞ্চি লম্বা), গোরাল ইত্যাদি।

তবে শিঙের বাহারের দিক থেকে ভেড়ার ওপরে কাউকেই টেক্কা দেয়া

দে গন্ধে অতুলনীয়

সুদৃশ্য প্যাকেট ৫০০ গ্রাম ৩.২০;
২৫০ গ্রাম ১.৬৫ ডাকমাশুল প্রাইজ কুপন

ব্যবহার করুন "ADNIVAG"

বার, শিঙ নেই এমন হরিণও আছে, : নাম দেওয়া হয়েছে কস্তুরী। এই রণের শরীরে এমন একটি গ্রন্থি আছে থেকে কস্তুরী সুবাস নিঃসৃত হয়। নিকে পাঞ্জাব অঞ্চলে হিমালয়ের কণে আছে চারশিঙওলা হরিণ, যার তি নাম চৌশিঙ।

ভারতীয় গণ্ডারের কিন্তু একটিমাত্র ঙ আর শিঙের আশ্চর্যভীয়তার জন্যেই র পৃথিবীজোড়া খ্যাতি। গণ্ডার ফ্রিকাতেও আছে কিন্তু সেই গণ্ডারের ঙ দুটি।

ভারতে এই বিখ্যাত জীবটি কিছু- ল আগে প্রায় লোপ পেয়ে যাবার মতো স্থায় এসেছিল। গত চল্লিশ বছর র সরকারী প্রচেষ্টায় সংরক্ষিত অঞ্চলে দের রক্ষণাবেক্ষণ চলেছে।

তবে ভারতের অরণ্যে কিন্তু শৃঙ্গ- দের চেয়ে শৃঙ্গহীনদেরই প্রতাপ শ। যেমন, হাতি, বাঘ ও সিংহ। াশা সিংহ সম্পর্কে একটি বলার কথা ছে। কিছুকাল আগে ভারতের উত্তর ও া অঞ্চলে সিংহ পশুরাজের মতোই অবাধে চলাফেরা করত। এখন শুধু গুজরাটের গির সংরক্ষিত অরণ্যে কয়েকটি সিংহকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রপ্রভা সংরক্ষিত অরণ্যেও তিনটি সিংহ আছে। ভারতে মোট সিংহের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিনশো।

বিলীয়মান ও লুপ্তপ্রায়

বিলীয়মান ও লুপ্তপ্রায় পশুর তালিকায় প্রথমেই নাম করতে হয় চিতার। তারপরে একশৃঙ্গ গণ্ডারের। অবশ্য শেষোক্ত জীবটির অবস্থা এখন ভালোর দিকে। আসামের সংরক্ষিত অরণ্যে বর্তমানে গণ্ডার আছে ২৪০। কুচবিহারে আছে কুড়িটি, বিহারে পাঁচটি। সব মিলিয়ে বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩৫০টি গণ্ডার আছে।

নতুন নতুন জমি আবাদ করার দরুন গৌর বা ভারতীয় বাইসন ঠাঁইছাড়া হয়ে গিয়ে লোপ পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক জাতের হরিণ এবং বন্য ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাবার দিকে। এমন কি যে-সব পশুকে সংরক্ষিত অরণ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা তারাও উপযুক্ত পরিবেশের যথেষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ভারতের ছবি যদি চোখের সামনে যায় তাহলে একথা স্বীকার করতে যে, ভারতের বন্য জীবন একটা বিপ মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপ রোধ করতে হলে সমস্যাটিকে ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। অ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত ন ভারতের অতুলনীয় বন্য-জীবন এম লোপ পাবে যার আর কোনো প্র থাকবে না। অবশ্য ১৯৫২ ভারত সরকারের উদ্যোগে বন্য- সংরক্ষণের জন্যে একটি বোর্ড হয়েছে। কিন্তু এই বোর্ড পর্যন্ত অনেকটা উপদেষ্টা ক মতো। অন্যদিকে বিপর্যয়টি এত যে শুধু একটি বোর্ডের সুপারিশে প্রতিকার সম্ভব নয়। যুদ্ধের জরুরি অবস্থার মতো একটি স প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে না পারলে বিপর্যয় প্রতিহত হবে না।

যুগান্তরের সম্পাদক

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন:

খুব গভীর ভাবে কিছু লিখবার কিম্বা
ভাববার সময়-আমি মাঝে মাঝে এক টিপ
নস্যি নি—দীপক নস্যি। এতে মাথার
স্নায়ুগুলো যেন খুলে যায়, লেখার বা
চিন্তার স্রোত পথ খুঁজে পায়।
সম্ভবতঃ এজন্য নেপোলিয়নের
সেনাপতিরা জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি
দাঁড়িয়েও নস্যি নিতেন।

* জ্যোতি স্নাফ্ কোং ৫নং নাট্টু পিল্লিয়ার কোবিল ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ-১ •

ডিটেকটিভ বজবিলাস ও বেসলেট

• পরিমল গোস্বামী •

[এক]

একটি সামান্য চুরি উপলক্ষে এত-খানি উত্তেজনা কোনো শহরে আজ পর্যন্ত হয়েছে কি না—উত্তেজনার ইতিহাসে তার কোনো নজির পাওয়া যায় না। এটি অবশ্য ছোট শহর—বড় শহর কলকাতার তলী। সংক্ষেপে শহরতলী।

ঘুমন্ত অবস্থায় কাদম্বিনী চৌধুরীর একখানা হাত থেকে দামী পাথর সেট করা একটি ব্রেসলেট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নিয়েছে জানালা দিয়ে। এমন জোরে টেনেছে যে তাঁর হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

শখ করে বাড়ি করেছিলেন শহর-তলীতে। শহরের বাড়িতে সব সময় ভাল লাগে না, নতুনের চাই, একটুখানি বেশি খোলা জায়গা চাই, তাই এই বিলাস।

দোতলা বাড়ি, অনেকখানি জায়গার উপর। উপরতলাটা এখনো ফিনিশ হয়নি, নিচের তলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সব শেষ হলে তবে আসবাবপত্র আসবে। ইতিমধ্যে দামী ফিতের খাটিয়া আর দু' চারখানা চেয়ার টেবিল মাত্র সম্বল। কাদম্বিনী চৌধুরীর হঠাৎ ইচ্ছা একতলাতেই গৃহপ্রবেশ করে কয়েকদিন অস্থায়ীভাবে সেখানে থাকেন।

যে জানালার ধারে তিনি শুয়ে ছিলেন, বিছানা থেকে তার দূরত্ব দশ ফুট। জানালা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে বিছানা শুধু চোরের জন্যই, কেননা সেটি নিচের তলার ঘর। এবং যদিও জানালার বাইরে ছ' ফুট দূরে প্রাচীর, কিন্তু বাইরের লোক প্রাচীর ডিঙিয়ে অনায়াসে ভিতরে আসতে পারে। তাই প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত সতর্কতা।

তবু হাত থেকে ব্রেসলেট ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হল কি করে? বাইরের লোক জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে কাদম্বিনী চৌধুরীর হাত থেকে ব্রেসলেট খুলে নিতে পারে না এবং দরজা দিয়ে ঘরেও কেউ ঢোকেনি।

তার প্রমাণ আছে। প্রমাণ কাদম্বিনী চৌধুরীর স্বামী কদম্ব চৌধুরী। চিৎকার শুনে তিনি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দরজায় বার বার কড়া নাড়তে কাদম্বিনী এক হাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার মানে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

একদল লোক রটাচ্ছে ভূত এসে-ছিল। আর একদল বলছে কাদম্বিনী চৌধুরীই ভূত, ইচ্ছে করলেই হাত লম্বা করতে পারেন। প্রাচীন কালে রূপ-কথার সুন্দরী স্ত্রীরা যেমন আসলে ধনকুবেরী, কাদম্বিনীও তেমনি আসলে ভূত।

পুলিস অনেক চিন্তা করে বলেছে, রহস্য। এবং আরও অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলেছে, রহস্য কিছুই নেই।

বজবিলাসকেও ডাকা হয়েছে, কিন্তু আপাতত সে পুরনো বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। সে বলেছে হাত লম্বা হয় এটাই ঠিক। এবং এখানে ঘণ্টাখানেক বসে চিন্তা করেই চলে গেছে পুরনো বাড়িতে।

অতএব পুলিস তার নিজস্ব পদ্ধতিতে জেরা চালাচ্ছে নতুন বাড়িতে বসে এবং কদম্ব চৌধুরী উত্তর দিচ্ছেন।

"মিসেস চৌধুরী একা শুয়ে ছিলেন এক ঘরে। উনি কি একা থাকতে ভালবাসেন?"

"সব সময়ে নয়, এবাড়িতে শখ হয়েছিল একা থাকবার।"

"ওঁর কি কোনো গরীব আত্মীয় আছেন?"

"আমার জানার মধ্যে কেউ নেই।"

"বাপের বাড়ির অবস্থা কেমন?"

"আপনার সীমা ছাড়াচ্ছেন, এরকম প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।"

"মাপ করবেন, কোনো দুশ্চরিত্র ভাই কিংবা নিকট আত্মীয় কেউ আছেন?"

কদম্ব চৌধুরী বিরক্ত এবং নিরুত্তর।

"কিছু মনে করবেন না, কেসটা সাজানো নয় তো? ধরুন কাউকে সাহায্য করার দরকার অথচ হাতে নগদ টাকা বিশেষ নেই, তাই চুরির অভিনয় করে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। মনে হয় কি এ রকম?"

"আপনার এ সব কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেব না। ভাষাটাও আপনার মার্জিত নয়।"

"অবশ্যই নয়। এনকোয়ারী করতে করতেই এই রকম হয়ে যায়, সে কথা কম করবেন। ডিটেকটিভ লাগিয়েছেন কি?"

"ব্রজবিলাস সরকার দেখছেন কেসটা। তিনি এই মুহূর্তে আমাদের পুরনো বাড়িতে সন্ধান চালাচ্ছেন, খবর এসেছে—এখুনি আসছেন।"

"ব্রজবিলাস? ও একটা চালিয়াত, সহজ জিনিসকে জটিল করে তোলে। কিন্তু চোর ধরতে ডিটেকটিভ কেন?"

"আমার স্ত্রীর ইচ্ছা। আমি নিজে পুলিস বা ডিটেকটিভ কিছুই ডাকতাম না। সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট, অথচ কোনো লাভ নেই। মিসেস চৌধুরী জোর করে এ সব করিয়েছেন। এ কেস্ পুলিসে কি করবে? যদি করে তবে ডিটেকটিভই করবে, আর কেউ না।"

"বটে?—বেশ তো, টাকা আছে, ওড়ান না? এরপর চুরি দূরের কথা খুন হলেও পুলিস ডাকবেন না। মড়াটি যদি দেহ থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায় তবু ডিটেকটিভকেই ডাকবেন।"

কথা শেষ হতে না হতে ব্রজবিলাস বাড়ির সামনে এসে নামল। তার এক হাতে টাইপরাইটার, অন্য পাশে কাঁধে ঝোলানো একটি থলে, তার মধ্যে টাইপ করা এক গাদা কাগজের ফ্লাট ফাইল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ভামাকের টিন, তিন চারটি পাইপ।

ব্রজবিলাসের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভরত সরকারের অনেক সাহায্য হয়েছে সেজন্য সে যাতে বিলেত থেকে নিয়মিত পাইপের তামাক পায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু শুধু বিদেশী তামাকে সকল দেশী সমস্যার সমাধান হয় না, এবং ব্রজবিলাস সম্প্রতি একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে—বিদেশী একটি বিশেষ তামাকের সঙ্গে মাত্র এক ফোঁটা মিশিয়ে নিলে যে-কোনো দেশী রহস্য অতি সহজে ভেদ হয়ে যায়। এ পরীক্ষা সে বিলেত গিয়েও করেছে, এবং শীতের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ফল কোনো তারতম্য দেখা যায়নি।

ব্রজবিলাস কনক চৌধুরীর পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে একবেলা কাটিয়ে এলো। সেখানে সে যা দেখতে চেয়েছে তা সে দেখেছে, যা শোনবার শুনেছে, এই রকম একটা তৃপ্তির ভাব তার চোখে।

দেখেছে একটা মেয়েদের সাইকেল, এক জোড়া পাহাড়ে জুতো। জানতে পারা গেছে কার্লাম্বনী চৌধুরী আগে সাইকেল চালাতেন, এখন মোটর চালান। তিনি তিনবার মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছেন। পাহাড়ে ওঠার ভীষণ শখ ছিল একদিনে।

পতন কাহিনীও আছে। পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন একবার, এবং তাতেও দমেননি, কয়েক দিন পরে আবার পাহাড়ে উঠেছিলেন।

একবার পাহাড়ের জঙ্গলপথে একা গিয়ে পথ হারিয়েছিলেন, শেষে রাত্রি-বেলা দুজন পাহাড়ী তাঁকে এনে পৌঁছে দেয়।

নতুন বাড়িতে যাবার সময় কি কি সঙ্গে নিয়েছেন তার খবরও যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে।

সব শেষে ব্রজবিলাস একটা ঘরে ঝাড়া দু ঘণ্টা বসে পাইপ খেয়েছে। বলা বাহুল্য তামাকের সঙ্গে সেই বিশেষ দ্রব্যটি মেশানো ছিল। তারপর তিন ঘণ্টা টাইপ করেছে।

ব্রজবিলাস পৌঁছে বাহিত-জিনিস-গুলি নামিয়ে রেখেই দারোগাকে নমস্কার করে বলল, "হাতে সময় নেই, আমাকে এখুনি কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

দারোগা একটুখানি বিদ্রূপের সুরে বললেন, "চুরি হল এ বাড়িতে, আপনি একটি দিন কাটিয়ে এলেন আর এক বাড়িতে, তবে আর এ বাড়িতে কি কাজ থাকতে পারে?"

ব্রজবিলাস কিছু অন্যমনস্কভাবে বলল, "হ্যাঁ, তা হয়তো নেই, না থাকলেই মঙ্গল। সেখানেই দেখেছি অনেক কিছু।"

"খুব মজার তো? কি দেখেছেন জানতে পারি?"

"চোখ খুললেই যা দেখা যায় তাই দেখেছি, অবশ্য তাদের দেখা মিথ্যেও হতে পারে।"

"জানালা থেকে খাটের দূরত্বটা মেপে দেখুন আগে, তা হলেই বুঝতে পারবেন ভুল কতই গভীর।"

"গভীর ভুলের কথায় ভয় দেখাচ্ছেন কেন? না হয় ব্যর্থ হব। আমাকে তবু চেষ্টা করতে হবে। আপনি আমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছেন অকারণ।"

"আপনার নির্বুদ্ধিতার সীমা দেখতে চাই এখানে বসে।"

"ও! তা হলে আপনাকে আমি খুব খুশি করতে পারব, আমাকে শুধু একটা পাঁচ ফোঁগাড় করে দিতে হবে, দেবেন দয়া করে?"

দারোগা এ কথায় খুব এক চোট হেসে বললেন, "বুঝতে পেরেছি, নিচ্ছি

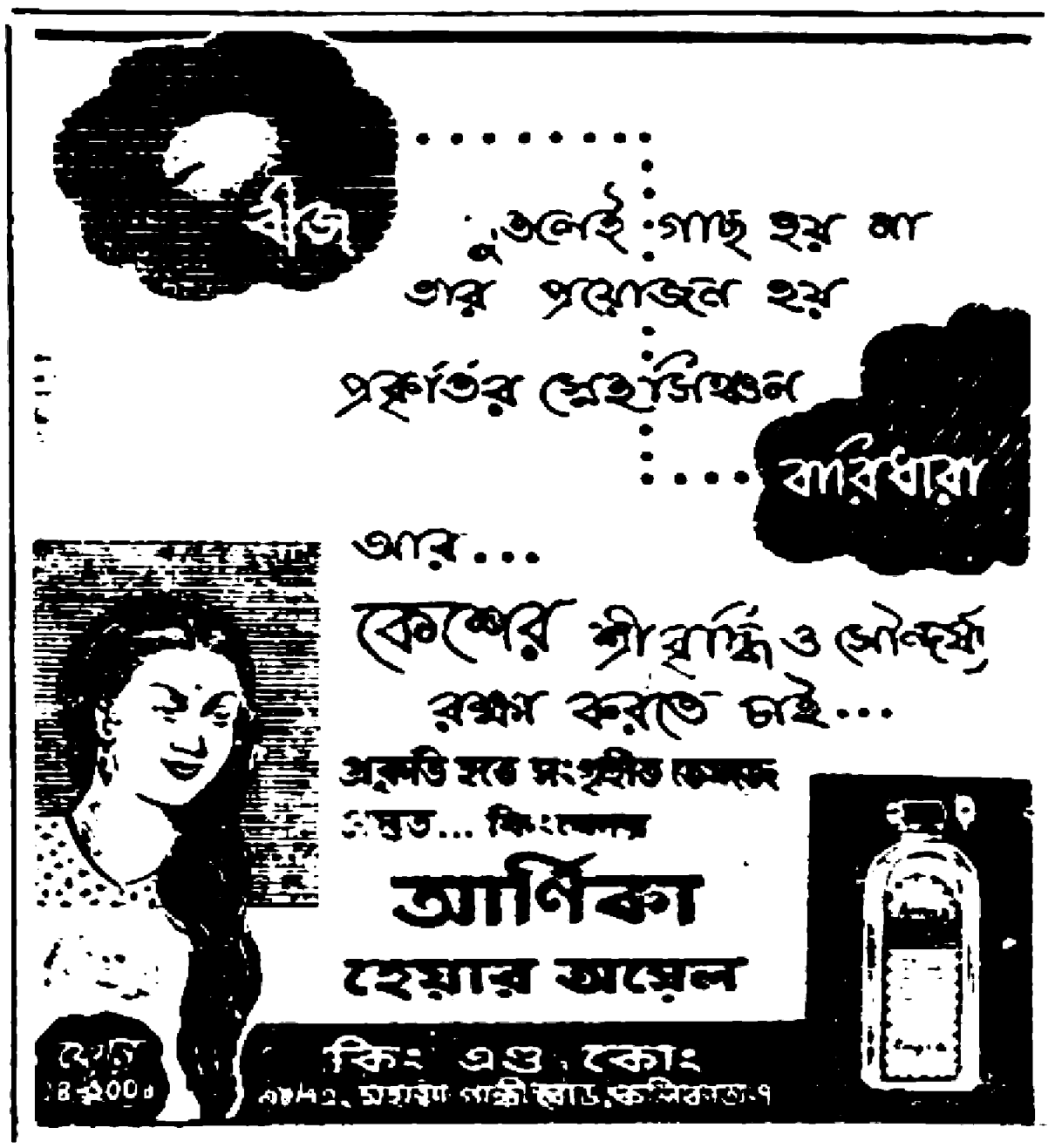

জোলাড় করে। আর আমার এখানে থাকা পোষাবে না সত্যিই।"

দারোগা কনস্টেবলকে গাঁজা জোগাড়ের হুকুম দিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি অদৃশ্য হওয়া মাত্র কনস্টেবল টাকে জড়ানো থলি থেকে ব্রজবিলাসকে একটুখানি গাঁজা বার করে দিয়ে অনেকগুলো দাঁত বিকসিত করল। দেখা গেল তার ডান হাতখানাও ঐ সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। সেই হাতে ব্রজবিলাস একটি টাকা দিল, কনস্টেবল আরও বেশি দাঁত বার করে এবং সভক্তি সেলাম জানিয়ে দারোগাকে অনুসরণ করল।

ব্রজবিলাস সমস্ত রাত একটা ঘরে বসে শুধু পাইপ টেনেছে। পরদিন সামান্য কিছু আহার করে কর্তব্য শুরু করল। রাতে চলেছিল মগজের কাজ, দিনে আরম্ভ হল অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা সত্যকে যাচাই করার কাজ। তখনও সামান্য অংশে আলোকপাত বাকি। ঠিক যেমন পূর্ণিমার আগের দিন চাঁদের একটুখানি অংশে আলো পড়তে বাকি থাকে, তেমনি।

এই সময় কাদম্বিনী চৌধুরী নিজে থেকেই ব্রজবিলাসের কাছে এসে একটি নতুন খবর দিলেন, সকাল বেলাতে একটা হনুমান এসে জানালার ধারে বসেছিল।

ব্রজবিলাস জিজ্ঞাসা করল, "একথা বলছেন, মানে হনুমানের উপর আপনার সন্দেহ হচ্ছে কি এখন? কিন্তু ওরা তো রাত্রে বেরোয় না। কারো শিক্ষিত হনুমান হলে হতেও পারে। কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন আসছে না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আপনি হনুমান ধরতে গিয়েছিলেন কেন?"

কাদম্বিনী চমকে উঠলেন এ কথা শুনে। ব্রজবিলাসের তো তা দেখবার কথা নয়। তবে কি ভদ্রলোক না দেখেও সব দেখতে পান!

কাদম্বিনী চৌধুরী বুঝলেন, এই সামান্য কথাটা গোপন করে লাভ নেই। হনুমান ধরার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর আছে। তাই ব্রজবিলাসকে সে-কথা বলতে যেতেই ব্রজবিলাস তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে আর কিছুই বলতে হবে না।"

ব্রজবিলাস আবার কিছু চিন্তামগ্ন। কমই শেষ, সামান্য একটুখানি কিসের অভাব। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি কুণ্ডলী পাকানো রেশম ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। তার একটা দিক প্লাগে লাগানো যায়, আর একদিকে বালব্ লাগানো যায়। এ জিনিষটা এতক্ষণ তার কল্পনার ছবির মধ্যে আসে নি, এখন হঠাৎ আসাতে সে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

অবশ্য এটি না এলেও ব্রজবিলাসের মূল সিদ্ধান্তের কোনো বদল হত না। তার সব কথাই টাইপ করা হয়ে গেছে, পুরনো বাড়িতে বসেই সে চতুর্দশীর চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে। টাইপ করা হয়ে গেছে পঞ্চাশ শীট কাগজ।

ব্রজবিলাস রেজরটি মেপে ফেলল, তার মুখে খুশিতে উজ্জ্বল। সে আরও কোনো একটি জিনিস খুব উৎসাহের সঙ্গে খুঁজতে আরম্ভ করল। ঘরে নেই, বাইরে ঘাসের মধ্যে থাকা সম্ভব। যে জানলা থেকে রেসলেট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তার বাইরেই সেটি থাকবার কথা।

ব্রজবিলাস ঘাসের উপর ছাগলের ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিতে খুঁজতে লাগল। নতুন তৈরি বাড়ি, এখনও জঞ্জাল সব সাফ করা হয়নি, তার মধ্যে খুঁজতে হচ্ছে খুব মনোযোগের সঙ্গে।

[দুই]

ব্রজবিলাস যখন কিছু খোঁজে তখন বুঝতে হবে সে জিনিষ সে পাবেই। একবার একটা কেসে তার ধারণা হয়েছিল অপরাধী একটা বিশেষ ঘরেই নিশ্চয় আছে। সে ঘরে কোনো আসবাব ছিল না, পরিষ্কার ঝকঝকে দেয়াল। কিন্তু ব্রজবিলাসের ধারণা কখনও মিথ্যা হয় না। সে সেই দেয়ালের ভিতর থেকে অপরাধীকে টেনে বার করল, দেয়াল যেমন ছিল তেমনি রইল, একটি টুকরোও কোথাও খসল না। কি করে হল, সবাই জিজ্ঞাসা করল। ব্রজবিলাস শুধু মৃদু মৃদু হাসল।

সেই ব্রজবিলাস জানালার বাইরে একটি বিশেষ জিনিষ আছে সন্দেহ করেছে, অতএব ধরে নিতে হবে সে জিনিষ সেখানে আছেই।

পেল ঠিক সেই জিনিষটি। কাপড়ের পাড় ছেঁড়া একটি বারো-তেরো ইঞ্চি টুকরো, কোনো জিনিষ তা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা ছিল, বোঝা যায়। এখনও তার পাক খোলেনি। গিট বাঁধা ছিল তারও চিহ্ন রয়ে গেছে।

ব্রজবিলাস ছুটে ঘরে গিয়ে টাইপ করতে বসল, আজ তার চাঁদ ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে।

টাইপ শেষে ব্রজবিলাস কফি খাচ্ছিল। আজ সে ভীষণ খুশি। সব মিলে গেছে। এখন শুধু দু একটি বিষয় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও যাচাই করা দরকার। বহুবার যাচাই না করলে কোনো সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না।

বাইরে ভালুক-নাচ দেখাচ্ছিল একটা লোক, তার ডুগডুগির বাজনা আর চিৎকার কানে আসছে ব্রজবিলাসের।

ব্রজবিলাসের কানে সেই শব্দ এসে, সিনেমা ক্যামেরার যেমন শব্দ আলোতে রূপান্তরিত হয়ে ছবি ওঠে, তেমনি আলোতে রূপান্তরিত হল। সে কফি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেন, তা সেই জানে, কি আলো জ্বলল, তা সেই জানে। বলে গেল একটি বিশেষ সূত্র সন্ধানে সে ব্যস্ত থাকবে, সন্ধ্যার আগে আর সে আসতে পারবে না।

এতে কাদম্বিনী চৌধুরীও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরই ইচ্ছায় ডিটেকটিভ এসেছে, অথচ বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ একজন ডিটেকটিভ থাকলে কেমন যেন চলাফেরায় অস্বস্তি বোধ হয়। নিজেকেই সবসময় অপরাধী বোধ হয়।

ভালুক নাচ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ব্রজবিলাস চলে যাওয়ার পর ভালুক নাচ এসে বাইরে গিয়ে বেশ দেখা যেত, ডিটেকটিভের সামনে একজন মহিলার ছেলেমি করা পোষায় না।

কিন্তু কাদম্বিনী চৌধুরীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল বিকেলের দিকে। ভালুক নাচের ডুগডুগি আবার শোনা গেল। তিনি নিজে ঘরের বাইরে গিয়ে নাচওয়ালাকে ডেকে খেলা দেখতে লাগলেন। লোকটির দুটো ভালুক, তার মধ্যে একটি খুব ভাল নাচে। তাকে একটি বোতল দিয়ে মাতালের ভূমিকা অভিনয় করতে বলা হল—"ব্যাটা মাতাল বনি!"—ভালুক বোতল মুখে দিয়ে মাতাল সাজল। কি সুন্দর সে মাতালের অভিনয়, সবাই হাততালি দিতে লাগল। কাদম্বিনী চৌধুরী তাঁর স্বামীর মত্ত অবস্থা অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু এই ভালুকের মতো এমন চমৎকার মাতাল তিনি দেখেননি। স্বামীর মাতলামির উপর তাঁর অশ্রদ্ধা জাগছিল ভালুকের মাতলামি দেখে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, মনে এলো এখন তো আর উপায় নেই।

এমন সময় এক হৈহৈ কাণ্ড। মাতাল ভালুক তার মনিবের আদেশ অমান্য করে মাতলামির ঝোঁক ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই উপস্থিত যাবতীয় দর্শক—ছেলে-বুড়ো সবাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। কিন্তু কাদম্বিনী চৌধুরীর কি ভয়ানক সাহস,

তিনিস্পটীলোক হয়ে ছুটে গিয়ে ভালুক-টাকে জাপটে ধরলেন এবং তাকে কাবু করে ফেলে কোনো রকমে ভালুককে তার মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

দর্শকেরা তখন পালানো প্রত্যাহার করে দাঁড়িয়ে গেল এবং কাদম্বিনী চৌধুরীর সাহসের জন্য তাঁকে প্রশংসা করতে লাগল যদিও তার একটা কথাও তাঁর কানে গেল না। কারণ সে সময় তিনি অবিরাম হাঁচছিলেন হাঁচ্চো হাঁচ্চো করে। ভালুকের লোম তাঁর নাকে ঢুকে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এবং গোটা পঞ্চাশেক হাঁচির পর তাঁর খেয়াল হল এ রকম একটি কাজ তাঁর মতো মহিলার প্রকাশ্যে করা হয়তো উচিত হয়নি, বিশেষ করে নতুন জায়গায়। তিনি ছুটে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন।

ব্রজবিলাস এলো ঘণ্টা দুই পরে। বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে, শিস দিচ্ছে। এসেই বলল "আমার সব কাজ শেষ হয়েছে।"

কাদম্বিনী ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করলেন "চোর ধরা পড়েছে?"

ব্রজবিলাস বলল "পড়েছে বৈকি।"

"কোথায়? সে কি এখন থানায়?— কাদম্বিনীর ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা।

ব্রজবিলাস বলল, "না। আমার কাজ চোর ধরা নয়, চোর ধরতে আমাকে ডাকা হয়নি, ডাকা হয়েছে রহস্য ভেদ করতে।"

"কি রকম?"

"আমি চাই সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে। অবশ্য আমার ব্যাখ্যা, অনুমান, এবং সিদ্ধান্ত সবই আমি অনেক আগেই টাইপ করে রেখেছি। তার পরে অনেক কিছু দেখেছি ও জেনেছি, কিন্তু সে সবই আমার পূর্ব সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছে। কদম্ববাবু, আপনি থানার দারোগাকে ডাকুন, তাঁর সবটা শোনা দরকার।

কদম্ব চৌধুরী একটুখানি বিরক্তভাবে বললেন, "আবার দারোগা কেন এর মধ্যে। সব তো আপনিই করলেন।"

"তবু ডাকুন।"

দারোগা প্রথমে আসতে রাজি হননি, বলেছেন ওসব চালিয়াতির মধ্যে আমি নেই। কিন্তু পরে অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে আনা হয়েছে।

[তিন]

ঘরে মাত্র চারজন লোক। কদম্ব চৌধুরী, কাদম্বিনী চৌধুরী, ব্রজবিলাস সরকার ও থানার দারোগা।

সবাই উৎসুক। চৌধুরী দম্পতির বুক দুরু দুরু। দারোগা মহা বিরক্ত। কিন্তু ব্রজবিলাসের মুখে খুব একটা গর্বিত ভাব।

ব্রজবিলাস তার চেয়ারটিকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল যাতে দরজা থেকে তিনজনকে একসঙ্গে সম্বোধন করার সুবিধা হয়।

পাইপে তাজা তামাক পুরে ভাল করে ধরিয়ে ব্রজবিলাস উঠে দাঁড়িয়ে টাইপ করা কাগজের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতে লাগল।

"এই কেসটার প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সে হচ্ছে জানালা ও খাটের দূরত্ব। দারোগাবাবু ঠিকই বলেছিলেন, ঐখানেই ব্যাখ্যা করা শক্ত। কি করে অত দূর থেকে একটি লোক মিসেস চৌধুরীর হাত ছুঁতে পারে এই হল প্রধান প্রশ্ন। এক, চোরের হাত দশ ফুট হলে তা হতে পারে, অথবা মিসেস চৌধুরীর হাত দশ ফুট লম্বা হওয়া দরকার।

"এ দুটোর কোনোটাই সম্ভব নয়।

"তৃতীয়—খাটটা যদি জানালার পাশে সরিয়ে দেওয়া যায় তা হলে চুরির ব্যাখ্যা হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখেছি খাট

জানালার পাশে সরানো হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার আগেই এ অনুমান আমি নির্ভুলভাবে করেছি। মিসেস চৌধুরী, আপনি একটু বিচলিত হচ্ছেন, দরকার নেই বিচলিত হবার। শুনুন ধৈর্য ধরে।

"কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, খাট জানালার পাশে সরানো হল কেন? এবং আগেই বলে রাখি, একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন রাত্রে সরানো হয়েছে, অথচ ঘরে খুব ভাল এবং নতুন পাখা ফিট করা আছে, প্রচুর হাওয়া পাওয়া যায় তা থেকে। তবু জানালার ধারে যাওয়া কেন? এবং যদি যাওয়া হল তা হলে খুব দামী পাখার

বসানো ব্রেসলেট হাতে পরা অবস্থায় কেন?

"এ প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি পুরনো বাড়িতে সন্ধান চালিয়ে।

"মিসেস চৌধুরী অ্যাডভেন্চার প্রিয়, সবসময় বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে ওঁর ভাল লাগে। মিসেস চৌধুরী, বিচলিত হবেন না। মিস্টার চৌধুরী, আপনি আমার কথায় খুশি হয়ে উঠছেন দেখতে পাচ্ছি। শুনুন ধৈর্য ধরে সবটা।

"মিসেস চৌধুরী নতুন বাড়িতে একটি রাত কাটিয়েই ছটফট করছিলেন অ্যাডভেন্চারের অভাবে। নতুন পরিবেশে এই ইচ্ছাটা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এঁর পূর্ব ইতিহাস আমি যা পেয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাহাড়ে ওঠার দুঃসাহসিক চেষ্টা, মোটর চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো, এবং পাহাড় পথে এলোমেলো ঘুরে পথ হারিয়ে মজা দেখা।

"এবারে নতুন অ্যাডভেন্চারের পরিকল্পনা। ব্রেসলেট-হাতে শূন্যে হাতখানা জানালার বাইরে রাখলে চুরির একটা সম্ভাবনা থাকে, এবং বিশুদ্ধ চুরি নয়, হাত থেকে টেনে ছিনিয়ে নিতে এলে সেই সঙ্গে একটা কোনো দুর্ধর্ষ চোরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি—কল্পনা করতেও মিসেস চৌধুরী রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন।

"কিন্তু অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে চোর এসে ঠিক তাঁর পরিকল্পনা মিলিয়ে চুরি করতে চাইবে কেন এটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কাছে। তাই তিনি কম পাওয়ারের একটি বাল্ব আনিয়ে প্লাগ থেকে জানালার বাইরে ঠিক-জায়গায় আলো ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতখানা দোবার সময় জানালার বাইরে রেখে, আলোটা জানালার গরাদের সঙ্গে, ছেঁড়া পাড়ের অংশ জড়িয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে আমি আসিনি।"

ব্রজবিলাস একটুখানি থেমে পাইপ ধরিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—"এইবারে আমি আর একটা দিকের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।"

কদম্ব চৌধুরী একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠলেন এ কথায়।

দারোগার চোখ দুটি ক্রমে বড় হচ্ছে।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল, "আমার অনুমানে কোথাও ভুল থাকলে আপনারা বলে দেবেন। আমার মনে হয় মিসেস কাদম্বিনী চৌধুরী আমার ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত সবই মেনে নিয়েছেন।"

কাদম্বিনী দেবী একটু জোরের সঙ্গে বললেন "বেশ তো নিয়েছি, তারপর কি বলুন।"

"এবারে মিস্টার কদম্ব চৌধুরীর দিকের কয়েকটি কথা বলছি। তিনি তাঁর স্ত্রীর এই জাতীয় দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া কাজ কখনও সমর্থন করতে পারেননি। তিনি স্ত্রীকে অনেকবার এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

"এইবার আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মিঃ কদম্ব চৌধুরী একদিন রাত্রে উঠে হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর এই মতলবের কথা বুঝতে পারেন। আলো জেবলে তার নিচে ব্রেসলেটসুদ্ধ হাত রাখা—এ সবই তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। কিন্তু প্রথম দিন বুঝতে পারেননি কি করা উচিত। পরদিন রাত্রে তিনি কর্তব্য ঠিক করে ফেলেন।"

কদম্ব চৌধুরী উসখুস করতে লাগলেন। ব্রজবিলাস বলল, "আশা করি আমি ঠিক বলছি মিস্টার চৌধুরী।"

মিঃ কদম্ব চৌধুরী নীরব থেকে সম্মতি জানালেন। ব্রজবিলাস বলতে লাগল, "ফলে মিসেস চৌধুরীর হাতের কি দুর্দশা হয়েছে দারোগাবাবু জানেন। মিস্টার চৌধুরীর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি স্ত্রীকে শিক্ষা দেবার জন্যই এটি করা কর্তব্য মনে করেছিলেন।

দারোগা আসন থেকে উঠে পড়লেন। তাঁর দৃষ্টি ব্রজবিলাসের উপর নিবদ্ধ। ব্যবহার দুর্বোধ্য।

ব্রজবিলাস বলতে লাগলেন, "এইবার আমার শেষ কথাটি বলি। মিস্টার চৌধুরী, কম পাওয়ারের আলোটি আপনি আগে খুলে নিয়েছিলেন। মিসেস চৌধুরী ঘুমিয়ে ছিলেন। কাজেই ব্রেসলেট কে ছিনিয়ে নিয়েছে তা তিনি অন্ধকারে বুঝতে পারেননি।

"কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, আপনার উদ্দেশ্যের কথা ভেবে আপনাকে আমি আদৌ অপরাধী মনে করতে পারছি না, আইনেও আপনাকে অপরাধী করবে না। কিন্তু আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে মিসেস চৌধুরী টের পেয়েছিলেন যে কাজটি আপনার।"

"অ্যাঁ!" বলে লাফিয়ে উঠলেন মিঃ কদম্ব চৌধুরী।

ব্রজবিলাস বলল, "আমি ঠিকই বলছি। মিসেস চৌধুরী সে জন্য প্রকাশ্যে পাঁচজনের সামনে স্বামীকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যেই ডিটেকটিভ ডাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

ইতিমধ্যে দারোগা ব্রজবিলাসের কাছে এগিয়ে এসেছেন এক পা এক পা করে।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল, "আমি কোনো অনুমানই বিনা যাচাইয়ে সিদ্ধান্তরূপে খাড়া করি না। আমি মিসেস চৌধুরীর অ্যাডভেনচারপ্রিয়তা নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখেছি।"

কাদম্বিনী চৌধুরী উৎকর্ণ হলেন।

"মিসেস চৌধুরী যে পালিয়ে যাওয়া ভালুকটাকে নিজের জীবন বিপন্ন করে ধরে এনেছিলেন, সে ভালুক আমি স্বয়ং। আমিই ভালুক সেজে এ পরীক্ষা করেছি।"

দারোগার চোখে উন্মাদনা ফুটে উঠছে ক্রমে।

মিসেস চৌধুরী কটমট করে চেয়ে আছেন ব্রজবিলাসের দিকে।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল—"আর একটি মাত্র কথা। ব্রেসের সঙ্গে যে কম পাওয়ারের বাল্বটি লাগানো ছিল সেটি মিস্টার চৌধুরীই ব্রেসলেট ছিনিয়ে নেবার আগে খুলে নিয়েছিলেন সে কথা আমি আগে বলেছি। আমার এ অনুমান সত্য কিনা যাচাই করার জন্য এরই মধ্যে এক সময় লুকিয়ে বাল্বটি আবিষ্কার করেছি—মিস্টার চৌধুরীর পকেটে।

কদম্ব চৌধুরী মূক—গদগদ।

দারোগা ভতোধিক। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে ব্রজবিলাসের বুদ্ধিতে, অনুসন্ধান রীতিতে এবং ঘটনা বিশ্লেষণের কৌশলে আনন্দে ক্ষেপে গিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। তিনি ব্রজবিলাসকে কঠিন আলিঙ্গনপাশে বেঁধে তার মুখচুম্বন করতে লাগলেন। সে কি উন্মাদনা। কিছুতেই ছাড়েন না। ব্রজবিলাসের দুর্দশায় চৌধুরী দম্পতি দারোগাকে শেষে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, কিন্তু দারোগা নাছোড়।

অবশেষে থানা থেকে চারজন কনস্টেবল ডাকিয়ে এনে ব্রজবিলাসকে উদ্ধার করতে হল দারোগার আলিঙ্গন থেকে।

দারোগা তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "আমাকে আপনারা মাপ করবেন, অতিরিক্ত বিস্ময়ে আমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।"—বলেই অবসন্ন অবস্থায় মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকিয়ে তাদের গাড়িতে তুলে দেওয়া হল।

ব্রজবিলাস মুখে জীবাণুনাশক লোশন লাগাতে লাগলেন।

তাকে দিতে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্মশান থেকে আমরা চারজন যখন ফিরেছি বেলা তখন প্রায় নটার কাছাকাছি। তখনো বৃষ্টি পড়ছে একটানা। আর সেই বৃষ্টির শব্দের ভেতর দিয়ে সামনের বাড়ীর দোতলা থেকে মায়ের কান্না শোনা যাচ্ছে এখনো : ও খুকু—খুকুরে—

খুকুকেই এই মাত্র পুড়িয়ে ফিরেছি আমরা—যার ভালো নাম ছিল কণিকা। আর আমরা চারজন নিজেদের মধ্যে যার নাম দিয়েছিলুম—নীলিমা।

আমাদের চার জোড়া চোখ এক সঙ্গে দোতলার সেই জানালাটার দিকে গিয়ে পড়ল। বৃষ্টিভেজা পর্দাটা জানালার গরাদের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে বসেছে যে মনে হয়—ও আর কোনোদিন সরবে না। সত্যিই সরবে না। আর কোনোদিন ওখানে এসে দাঁড়াবে না নীলিমা—ঘন কালো চুলের রাশি আঁচড়াতে আঁচড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকবে না আকাশের দিকে। আজকের এই জমাট ধোঁয়াটে মেঘ, এই একটানা কান্নার মতো বৃষ্টি আমাদের ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে থাকবে। অনেক—অনেক দিন পর্যন্ত।

আমি তালাটা খুলছিলুম, সেই সময় সমীরের চোখ পড়ল চিঠির বাক্সের দিকে।

—ইস্—বাক্সটা খোলা ছিল দেখছি। কার একটা চিঠি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে!

জলে ভিজে একাকার একখানা খাম। কালি গলে ঠিকানাটা সম্পূর্ণ অপাঠ্য হয়ে গেছে! অনেক চেষ্টা করেও আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারলুম না। ডাকঘরের ছাপটাও এই শহরেরই—তা থেকেও কোনো হদিস মিলল না।

সমীর বললে, পরে খুলে দেখা যাবে। আগে এই ভিজে জামা-কাপড় ছাড়া যাক।

বারান্দায় আমাদের চারখানা ইজি-চেয়ার তেমনি পাশাপাশি সাজানো আছে। কিন্তু কাপড় বদলে, ক্লান্ত শরীরে আজ যেন আমরা এক একটা নির্জন দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন মন নিয়ে নিজের নিজের চেয়ারে এসে বসলুম। সামনের চারটি ছোট ছোট টিপয়ে আমাদের চাকর হীরালাল চা সাজিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু চায়ে কারো উৎসাহ ছিল না। বাইরের ধোঁয়াটে আকাশ আমাদের চেতনার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল, আমাদের বুকের ভেতর বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা ভাবছিলুম—আমি জানি, আমরা সবাই ভাবছিলুম—চিতার পোড়া কাঠ আর কয়লাগুলো এতক্ষণে খাঁড়ির খরস্রোত বেয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে—সেখান থেকে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

আজ রবিবার—আমাদের তিনজনের অফিস নেই। ডাক্তার অংশু রয়েছে চার দিনের ছুটিতে—তারও হাসপাতালে ছোটবার দায় নেই কোনো। আজ সমস্তটা দিন এই বিষণ্ণ দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আমরা এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি; মনের ভারে শূন্য অবসন্নতার ভেতরে তলিয়ে থাকতে পারি। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারি, কেন আত্মহত্যা করতে গেল আমাদের নীলিমা—কী ওর দরকার ছিল!

সেই সময় সমীর বললে, ওহো—সেই চিঠিটা। কার নাম ছিল বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা যদি অনুমতি করো তো খুলি।

প্রমোদ ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়ে-ছিল। কথা বললে না, মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে। আমি আর অংশু বললুম, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সমীর খাম খুলল। বললে, এটা নষ্ট হয়নি—পড়া যাবে।—তারপরেই অদ্ভুত একটা শব্দ করে, প্রায় বোবাধরা গলায় বলে উঠল, এঁ্যা! এ যে নীলিমা—মানে কণিকার চিঠি!

কণিকা—নীলিমা! মেঘলা আকাশ থেকে এক একটা ছুরির মতো বিদ্যুৎ এসে যেন আমাদের প্রত্যেককে আঘাত করল। আমি আর অংশু মেরুদণ্ড টান করে সমীরের দিকে তাকালুম, কিন্তু প্রমোদ এমনভাবে উঠে বসল যে, ওর হাঁটুর ধাক্কায় চায়ের পেয়ালাটা নিচের বৃষ্টিঝরা উঠোনের মধ্যে গিয়ে ঠিকরে পড়ল।

সমীরের মুখের রঙ বদলাচ্ছিল বহুরূপীর মতো। শ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন।

—কাকে লিখেছে—কাকে?—আমাদের তিনজনের গলা এক হয়ে ছুটে গেল ওর দিকে।

তেমনি অস্বাভাবিক স্বরে সমীর বলল, জানি না। পড়ো।

ওর হাত থেকে অংশু চিঠিটা নিলে। তারপর পড়ে গেল।

'কাল যখন এই চিঠি তুমি পড়বে, তখন আমি আর থাকব না। আমি অরুণকে কথা দিয়েছিলুম—আসছে মাসে বাবা বিয়ের দিন ঠিক করেছেন। তোমাকে কত ভালোবেসেছি সেটা বুঝতে পারলুম কাল—অরুণের চিঠি পাওয়ার পর। আমাকে ও এত বিশ্বাস করে যে ওকে দুঃখ দেওয়া অসম্ভব। তাই তোমাকেও চাইতে পারলুম না। আত্মহত্যা করব কোনোদিন ভাবিনি—জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ ছিল না। কিন্তু কী করা যায় বলো—কাল সারা রাত ভেবেও যখন জট খুলতে পারিনি। তাই চলেই যেতে হল। তোমাকে এই আমার প্রথম আর শেষ চিঠি। খুব অনিচ্ছা নিয়েই মরতে চলেছি, তবু এই-টুকু তৃপ্তি রইল যে এতদিনের সংকোচ কাটিয়ে এইবারে বলতে পারলুম,

তোমাকে ভালোবেসেছি—আমাকে তুমি সুধার ভরে দিয়েছ।—কণিকা।'

কিছুক্ষণ আমরা আমাদের চেয়ারের মধ্যে এক ভাবে বসে রইলুম। তারপর শুকনো ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে, পড়ন্ত বৃষ্টির শব্দের ভেতরে—প্রায় শোনা যায় না—এমনিভাবে প্রমোদ জিজ্ঞেস করলে, কোনো নাম নেই কোথাও?

অংশু বললে, না।

—কাকে লেখা কিছু বোঝবার জো নেই?

অংশু আবার বললে, না।

আমরা চারজনে চারটে চেয়ারে তেমনি নিথর হয়ে বসে রইলুম—একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম আকাশের দিকে। তিন কাপ চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, প্রমোদের ছিটকে পড়া পেয়ালাটার ভেতর ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল করোগেটেড্ টিনের চাল থেকে। আর প্রত্যেকের মনের বিষণ্ণ দ্বীপগুলোকে ঘিরে ঘিরে ঘন সামুদ্রিক কুয়াশার মতো একটি মাত্র সংশয় জেগে উঠতে লাগল : কে সে? যার জন্যে আমাদের সকলের আকাশ থেকে আলো নিবে গেল? আমাদের নীলিমার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী? প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সন্দেহ সমুদ্রের হিংস্র ঢেউ হয়ে গর্জন করতে লাগল।

কাল শেষ রাতে যখন আমরা শব নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলুম—তখন এই মন আমাদের ছিল না। একটি শোক—একটি আহত বিস্ময় আমাদের চারজনকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। মানুষ কেন আত্মহত্যা করে—এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব আমরা জানি। প্রমোদ কিছুদিন অ্যাব্-নর্ম্যাল সাইকোলজী নিয়ে চর্চা করেছে—সে আমাদের চাইতে অনেক বেশি জানে। আমি স্তাঁধাল আর প্রুস্তের ভক্ত—জেম্‌স্ জয়েস নিয়ে অনেক তর্ক করেছি কলেজের কমন-রুমে—মাদাম বোভারির মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে পত্রিকায় একটা লেখা পাঠিয়েছিলুম, যদিও ছাপে নি। ডাক্তার অংশুও মানুষের মনোব্যাধির খবর রাখে। কিন্তু কল্প শেষ যাতে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি আমাদের নীলিমা কেন এমন করে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনল। সমীর ওয়াই-এম-সি-এ'তে থাকবার সময় বেহালায় বিলিতী সুর বাজাতে শিখেছিল—কিন্তু শপার বিষাদ ঘন মেলোডির ভেতরেও সে নীলিমার মনের সন্ধান পায়নি।

আজ দেখা গেল শপাঁ নয়, অ্যাব্-নর্মাল সাইকোলজী নয়, মেন্টাল্ ডিজিজ নয়, হেন্‌রি জেম্‌সের চরিত্র নয়! নিতান্ত সাধারণ—নিতান্তই রোম্যান্টিক্ আত্ম-হত্যা। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে সেই অচেতন বিশ্বাসঘাতক—যে এমন একটা তুচ্ছ মৃত্যুর অ্যাণ্টিক্লাইম্যাক্স রচনা করল? আমরা আজ নিজেদের ঘৃণা করছি—ঘৃণা করতে শুরু করেছি পরস্পরকে। এই বৃষ্টিঝরা কর্মহীন মলিন দিনটা আমাদেরই মনের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

অথচ কাল শেষ রাতে—অথবা আজ বেলা সাড়ে নটার সময় চারখানি ইজি-চেয়ারে এসে বসা পর্যন্ত—একটি শোকের জগতে—একটি বিমূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে আমরা এক হয়ে ছিলুম!

আমরা বসেছিলুম তিনদিক খোলা সেই টিনের চালাটার নিচে। মিউনিসি-প্যালিটির সিমেন্টের বেঞ্চিটার ওপর। আমাদের পায়ের কাছে দুটো লণ্ঠন জ্বলছিল—একটার মাথার দিক খানিকটা ভাঙা—তীব্র কেরোসিন গ্যাস উঠে আস-ছিল তার ভেতর দিয়ে। হু হু করে হাওয়া ছুটছিল গঙ্গার চড়ার ওপর,—কী কতগুলো দুলছিল ঢেউয়ের মতো—যাতে মনে হয়েছিল ভুট্টার ক্ষেত, দিনের বেলা দেখেছিলুম ঘাসের জঙ্গল।

সেই হাওয়ায় চিতার আগুনটাও লাফালাফি করছিল, মিউনিসিপ্যালিটির দুজন ডোম বাঁশ দিয়ে মধ্যে মধ্যে চিতাটা ঝেড়ে দিচ্ছিল, কতগুলো ফুলকি উড়ে গিয়ে পড়ছিল নিচের খাড়িটার কালো জলে। একটা আধভাঙা কলসীকে মড়ার মাথার মতো দেখাচ্ছিল চিতার আলোয় আর কণিকার থার্ড ইয়ারে পড়া ছোট ভাইটা, খাঁড়ির ওপারে—চড়ার ওপারে—দূরের অন্ধকার গঙ্গার দিকে একভাবে তাকিয়ে বসে ছিল।

সমীর ফিস ফিস করে বলেছিল আশ্চর্য!

আমরা তিনজনে সাড়া দিয়ে বলে-ছিলুম, আশ্চর্য!

তা ছাড়া কী আর? কলকাতা থেকে আমাদের হেড্ অফিস সরে গিয়ে যখন পশ্চিমের এই শহরটাতে চলে এল, আর আমরা তিন বন্ধু—আমি, সমীর আর প্রমোদ এখানে বদলি হলুম—তখন অনেক কষ্টে শহরের শেষ প্রান্তে এই নির্জন জায়গায় ছোট বাড়ীটি সংগ্রহ করেছিলুম। এর মধ্যে উপযাচক হয়ে দেখা দিল অংশু ডাক্তার : 'থাকবার জায়গা পাচ্ছি না, আপনাদের মেসে যদি দিন কয়েকের জন্যে—'

ক'দিনের জন্যে এসে পাকাপাকি হয়ে গেল। তিনজনে ব্রীজ জমতনা—দেখা গেল অংশু অদ্ভুত ভালো খেলোয়াড়। বেশ মেজাজের মানুষ—আমাদের মতোই ব্যাচেলার। কাজেই ত্রিভুজটি নির্ভুল চতুষ্কোণে পরিণত হল। ব্রীজ তো ছিলই—তার সঙ্গে মিলল সমীরের বেহালা, প্রমোদের অ্যাব্‌নর্ম্যাল সাইকোলজী, অংশুর ডাক্তারী অভিজ্ঞতার গল্প আর আমার সাহিত্য-তত্ত্ব।

কোনো ক্লান্তি ছিল না, ক্লান্তিও ছিল না। সন্ধ্যের ব্রীজ খেলে, রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা চার বন্ধু চারটি ইজিচেয়ারে এসে বসে পড়তুম। আমি আর অংশু সিগারেট খেতুম একটার পর একটা, সমীর বেহালা বাজাত, প্রমোদ চোখ বুজে শুনত। তারপর হঠাৎ প্রমোদ এক সময় নাক ডাকাতে আরম্ভ করলে ইজি-চেয়ার শুদ্ধ শুনো তুলে তাকে চমকে দেওয়া—শোওয়ার আগে এইটুকুই ছিল আমাদের শেষ কৌতুক।

আমাদের বাসার সামনের ছোট মাঠ-টুকু পেরিয়ে রাস্তার ওধারে যে পুরনো দোতলা বাড়ীটা—যার সামনে দুটো নিমের গাছ, প্রথম থেকেই তার দোর-

বক্সী ব্রাদার্স

সর্ব প্রকার লৌহ বিক্রেতা

১৮, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি-৭

= নির্ভরযোগ্য ১৬ বছরের প্রতিষ্ঠান =

আপনার জড়োয়া ও পিনি সোনার আধুনিক অলঙ্কারের অর্ডার (আমরা বাড়ী গিয়ে নিয়ে থাকি এবং সুন্দর কারুকার্যে সম্পন্ন করি)

পি, সি, রায়—জুয়েলার

১৪, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

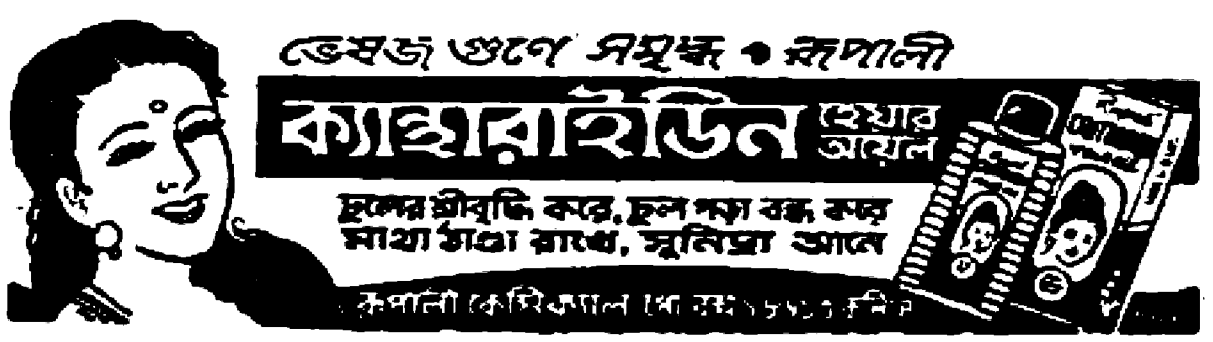

জানলা বন্ধ দেখেছি। কবে সেখানে রোদ্দুর এল, জানি না। কিন্তু এক বর্ষণক্লান্ত দুপুরে—যখন অমর সমীরের একপাশে বসে তাস খেলছি, এমন সময় প্রমোদ বললে, দাদা—

পাঁচটা নো-ট্রাম্পসের ডাক নিয়ে আমার তখন মাথা তোলবার জো ছিল না। কিন্তু যে পরমক্ষণে সমীরের হাতে দ্বিপঞ্চাশক টেক্কাটার অস্তিত্ব অনুমান করে চাঁচাতে যাচ্ছিলুম সে-ই যখন হাত দিয়ে বললে, দাদা না, তখন—

সামনের বাড়ির দো-তলার জানলায় একটি মেয়ে। বড়ি-বাইশ বছর বয়েস হবে মনে হয়। বাঙালী—সে কথা বুঝতেও সময় লাগে না। কিন্তু সেজন্যে নয়। তরুণী মেয়ে দেখলেই হাঁ করে চেয়ে থাকার রুচিও আমাদের কারুর নেই। আসল কথা হল, এমন রূপ যেখানে সেখানে চোখে পড়ে না।

পরনে নীল শাড়ী। (পরে আমরা দেখেছি, নীল শাড়ী ছাড়া অন্য কোনো রঙের শাড়ী সে কখনো ব্যবহার করত না।) এক হাতে জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে। আর এক হাতে চিরুণী দিয়ে ঘন চুলের রাশি আঁচড়ে চলেছে। দু-হাতের দুটি সোনার বালা মিশে আছে গায়ের রঙে। আকাশের দিকে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কী ভাবছিল সে-ই জানে।

অংশু বললে, জানালাটা বন্ধ করে দাও। কী ভাববে আমাদের?

সমীর প্রতিবাদ করল: ভাববে কেন? মানুষে খুসি হয়ে দেখবে বলেই তো পৃথিবীতে সুন্দর জিনিষেরা এসেছে।

—কিন্তু—

—কিন্তুর কিছু নেই। আমরা প্রত্যেকে অন্যকে জানি, খাঁটি ভদ্রলোক হিসেবে সবাই-ই নিজেকে দাবি করতে পারি। এর মধ্যে তো কোনো নোংরামো নেই কোথাও। সেদিন যখন চারজনে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলুম, তখন তো আমরা কেউ-ই লজ্জিত হইনি।

মেয়েটির চোখ আকাশ থেকে নেমে এইবার আমাদের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। আমাদের দেখেও দেখল না, এইভাবে চুল আঁচড়ে চলল।

প্রমোদ বললে, তা হলে এসো, একটা চুক্তি করা যাক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কিসের চুক্তি?

—যেমন ভাবে আমরা চারজনে গঙ্গার চড়ার ওপর সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, এই মেয়েটিকেও সেই ভাবে আমরা দেখব।

আসল কথা হল, এমন রূপ যেখানে সেখানে চোখে পড়ে না।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইম্‌প্যার্সোনাল ভাবে—বিশুদ্ধ সৌন্দর্য হিসেবে। ঘরে কেউ একা থাকলে কখনো জানালা খুলব না—দু'জন থাকলে নয়, তিনজন থাকলেও নয়। যখন দেখব, একসঙ্গে চারজনেই দেখব। তাতে লাভ হবে এই—ইন্‌ডিভিজুয়াল হিসেবে আমাদের কারো মনে কোনো রকম ব্যক্তিগত দুর্বলতা আসবে না।

আমি হাসলুম: অর্থাৎ যৌথভাবে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপাসনা?

—ঠিক তাই।

—বেশ একটা নতুন রোম্যান্টিক্ আপ্রোচ্ মনে হচ্ছে!

সমীর বললে, ক্ষতি কী। কিছুতেই রোম্যান্টিক হবো না—এই কথা নিয়ে চ্যাঁচানোটাও তো একটা সংস্কার। তাকে বলা যায় রোমান্স্ অফ্ আন্টি-রোম্যান্টিসিজম্!

ডাক্তার অংশু বিরক্ত হয়ে বললে, আঃ, কচকচানি বন্ধ করো। দ্যাখো, মেয়েটি আমাদের লক্ষ্য করছে।

সমীর বললে, ক্ষতি কী। কিছুতেই নেহাৎ অদ্রষ্টব্য নই। তুমি আর প্রমোদ

তো রীতিমতো সুপুরুষ—আমি আর সুকুমারও খুব সম্ভব সুশ্রী বলেই বাজারে চলে যেতে পারি। আমরা চার-জনে যেমন ইম্‌পার্সনালি ওকে দেখছি, ও-ও তেমনি ইম্‌পার্সনাল চোখে আমাদের দেখছে।

—তা হলে আমার কথাটাই তোমরা মেনে নিচ্ছ।—প্রমোদ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল : তা হলে চুক্তিটা পাকা?

আমি আর সমীর একসঙ্গে জবাব দিলুম : পাকা।

অংশু চিন্তিতের মতো মাথা নাড়ল : তোমাদের ইম্‌পার্সোনাল সৌন্দর্যবোধ তবু আমার ডাক্তারী মগজে ভালো করে ঢুকল না। তবে এই সর্তটা মানছি আমরা চারজনই একসঙ্গে ওকে দেখব।

আজকেই সাপ্লাই ২/৩ ঘন্টায়
ব্যানার্জো
টেলার্স
২৩এ,মহাত্মা গান্ধী রোড-কলি-৯
সুলভমূল্যে ভালো কাজের জন্যে

কুঁচতৈল (হার্বিল্‌স্ত তন্ত্র মিশ্রিত)
টাক, চুল উঠা, মরামাস, অকালপক্কতা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে, নূতন চুল গজায়। মূল্য : ২, ৬ ৭। ভারতী ঔষধালয়, ১২৬।২, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬, ফোন ৪৭-১৭১৬

তাতে অবশ্য এইটে লাভ হবে যে লাঠি যদি কখনো খেতেই হয়, সেটা ভাগাভাগি করেই খাব। একা আমার পিঠেই এসে পড়বে না।

চিন্তাটা জ্বলছে—গঙ্গার চড়ার হু হু হাওয়া এসে তার শিখাগুলোকে নিয়ে খেলা করছে। সেই ছোট ভাইটা—পুর্ণেন্দু—ঠিক একইভাবে বসে আছে সেখানে। সমীর ফিস ফিস করে টুকরো টুকরোভাবে প্রথমদিনের কথা বলছে, আমরা তিনজন আলাদা আলাদা ভাবনা নিয়ে—কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। যে মাথাভাঙা লণ্ঠনটা থেকে কেরোসিনের গ্যাস বেরুচ্ছিল, সেটা শেষবারের মতো এক রাশ উগ্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দপ করে নিভে গেল। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, চড়া পেরিয়ে পশ্চিমে গঙ্গার কিনারায় কয়েকটা সাদা সাদা রেখা ফুটে উঠছে। একটু পরেই ভোর হবে।

তারপর আরো কতদিন পার হয়ে গেছে। আমরা এই বাড়ীর নতুন ভাড়াটে-দের দেখেছি। একজন প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক—ঠিক নটা চল্লিশে একটা পুরোনো সাইকেল নিয়ে অফিসে চলে যান। ঠিক দশটা পনেরো কিংবা কুড়িতে একটি প্রিয়দর্শন ছেলে ট্রাউজার আর বুশ সার্ট পরে, একটা নতুন সাইকেল নিয়ে কলেজের দিকে রওনা হয়। মাঝবয়েসী একটু ভারী চেহারার একটি শান্ত গম্ভীর মহিলা কখনো একা, কখনো বা মেয়েটির পাশে এই জানালায় এসে দাঁড়ান। বোঝা যায়, বাড়ীতে মোটামুটি এই চারজন লোক। আর একটি বাচ্চাকাচ্চা চাকরকেও দেখা যায়, কখনো বাজার করে আনে, কখনো বা দৌড়োদৌড়ি করে ফাই-ফরমাস খাটে।

প্রমোদ এসে একদিন বললে, গেটের সামনে একটা নেমপ্লেট পড়েছে ও-বাড়ীতে। প্রসাদকুমার বসু, ফিসারি ডিপার্টমেন্ট। আমি বললুম, মেয়েটি তা হলে প্রসাদ-নন্দিনী। ওর নাম দেওয়া যাক বাসবদত্তা।

সমীর চটে উঠল : দ্যাখো সুকুমার এই জন্যেই তোমার গল্প-প্রবন্ধ কোনো পত্রিকায় ছাপানো হয় না, তুমি স্ট্যাম্প না দিলেও প্রাণের দায়ে ওরাই ফেরৎ পাঠায়। অমন সুন্দর—সমীর আরো জোরালো করতে চাইল : অমন আশ্চর্য সুন্দর মেয়ের নাম কখনো বাসবদত্তা হয়? অত কর্কশ পুরুষালি নাম?

আমি বললুম, মোটেই পুরুষালি নয়। তুমি যদি সুবন্ধু পড় দ্যাখো—

—চুলোয় যাক সুবন্ধু। এই মেয়েটি যেন প্রথম সূর্যের আলোয় রাঙানো আকাশের মতো। অমন সুন্দর নাম তুমি ভাবতেই পারো না। ওকে বলতে পারো : নীলিমা। বললুম, চীপ—রোমান্টিক।

সমীর এইবার ঘুষি বাগালো : ফের যদি রোমান্টিক বলে অমনভাবে নাক কোঁচকাবে তা হলে মারামারি হয়ে যাবে। রোমান্টিক হওয়ার মতো মনের সুস্থতা নেই বলেই বিরোধিতার ঢেউ ধরেছে। বাংলা দেশে একসময় যেমন অকাম জোড় থেকে বালীগঞ্জের মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত।

অংশু বললে, কী কচকচি আরম্ভ করেছ বলো তো। বেশ তো, নীলিমা নামটাই দেওয়া যাক না। আমার তো ভালোই লাগছে। প্রমোদ বললে, আমারও।

মেজরিটি ভোটে আমি হেরে গেলুম বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি নামটা আমারও খারাপ লাগল না। নীল আকাশের সঙ্গে ওর মিতালি, ওর পরণের নীল শাড়ী, একটা নীল রাত্রির মতো মায়ায় ঘেরা ওর মন—সব মিলিয়ে ওকে যেন নীলিমা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। এক একটি মেয়ে নিজের নামের সঙ্গে মানিয়ে যায়, কোনো কোনো মেয়েকে মানাবার জন্যে নাম খুঁজে আনতে হয়।

ওকে নাম দিয়েছি নীলিমা। আমা-দের নীলিমা।

তারপর এক সময় প্রসাদবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—যেমন হয়।

শারদীয়া পূজায় বিশেষ কনশেসন
১০, হইতে ২৫, টাকা পর্যন্ত
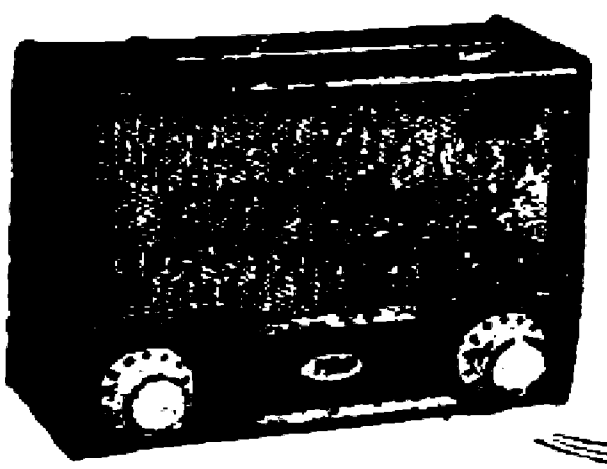
রেডিও জগতের বিস্ময়!
এম.আর.পি.
ট্রানজিস্টার রেডিও
অলওয়েভ ও লোকাল
সুদৃশ্য ও নিখুঁত কার্য্যকারিতা
বিভিন্ন মূল্য ও মডেলের সেট
এক বৎসরের গ্যারান্টি সহ বিক্রয়
মনি রেডিও প্রোডাক্টস,
১৫৭ বি, বিবেকানন্দ রোড - কলিকাতা-১৩

আমরা চার বন্ধু বিকেলে সমুদ্রের মাঠটার ছেড়ায় পায়চারি করছিলাম, উনি একটা লাঠি হাতে বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন।

—নমস্কার। আমার নাম প্রমোদ বসু।

আমরা প্রতি নমস্কার করলাম।

—পাড়ার প্রতিবেশী বলতে তো আপনারাই চারজন। প্রায়ই ভাবি আলাপ করব—কিন্তু কিছুতেই আর সুযোগ হয় না। নতুন বদলি হয়ে এসেছি, কারো সঙ্গে বিশেষ জানা চেনাও নেই। বড্ড একা একা লাগে। কাল বিকেলে যদি আমার ওখানে চা খান—

নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমাদের সৌভাগ্য।

সাধারণ ধরণের মানুষ—নির্ভেজাল সরকারী কর্মচারী। মোটের ওপর সুখী আর আত্মতৃপ্ত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের খবর নিলেন। অংশুর মেডিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপকের সঙ্গে পড়তেন ছাত্রজীবনে, তাও জানা গেল। তারপর চায়ের নেমন্তন্নের কথাটা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

পরদিন চা খেতে যাওয়ার আগে প্রমোদ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কমরেড, আমার একটি বক্তব্য আছে।

সমীর বলেছিল, হিয়ার-হিয়ার!

—না, ঠাট্টা নয়। বন্ধুগণ, তোমরা সবই জানো, যে নীলিমাকে আমরা প্রায় রোজই দূর থেকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপে দেখে থাকি, আজকে আমরা তার সামনে গিয়ে পড়ব। কিন্তু এই সময় আমাদের সেই পুরোনো চুক্তিটা মনে রাখতে হবে। আমরা তার কালেক্‌টিভ ওয়ারশিপার। অতএব—

—অতএব?—অংশু জানতে চাইল।

—আমরা কেউ এমনভাবে সাজব না যাতে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বিশিষ্ট মনে হতে পারে।

আমি বললুম, আগে বলনি কেন? তা হলে সকলের জন্যে ফুটবলের শর্টস আর জার্সি আনা যেত।

আমাদের তিনজনের হাসিতে প্রমোদ একটু অপ্রতিভ হলো।

—ঠাট্টা নয়। আমরা কেউ ডিসটিংগুইশড্ হওয়ার চেষ্টা করব না। কেউ আগে বাড়িয়ে বেশি কথা বলে মেয়েটির কাছে নিজেকে তুলে ধরতে চাইব না।

—কিন্তু চেহারায় যারা ডিসটিংকটিভ্ তাদের কি হবে?—সমীর প্রশ্ন তুলল: তা হলে আমার আর সুকুমারের মুখ চেয়ে তোমার আর অংশুর এক আধ পেগ ঘুষো কালি মেখে যাওয়া উচিত।

আমি বললাম, তাতে ওদের রাউন্সের মাত্রা কমবে এবং আরো বেশি ডিসটিংকটিভ্ হবে।

কিন্তু ঠাট্টা করে যাই বলি, আমরা চুক্তি ভাঙিনি। বাইরে আমাদের একেতা যতই থাক—মনের ছেড়ায় একটা সাধারণ প্রত্যয়ের মতো, একটা আদর্শের মতো, একটা সংকল্পের মতো সেই সত্যটাকে জমা করে নিয়েছিলুম। ওই মেয়েটির ছেড়ায় আমরা এক সাথে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্যোদয় দেখতুম, গঙ্গার ধারে সূর্যাস্ত দেখতুম, তাজমহলের ওপর জ্যোৎস্না দেখতুম, এক সাথে দেখতুম অজন্তা গুহার মহাজনক জাতকের সেই অপূর্ব ছবিগুলো। সেই রৌদ্র মন নিয়ে—চুক্তির প্রতি সেই আনুগত্য বহন করে আমরা চা খেতে গিয়েছিলুম।

আমার স্ত্রী। আমার ছেলে পুর্ণেন্দু—বি এস্-সি পড়ছে। আমার মেয়ে কণিকা, গত বছর বি-এ পাশ করেছে পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে।

কণিকা হাসল: ওঁদের আমি রোজই দেখি। খুব তাস খেলতে ভালোবাসেন।

সমীর জবাব দিলে, সময় কাটাই। কি আর করা যায় বলুন।

বাড়ী ফিরে আমি বলেছিলুম, দূর থেকে যা ভেবেছিলুম, কাছ থেকে দেখলুম মেয়েটি তার চাইতেও সুন্দরী।

অংশু হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, সাধারণতঃ যা হয় না।

সমীর বলেছিল, কিন্তু ওর নাম কণিকা।

তা হোক, তা হোক। —প্রমোদ জবাব দিয়েছিল: এক বিন্দু জলে সমুদ্র দেখি, একটি নীলিমায় কণিকায় নীল আকাশকে দেখতে পাই।

আমরা চারজনেই রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছিলুম। একা হলে লজ্জা ছিল, কিন্তু চারজনে মিলে যেন একটা নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। সম্মিলিতভাবে সৌন্দর্যের উপাসনা করছি আমরা। নিজেদের এই সংঘ শক্তিতে আলাদা একটা গৌরব বোধ হতে থাকে এখন।

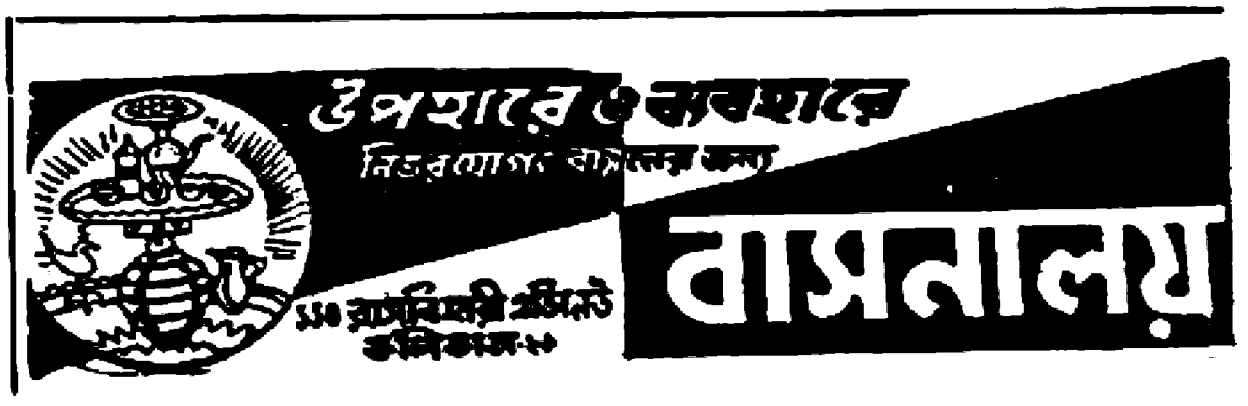

আকাশ ও জীবন — ফটো : জেঃ আচা

.....আর একটা লণ্ঠনও নিভল। সূর্যের আভায় গঙ্গার পশ্চিম আকাশ রাঙা হল। চিতাটা প্রায় নিবু নিবু। অংশু আর একটা সিগারেট দিয়েছে আমাকে, আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। গলা জ্বালা করছে এখন। গঙ্গার চড়ার ওপর যেগুলোকে রাতের অন্ধকারে ভুট্টার ক্ষেত মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তা ঘাসের জঙ্গল। হাওয়া তেমনি হু হু করে ঘুরছে, আধ ভাঙা কলসীটা রাতের শিশিরে ভিজে চকচক করছে। পূর্ণেন্দু কপালে হাত চেপে বসে আছে, রুক্ষ চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে ওর। টিনের চালাটার গায়ে হিন্দী-ইংরেজী আর কখনো কখনো বাংলায় লেখা দুটো একটা নাম একটু আধটু পড়া যায় এখন।

একটু আগে প্রমোদ জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল, এখন আমরা সবাই চুপ করে আছি। এর পরে দিনগুলোর আর কোনো হিসেব করা তালিকা নেই। অনেকবার গেছি, অনেক চা খেয়েছি, প্রদ্যোতবাবুকেও টেনে এনেছি আমাদের তাসের আড্ডায়। কিন্তু এদের বাড়ীতে কখনো একা কেউ যাইনি। সমীর যেদিন বেহালা বাজিয়েছে, সেদিন প্রসাদ বলেছে সাঁওতাল-ভালুয়ার জঙ্গলে তার বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী; আমি যেদিন ইংরেজ কবিতা আবৃত্তি করেছি, সেদিন ডাক্তারী অভিজ্ঞতার আশ্চর্য গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়েছে অংশু। আমাদের নীলিমার মুগ্ধ চোখ সকলের ওপর দিয়ে সমানভাবে ঘুরেছে। কারুর ওপর কোনো পক্ষপাতের সুযোগ আমরা কোনো দিন দিইনি। সচেতনভাবে তো নয়, হয়তো অচেতনভাবেও নয়।

শুধু একদিন নীলিমা প্রশ্ন করেছিল : আপনারা চারজন বুঝি সব সময়ে এক সঙ্গে চলেন?

প্রমোদ হেসে বলেছিল : সব সময়ে নয়। কোনো কোনো ব্যাপারে।

সমীরের মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে পড়েছিল : আমরা চুক্তি মেনে চলি।

—কিসের চুক্তি?—নীলিমার কোজাগরী চোখের তারায় কৌতূহলের আলো জ্বলে উঠেছিল।

আমি বলেছিলুম : ক্ষমা করবেন—বলতে বাধা আছে!

—চারজনেরই?

অংশু জবাব দিয়েছিল : হাঁ, চারজনেরই।

নীলিমা আর জানতে চায় নি। কোনো দিনই নয়।

রোদ উঠল। চিতা প্রায় নিবে এসেছে। পূর্ণেন্দু উঠে দাঁড়ালো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলুম আমরা। একটু পরেই চিতাটা একেবারে নিবে যাবে, জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হবে। এক আধটা ছোট হাড়ের টুকরো আর হাতের যে ছোট আংটিটাকে খুলে নেওয়া হয়নি তার একটা গলিত রূপ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে ওর ভেতরে।

এবার অংশু বললে আশ্চর্য!

আশ্চর্যই তো। রাত বারোটার সময় ঘর থেকে সেই গোঙানির শব্দ। ব্যতিব্যস্ত প্রদ্যোতবাবুর দরজা ভেঙে ফেলা। আশ্চর্যই তো। রাত বারোটার সময় ঘর থেকে এনেছিল নীলিমাই জানে। কিন্তু চারটাকে আর বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। তথায় এক টুকরো চিঠি।

'আমি যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ছাড়া কেউ দায়ী নয়।'

অংশু ছুটে গিয়েছিল। এবার ওকে ডিসটিংটিউট হতে আমরা বাধা দিইনি। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সুযোগ সে পেলো না। মা লুটিয়ে কাঁদলেন। পূর্ণেন্দু বিহ্বলভাবে চেয়ে আছে—যেন কিছু বুঝতে পারছে না এখনো। আর প্রদ্যোতবাবু হাহাকার করছেন : এ আমার কী হল—এ আমার কী হল! আমার সোনার প্রতিমা এমন করে কেন চলে গেল—কেন?

এই সান্ত্বনাহীন অসহ্য শোকের মধ্যে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। আমাদের আকাশ নিবে গেছে—একটা স্থবির অন্ধকার লোহার প্রাচীরের মতো চারদিক থেকে উঠে আসছে। সমুদ্রের ধারে গ্রানিট্ মন্দিরে আফ্রোদিতের সোনার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলুম আমরা—হঠাৎ কোথা থেকে আকাশছোঁয়া ঢেউ উঠে সেই মন্দির—সেই মূর্তিকে চিরকালের মতো অতলে তলিয়ে নিয়ে গেছে।

চিতা নিবেছে। পূর্ণেন্দু জল আনতে নামল গঙ্গার খাঁড়িতে। আমরা স্বপ্নাবিষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালুম চার জনে। এবার ওকে সাহায্য করা দরকার।

ভোরের আকাশ কালো করে কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি নামবে।

বৃষ্টি পড়ছে।

চারটে ইঞ্জি চেয়ারের দ্বীপের ভেতর, চারটে নিঃসঙ্গ, চারটে ঘৃণায় কুটিল মন নিয়ে আমরা বসে আছি। হঠাৎ যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠে সামুদ্রিক হাওয়ার স্বর পাঠিয়ে দিলে প্রমোদ : এমন তো হতে পারে তুমি বলতে আমাদের চারজনকেই এক সঙ্গে বুকিয়েছিল সে! আমরা চারজনেই তার কাছে এক হয়ে গিয়েছিলুম?

হয়তো। হয়তো সবাই আমরা দায়ী। এখনো মানতে পারছি না। কিন্তু হয়তো এই কথাটাই আমরা মেনে নেব এর পরে। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করব। নইলে, নিজেদের প্রতি ঘৃণায়, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসে, আমাদের মধ্যে এই যে কুয়াশা ঘনিয়ে আসছে, তা আমাদের চারজনকে—চারটি মহাদেশের দূরত্বে ছড়িয়ে দেবে।

G.E.C.

॥ স্বর ও গুণের জন্যই রেডিও ॥

এক্সাইজ ডিউটি সমেত সর্বশেষ মূল্য তালিকা

মডেল নং				
৩৫১	৫ ভালব	৩ ব্যাণ্ড (জেনালেস্ক)		মূল্য ১৫০৲
১১৫৫	৪ ভালব	৩ ব্যাণ্ড (ড্রাই ব্যাটারি)		মূল্য ৩৩৫৲
৫১৫১	৫ ভালব	৩ ব্যাণ্ড এ সি		মূল্য ৩৩৫৲
৬১৫০	৫ ভালব	৩ ব্যাণ্ড এ সি/ডি সি		মূল্য ৩৩৫৲
৫১৫১ডব্লিউ	৫ ভালব	৩ ব্যাণ্ড এ সি	কাঠের ক্যাবিনেট	মূল্য ৩৮৪৲
৬১৫০ডব্লিউ	৫ ভালব	৩ ব্যাণ্ড এ সি/ডি সি	"	মূল্য ৩৮৪৲
৫৩৫০	৬ ভালব	৩ ব্যাণ্ড এ সি	"	মূল্য ৪৬৮৲
৬৩৪৯	৬ ভালব	৩ ব্যাণ্ড এ সি/ডি সি	"	মূল্য ৪৬৮৲
৬৭৪৫	৭ ভালব	৫ ব্যাণ্ড এ সি/ডি সি	"	মূল্য ৭৮৩৲

হাই ফাই কাঠের ক্যাবিনেট :

৫৭৪৬	৭ ভালব	৫ ব্যাণ্ড এ সি	"	মূল্য ৭৮৩৲

হাই ফাই কাঠের ক্যাবিনেট :

পরিবেশক :

রেডিও ক্লাব প্রাইভেট লিঃ

শো-রুম : ৩০, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা—১৩

হেড অফিস : ৩, মাণ্ডো লেন, কলিকাতা—১

ফোন : ২৩-১৩৯৮

সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে রেডিও, রেফ্রিজারেটরস, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড চেঞ্জার্স, টেপরেকর্ডার্স এবং বিবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি মেরামত হয়।

কিস্তিতে অথবা নগদ মূল্যে পাওয়া যায়।

বাঙলা চলচ্চিত্র জগতে নবদিগন্ত

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের একটুখানি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা ছবি যদিও কথা কইতে সুরু করেছে ১৯৩০-৩১ সাল থেকে, কিন্তু সত্যিকারের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের পত্তনকালে নির্মিত দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "চণ্ডীদাস"। "চণ্ডীদাস"-এর পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাঙলা দেশে বহু বাঙলা ছবি তৈরী হয়েছে, যার সংখ্যা অন্ততঃ এক হাজারের কম নয়। এইসব ছবির মধ্যে অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের গল্প ছিল—গার্হস্থ্য এবং বাকী সব ছিল, ধর্মমূলক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, হাস্যরসাত্মক, অপরাধমূলক এবং আরো অন্য কিছু। কিন্তু ছবি যে-শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, গল্প কিছু বহির্দৃশ্য বাদে তার বেশীর ভাগ অংশই তোলা হোতো স্টুডিওতে তৈরী সেটের মধ্যে। রূপকাহিনীরই হোক, আর মন্দিরের ভিতরই হোক, বাড়ীর উঠানই হোক আর মন্দিরের চত্বরই হোক—সবই তৈরী হোতো স্টুডিওর ফ্লোরের মধ্যে। রেল স্টেশন, চোরাগলির রাস্তা, কয়লাখনির অভ্যন্তর, এমন কি ধানক্ষেত পর্যন্ত গড়া হয়েছে ঐ স্টুডিওর ফ্লোরেরই মধ্যে। আর গার্হস্থ্য চিত্রের তো কথাই নেই; সোফা, সেটি, চেয়ার টেবিল, খাট আলমারি আর কাঠের দিয়ালা দেখে দেখে দর্শক-সাধারণের চোখ রীতিমত পীড়িত হয়ে পড়ছিল এবং মন উঠেছিল হাঁফিয়ে।

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্কর রচিত "পরশপাথর" চিত্রে উত্তম ও সুচিত্রা

ঠিক এই সময়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সমস্যা নিয়ে নিমাই ঘোষ তৈরী করলেন "ছিন্নমূল।" ছবি হিসাবে যদিও তা সার্থক হয়ে ওঠেনি নানা কারণে, কিন্তু এই ছবিখানিকেই বাঙলার চিত্রজগতে নবযুগের প্রবর্তক বলে অভিনন্দিত করা যায়। কেননা ছবিটির সকল দিকেই একটি নূতনত্বের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। এর বিষয়বস্তুই খালি নূতন ছিল না, এটি তোলাও হয়েছিল সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে। ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিনা মেক-আপেই ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং ছবির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যই তোলা হয় স্টুডিওর বাইরে, উন্মুক্ত দিবালোকে। যাঁরা এতে অভিনয় করেছিলেন, তাঁরাও প্রায় সকলেই চিত্রজগতে নবাগত। কিন্তু অর্থাভাবের অভাবমাত্র নিয়েই নিমাই ঘোষ যেখানে থেমে গেলেন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে, বছর দুই বাদে সত্যজিৎ রায় এসে সেইখানেই জয়-পতাকা উড্ডীন করলেন তাঁর "পথের পাঁচালী" মারফত। অবশ্য এখানে বলা অন্যায় হবে না যে, সত্যজিৎ রায়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভাগ্য ভালো, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁর উদ্যমকে জয়যুক্ত করবার জন্যে সাহায্য-কারী হিসাবে পেয়েছিলেন। শ্রীরায় দেখালেন যে, তাঁর "পথের পাঁচালী" ছবির গল্প তার গ্রাম্য পটভূমিকাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই ফুটে উঠেছে, গ্রামীন জীবন থেকে আলাদা করে নিলে তার পরে রস যাবে মরে, প্রাণ উঠবে শুকিয়ে। তার অপু-দুর্গা হচ্ছে গ্রামের মাটির সন্তান, তার ধুলোবালা, ঝড়-বৃষ্টি, পুকুর-পানাড় পথঘাট জলজলের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যাকে

ছবি বিশ্বাসের "সন্ধ্যারাগ" চিত্রে কল্যাণী ঘোষ।

বলে বস্তিশপাকে জড়ানো। তাই "পথের পাঁচালী"তে আমরা দেখতে পেলুম একটি পরিপূর্ণ গ্রামের রূপ—তার ভালো মন্দ, সবখানি মিলিয়ে। গ্রামের ছেলেমেয়ে অপু-দুর্গা। তাই শ্রীরায় সাজানো-গোছানো, ফক্‌ফকে-তক্‌তকে, নখরকান্তি সজ্জী ছেলেমেয়েকে প্রচলিত প্রথায় সুন্দর করে মেক্‌আপ্ করিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করালেন; চোখ দেখলেই মনে হবে, এরা গ্রামেরই ছেলে-মেয়ে, এমন খুঁজেপাতা ছেলেমেয়েকে আবিষ্কার করে তাদের বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরী সাজালেন। ইন্দির-ঠাকরুণের ভূমিকায় জনৈ সত্তিয়ে-বয়স বাড়িয়ে বুড়ীকরা অভিনেত্রী নিয়োগ করতে তাঁর মন উঠল না; তিনি যথার্থ বৃদ্ধা চুণী-বালাকে খুঁজে বার করলেন। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক পুডভ্‌কিন যাকে বাস্তবধর্মী শিল্পকলা বা realistic art বলেছেন, তাকেই এনে ফেললেন সত্যজিৎ রায় বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে। বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্প তার পোশাকী এবং কৃত্রিমতার বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পেল।

নিমাই ঘোষ, সত্যজিৎ রায়ের এই বাস্তবধর্মী শিল্পসাধনাকে অনুসরণ করে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজেন তরফদার, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক। রাজেন-বাবুর প্রথম ছবি "অন্তরীক্ষ"-তে বাস্তবধর্মিতার বহুতর নিদর্শন পাওয়া গেলেও চিত্রধর্মিতার অভাব ছিল বলে "অন্তরীক্ষ" রসিকজনের কাছে উপযুক্ত সমাদর লাভে অসমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরবর্তী চিত্র "গঙ্গা" মাত্র চিত্র-সৌন্দর্য দিয়ে দর্শক-নয়নকে এত তৃপ্তি দিয়েছে যে, ছবির প্রথম দিকে মৎস্য-জীবিদের জীবনবেদরূপে রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও আসলে ছবিখানি যে যৌন আবেদনমূলক প্রেম-চিত্ররূপেই সকলের মনহরণে সক্ষম হয়েছে, এই তথ্যটি ব্যক্ত করতে বহু চিত্র-সমালোচকও বিস্মৃত হয়েছেন। মৃণাল সেনের প্রথম ছবি "দুধারা" আমরা দেখিনি। কিন্তু তাঁর "নীল আকাশের নীচে" এবং "বাইশে শ্রাবণ" নিশ্চয়ই বাস্তবধর্মী শিল্প-সাধনার পরিচয় বহন করে। "একাধিক ছবি ও শব্দের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দর্শককে নতুন এক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া"র সাধনায়, "দুই বা ততোধিক বস্তু বা অবস্থার বিরোধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ" করবার প্রক্রিয়াকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিতে গেতে তিনি স্বতঃই সচেষ্ট। ঋত্বিক ঘটকের "মেঘে ঢাকা তারা"-তেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে, "নাটক সার্থকতায় পৌঁছোয় বিরোধের মধ্য দিয়ে, চরিত্রের স্পষ্টতাও অন্ত-র্বিরোধের মাধ্যমেই ঘটে থাকে, আর ঘটনার বাস্তবতাও পুরোমাত্রায় নির্ভর-শীল বিরোধী অস্তিত্বের সংঘর্ষের ভেতরেই।" বাস্তুহারা-জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না পশ্চিম বাঙলায় যে চরম গ্লানি, লাঞ্ছনা ও অপমানের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত ও প্রবাহিত হচ্ছে, তাকেই পরিপূর্ণরূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে "মেঘে ঢাকা তারা"-তে।

"ছিন্নমূল" এবং "পথের পাঁচালী"র আগে আমাদের ধারণা ছিল, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাকে ছবির পর্দায় তুলে ধরলে তা দর্শকদের বিরক্তিই উৎপাদন করবে। তাই ছবির ঘটনাকে দর্শকদের আনন্দের খোরাক করবার জন্যে আমরা কল্পনার ডানায় ভর করে ওড়বার চেষ্টা করতুম। তাই কাল্পনিক কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরাও হয়ে পড়ত অবাস্তব—নিত্য-কারের দেখা রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে থাকত না তাদের তিলমাত্রও সম্পর্ক। "বাস্তব জীবনও যে সম্ভাবনার প্রাচুর্যে ঠাসা, এবং এই আটপৌরে জীবনকে সোজাসুজি দেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করাটাই যে যথেষ্ট"—এই মহান সত্যকে নিঃসন্দেহে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। জীবনকে খোলা চোখে দেখা, বোঝা—তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া হচ্ছে এক কথা, আর তাকে কল্পনার ফানুসে চড়িয়ে 'মনোহারী' করে তোলা হচ্ছে আর এক কথা—দুইয়ের মাঝে আসমান-জমিন ফারাক।

বাঙলা চলচ্চিত্রে এই যে বাস্তব-বাদের প্রবর্তন, ভেবে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, এটার আমদানী হয়েছে যুদ্ধোত্তর ইতালীয় ছবি থেকে। "শু শাইন", "সাইকেল্ থিফ", "মিরাকেল্ ইন মিলান", "ইল তেত্তো" প্রভৃতি ছবির পরিচালক ভিত্তোরিও ডে-সিকা জন-সাধারণকে দেখলেন, কত ছোট্ট নগণ্য ঘটনা নিয়ে কি মহান শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব। মনে হয়, গল্প যেন ছড়িয়ে আছে আমাদের চারিদিকে। যে-কোনও জিনিষ ঠিকমত তুলে ধরতে পারলেই হোলো—যে-কোনো মুহূর্ত, যে-কোনো মানুষ, যে-কোনো জায়গা আজ গল্পের উপাদানে ভরপুর। যা-কিছু ঘটছে বা যা-কিছু দেখছি—তাকেই খুঁটিয়ে, চুল চিরে, উল্টেপাল্টে, ছিঁড়েখুঁড়ে দেখতে পারলে দেখা যাবে, তারই মধ্যে রয়েছে একটা পুরো গল্পের মানবীয় উপকরণ, যা আমাদের সিনেমার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

আজকের দিনে আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রকে বাস্তবমুখী করে তুলে নিমাই ঘোষ, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ পরিচালকেরা একটি বিরাট নামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য।

ডান্সেস অব ইণ্ডিয়া

শিরিনের বই

অধ্যক্ষ প্রহ্লাদ দাসের

কথক (বোল্) ২·৫০ নঃ পঃ

(ইংরাজী)

নৃত্য-বিজ্ঞান ২·৫০ নঃ পঃ

২য় সংস্করণ

নৃত্য-শিক্ষা ৫·০০ নঃ পঃ

প্রাপ্তব্য

নৃত্য-ভারতী — কলিঃ-১১।

প্রভাত—২সি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯।

পুস্তকের দোকান ও যন্ত্রসংগীতের দোকান।

সাদা ও ছাপা

টিনের কৌটা

প্রস্তুতকারক:

BOX OF CALCUTTA

73, BELGACHIA ROAD, CAL-37

Phone: 56-2077

সদ্য প্রকাশিত হলো

ভারতের যে সব অবিস্মরণীয়া মহীয়সী শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ভক্তি ও সাধনা, বিপ্লব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদেরই সমৃদ্ধ জীবন কাহিনী

যাঁরা মহীয়সী ২·০০

সুদেষ্ণারঞ্জন দত্ত

ছোটদের ভালো ভালো গল্প

প্রতিটি ২·০০

বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শিবরাম চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে নিবেদিত বাংলার সেরা সাহিত্যিকদের রচনার সমৃদ্ধ

কিশোর সংকলন

প্রণাম নাও ৪·০০

আরও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য কিশোর গ্রন্থ

হেমেন্দ্র মিত্র ভানুমতীর খেল ২·০০। প্রমোদকুমার সান্যাল বিচিত্র এ দেশ ২·৫০। বুদ্ধদেব বসু হাসনাবিবির বাঁশিওলা ২·০০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ডাকাতের হাতে ২·৫০। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নয়পেশাদের খেলুন ২·০০। ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পায়ে পায়ে মরণ ২·০০। সুবর্ণ মিত্র দুরন্তের ডাক ২·০০। বিশ্বনাথ দে মোহাইপুরের রাজা ১·৬০। সুদেষ্ণারঞ্জন দত্ত বিদ্যাসাগর ০·৮০। সুনন্দা ঘোষ রূপকথার গাছি ১·৫০। গল্প সংকলন আহরণে আটখানা ৩·০০।

শ্রী প্রকাশ ভবন

এ-৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

মশারি

উপরন্তু মোলাই গায়ে মেপের কোনে কাটি চায়ে কিনুন

৬॥	× ৩	× ৪	কুট	১·৫০
৬॥	× ৩॥	× ৪	"	১০·৫০
৬॥	× ৪	× ৪॥	"	১২·৫০
৭	× ৪॥	× ৫	"	১৪·২৫
৭	× ৫	× ৫	"	১৫·০০
৭	× ৬	× ৫	"	১৬·৫০

অনন্তচরণ মল্লিক এণ্ড কোং

১৬৭।৪, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩

ফোন ২১-৪৩২৮

বাংলাদেশের রূপকথা

লেখা ও ছবি—ত্রিদিব রায়

খাঁটি রূপকথার ভাণ্ডার অপূর্ব গল্প। দুরঙে ছাপা অসংখ্য ছবি। ৩·০০

নিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়ের

বারো মাসের বারো রাজা ৩·০০

মূল চেক রূপকথা থেকে অনুবাদ। অসংখ্য ছবি। ৩·০০

জুন ডার্ন-এর

কাইন্ড উইকস্ ইন এ বেলুন ২·৫০

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড ৩·৫০

জার্নি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ ২·০০

এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ ২·৫০

রুল দি আর্থ টু দি মুন ২·০০

অনুবাদক—অনীকেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়ার রাজদূত

মাইকেল শ্টগফ ৩·৫০

অনুবাদক—মনোমোহন চক্রবর্তী

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

এই সিরিজে: অচিন্ত্য - সৌরীন্দ্র - আশাপূর্ণা - জরাসন্ধ - নারায়ণ - বনফুল - মোহনলাল - শিবরাম - সুকুমার সে সরকার কমলাকী - তারাশঙ্কর - প্রেমেন্দ্র - বিভূতি বন্দ্যো: - মানিক - শরদিন্দু - শৈলজা - হেমেন্দ্র: লেখকদের সমগ্র গল্প থেকে বাছাই করা এক-একটি গ্রন্থ। প্রতি বই ২·০০

যামিনীকান্ত সোমের

কবিদাদুর গল্প ১·৫০

অপূর্ব গ্রন্থ। দু রঙে ছাপা ছবি

অবনীন্দ্রনাথের

রং বেরং (গল্পগ্রন্থ) ৩·৫০

এইচ জি ওয়েলসের

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬·০০

আলাস্টাইনের

ডগ ডুলো ১·২৫

কোরাল আইল্যান্ড ১·৭৫

অজানার অভিযানে

রিচার্ড এল নিউবার্গের

অসংখ্য ছবি। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ২·০০

অক্ষয়বট প্রকাশ-মন্দির

বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—৭২

কিশোর সঞ্চয়ন

শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিচিত্রমুখী প্রতিভার পরিচয় এই সিরিজের প্রতি বইয়ে। উপন্যাস, গল্প, কবিতা নাটক ও প্রবন্ধ। প্রতি বই ৪·০০

এই সিরিজের নতুন বই

শিবরাম চক্রবর্তী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইতিপূর্বে বেরিয়েছে

প্রেমেন্দ্র • বুদ্ধদেব

অচিন্ত্য • অবনীন্দ্র

এক যে ছিল রাজা ৩·৫০

(রূপকথার সংকলন)

ইতিহাসের গল্পগুচ্ছ ৩·০০

(ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন)

হালকা হাসির গল্প ৩·৫০

(হাসির গল্পের সংকলন)

সমৃদ্ধ

শিকার কাহিনী ১ম খণ্ড ২·২৫, ২য় খণ্ড ৩·০০, একত্রে ৫·০০

সুকুমার সে সরকারের

অন্ধকূপী কন ২·০০

নাকরাজা ১·৮০, বনের গল্প ১·৫০

বাঘবাবার গল্প ১·২৫

ভাদুকদাদার গল্প ১·২৫

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

চারমূর্তি ২·৫০

চারমূর্তির অভিযান ২·০০

খুশির হাওয়া ২·০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

হুন্টেন্দ্রর অ্যাডভেঞ্চার ২·০০

সুন্দরবনের ডুডুক্কে দেশ ১·৫০

সাতাকার শার্লক হোমস ০·৭৫

এইচ জি ওয়েলসের

আইল্যান্ড অব ডঃ মোরো ২·৫০

কুড অব দি গডস্ ২·০০

অলিম্পিক আবির রচিত ৫·০০

অলিম্পিক ক্রীড়াসংঘের বিশদ বিবরণী। অসংখ্য আর্ট-প্লেট-শোভিত

সুবালার সাহস

মনীন্দ্রলাল বসু

অশ্বিনের আলোকস্নাত আকাশ মাতৃস্তনাপানরত শিশুর হাসির মত মধুর ছিল, সহসা অভিমানিনী নারীর ভ্রূকুটিকুটিল আননের মত তিমিরঘন হয়ে এল।

কলিকাতার সংকীর্ণ গলির একতলার ছোট ফ্লাটে সূর্যালোক সোজা আসেনা, কখনও বা পাশের বাড়ীগুলি এড়িয়ে তির্যকভাবে প্রবেশ করে। কিন্তু, আজ প্রভাতে উঠে মনে হয়েছিল, চারদিক আলোয় ঝলমল করছে, শুধু আলো নয় কোথা হতে যেন শেফালীর সুবাস শারদীয় সঙ্গীতের সুর আসছে—কিশোর-স্মৃতির ছায়াছবি। এমনি শরতের আলোয় সুবালার মনে প্রথম যৌবনের সুখস্মৃতি জেগে ওঠে, সেই চিন্তাজ্বরহীন অকারণ পুলকভরা দিনগুলি!

খুসিমনেই সুবালা তাহার ছোট সংসারের কাজ সকালে সুরু করেছিল। ভৃত্যটি অসুস্থ ও অনুপস্থিত, ঠিকে-ঝিকে বাজার পাঠাতে হয়েছে, বেশী দামে বাসী তরকারি ও বরফের মাছ এনেছে বলে বচসা করেনি। গত শরতের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর তার অন্তরে আজ গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে।

কিন্তু চায়ের টেবিলে কলহ না হলেও, স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি সুরু হল। অফিসের মোটা ফাইল নিয়ে স্বামী চা খেতে এলেন। গম্ভীর প্রকৃতির লোক, স্বল্পভাষী, সহকারী সেক্রেটারীর পদ লাভ করে আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন, আগে যেটুকু মন সংসারে দিতেন এখন তা ফাইল দেখতেই যায়।

চার বছরের বিবাহিত জীবনে সুবালা হাঁফিয়ে উঠেছে; গত বছরে খোকা আসতে আর সে স্বামীসঙ্গলাভের জন্য তৃষিত হয় না। তবু আজ মোটা ফাইল দেখে তার ইচ্ছা হল, বলে, ছুঁড়ে ফেলে দাও ফাইলটা, আজ শরদিন্দ্রীয় সমাদরে অফিসের ফাইল বন্ধ করো, তুমিত উপনন্দের মত ঋণশোধ করতে বসনি। তারপর স্বামী ফাইল হতে মুখ না তুলে বললেন, শোন, আমাকে শীগগীর যেতে হবে, অফিসের গাড়ী এক্ষুনি আসবে, আমাকে আজ দার্জিলিং যেতে হবে।

দার্জিলিং! সুবালা চঞ্চলা হয়ে উঠল। আবদারের সুরে বলে উঠল, বা, দার্জিলিং যাবে, বলনিত, আমি যাব, আমিও যাব দার্জিলিং।

ফাইলের পাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটতে কাটতে স্বামী বললেন, না, তুমি কোথায় যাবে! আমি অফিসের কাজে যাচ্ছি, তুমি কোথায় যাবে!

আহত অভিমানে সুবালা বললে, বা, আমি যেতে পারিনা বুঝি, শুনেছ যাবেত, শুনে বুঝি আর একটা সিট বুক করা যায় না,—আমি যেতে পারিনা!

এবার চশমা খুলে স্বামী চাইলেন, দেখ, এ আমি অফিসের জরুরী কাজে যাচ্ছি, আজই হয়ত ফিরতে হবে, তুমি কোথায় যাবে, অবুঝ হোওনা।

বেলা! সুবালা চলে গেল খোকার কাচা-জামাগুলি উঠানের বারান্দায় শুকোতে দিতে। শরতপ্রভাতের সংগীত ছন্দোভ্রংশ হয়ে গেল।

এক হাতে মোটা পোর্টফোলিও অপর হাতে ছাতা নিয়ে স্বামী চলে গেলেন। সোনার আলো মিলিয়ে গিয়ে বাদল ধারা সুরু হয়েছে।

খোকা সুষুপ্ত, কাঁচ মোটা আঙ্গুলে প্লাস্টিকের ঝুমঝুমিটা ধরে আছে। খোকার দুধ তৈরি করে বোতলে ভরে সুবালা সেফায় এলিয়ে বসল, আর কোন কাজ করতে তার উৎসাহ রইল না। রান্না-ঘরে ভেটকি মৎস্য খণ্ডগুলি ফ্রাই প্যানে পড়ে রইল, বারান্দায় জামাকাপড়গুলি ভিজতে লাগল, আরও জোরে বৃষ্টি এল। সে ভাবতে লাগল, খুব বৃষ্টি আসে, রাস্তা সব ডুবে যায়, ট্রেন ছাড়তে না পারে, কেশ মজা হয়। কিন্তু ভারাক্রান্ত অন্তরে সে কোন কৌতুক অনুভব করতে পারল না।

হঠাৎ হরিণীর মত সুবালা চমকে জাগল। চারিদিকে নানা শব্দের ঝড় উঠেছে, কোলাহলের তুফান,—কম্‌কম

বিষ্টি পড়ছে, খোকা বোধ হয় উচ্চস্বরে কাঁদছে, জানলাটা কাঁপছে, পথে কোথায় মোটরগাড়ীর হর্ণের ধ্বনি, কে যেন বেল বাজাচ্ছে, এ ঝড়জলে কে বার বার বেল বাজাচ্ছে!

খোকার দিকে একবার চেয়ে সুবালা ড্রয়িংরুম পার হয়ে দরজা খুললে, সম্পূর্ণ খুললে না, একপাল্লা খুলে পাড়ার আড়াল কোমরে জড়িয়ে দাঁড়াল। অদূরে এক জীপ-গাড়ী দেখা যাচ্ছে আর দরজা জুড়ে সোনালী-সাজপরা রহস্যময় দীর্ঘকায় যুবকমূর্তি! মাথার টুপি প্রশস্ত কপাল জুড়ে বসেছে, শুধু দুটি চোখ কালো মেঘের পাশে তারার মত জ্বলজ্বল করছে, কোটের কাঁধের ওপর এয়রোপ্লেনের ডানা আঁকা না আটা, বোঝা যাচ্ছে না। বিস্মিতভাবে সুবালা চাইল।

যুবকমূর্তিটি দুলে উচ্চহাসা করে উঠল। ত্রাসিত হয়ে সুবালা দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে, মুখে কোন কথা এল না।

অজানা যুবক দরজা ঠেলে দিলে, মৃদুহাসো কৌতুক সঙ্গীতের সুরে বলে উঠল—সু-বালা ঠিক বাড়ীতেই এসেছি মনে হচ্ছে—সু-বা-লা চৌধুরি nee ঘোষ—ঠিক না?

কে! কে আপনি?

আমি চিরপরিচিত, বহু পরিচিত তবু অজানা—

চমকিত হয়ে সুবালা দরজা খুলে দিলে, প্রথম যৌবনের পার হতে কোন চিরপরিচিত বহু আকাঙ্খিত চাউনি ভেসে এল।

দরজা বন্ধ করে তারা ড্রয়িংরুমে এল। কৌতুকের সুরে যুবকটি বললে, হায় ভীতা অ-বালা এখনও চিনতে পারলে না!

কণ্ঠের সুরে সুবালার বুকের রক্ত দুলে উঠল! কত শরৎপ্রভাতে কত ফাল্গুন সন্ধ্যায় ওই সুরে ডাকা তার নাম! ভয় হয় চিনতে।

কে! অসিত! অসি-দা-তুমি! সত্যি তুমি! ওতু-মি!

হাঁ, আমিই, যে পথিক অজানা পথে বাহির হয়েছিল কপর্দকহীন, আজ সে সোনার রথে জয়ী বেশে এল, কিন্তু রাজবালা—

ও! সুবালা শিউরে উঠল। আবেগের সঙ্গে অসিতের হাত ধরলে, সে কোমল তরুণ স্পর্শ নেই, এ দৃঢ় রকমমূর্তি। তবু সুবালা জোরে ধরে রইল। দুই চোখ ফেটে বুঝি অশ্রুপ্লাবন আসছে।

সেই যে তুমি গেলে, তারপর কোন খবর নেই, তিনবছর ধরে একখানা চিঠিও পেলুম না।

আমি তখন ব্রেজিলের ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেছি।

তারপরও কবছর কেটে গেল বলতে—

থাক সে কাহিনী, বেবীর চিঠিতে তোমার সব খবর পেতুম, একটা খোকাও ত হয়েছে।

হাঁ, হয়েছে অবশেষে! আর তুমি?

আমি, দেখতেই পাচ্ছ, এখন এয়ার-পাইলট— ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাজিক কার্পেটের অধিকারী —গগণবিহারী— একদিন-রাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়ে আনতে পারি—যাবে? যাবে আমার সঙ্গে!

সত্যি! যাব, যাব তোমার সঙ্গে।

হায় বালা, কত সাধ হয় সাধা হয় না।

আমি যাবো, কে আমায় আটকাতে পারে! তুমি-ও নিয়ে যাবে না বলো!

আচ্ছা যাবে, সেই রকমই আবদারে আছ দেখছি।

সত্যি নিয়ে যাবে, জাননা, এঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, চারটে দেওয়াল যেন বুকে চেপে ধরে—

কেন, ড্রয়িংরুমটি বেশ সাজানও দেখছি, আমার ড্রেসডনের চায়ের সেট-

: সাজিয়ে রেখেছ, তাতে বুঝি চা ওয়া হয়না, এমন বাবলাতিলা আলাদের ও পাপর-ভাজার মজলিস মনে পড়ে—

ও সেই-টাই বুঝি মনে আছে। সুবালা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

চৌধুরি সাহেব কোথায়?

আজ সকালে দার্জিলিং গেছেন।

তুমি গেলে না, তোমাকে নিয়ে গেল না বুঝি?

কে যাবে ওর সঙ্গে, আফিসের ৈ ঘাড়ে করে, তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা বার ইচ্ছা ছিল।

বেশত, কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন, এভারেস্টের খরের ওপর তোমায় নিয়ে যাব।

নিয়ে যাবে সত্যি! আমি চলে যাব ার সঙ্গে। তখন—

ন, তবে আগে পাপর ভাজা—

পাপরগুলোর বোধ হয় ছ্যাতা পড়ে ছে, ভেটকি-ফ্রাই হতে পারে।

o! tres bien, tres bien (ত্রে' াঁ)!

মোহমুগ্ধ নয়নে সুবালা অসিতের ক চেয়ে রইল।

এই অসিত। সত্যি-ই এই অসিত

তার কেউ তার সাজ পরে এসেছে, কেমন ভয় করছে। হাঁ, এই অসিত, সেই কিশোর তরুণ এখন বলিষ্ঠ তেজ-য়ান যুবক, অজানা কত দুঃসাহসের ঠাৎ-আসা অধিপতি, কত অপরাহ্ণে অলস গল্প-করা অসিত, কত সন্ধ্যায় নিচে কেতোয়ায় ফেরে-যাওয়া অসিত! তারপর, কত অজানা দেশে দুঃসাহসিক যাত্রী, জীবনস্বপ্ন-বোনার অসিত! আজ যে এল, চার বছর আগে এলনা কেন, সে কি ভাবে, সারাজীবন প্রতীক্ষা করে বসে থাকা যায়! তার বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে।

অসিতও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না, কেন! চিরকালই সে চঞ্চল, প্রাণবান, অস্থির হয়ে ঘরের চারিদিকে ঘোরে। সে-ও কি ভাবছে, কেন চার বছর আগে এল না!

অসিত যেন বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে, কখনও সে চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরের কোনে ঘুরছে, তখনও অর্ধেক ফ্রাই মুখে পুরে জানলা খুলে অন্ধকার আকাশের দিকে চাইছে, কখনও কাঁধে-লাগান বন্দুক খুলে খোকার হাতে গুঁজে দিচ্ছে, গান টিপে নাচুনি ভঙ্গীতে অপারেটর সুরে ফেরো উঠছে, Yes sir this is my baby!

মায়াকুহকস্বপনে সুবালা চেয়ে রইল।

চায়ের খালি পেয়ালা কাচের ট্রে ঠক্ করে রেখে অসিত যেন আরাম সোফায় বসলে। সুবালার দিকে কে নয়নে চেয়ে হেসে উঠল। ওই সুবালার বুকে কাঁপন ধরাল।

তোমাকে প্রথম দেখে কি ভয় ছিলুম!

এখন-ই বা ভরসা কি?

আমি জানি, তুমি চিরকাল ভয় দেখাতে ভালবাস।

হয়ত ভালবাসি বলে ভয়। একটা 'হয়ত' আছে, লক্ষ্য করবে

জান, সেই একবার মাত্রের সেতে কি ভয় দেখিয়েছিলে।

আর একবার এভিকেটারের সাথে দেখাতে এসেছি, বলছ।

জানি না। তুমি কোথা হতে কোথায় যাবে, সত্যি সত্যি কি আমার কাছে এসেছ, তুমি সেই অ

এ সব প্রশ্ন বৃথা। সুন্দরীপিপা দুয়ারে প্রস্তুত রথ তারপর কো অজানা যাত্রা, রক্তপদ্ম নতজানু হতে এল, রক্তবালা কিন্তু জাগছে

যাব, যাব, এ চারদেওয়াল ছেড়ে কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে—

যে সব জায়গায় তোমায় যাবার

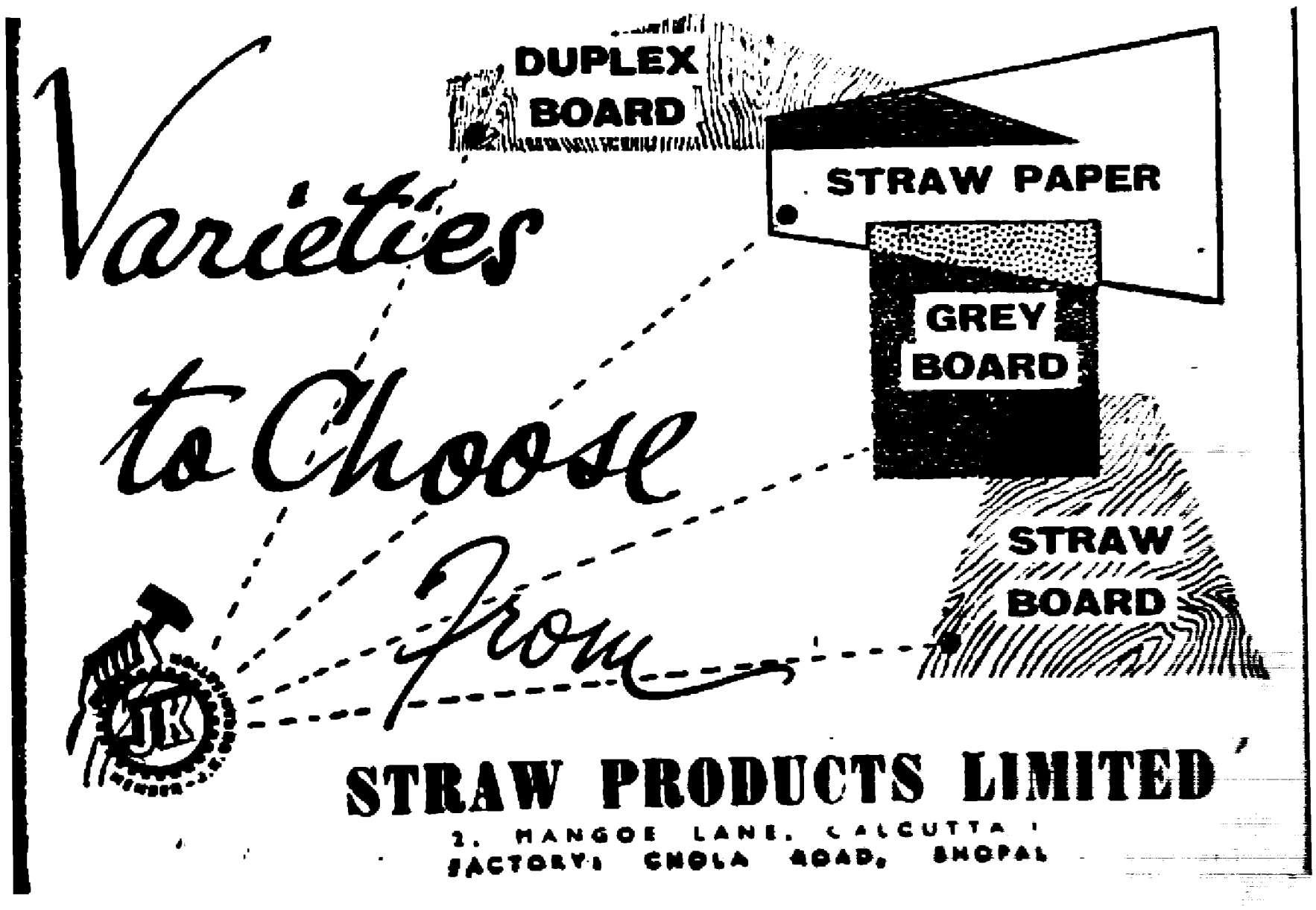

ছিল, এ অন্ধপুরী ছাড়িয়ে নিয়ে যাব, যে-সব অপূর্ব দেশে তুমি যাবে বলে কল্পনা করতে, ব্লুপার্ট ব্রুকের টাহিটির শ্যামল প্রবাল দ্বীপে, অথবা হনলুলুর চিরবসন্তময় সমুদ্রতীরে অথবা দক্ষিণ ফ্রান্সের গ্রাসকুঞ্জবনে—এই সজল অন্ধকার হতে মেঘলোক পেরিয়ে যেখানে সূর্যালোকের সাত রঙের বন্যা—শুধু মন নয়, দেহমোর মেঘের সঙ্গী—

সুবলা মুগ্ধচিত্তে শুনছিল, কিন্তু অসিতের ভুল সুরে গাওয়ার ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

তারপর!

তারপর জেট-প্লেনে হয় ভূতলে পতন বা মহাকাশে নর্তন। চলো আর দেরী নয়।

তুমি চিরকাল আমার সঙ্গে পরিহাস করতে ভালবাস, তুমি নিষ্ঠুর!

বেশ, সাহসিকা এস, পরিহাস কি সত্য বুঝতে পারবে। আর সময় নেই।

যাব, আমি যাব! কি অমমনীয় দিদৃক্ষায় তার বুক কেঁপে উঠল।

মন্ত্রচালিতের মত সুবালা উঠল। বলাকা-আঁকা ঘন নীল ব্লাউজের ওপর সবুজ শাড়ী পরলে, কানে নীলার দুল টিপে নিলে, কপালে সিন্দুর-তিলক আঁকলে রক্তারুণের মত।

ভুণ্ডারসোন্! অসিতের কণ্ঠে রক্তের সুরে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

খোকাকে অসিত বুকে ধরে নিয়েছে আনাড়ীর মত, তার হাত ধরে বলে উঠল, মোদের যাত্রা হল সুরু ওগো এ্যাভিয়েটার!

দাও, খোকাকে, কি নিশ্চিন্ত ঘুমোচ্ছে, আর তোমার ওই পরিহাস রাখো!

নিশি পাওয়ার মত সুবালা জীপ গাড়ীতে উঠে বসল। কখন যে গলির মোড়ের লক্ষ্মীভাণ্ডার কমলাবিপণী পার হয়ে গেল, কখন মেঘস্তম্ভিত আকাশের নীচে কলিকাতার প্রাসাদশ্রেণী ছায়াছবিস্রোতের মত মিলিয়ে গেল, কখন সে বুহৎ ব্যোমযানে উঠল, মেঘলোক পার হয়ে ঊর্ধে আরও ঊর্ধে প্লেন উঠে চলেছে—সুবালার কোন খেয়াল রইল না।

এ কি অপরূপ উজ্জ্বল নীল! একি অলৌকিক সুন্দর সুস্নিগ্ধ! একি অপূর্ব বর্ণের বন্যা। একি আলোকের মায়াপুরী! এত রং, এত মাধুরী! বুঝি চোখ ফেটে যাবে।

যেন কোন দুঃস্বপ্ন হতে সুবালা জেগে উঠল। সে কোথায় আছে, এ কোন রূপলোকে এল সে কিছু মনে করতে পারছে না। হয়ত সে স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন এত সুন্দর হয়! অথবা হয়ত সে তার দম-আটকান ফ্লাটের চারদেওয়াল-চাপা পড়ে মরে গেছে, এখন কোন সুরলোকে চলেছে। কিন্তু এই ত চারদেওয়াল-চাপা আরামদায়ক বড় চেয়ারে সে বসে, তার ড্রয়িংরুমের সোফার মত।

তারযন্ত্রের সূত্রে কে যেন বলে উঠল, কেমোন দেখছেন?

নিম্নে তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গের শোভা দেখতে দেখতে সুবালা বললে—চমৎকার!

ইয়া, টমট্‌কার!

সুবালা প্লেনের ভেতর চাইলে। তার পাশে এক রহস্যময়ী অজানা তরুণী বসে। নির্বাক বিস্ময়ে সে চেয়ে রইল। সোনার সুতার মত চুলগুলি, স্তবকে স্তবকে ঝুলে পড়েছে, ঘননীল নয়ন, যেন আকাশের সমস্ত নীল রং ছেঁকে নেওয়া, সরু ঠোঁট দুটিতে কে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। কি মধুর হেসে সে তাকিয়ে।

মিসেস্ চৌধুরি, ভয় পাবেন না। ভাল লাগে?

খুব ভাল। আপনি?

হাম্ Air hostess, আপনার শিশু আমার নিকট, দেখুন, কেমন ঘুম করছে, milk দিয়েছি। থাক আমার নিকট, আপনি হিমালয়-সীন দেখুন, শীঘ্র চলে যাবে, আমরা এভারেস্টের নিকট যাইতেছি।

এভারেস্ট! সত্যই তাহলে সে প্লেনে বসে, সত্যই কি অসিত তাকে নিয়ে এসেছে। সুবালা কেন কিছু বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করে উঠল, আপনি সত্য বলছেন?

কনকবরণী হেসে উঠল। সুবালার হাত ধরে বললে, সত্য! সত্য! আপনি সত্য, আমি সত্য, এই জেট-প্লেন On Himalayas সত্য! আপনি ভয় পেয়েছেন, অসিট আপনাকে বোধ হয় ভয় দেখায়, কোন ভয় নেই। সত্য! অসিত কোথায়?

নিজে pilot করছে, এখানে চালান শক্ত। দেখে নিন, ভি ভুণ্ডারসোন।

ও কথার মানে কি?

সুন্দরম্, সুন্দরম্। ওই এভারেস্ট! ওই তুষার-নদী।

কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি আগে বলুন, আমরা কোথায় চলেছি।

আপনার ভয় বুঝি যায় না, আগে দেখে নিন, এ দৃশ্য শীঘ্র চলে যাবে, কয়েক মিনিট, তারপর পার হয়ে যাব। ওই এভারেস্ট শৃঙ্গ।

বাহিরে তাকিয়ে সুবালা দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে মাথা নত করে প্রণাম করলে। একি অপূর্ব সুভ্রশ্রী একি শান্তগম্ভীর মহিমা। নিম্নে তুষার-কিরীটি পর্বতমালা মেঘের খেলা, তুষারনদীর বিচিত্র ধারা, এ সকল পৃথক্‌রূপে তাহার চোখে পড়ল না, শুধু এক ঝলক আলোর দিব্যপ্রভা তাহার নয়নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে আলোর পুণ্যস্পর্শ অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করলে। করযোড়ে পূজারিণীর মত স্তব্ধচিত্তে সে চেয়ে রইল। তারপর চোখ বুজে শান্ত হয়ে বসে পড়ল। যখন চোখ চাইলে, সেই অলৌকিক সুভ্রশ্রী কোথায় মিলিয়ে গেছে। গভীর তৃপ্তিতে চক্ষু মুদিত হয়ে এল।

স্বর্ণকৌশনীর স্পর্শে সুবালা চাইলে। টেবিলে চা ও কেক সাজান।

দেখুন নীচে, আমরা শীঘ্র দার্জিলিং পৌঁছাব।

দার্জিলিং! এত শীগগীর। কিছু বোঝা যায় না।

মেঘ সরে যাবে, সব দেখা যাবে, আমরা খুব দ্রুত যাই না, ঘণ্টায় চারশত মাইল।

কত উঁচুতে?

এখন বোধ হয় বিশ হাজার ফিট, এখন নামছি।

দার্জিলিংএ দশ হাজারও নয়, কিন্তু সত্যি আমরা কোথায় চলেছি, কিছু বুঝতে পারছি না।

পেছনে কে উচ্চহাস্য করে উঠল।

রঙীন পেয়ালা হাতে অসিত সেন দাঁড়াল। পোষাকী সাজ আর নেই, হলদে নীল ডোরাকাটা বুস্‌সার্ট ও ঘন নীল-বর্ণের ট্রাউজার পরে তাহাকে বড় তরুণ দেখাচ্ছে। গম্ভীর সুরে সে বললে, কোথায় চলেছি পাইলট জানে, আমরা কি জানি!

কেন ওঁকে ভয় করাও, ওই দার্জিলিং দেখুন, দেখুন। আমরা সৌভাগ্যবান কোন মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই।

ছোট সবুজ ডিপির মত পাহাড়ের গায়ে তাসের ঘরের মত নানারঙের বাড়ী সাজান। ওই দার্জিলিং!

চৌধুরী সাহেবের অফিস কোথায়?

ম্যাপের কাছে শুনেছি, ওখানে আমরা নামবো?

ওখানে! আমরা ত টাহিটি দ্বীপে যাচ্ছি।

ওঁকে ভীত কর কেন? আপনি কোথায় যেতে চান?

দার্জিলিং।

দার্জিলিং-এ landing স্থান নেই, প্যারাসুটে নামতে পারবেন?

ভীতভাবে সুবালা উঠে দাঁড়াল। বন্ধকাচের লোহার খাঁচা এখানেও সে কি বন্দিনী?

আপনি বসুন, চা খান। কোথায় যাবেন?

তাহলে কলকেতা, কলকাতা!

বেশ, ওই টেলিফোন আছে, পাইলটকে বলুন কালকুটা।

হায় সাহসিকা! হনুলুলু ত হল না।

যাবেন হনোলুলু? কাল আপনাকে কলিকাতায় পৌঁছে দেব।

না, না, খোকাকে দাও। কলকাতা চলো। কোথায় চলেছে প্লেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এ জেট্-প্লেন হলাণ্ডে নির্মিত হয়েছে, আমরা আরজেনটাইন চলেছি, সেখানে বিক্রয় হবে, পথে আপনাকে দর্শন করতে কলিকাতায় নেমেছি।

বুঝেচি। দর্শন হল। তোমরা সুখী হও।

আমরা সব সময় সুখী। উচ্চ আকাশের নির্মল বাতাসে দেশে দেশে উড়ে বেড়াই। নগরের দূষিত ঘরের দুঃখ নেই—হ্যালো কালকুটা! ইয়া।

অসিত কৌতুককণ্ঠে বলে উঠল, পাইলট কিন্তু সব সময়ে কথা শোনে না, কোন Direction জানে না, নিজের খুসিমত চালায়, আবহাওয়া নিয়ে নাচে।

আপনি কেক খান, ভয় পাবেন না, ওসব ওর joke দেখলেত পথে কেমন নিশ্চিন্ত চেয়ে আছে।

জানি, অসিত আমাকে ভয় দেখাতে পরিহাস করতে ভালবাসে।

এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষিত করে অসিত গম্ভীরভাবে বললে, পরিহাস সহ্য হয়, সত্যকে কি সহ্য করতে পারবে।

ওই মিলিয়ে গেল দার্জিলিং।

অপরাহ্নের ম্লান আলোয় সুবালা যখন তার অন্ধকার ফ্লাটে পৌঁছল সন্ধ্যা-গুলি জলে ডুবে গেছে, বর্ষণক্লিষ্ট ছিন্ন-মেঘদল হতে আলোর ফলক মাঝে মাঝে বন্ধঘরে বিদ্যুৎশিখা করছে। কিন্তু চারি-দিকে অপরূপ আলোর আভা, তুষার-কিরীটিনী হিমাচল শ্রেণীর দিব্যজ্যোতির মত। দরজার চাবি খুলে ঢুকতে শাড়ীর লাল পাড় কালায় কালো হয়ে গেল।

খোকা সুপ্ত, শান্ত, যেন কোন স্বপ্নে সমাহিত।

বসবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, সব ঘর সুবালা চঞ্চলপদে ঘুরলে, সব ঠিক আছে। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জেলে দিলে। অসিত যে বলেছিল, সুন্দর সাজান, তা সত্যি মনে হল। ইচ্ছা হল, আরও ভাল করে সাজায়, গোছায়, কিন্তু দেহের শ্রান্তিভারে সে সোফায় বসে পড়ল। অন্তরে গভীর প্রশান্তি অনুভব করলে। বিদ্যুৎশক্তির কৃত্রিম আলো অলৌকিক মনে হল, যেন গৌরী-শঙ্কর শৃঙ্গের দিব্যজ্যোতিঃর এককণা তার ঘরেও জ্বলছে।

স্বামীর পদধ্বনিতে সুবালা চমকে জেগে উঠল। এক হাতে ফাইল-ভরা পোর্টফোলিও অন্য হাতে গুটান ছাতা, স্বামী তাকে স্পর্শ করে জাগালেন।

ও তুমি—তুমি! এখন এলে!

যা কি স্বপ্নই দেখছ, কোথায় যাবে?

যাবনা, কোথাও যাব না। আবেগের সঙ্গে সুবালা দাঁড়িয়ে উঠল।

শোন, আজ অড়েজলে দার্জিলিং যাওয়া হল না, সেখানে নাকি খুব বিষ্টি।

বিষ্টি! সুবালা উচ্চহাসা করে উঠল। কোন কথা বললে না।

শোন, পূজোর ছুটিতে দার্জিলিং যেতে হবে, জরুরী কাজ তুমিও যাবে, সেইরকম হোটেলে বন্দোবস্ত করে এলুম।

না, আমি যাব না, আমি দার্জিলিং কেন—আবার সে উচ্চহাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বামীকে আলিঙ্গন করলে। হাতের পোর্টফোলিও ঘরের মেঝেতে পড়ে গেল।

স্মিতনয়নে স্বামী তার দিকে চাইলেন। বিবাহের প্রথম বৎসরের সেই রঙ্গিণী চঞ্চলা সুবালা আবার যেন জেগে উঠেছে।

রাত কত হবে কে জানে। ঘর ঘর সুবালার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। বোতামের ঘাতসহ স্পর্শে দেহের চঞ্চলতা যেন দূর হয় না।

অন্ধকূপের মত উঠানে সে দাঁড়াল, ঊর্ধ্বে চেয়ে রইল। তেতলার ছাদের আলিসার পাশে একটি তারা জ্বলজ্বল করছে, ওই আকাশের কটা ছোট টুকরার দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল অগণিত তারাভরা অসীম আকাশের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে জেট-প্লেন উড়ে চলেছে, কোন নবদেশে অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে! সে-ও কি যেতে পারত!

মহাকাব্য জিজ্ঞাসা

—ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য

মূল্য ৩·৫০

মহাকাব্যের উপর এই ধরনের আলোচনার বই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। স্নাতক মানের এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্যও এই বই যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজন সমস্ত সাহিত্যানুরাগীরই।

রবীন্দ্র শিশু সাহিত্য পরিক্রমা

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র

মূল্য ৫·০০

রবীন্দ্র শিশু-সাহিত্যের উপর এই ধরনের আলোচনার বই এই প্রথম প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগীগণ এবং বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীগণ সকলে এই বই সংগ্রহ করিবেন আশা করি।

ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখা

—অধ্যাপক গোপাল হালদার

(সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বাহির হইবে)

অধ্যাপক গোপাল হালদার ইংরেজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যে একজন কৃতী পণ্ডিত হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। দ্বি-বর্ষ স্নাতক মানের বাংলা সাহিত্যে অনার্স পরীক্ষার্থী-দের জন্য ইহা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমন প্রয়োজন হইবে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের এবং সাহিত্যানুরাগীদের।

আজই অর্ডার পাঠান।

নবারুণ প্রকাশনী

৩৪১ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিঃ-১২

থ্রি ষ্টার্স পার্লসাগু

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

ন্যাশনাল ড্যারাইটিজ ইণ্ডাষ্ট্রিজ কলিকাতা-৬

আসল "যশোর চিরুণী" বলতে শঙ্খ মার্কা

স্থাপিত-১৯৩৩

যশোর কম্ব ইনডাষ্ট্রী কোঃ

ফোন: ৩৫-৪৩৩২

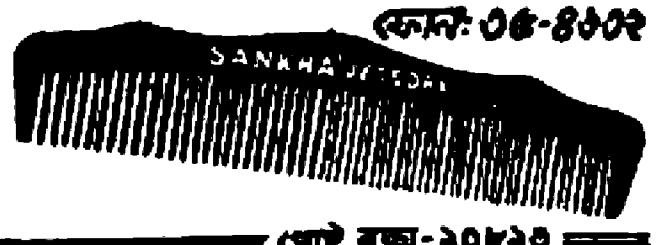

পোষ্ট বক্স-১০৮১৩ কলিকাতা-৬

মানুষ খেকো

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক হিংস্র বন্য জন্তুই মানুষ ধরে খায়, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, এমন কি ভল্লুক, আবার জলে আছে কুমীর, হাঙ্গর, কামঠ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশে "মানুষ খেকো"—কিম্বা নরখাদক—বলতে সাধারণতঃ বুঝায় বাঘ। সব বাঘই কিছু মানুষ ধরে খায় না, বরঞ্চ যাদের বনে জঙ্গলে ঘুরতে হয় তাদের মতে সাধারণ অবস্থায় বাঘ মানুষকে এড়িয়েই চলে। বড় বড় শিকারীদের কাছেও ঐ কথাই শোনা যায়। তবে একথা ঠিক যে কোন কোনও অঞ্চলে মানুষ খেকো বাঘের উৎপাত খুব বেশী, যেমন বাংলার সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশে মাণ্ডলা, বালাঘাট ও বেতুল্ অঞ্চল। সুন্দরবনের শিকারীরা বলে যে ওখানের বাঘ মাত্রই মানুষখেকো এবং মাণ্ডলা ও বালাঘাট অঞ্চলের লোকের কাছেও ঐ কথাই শুনেছি। তবে রামউক ও সিওনি অঞ্চলের আদিম গোণ্ডজাতির লোকেরা বলে যে বাঘ সহজে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে না এবং মানুষ সজাগ এবং হাতে হাতিয়ার থাকলে অর্থাৎ টাঙ্গি, কুড়াল, বর্শা বা তীর ধনুক, যা ওদের অস্ত্র—বাঘ তার কাছে ঘেঁসে না। তবে বেকায়দায় পড়লে বাঘ মানুষকে আক্রমণ করবেই, এবং যদি সে বাঘ মানুষ মেরে তার রক্তের স্বাদ পায়, তবে তার মানুষ খেকো হতে দেরী লাগে না।

বাঘ মানুষ খেকো হয় কেন? সাধারণ মতে বাঘের 'পঞ্চম্ গালতং পালতং কেশম্' অবস্থা দাঁড়ালে, অর্থাৎ সে বুড়ো ও অশক্ত হয়ে পড়লে আর তার বনের পশু তাড়িয়ে ধরা বা মারার ক্ষমতা থাকে না। তখন সে মানুষের পেছনে ফেরে এবং সুবিধা পেলেই মানুষ মেরে খায়। বনে জঙ্গলে কাঠুরে, বনপথ যাত্রী পথিক বা নির্জন অঞ্চলে রাখাল ইত্যাদি তার শিকার দাঁড়ায়। ক্রমে ভয় ভেঙ্গে গেলে সে ভয়ানক হয়ে ওঠে।

বড় শিকারীরা, বিশেষ যাঁদের মানুষ খেকো বাঘ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা বলেন যে নানা কারণে বাঘ মানুষ খেকো হয়। বাঘ অশক্ত বা বুড়ো হ'লে মানুষ খেকো হয়, তাছাড়াও বাঘিনীর ছানা হলে, নিজের ও তাদের খাবার যোগাড় করতে অনেক সময় সে মানুষ খেকো হয়, কেননা মানুষ সকল জীবের থেকে, আত্মরক্ষার ব্যাপারে বেশী অসহায়। আবার বাঘের বাচ্চা মায়ের সঙ্গে মানুষ শিকার আরম্ভ করলে সহজেই দুর্দান্ত মানুষ খেকো হয়ে দাঁড়ায়। যে সব অঞ্চলে জঙ্গলের আশে পাশে বিশাল গোচারণের মাঠ আছে সেখানের বাঘ প্রায়ই গরু, বলদ, ছাগল, ভেড়া মেরে খায়। এইভাবে পালিত পশু ধরে খেয়ে বাঘ মানুষের ভয়ও হারায় আবার অন্যদিকে বনের পশু শিকারের জন্য যে দ্রুত তাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ও অন্য সামর্থ তাও ক্রমে অনভ্যাসের দরুণ হারিয়ে ফেলে। অন্য দিকে যদি গ্রামের পশু ধরায় খুব বেশী বাধা না পায় তবে সেই বাঘ ক্রমে বনের পশু ছেড়ে শুধু গরু-বাছুর মেরেই খায়। সেই বাঘ যদি কোনও কারণে আর গরু-বলদ, ছাগলের নাগাল না পায়, অর্থাৎ এলাকার গোচারণের জমির ঘাস যদি আগুনে লেগে পুড়ে যায়—যাহা উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের নানা অঞ্চলে খুব সাধারণ ব্যাপার—অথবা অন্য কোনও কারণে সেখানে গোচারণ বন্ধ হয়, এখন সে গ্রামের পশুর বদলে গ্রামের মানুষ, বনের কাঠুরে ধরে খেতে আরম্ভ করে। যদি গ্রামের লোকজনের কাছে বন্দুক না থাকে বা সে রকম দক্ষ শিকারি যদি তার পিছনে লেগে তাকে শেষ না করে, তাহলে ক্রমে সে অতি ভয়ানক ও মহা-চতুর মানুষ খেকো হয়ে দাঁড়ায়।

আজকের দিনে বন্দুক, রাইফেলের লাইসেন্স পাওয়া সহজ হয়েছে—যদিও বাঘ বা ঐ জাতীয় হিংস্র পশু শিকারের উপযুক্ত শক্তি ও গতিযুক্ত রাইফেলের মাত্র এখন আগুন—কাজেই এখন বাঘের উৎপাত অনেক কমে গিয়েছে। অনেক বন-জঙ্গল ও কাঠের জন্য উজাড় করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেখানের বন্য পশুও লোপ পেয়েছে। ছোটনাগপুরের অনেক প্রসিদ্ধ জঙ্গলের আজ প্রায় চিহ্নই নাই; গয়ার কাছে "পালোয়া ভালুয়ার" ভীষণ জঙ্গল, রুপাপুরের বন-প্রশাস এসবই মানুষ কাঠের লোভে ও চাষ-আবাদের প্রয়োজনে কেটে প্রায় শেষ করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেসব জঙ্গলের মানুষ খেকো বাঘও শেষ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশেও অনেক অঞ্চল, যেখানে আগে বাঘের প্রাচুর্য ছিল, এখন খোলা মাঠে পরিণত হয়েছে। ক্বচিৎ কদাচিত সেখানে বাঘের উপদ্রব হয়।

আগেকার দিনে অবস্থা অন্য রকম ছিল। তখন বনজঙ্গল ছিল ঢের ঘন এবং বাঘ শিকারের অস্ত্র এবং সেই অস্ত্র চালাবার জন্য দক্ষ শিকারী, দুইই ছিল কম। সেইজন্য কিছুদিন পূর্বেও নানা অঞ্চলে বাঘের উৎপাতে সারা এষ্টেটের লোক ভীত ত্রস্ত হয়ে থাকতো। সেই সময়ের এক মানুষ খেকোর গল্প বলি। স্থানটি ছিল মধ্যপ্রদেশের বেতুল অঞ্চলের টাঁকগাছের জঙ্গল এবং সময়টা ছিল এপ্রিল মাসের শেষ অর্ধেক ও মে মাসের আরম্ভ, অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাঝামাঝি।

জঙ্গলের প্রবীন কনসারভেটার সাহেবের কাছে খবর গিয়েছিল যে, ঐ খানের কাঠের কারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে এক মানুষ খেকো বাঘের উৎপাতে। সেই দুর্দান্ত শয়তান শতাধিক মানুষ খেয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল চওড়া এলাকার পথঘাটে লোকচলা বন্ধ করেছে এবং গ্রামাঞ্চলের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ করেছে। অতখানি এলাকা এবং এতো লোক বাঘের পেটে গিয়েছে শুনে সাহেব প্রথমে ভাবেন যে এই অত্যাচার চালিয়েছে একাধিক বাঘে। সেই জন্য দীর্ঘ দিনের শিকারের ব্যবস্থা করে, সঙ্গে হাতি, ঘোড়া এবং লোকলস্কর নিয়ে জঙ্গলে অভিযান করা হয়। জঙ্গলের কাজই সাহেবের পেশা সেইজন্য ভাল হাতি ও অভিজ্ঞ ও সাহসী শিকার খোঁজার লোক তাঁর সঙ্গেই থাকতো। বাঘের শিকারি বলে তাঁর খ্যাতি থাকায় গ্রামের লোক তাকে সাহায্য করতে সাহস করে এগিয়ে আসতো।

প্রথমে খবর এলো এক অতি ধূর্ত ও বুড়ো বাঘের, যে ঐ অঞ্চলের এক সীমানায় দুই তিন গ্রামের গরু ছাগল মেরে দীর্ঘদিন সেখানের লোকজনকে জ্বালিয়েছে এবং স্থানীয় শিকারিদের এড়িয়ে, আজ এই গ্রামের কাল ভিন্ন গ্রামের, গরু বাছুর মেরেছে। সেটা হয়ত মানুষ খেতে আরম্ভ করেছে এই ভেবে তাকে খুঁজে মারা হোলো। তার পর

সাহেবের পায়ের গোড়ালিতে বিষম চোট লাগায় সাহেব পঙ্গু হয়ে তাঁবুর ছাউনীর তলিতেই আটকা পড়লেন। এক বড় গাছের কড়ের নীচে তাঁবু ফেলে সাহেব পায়ের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হলেন কিন্তু কয়েক দিন পরেই খবর এলো যে কাছেই আবার বাঘে মানুষ নিয়েছে, সুতরাং ঠিক হলো অন্য বাঘ মানুষ খেকো, সেই বুড়ো বাঘটা নয়।

বড় গ্রামের কাছে, মোরান নদীর নিকটে, আড়কুণ্ডে অত বড় শিকারি এসেছেন শুনে নানা গ্রামের লোক এসে বাঘের উৎপাতের কথা জানাতে লাগলো। বাঘের আকার-প্রকার তার মানুষ ধরার কায়দা, এইসব নিয়ে নানা বিচিত্র বর্ণনা শুনতে শুনতে সাহেবের শিকারে ঘোরা, দিনের পর দিন। বাঘ নাকি প্রকাণ্ড বড়, তার মানুষ খেয়ে পেট মোটা হয়ে মাটিতে ঠেকে গিয়েছে। তার মাথায় সাদা চাঁদের মতো দাগ। একজন বললে যে একবার নাকি একদল যাত্রীকে সে বনের ধারে দাঁড় করিয়ে প্রথমে নিজে বালিতে গড়িয়ে নিজেকে চনচনে করে নিল, তার পর যাত্রীদের সব কয়জনকে দেখে সবচেয়ে মোটা যে ছিলো তাকে ধরে নিয়ে যায়। এই নাকি তার কায়দা। কেউ বললে বাঘ যাদু জানে। মন্ত্রবলে কাঠুরে সেজে সে বনেজঙ্গলে ডাকাতাকি করে, শিস দিয়ে, অন্য কাঠুরেকে ডেকে তারপর বাঘ হয়ে তাকে ধরে। আবার কেউ বললে যে ও শেষ বাঘে খেয়েছে তার ভূত ওর মাথায় বসে ওকে বিপদ আপদ থেকে বাঁচায় এবং কোথায়, কোন পথে, এবং কখন, ওর পরের শিকারে যে পথিক, তাকে পাওয়া যাবে এসব বাতলিয়ে দেয়।

স্থানীয় ছোটবড় জমীদার, বিশি শিকারি এবং বহু লোকজন, রোজ এসে ভীড় করে সাহেবকে ঐ দুরন্ত বাঘ মেরে তাদের উদ্ধার করার অনুরোধ জানাতে লাগলো। এক গরীব স্ত্রীলোক এসে কান্নাকাটি করে জানালে যে সে তার কোলের শিশুকে মাটিতে বসিয়ে কুয়োর জল তুলছিল, বাঘটা তখন হঠাৎ এসে তার বাচ্চাকে নিয়ে যায়। সকলেই জানালে যে তারা সকল রকমে সাহেবকে

৬ই অক্টোবর
শুভ-মুক্তি!
চিত্রম এন্টারপ্রাইজের
নিবেদন
দুই ভাই
ভূমিকায়
উত্তম
সাবিত্রী
বিশ্বজিৎ
সুলতা
শীতল
জীবেন
তুলসী
পরিচালনা·
সুধীর মুখার্জী
সঙ্গীত·
হেমন্ত মুখার্জী
কাহিনী ও চিত্রনাট্য· সুপেন্দ্র কৃষ্ণ
পরিবেশনা·
ফাগুনী ফিল্মস্
মিনার·বিজলী·ছবিঘর

বাঘ মারতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারা সকলেই এমন ভয়ত্রস্ত যে তাদের দ্বারা কোনও সাহায্যই সম্ভব ছিল না।

গাঁয়ের লোক দরজা জানালা বন্ধ করে বড় বড় কাঠের আগড় দিয়ে আটকিয়ে ঘরের ভিতরে থাকতো। পথে বা ক্ষেত-খামারে যেতে হলে, দলবেঁধে লাঠি-কুড়াল নিয়ে, ঢোলকাঁসী বাজিয়ে তবে তারা পথ চলতো। সেই তল্লাটের ছোট গ্রামগুলির লোকজন প্রায় সকলেই বড় গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। সারা দেশের বসতি উজার করে এনেছিল এই একটা হিংস্র মানুষ-খেকো। প্রথমে দুটো বাঘে উৎপাত আরম্ভ করেছিল, তার একটা, বোধহয় মাদিনী—স্থানীয় শিকারিরা গুলি করে মারে বছর খানেক আগে, গ্রীষ্মকালে। কিন্তু এই শয়তানটাকে কিছুতেই শেষ করা যাচ্ছিল না।

খবর এলো যে ঐ বাঘ চারখেরা নামক গ্রামে মানুষ মেরেছে। সাহেব তখন ঘুড়িয়ে চলতে পারেন এবং হাতির হাওদায় ঠিকমত বন্দুক ধরে বসতে পারেন। ছাউনি তোলা হোলো এবং শিকারি হাতি, মালবওয়া হাতি, লোক-লস্কর নিয়ে সাহেব চললেন সেই গ্রামে। পথ চলার সময় সামনে ও পিছনে হাতির দল, এবং লোকজনের সারির দুপাশে বন্দুকধারি পুলিশ কয়জন, সাহেবের কয়জন বন্দুকধারী পিয়ন মার্চ করে চললো। লোকজনকে নির্দেশ করা হোলো দলের সারি ছেড়ে আশে-পাশে ছটকে যেতে।

পথের দুপাশে কোপ-ঝাড়ে ভরা টাঁক গাছের ঘন জঙ্গল। আবার একটা আঁকা-বাঁকা নালা, কখনো পথের একে-বারে পাশে, কখনো একটু তফাতে চলেছে যার মধ্যে মাঝে মাঝে জলভরা খাদ রয়েছে। মানুষ খেকো বাঘের পক্ষে এর চেয়ে ভাল এলাকা হতে পারে না। পথের ধারে স্থানে স্থানে টুকরা পাথরের ঢিপিতে বুঝাচ্ছে যে সেখানে একজন বাঘের মুখে প্রাণ দিয়েছে। পথের পাশে দুটো গ্রাম দেখা গেল, জনমানব শূন্য। সাহেব, শিকারি নিয়ে, নালায় নেমে দেখতে দেখতে চললেন এবং অনেক জায়গায় একটা বড় মর্দা বাঘের থাবার পুরানো দাগ দেখলেন। স্থানীয় শিকারিরা জানালে যে সেগুলো ঐ মানুষখেকোরই পদচিহ্ন।

চারখেরার দেখা গেল গ্রামের লোক বাঘের ভয়ে সবাই পালিয়েছে। গ্রামে ছায়ারও অভাব ছিল, কিন্তু বাঘের এলাকার কেন্দ্রস্থল বলে সাহেব গ্রামের কাছেই ছাউনি ফেলতে হুকুম দিলেন রসদপত্রের জন্য, কেননা সঙ্গে অনেক লোকজন, হাতি-ঘোড়া। সেই দিনই সন্ধ্যার মুখে একজন লোক খবর নিয়ে এলো যে, যে পথে সাহেব এসেছেন তার কাছেই, সে নামের গ্রামের পাশে, একদল পথিকের মাঝ থেকে একজনকে ঐ বাঘে নিয়েছে। যাত্রীরা না জেনে, নির্ভয়ে ঐ বনপথে চলেছিল।

পরের দিন খুব ভোরে দুটি হাতি নিয়ে সাহেব রওয়ানা হয়ে সকাল আটটার আগে অকুস্থলে পৌঁছালেন। জায়গাটায় একটা ছোট নালা পথ পার করে মোরান নদীর দিকে গিয়েছে। সেখানে সেই অভাগা যাত্রীর কাঁধের বাঁকে বাঁধা ঝুড়ি এবং তীর্থবারিভরা ছোট ঘড়া সবই পড়ে আছে, তার পাশে শুকানো রক্তের চাপ ধুলোয় রয়েছে। তাকে যেদিকে টেনে ঐ নালায় নিয়ে গেছে তার দুপাশের ঝোপে তার কাপড়ের টুকরা লেগে রয়েছে। আরো কিছু দূর এগিয়ে এক ঘন ঘাসের ঝোপে সেই পরীবের হাড়-গোড়, মাথা আর শরীরের কিছুটা দেখা গেল। বাঘটা ভয়ানক চতুর, তাই মানুষ মেরে একবারে যতটা সম্ভব খেয়ে নিতো। অন্য বাঘের মত দ্বিতীয় বার শিকারের কাছে আসা তার ছিল না। সুতরাং সেখানে তার জন্য অপেক্ষা বৃথা জেনে, সেইদিনই বাঘের খোঁজে তার পায়ের দাগ ধরে সাহেব ও তার শিকারির দল রওয়ানা হল।

"খোঁজ"কার—অর্থাৎ যারা বন্যপশুর পায়ের দাগ বা অন্য চিহ্ন ধরে অব্যর্থভাবে শিকারের খোঁজ দেয়—লোকেরা ভয়ে ভয়ে ও অতি সন্তর্পণে সেইখান থেকে মানুষখেকোর পায়ের দাগ ধরে এগোতে লাগলো। তারা চলছিল সাহেবের শিকারি হাতির প্রায় শুঁড়ের নীচে, উপরে রাইফেল বাগিয়ে ধরে সাহেব পাহারায় আছেন। নদীর পাড়ে ঐ পায়ের দাগ একটা বালির চড়ায় এগিয়ে জলের কাছে গেলো। সেখানে বাঘ জল খেয়ে নদীর পাড়ের নীচে বড় বড় পাথরে ভরা এক গর্তের দিকে যায়। সেই গর্তের মুখে পাথর ছুঁড়ে এবং পরে ছুঁচো বাজি ফেলে দেখা গেল যে একটা ঘেয়ো হুঁড়ার (হায়না) ছাড়া আর কিছু সেখানে নাই। তার আশে-পাশে সারাদিন খোঁজ করে বাঘের কোনও চিহ্ন না পাওয়ায় সন্ধ্যার মুখে সাহেব ছাউনির দিকে ফিরবার হুকুম দিলেন।

ফেরার পথে, যখন সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, এবং ছাউনি মাইল দুই-তিন মাত্র তখন সাহেবের হাতির পিছনে যারা চলেছিল তাদের একজন চমকে দাঁড়ালো এবং সাহেবকে থামতে বললো। তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাঘের পায়ের দাগ ধরা পড়েছে। কিছুক্ষণ দেখার পরই বুঝা গেল যে এই সেই বাঘ যার খোঁজে সারাদিন গিয়েছে। শুধু তাই নয় অভিজ্ঞ শিকারি এবং তার বন্যপশুর বিষয়ে দক্ষ অনুচরদের চোখে একথাও স্পষ্ট জাহির হোলো যে সময় সাহেবের বল পথ ছেড়ে নালায় নেমে সেই বাঘে ধরা লোকের সন্ধানে ফিরছিলেন, তার কিছুপরেই অন্যদিক দিয়ে এসে বাঘ সেইপথেই তার গন্তব্যস্থানে গিয়েছে। সাহেবের হাতির পায়ের দাগের উপরে তার প্রকাণ্ড চওড়া—প্রায় চৌকো থাবার চিহ্ন সে খবর অব্যর্থভাবে জানাচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো কাজেই ছাউনিতে সবাই ফিরলো। মানুষ খেকো কাছাকাছিই আছে জানা ছিল, কেননা, ছাউনি থেকে মাইলখানেকের মধ্যে বাঘটা চলাপথ ছেড়ে পাশের নালায় নেমে গিয়েছে, তার পায়ের চিহ্নে একথা বুঝায়। সেইজন্য ছাউনির বাইরের দিকের তিন কোনে তিনটা হাতি বাঁধা হোলো এবং তাদের মাঝে আগুন জ্বেলে রাখা হোলো।

পরের দিন অতি ভোরেই যেখানে বাঘ পথ ছেড়ে নালায় নেমে গিয়েছিল সেখানে থেকে নালায় নেমে, ঝোপঝাড় দাবড়ে হাতি নিয়ে বাঘের খোঁজ করা হোলো। কিন্তু বাঘ নালা ছেড়ে এক জায়গায় ঘন জঙ্গলে ঢুকেছে সেই পর্যন্ত তার চিহ্ন পরে আর কিছুই নাই। কিন্তু ওকে খুঁজে বেড়াতে হবে, কেননা মানুষ খেকো সাধারণ বাঘ নয়—যে রয়ে-সয়ে তার ঠিকানা পাওয়া যাবে, তার খোঁজ আরম্ভ হলে ভোর থেকে সন্ধ্যা এবং প্রয়োজন হলে দিবারাত্রী চালাতেই হবে। এই স্থির করে সাহেব তাঁবুতে ফিরে সকালের খাওয়ায় বসতে যাবেন এমন সময় একদল বাঞ্জারা—এরা যাযাবর জাতীয় একজাতের লোক, বেদে ইরাণী-দের মত, দেশে দেশে গরু, ভেড়া ইত্যাদি বেচে বেড়ায়—ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে যে তাদের একজন লোককে ঐ সকালেই গরুর পালের মাঝ থেকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে, যখন ওরা রাত-কাটাবার পর ছাউনি তুলে যাত্রারম্ভ করছে।

খাওয়া রইল। হাতির হাওদা খুলতে বারণ করে সঙ্গে কিছু খাবার ও পানীয় নিয়ে সাহেব সদলে রওয়ানা দিলেন, দু-চার মিনিটের মধ্যে। লম্বা ঘাসে ভরা খানিক নীচু জমীর মাঝে একটা নালা, তারই ধারে লোকটি বাঘের কবলে গিয়েছে। সেখানে তাকে টেনে নিয়ে গেছে সেখানের ঘাস তখনও চাপে দলিত হয়ে আছে। কোনও খোঁজের দরকার

করানো হোলো। তারপর আরম্ভ হোলো "হাঁকা" এবং তাতে সবার আগে চললো সরযূপ্রসাদ হাতি, তার হাওদায় দোনলা তবুও রাইফেল হাতে সরাসরিদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বয়ং সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে "খোঙ্কার"দের মধ্যে সকলের চাইতে সাহসী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক হিন্দুস্থানি কনেষ্টের সন্তান/যাকে সবাই "লালা" বলে ডাকতো।

সরযূপ্রসাদ ধীরে ধীরে, কিন্তু সমানে, জঙ্গলের কেন্দ্র লক্ষ্য করে, ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে এগোতে লাগলো। কাঁকে কাঁকে ময়ূর উড়ে বেরোলো কিছু খরগোস ও অন্য ছোট জানোয়ারও ছুটে বেরিয়ে গেলো। জঙ্গলের মধ্যখানটা খুবেই ঘন এবং গাছের শিকড় ও ডালে ছাওয়া গভীর খানাখন্দে ভর্তী। তার কাছে এসে হাতি থেমে গেল এবং পরে জোরে মাটিতে পা ঠুকতে এবং শুঁড়ের ভিতরে আস্তে আস্তে কাঁপানো গুগগুগ শব্দ করতে লাগলো—যার মানে কাছেই বাঘ!

সবাইতো দুরু দুরু বুকে, উদগ্রীব হয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগলো। খানিক পরে হাতির মাহুত যে সামনে ও কিছু নীচে হাতির ঘাড়ে বসেছিল—একটা জাম গাছের তলা দেখিয়ে বললে যে বাঘটা সেখানে শুয়ে। সাহেবের ইঙ্গিতে লালা সেখানে একটা বড় পাথরের টুকরো ছুঁড়ে ফেলতেই বাঘ গাঁক করে গর্জে লাফ মেরে ঝোপ ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করল। সাহেবের রাইফেলের দুইনলই গর্জে উঠলো, গুলী লাগার শব্দও শোনা গেল, বাঘ কিন্তু থামলো না, পালাবার চেষ্টায় নদীর পাড়ের উপর ওঠার পথ নিল। সে পথ হাতি ও শিকারি দিয়ে আটকানো দেখে বাঘ ভীষণ গর্জন করে সাহেবের হাতি লক্ষ্য করে তেড়ে এগিয়ে এলো। গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে তাকে ঠিক মত দেখা যাচ্ছিল না, সেজন্য সে যখন মাত্র কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে তখন সাহেব রাইফেল চালালেন। এবারের গুলীতে বাঘ, একটা খানায় পড়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে উঠে সে আবার হাতির দিকে তেড়ে এলো, কিন্তু অতটা জোরে নয়। সাহেব তাকে তাক করে শেষ মার মারবার জন্য রাইফেল তুলেছেন এমন সময় হাতিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। সাহেবের মুখ ও বন্দুকের মুখ বিপরীত দিকে ফিরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে আঁচড় কামড়ের শব্দ ও হাতির পাগলের মত গাঁগাড়া ও লাফ-ঝাঁপে বোঝা গেল যে সাহেবের এক অতি ভয়ানক সহযাত্রী জুটেছে হাতির উপরে।

হাতির বিষম গাঁগাড়া দেওয়া ও লাফঝাঁপের চোটে সাহেব কোনও ক্রমে হাওদা ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালেন, বাঘকে গুলী করার কথা তখন দূরে। সরযূপ্রসাদ শিকারি হাতি, কিছুক্ষণ পরে গা ঝেড়ে বাঘকে ফেলতে না পারায় সে অন্য ব্যবস্থা করার চিন্তায় একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সাহেবও সেই মুহূর্তে ঘুরে রাইফেলের মুখ প্রায় বাঘের মাথায় ঠেকিয়ে গুলী চালিয়ে তার খুলি ছাতু করে দিলেন। বাঘ আলুর বস্তার মত ধপাস্ করে পড়ে গেল। তখন সাহেবের খেয়াল হোলো যে যত নষ্টের গোড়া হোলো সরযূ-প্রসাদের মাহুত—লোকটা ছিল আফিং-খোর—এবং সেইই হাতি নিয়ে পালাবার চেষ্টায় হাতি ঘুরিয়েছে এবং তখনও চেষ্টা করছে তাকে জঙ্গল থেকে বার করার জন্য। সাহেব তাকে ধমকে, শেষে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ধাক্কতক দিতে তার নেশা ছুটে চৈতন্য হোল। তখন হাতি ঘুরে বাঘের দিকে ফিরে আবার তার দেহটা থেঁতলাবার জন্য নাচানাচি আরম্ভ করল। সরযূপ্রসাদের শিকারি হাতি হিসাবে একটু দোষ ছিল—সেটা সাহসের অভাব নয়, বরঞ্চ আতিশয্য। তাকে সোজা রাখার জন্য সামনে মাহুত ও পিছনে নেজের কাছে লাঠি হাতে এক হাতির সাহস লাগতো। আফিংয়ের ঝোঁকে মাহুত যখন হঠাৎ হাতিকে ঘুরোয় তখন ঐ সাহস টাল সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গিয়েছিল—প্রায় বাঘের মুখে। বাঘ তখন উন্মত্ত হয়ে হাতির উপর উঠে, হাতিকে এবং শিকারিকে ঘায়েল করতে চায়, সুতরাং সাহসের দিকে তাকায়নি। সাহস ছোকরাও ছুটে পালিয়ে অন্য হাতির কাছে আশ্রয় নেয়।

বাঘটার আঁচড় কামড়ে সরযূ-প্রসাদের পিছন দিক ক্ষত-বিক্ষত হয়, কিন্তু তার সাহস অটুট রয়ে যায়। ঐ শিকারের কয়দিন পরে আবার বাঘ শিকারে সে সমানে এগিয়ে গিয়ে স্থির-ভাবে আহত বাঘের সামনে দাঁড়ায়।

মানুষ খেকো বাঘটা পুরা দশ ফুট লম্বা এবং পূর্ণ শক্তিশালী ছিল। তার নখ দাঁত সবই ছিল ঠিক এবং দেহের গঠনও ছিল প্রচণ্ড শক্তির পরিচায়ক। গল্পের মানুষ খেকো বাঘের মত 'গলিত দন্তনখর' বা জরাগ্রস্ত তো সে ছিলই না, আবার স্থানীয় লোকের বর্ণনা মত তার মাটি-ছোঁয়া ভুঁড়ি বা মাথার চাঁদের মত সাদা দাগ এ সবও ছিল না। মানুষ-খেকো বাঘের বর্ণনায় এই সব আজগুবি কথা ঐ অঞ্চলে চলিত আছে, কাজেই এই বাঘের বেলায়ও ঠিক ঐ রকম বর্ণনাই হয়েছিল।

বাঘ মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অঞ্চলে বাঘে মানুষ নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে আসল মানুষ খেকোই শেষ হয়েছে তখন সাহেবের শিকারের সফরও শেষ হোলো।

১। যাকনা হাতি—মদ্দা হাতি কিন্তু দাঁতাল নয়। অর্থাৎ জন্ম থেকেই সে গজদন্তহীন। কারণ যাই হোক, এরকম পুরুষ হাতি অসম্ভব শক্তিশালী ও চালাক হয় বলে খ্যাতি আছে। বোধহয় পুরুষ হাতির প্রধান অস্ত্র যে পাবলের মত দুই দাঁত, তার অভাব মেটাবার জন্যই প্রকৃতি-দেবীর এই ব্যবস্থা। অভিজ্ঞ মাহুতেরা বলে যে, হাতির বাচ্চার ঐ দাঁত বেরোলে খোঁচা লাগে বলে তার মা দুধ খেতে দেয় না। যাকনা বাচ্চার দাঁত না থাকায় সে মায়ের দুধও অনেক দিন পায় এবং ঘাসের খড়ও পায় বেশী, সেই জন্য তার গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর দুই-ই বাড়ে।

২। Match lock পুরণো ধরণের গাদা বন্দুক। এর ঘোড়ার মুখে পলতে থাকতো এবং তাতে আগুন ধরিয়ে বন্দুক চালাতে হতো। ঘোড়া টিপলে তার পলতের বন্দুক ধাঁচ্চা।

বিয়ে চুকে যাওয়ার পর থেকেই অপর্ণা ভাবতে শুরু করেছিল কোনদিন সে আর আসবে যায় তাহলে.....তাহলে যে কি তা সে স্পষ্ট করে বলেনি একটা ভয়ঙ্কর রকমের কিছু, যা বলা দূরে থাক ভাবতেও পারছিলনা সে। ছি—ছি—ছি একথা বলতে পারলেন জ্যোঠিমা, যে জ্যোঠিমাকে মার চেয়ে ভালবেসে ভক্তি করে এসেছে অপর্ণা।

অরুণদা ত বরাবর আসেই —পিসীমার দেওরের ছেলে অরুণদা। সেই একরত্তি বেলা থেকে দেখে আসছে। দোলের দিন প্রতি বছরই ত আসে, রং নিয়ে ফাগ নিয়ে প্রতি বছর যা হয় গতবার তাই ত হয়েছিল—অর্থাৎ সেও অরুণদাকে ফাগে রং-টুং দিয়েছে—অরুণদাও দিয়েছে। এর মধ্যে বোতাম কোথায়, কিন্তু গতবারে এই নিয়ে যাকে বলে একেবারে যাচ্ছেতাই—তাই করলেন। —"মেয়ে যত বড় হচ্ছেন তত ধিঙ্গি হচ্ছেন—লজ্জা করেনা এরকম বেলেল্লাপনা করতে।' কিন্তু গতবারের চেয়ে অন্যবারের তফাৎটা কোথায়, কি অন্যায় করেছিল সে! সেই অরুণদাই ত এসেছিল—সেই রকমইত রং নিয়ে ফাগ নিয়ে হুল্লোড়—যা সব বছরেই হয়ে থাকে। মানে, দোলের দিন রঙ খেলতে গেলে একটু হাতে হাতে বা গায়ে গায়ে ঠেকবেই.....মানে, মুখে জোর করে ফাগ দিতে গেলে তাকে ত কোমরটা ধরে একটু কাছে টানতেই হবে—তা নয়ত ফাগ মাখতে গেলে দুনিয়ার কে কবে মুখটা বাড়িয়ে দেয়, তাছাড়া এইত কয়েক বছর আগে সব ভাইবোনেরা মিলে অরুণদাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের উপর পড়ে রং মাখিয়েছে জ্যোঠিমার সে সব কথা মনে হল না। তার বদলে তিনি মাকে যেসব কথা বলেছেন—এবং মা রাত্তিরে তাকে যা সব বলেছেন, সে সব কথা মুখে আনা যায় না, জানিনা অবার এসব কথা অরুণদার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছে কিনা, তাহলে ত অপর্ণাকে বিষ খেতে হবে।

অরুণদা নাকি তার মুখে, বিশেষ করে সিঁথিতে ঘসে ঘসে ফাগ মাখিয়ে ছিল.....যত সব বাজে কথা, আচ্ছা যদি বাজে নাই হয়, বেশ করেছে তাতে ক্ষতি কি, তার মানে কি...যাকগে ওকথা। তার নিজের দুহাতে ফাগ ছিল, অরুণদা তার হাত থেকে ফাগ ফেলে দেবার জন্য টানাটানি করে হুড়মুড় করে তার বুকের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল...আচ্ছা, হাতটা ওরকম করে টানলে লোকে আপনিই ত গিয়ে পড়বে জ্যোঠিমার হাতটা ধরে কেউ টানুকনা দেখি তিনি কি করে দাঁড়িয়ে থাকেন এর মানে যদি.....ছি—ছি জ্যোঠিমার এরকম মনোবৃত্তি, একটা তুচ্ছ ব্যাপার এইরকম বাঁকা করে দেখলে তার গলায় দড়ী দেওয়া ছাড়া গতি কি! তারপর ও কেন জানিনা অরুণদাকে টিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলেছিল, আর অরুণদাও.....না, জ্যোঠিমা নিশ্চয়ই দেখতে পাননি, আন্দাজ করে বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন। কেন—ওর প্রণাম করা তার চোখে পড়ল না.....কেন—এর আগে উনিই ত বিজয়ার অরুণদাকে প্রণাম না করার জন্য কত বকেছেন: তাছাড়া অরুণদা যেন কি! দোলের দিন একবাড়ী লোক থৈ থৈ করছে...কেউ প্রণামই না হয় করেছিলুম কিন্তু তাই বলে..... যাকগে, যা হবার তা ত হয়েই গেছে, এবার বরং ছুঁয়ে ইনসাল্ট করছে অপর্ণা যদি জীবনে আর কোনদিন সে আসবে যায় তাহলে.....সেই ভয়ঙ্কর অনুচ্চারিত অকল্পিত কথাটা!

দোলের দিন ভোরে উঠে ঘটা করে চান করতে গেল অপর্ণা। ছোট ভাইবোনরা এসে বলল—"এই দিদি রং খেলবি না খুনখারাপী, বড় বড়া রং রে! কাপড় ছেড়ে যাবে তবু রং উঠবে না।" ঠিক ওর কোলের ভাই মন্টু বলল "আমি এসব বাজে ব্যাপারে নেই—আমি বিকেলে রং

রয়েল কলেজ
ভারতের বৃহত্তম বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মেইন : ১২, ডাঃ বেরেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। (পূর্বেকার পাঁচু খানসামা লেন)
ফোন : ৩৫-৪৮১৪, ৩৫-২১২৯

কমার্স বিভাগ : টাইপ ও শর্টহ্যান্ড ১, ৩, ৬ মাসে ফুল কোর্স। শিক্ষান্তে কাজের ব্যবস্থা।

টিউটোরিয়াল বিভাগ : এস-এফ আই-এ, আই-এস-সি, আই-কম, বি-এ, বি-এস-সি, বি-কম'এর কোচিং'এর সুব্যবস্থা আছে। ইংরাজীতে কথা বলা/লেখা বিদেশিনী মহিলা দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়। বেতন ৭., জার্মাণ ১০.।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ : টার্নার, ফিটার, মেশিনিষ্ট, ব্লেডিং, ওয়ারম্যান, ইলেকট্রিক সুপারভাইজার, মেকানিক্যাল ফোরম্যান, ড্রাফটসম্যানশিপ, বি-ও-এ-টি কোর্সসমূহে ভর্তি চলিতেছে।

শাখাসমূহ—ধর্মতলা, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, সার্কুলার রোড, বেহালা, খিদিরপুর, দমদম, হাবড়া ও বর্ধমান।

কলেজ কোথায় ?

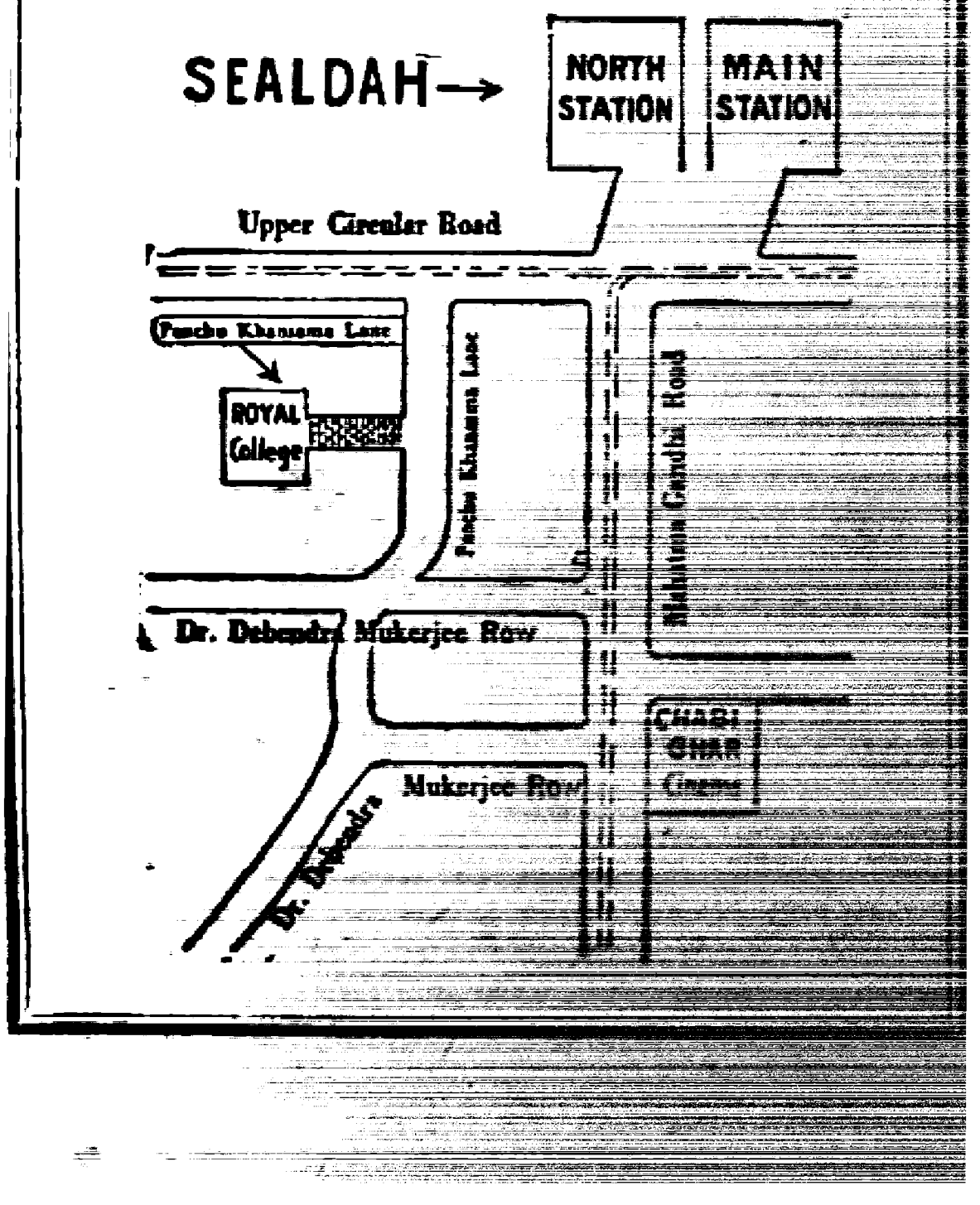

শপথ করেছে বিলে ছুঁয়ে, যাকে বলে খিল সাঁটা—সামনেই পরীক্ষা এ শপথ ভাঙবে কি করে। তাছাড়া অরুণদা—অরুণদা হরি এর মধ্যে এসে পড়ে। ওরা আরো দু একবার অনুরোধ করলে—কিন্তু গোষ্ঠির মধ্যে একজন কতটুকু খানিকটা শাসিয়ে চলে গেল।

কিন্তু অরুণদার ত কোন পাত্তাই নেই—একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

অপর্ণা সন্তর্পিতা নিজ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল—

"... ... ...
আরক্তে কম্প্র পরাণ বধূরে
আবেশরশ্মি করিয়া যে দূর
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল
কে তোল দেখ.....

দূর ভাল লাগছে না। তার চেয়ে অরুণদাকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! অরুণদা যখন জানালার নীচে দিয়ে যাবেন তখন টুপ করে ফেলে দেবে। কিন্তু ফেলাও বেশ শক্ত। মনে হয় কাগজটা নীচে পড়বার আগেই অরুণদা এগিয়ে গেলো—দেখতে পেল না, তারপর বাবা বা কাকার হাতে পড়লে ত সব খতম! না, লোকে ত বিজন থেকে বন্যা এলাকায় আটার কত্তা ফেলে আর সে তোতলা থেকে এক-টুকরো কাগজ ঠিক করে ফেলতে পারবে না। আচ্ছা, দেখাই না। ওই ত ভোলা আসছে বাজার নিয়ে রংএ ভূত হয়ে—ওই ভোলার গায়েই ঢেউটেলা খড় দিয়েছে সে। অপর্ণা তাড়াতাড়ি একটা কাগজ দলা পাকিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল—তারপর ভোলা আসতেই টুপ করে ফেলে দিলে। আশ্চর্য! পড়বি ত পড় একেবারে ভোলার টাকের উপর। ভোলা উপর দিকে চেয়ে হাসল—ওর সারা মুখখানায় কারা কালো রং মাখিয়ে দিয়েছে—শুধু দাঁত আর চোখের ভেতরটা সাদা হাসতেই ওকে হনুমানের মত মনে হল। অপর্ণাও হেসে ফেললে—কিন্তু তারপরেই মনের সবটা থমথমে করে গুটিয়ে নিলে। ছিঃ—তার না শোক চলছে, হাসি এলো কি করে। যাকগে ও কিন্তু নেবে না। অরুণদাকে জানিয়েই ফেলবে।

বালিশ বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল। কিন্তু কি লিখবে। কতকগুলো কাগজ অযথা নষ্ট করলে। তারপর লিখলে—অরুণদা মনে পড়ে আমার গত বছরের জীবনের প্রথম দোল? কী অক্ষয় সুধায় না ভরিয়ে দিয়েছিল!—আমি তারি স্মৃতি নিয়ে আমার জীবনের বাকী দোলগুলো কাটিয়ে দেবো—তুমি দুঃখ কোরোনা অরুণদা.....' বড় ভাল লিখেছে অপর্ণা পড়তে গিয়ে কান্নায় নিজের গলা বুজে আসছে।

হঠাৎ চমকে উঠল অপর্ণা। অরুণদার গলা না! মন্টু, নন্টে রীণা সবাই চেঁচাচ্ছে। মা যেন একবার বললেন—"তুই যে এত বেলা করে এলি অরুণ....." অরুণদার গলাই শুধু পাচ্ছিনা। আহ্লাদী করে কেন এখন চিঠি লিখতে বসল। জানালায় এখন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে চোখাচোখি ত হতই।

কিন্তু অরুণদা কি ওকে খুঁজছে না?—নিশ্চয়ই খুঁজছে। হয়ত মীনাকে টফির ঘুষ দিয়ে এ বাড়ীর আবহাওয়া জেনে নিচ্ছে। একটু কৌতুকের হাসি অপর্ণার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। আচ্ছা অরুণদা চুপিচুপি উপরে উঠে আসতেও ত পারে। যে মেয়ে গেরুয়া না পরেও সকাল থেকে সন্ন্যাসিনী সেজেছে—তার উপর কি জ্যেঠিমা এখনো চোখ পেতে বসে আছেন? না—দরকার নেই দরজার খিলটা খুলেই রাখি। বন্ধ করব না, সাফ কথা—কিন্তু খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকব এমন কথা ত ছিল না—এ যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অপর্ণা উঠে গিয়ে নিঃশব্দে খিলটা খুলে দিল। এখন অরুণদা যদি ওর ঘরে ঢুকেই পড়ে তাহলে ওর করবার কি আছে—পড়াটড়া বন্ধ দিতে এমনিত কতবারই এসেছে। তা ছাড়া সে এই প্রতিজ্ঞাই করেছে জীবনে কোনদিন রং না আবির ছোঁবে না—কিন্তু কেউ যদি জোর করে ওকে আবির মাখায়—বিশেষ করে সে যদি পুরুষ মানুষ হয়...আচ্ছা তাহলে তার সঙ্গে জোরে অপর্ণা পেরে উঠতে পারে? আসল কথা সে ত আর আবির ছুঁচ্ছে না—তাকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছোঁয়ান হচ্ছে। তাইতে কারো দিব্যি পচে যায়। আর এ নিয়েত আইন আদালত হয় না। অপর্ণা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়াল—জানালার বাইরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে দোলা লেগেছে—কোমলায় ডালগুলোও যেন মেতে উঠেছে। রাস্তার পাঁচের রং পর্যন্ত বদলে গেছে—দেওয়ালে ফিকে রং গাঢ় রংএর ছোপ। ছেলেমেয়েদের রংএর খেলা প্রায় শেষ হয়েছে। ওদিকে বস্তির ছেলেরা খুব হল্লা করছে—কাদা নিয়ে ছুঁড়ছে এ ওকে তাড়া করছে। দোলের আবশ্যিক পরিণতি সে প্রতি বছর এমনি দেখে এসেছে। এক ফ্লরিডার্ড একগাদা তারই বয়সী ছেলে-মেয়ে রং খেলে গান গাইতে গাইতে চলে গেল—কেন, তার বেলা দোষ হয় না? এগুলো ত কই জ্যেঠিমার চোখে পড়ে না—যত সব সেকেলেপনা।

কিন্তু অরুণদা যেন কি? মন্টু, নন্টে রীণা হুল্লোড় করছে আর অরুণদা দুনিয়া ভুলে গেল। কিন্তু ওই

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
ক্রেওস কেবিন
১৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪
(কলেজ স্কোয়ার পূর্ব)
কাছে—বাহিরের অর্ডার পাইলে যত্নসহকারে সরবরাহ করিয়া থাকি।

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী ঔষধের জন্য—
রামকানাই মেডিক্যাল ষ্টোর্স
১২৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিঃ ৪
ফোন : ৫৫—৩৭১১

সর্বপ্রকার লৌহ বিক্রেতা
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল
হার্ডওয়ার ডিভিসন,
১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা
ফোন : ৩০—৫৪৬৪

সর্বপ্রকার বস্ত্র ও পোষাকের জন্য
রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল
প্রাইভেট লিমিটেড
বড়বাজার, কলিকাতা—৭ ফোন : ৩০—২৩০০

জ্যোঠিমা—সে জ্যোঠিমা অপমানের কিছু বাকী রাখেনি—যার জন্য অপর্ণা আজ সন্ন্যাস নিয়েছে। হয়ত তারই নির্বিকার ঘরের দরজার কাছে বসে তারই হাতে ভাজা বেগুণী খাচ্ছে। নির্লজ্জ কোথাকার! সব ভুলে গেল। গত বছরের রং খেলা—আর ওই সব মাখা-মুখু.....তার চোখের উপর সেদিনের গাঢ় ছায়া নেমেছে—ঠোঁট দুটো শুখিয়ে শুখিয়ে উঠছে—সারা শরীরে একরকমের দাহ অনুভব করছে।—ছেলেছেলে জাতটাই এমনি!

পায়ের শব্দ না?—উৎসুক হয়ে পড়িল অপর্ণা। তাই তখনো হয়। অরুণদা তার অনেক চাওয়া বছরের একটি দিনকে ব্যর্থ করে চলে যাবে। আসল কথা—ম্যানেজ করতে পারছিল না বেচারা। জ্যোঠিমার দরজায় বসে ভেলেভাজা যদি খেয়েই থাকে—সে জ্যোঠিমার চোখে ধুলো দেবার জন্য। হালকা পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে—এক্ষুণি একটা ভীরু কাঁপা গলায় 'অপি' ডাক শুনবে। অপি কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবে না। অরুণদা হয়ত বলবে—ছেলেমানষী কোরোনা অপি তুমি বুঝতে পার না আমার কি অবস্থা। গতবারের ব্যাপারের পর এমনি মুখ বলতে চলে আসা যায় নাকি!" অপি তখনো কথা বলবে না যতক্ষণ না অরুণদা এগিয়ে এসে চারিদিক চেয়ে ভয়ে ভয়ে.....

একটা কাল্পিত আবেগে অপর্ণার পা দুটো কাঁপছে—ঠোঁট দুটো কান দুটো জ্বালা করছে—গলা শুকিয়ে আসছে। না-না মান অভিমান করে আজ সময় কাটিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। কে জানে, জ্যোঠিমা হয়ত পেছন পেছন এক গ্লাস জল বা এমনি কিছু নিয়ে উঠে আসবেন। বাড়ী ত নয়, জেল—না জেল বোধ হয় এর চেয়ে অনেক ভাল। তার চেয়ে ও চোখবুজে একেবারে অরুণদার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকের মধ্যিখানে.....' পায়ের শব্দ দরজার সামনে এসে গেছে। অপর্ণা চোখবুজে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য এক পা তুলছে এমন সময় দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

—"অরুণদা!"

রীনি বলল—"অরুণদা অনেকক্ষণ চলে গেছে। বেলা দুটো বেজেছে—মা তাই বেড়াতে নীচে যাবে বলল।"

রীনা নোটিশ ধরিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। অপর্ণা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর ঠোঁটদুটো আগের মত জ্বলছে—কান দুটো আগের মত দপদপ করছে—কিন্তু চোখের কাজলের নীচে মেঘলাদিনের কামনাঘন নিবিড়তা আর নেই—সে দুটো রাগে আর ঘৃণায় দপদপ করে জ্বলছে।

অরুণকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানা টেনে নিয়ে একেবারে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললে। কান্নার গলা বুজে আসছে—অপর্ণা বালিশে মুখ গুঁজে সেটা চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। তার সেইটা ফুলে ফুলে উঠছে আর অস্পষ্ট গোঙানীর মধ্যে কটা কথা মাত্র শুধু শোনা গেল—"ভীতু—ভীতু কোথাকার!"—এই বিনা দুঃখে দিনদিন মরছি যদি কোনদিন তোমায়....."

নিউ ফ্যাসানহাউস
টেলার্স
৩৪ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট ক্রসিং
কলিকাতা-১৩
পূরবী সিনেমার পূর্বদিকে
অর্ডার সাপ্লাই করা হয়

বীণা চিত্রমের "হিট্ ছবি"
কণ্ঠ-সঙ্গীতে :—হেমন্ত, সন্ধ্যা, সুমিত্রা ও অনেকে

নৃত্যে :—জয়শ্রী, বীণা, নরেশ কুমার, কানুশঙ্কর, কেনেট কুমার প্রভৃতি।
অভিনয়ে :—ছবি, জহর, পদ্মা, নীতীশ, একটি ঘোড়া, একটি সাপ আর একটি ছোট রাজকুমার ও রাজকন্যা।
পরিচালনায় :—প্রফুল্ল রায়, ● সঙ্গীত :—হীরেন বোস
নৃত্য পরিচালনায় :—বিনয় ঘোষ ● সম্পাদনায় :—বিনয় ব্যানার্জী
পরিবেশনায় : বীণা ফিল্মস ৬২নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিঃ-১

নতুন পাওয়া

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রী বিয়োগের পর সত্যিই কি সন্ন্যাসী হলেন প্রতাপবাবু। ধুতি ছেড়ে থান পরলেন। মাছ ছেড়ে নিরামিষ ধরলেন। তিনটে ছেলের নামে তিনখানা বাড়ী লিখে দিলেন। নিজে রইলেন এক সতন্ত্র বাড়ীতে। নীরব নিস্তব্ধ বাড়ীতে একা রইলেন মাত্র।

বন্ধু মহলে তুমুল আলোচনা। লোকটা কি পাগল হয়ে যাবে? বন্ধুর স্ত্রীরা প্রতাপবাবুর মৃতা স্ত্রীর স্বামী সৌভাগ্যের জন্য বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন ভগবানের কাছে। স্বামীদের প্রতি কথায় প্রতাপবাবুর আদর্শ হতে বললেন।

পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রতাপ রায়কে সান্ত্বনা দিতে বন্ধুরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রতাপবাবুর গৃহে হাজির হতেন। সান্ত্বনা না পেলেও প্রতাপবাবু স্নেহময়ীকে ভুলে থাকতেন হয়ত বা কিছুক্ষণের জন্য।

বন্ধু গোরাচাঁদবাবু বলতেন—"আবার বিয়ে কর প্রতাপ। বড় মেয়ের ত অভাব নেই। শূন্য মন পূর্ণ না হলেও শূণ্য ঘরত পূর্ণ হবে।"

নাঃ যে আর হয় না গোরা, স্নেহময়ীর শূন্য ঘর আর কোন নারীই পূর্ণ করতে পারবে না। সে মানুষ ছিলো না ছিলো দেবী। তার শূণ্য সিংহাসনে জ্বলবে ধূপের আগুন, যা নিজেও পুড়বে, পোড়াবে-আমাকে। কথা শেষে প্রতাপবাবুর চোখে জল দেখে, বেদনার পশরা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গোরাচাঁদবাবু।

দেখতে দেখতে বছর চার কাটলো। প্রতাপবাবুর কাছে শূণ্য মন আর শূণ্য ঘরের রূপ কেন হঠাৎ একদিন বদলে গেল মনে হতে লাগলো মরুভূমির মধ্যে বাস করছেন। তৃষ্ণায় তার গলাটা কাঠ হয়ে উঠলো। জল কোথায়? তাই সেদিন গোপনে খবরের কাগজের পাতায় এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন।

ত্রিরিশের উর্ধ্বে, যে কোন বর্ণের বিধবা, সধবা, (ডাইভোর্স) বা কুমারী পাত্রী চাই। পাত্রীর সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়।

এরপর যদিও রইল বন্ধ, নম্বর, তবুও কিভাবে যেন কথাটা প্রচার হয়ে পড়লো বন্ধু মহলে। এবার গোরাচাঁদবাবু এগিয়ে এলেন বাধা দিতে। "আর কেন প্রতাপ সময় ত হয়ে এলো।" প্রতাপবাবু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। "সময় হয়ে আসবার আগে ত চাই সমব্যথি। ও সব তোমরা বুঝবে না। এর পরেও অনেকের অনেক আপত্তি প্রতাপবাবুর দৃঢ়তার বানে ভেসে গেল।

একদিন দেখা গেল প্রতাপবাবুর স্টুডিবেকার থেকে নেমে এলেন তিনি নিজে, আর পিছনে নামলেন এক স্থূলকায়া বর্ষীয়সী মহিলা। উনি প্রতাপবাবুর চেয়ে দুচমনা, দশ বছর বিধবা থাকবার পর আজ আবার প্রতাপবাবুর হাতের সিঁদুরে সিঁথি রাঙ্গা করেছেন। মুখে সলজ্জ হাসবার চেষ্টা, দীর্ঘদিন রঙীন শাড়ী পরায় অনভ্যস্ত মহিলার পরনে ফিকে গোলাপী শাড়ী।

প্রতাপবাবু তাঁকে ডাকলেন—"এস প্রভা তোমার ঘর, তুমিই দেখে নাও। জানত ছেলে বৌ কেউই আমাকে স্বাগত জানাতে আসবে না আজ।"

"তোমার কিছুই ভাবতে হবে না, এই বাড়ীই আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।" প্রভাবতী স্থূল দেহ নিয়ে মন্থরগতিতে গেটের ভিতর চলে গেলেন। প্রতাপবাবুও পিছু পিছু। সামনেই স্নেহময়ীর বড় অয়েল পেন্টিং। এর দিকে চেয়ে প্রতাপবাবু বললেন, "এতদিনে আবার কোথায় জন্ম নিয়েছে।"

"আসা যাওয়াই ত সংসারের রীতি। ঐ ভেবে বসে থাকলে চলে? সান্ত্বনার সুরে বললেন প্রভা। "হ্যাঁ গো। ছবিখানাকে সরিয়ে রেখ, মরা মানুষের ছবি দেখলে আমার মন যেন কোথায় চলে যায়—এগিয়ে এসে প্রভার হাত ধরলেন প্রতাপবাবু। বললেন, চল, তোমার শোবার ঘর, বসবার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।

এরপর ঠাকুর, চাকর তাদের নূতন প্রভুপত্নীকে চা মিষ্টিতে আপ্যায়িত করতে এতটুকু ত্রুটি করলেন না। প্রভাদেবীর সোল্লাসে খাওয়াকে, সানন্দে খাওয়া মনে করে পরম তৃপ্তি নিয়ে চেয়ে রইলেন প্রতাপবাবু। সেইদিন থেকে আরম্ভ হলো তাঁর দ্বিতীয় সংসার।

নূতনের ডোরে বাঁধা পড়লেন প্রতাপবাবু। এমন সংসারী হয়ে পড়লেন যে—ভিতর বাড়ী থেকে সদর ঘরে আসবারও সময় পান না তিনি। বন্ধুরা সান্ধ্য মজলিসে এসে প্রতাপবাবুকে না পেয়ে

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য!

বিমল রায় প্রোডাকসান্সের

গৌরবদীপ্ত অবদান!

রবীন্দ্রনাথের

কাবুলিওয়ালা

হিন্দি

বলরাজ সাহনী, বেবী সোনু, সন্ধ্যা, উষাকিরণ,
অসিত সেন, তরুণ বসু,

পরিচালনা : প্রযোজনা : সঙ্গীত

হেমেন গুপ্ত বিমল রায় সলিল চৌধুরী

মিনাভা : রাধা : পূর্ণ : মোটাস : প্রেম
চিত্রপুরী : বঙ্গবাসী : পারিজাত
অন্নপূর্ণা (ব্যাণ্ডেল)

পরিবেশক:

ক্যালকাটা মিভাস সেন্টার

প্রদর্শনের জন্য:

আহা বাছারা আমার সারা জীবন কষ্ট পেয়েছে, আজ একটু সুখের মুখ দেখলো তোমার জন্য। এ্যাঁ, প্রতাপবাবুর চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চায়। কিছু বলবার ইচ্ছা আছড়ে পড়তে লাগলো, প্রকাশ করবার ক্ষমতা নেই। বড় মেয়ে দুটি একটু ইতশ্চতঃ করছিলো তাদের বর্তমান করণীয় কি? এবার সেই এগার বছরের আহ্লাদী প্রতাপ রায়কে ছেড়ে জড়িয়ে ধরলো বড় বোনটিকে, "দিদি চলো আমাদের ফুল বাগান দেখে আসি।"

প্রতাপবাবু এতক্ষণ পরে বললেন—হ্যাঁ মা যাও তোমাদের ফুলবাগান দেখে এসো। তোমাদের ফুল বাগান—

ওরা চলে যেতেই শান্তির নিশ্বাস ফেললেন প্রভাদেবী। "আহা বাছারা আমার দশ বছর পরে ঘর পেলো। তাছাড়া আহ্লাদী আমার জন্ম থেকেই বাপ হারা।

প্রতাপ প্রশ্ন করলেন—"কই তোমার যে মেয়ে তিনটি আছে একথা ত বলোনি।

"বলবার প্রয়োজন মনে করিনি কেন জান, তোমার তিনটি ছেলে থেকেও যদি তোমাকে মানতে পেরে থাকি তবে তুমি আমায় মানতে পারবে না কেন?"

তবুও শেষ চেষ্টা প্রতাপের, বেশ তা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু ওরা কি অন্য জায়গায় থাকতে পারত না?

না পরের বাড়ী ওরা আর থাকতে পারবে না, এতদিনে ওরা আশ্রয় পেয়েছে।

ওদের বোর্ডিং-এ রেখে দেবো, যত টাকা খরচ হয় সব দেব, শুধু ওদের এখান থেকে যেতে বলো। নচেৎ আমি হয়ত পাগল হয়ে যাবো। একান্ত অনুরোধ নিয়ে বললেন প্রতাপ রায়।

ওদের নিজের বাপ হলে কি একথা বলতে পারতে? গলার স্বর আর্দ্র হয়ে ওঠে প্রভার। আবার রুদ্ধ হলেন, আমার বাড়ী ছেড়ে আমার মেয়েরা চলে যাবে, আর আমি শান্তিতে থাকবো মনে করেছ?

তোমার বাড়ী?

হ্যাঁ, আগে থেকেই ত এ বাড়ী আমার নামে লিখে দিয়েছ।

ওঃ লিখে দিয়েছি, - বেশ করেছি। আমি জ্ঞানীর মত কাজ করেছি। বাবা সাধুর মত কাজ করেছি। তার সঙ্গে আমার মাথাটাও তোমাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছি। প্রতাপ রায় বসে পড়লেন দু'হাতের উপর মাথা রেখে। প্রভার অজস্র কথার তীর তাঁর সারা দেহে এসে বিঁধতে লাগলো একটার পর একটা।

"এখন আর অনুতাপ করে কি হবে বলো, জানোইত এ বয়সে মরতে এসেছি, শুধু ঐ মেয়ে কটার জন্য। ওদের মায়ের যা কিছু সব ত ওদেরই। আজ পুরুষ মেয়ের সমান অধিকার, একথা ওরা বুঝে যাক, আহা বাছারা আমার কবে থেকে বাপহারা। তুমি কি এখানে থাকতে পারবে ভেবেছ?" ওরা আমার যদি চলে যায়?—

আমি থাকতে পারবো না। বিপন্ন-বিস্ময়ে প্রতিবাদ করবার জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবার মুহূর্তে আবার ছুটে এলো আহ্লাদী, জাপটে ধরলে প্রতাপ রায়ের গলাটা।

মেশোমণি, চলো আমাকে একটু গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কই—ওঠোনা?

আমি—

হ্যাঁ—তুমি-তুমি ত আমার বাবামণি। অবাঞ্ছনীয় হাতের বেষ্টনীর মাঝে আড়ষ্ট হয়ে প্রতাপ রায় ভয়ার্ত চোখে বললেন, কে? কে বললে? ঐ ত দিদি বললে, তুমিইত আমার বাবা-মণি হয়েছ। তোমার সব আমাদের দিয়েছ। চলো। দিদি ধরত বাবামণিকে জোর করে নিয়ে যাই।

আহ্লাদীর মুখের কথা শেষ না হতে তিন বোনে মিলে, হিড় হিড় করে সদরের দিকে টেনে নিয়ে গেল প্রতাপ রায়কে—পিছনে মুখে কাপড় দিয়ে ডুকরে হেসে উঠলেন প্রভাদেবী।

এদিকে প্রতাপ রায় যখন তিন কন্যার বাহুর মাঝে সমাহিত পথের দুধার জনারণ্য হয়ে উঠেছে তখন প্রতাপ রায়কে কেন্দ্র করে। সেই ব্যূহ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন গোরাচাঁদবাবু।

"কি হে প্রতাপ নূতন পাওয়ার আনন্দ বুঝি?"

বিপন্ন চোখে গোরাচাঁদবাবুর দিকে চেয়ে বললেন প্রতাপবাবু, আমাকে বাঁচাও গোরা। নূতন পাওয়ার মোহ আমার কেটে গেছে। আমি নিস্ব—আমি রিক্ত, মনে হচ্ছে কেউ কোথাও আমার নেই, আশ্রয় হারা আমি সর্ষে ক্ষেতে দাঁড়িয়ে—কথা শেষ হওয়ার আগেই সেইখানে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রতাপ রায়। কে জানে সে জ্ঞান আর কোনদিন তাঁর ফিরেছিলো কি-না।

গ্রন্থমের বই-এর কোন পরিচিতি লাগে না

উপন্যাস

বাণী রায়
মিস্ বোসের কাহিনী ৩·০০

প্রতিভা বসু
ঘনে যদি ফুটলো কুসুম ৪·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগীর
এক মুঠো আকাশ (৫ম সং) ৫·০০
মধুরাই ২·৫০

বিভূতিভূষণ গুপ্ত
লাল সন্ধ্যা ৬·০০
বাঁধ ৩·৫০

দিলীপকুমার রায়
তরুণ রোমিও কে ৩·০০

বুদ্ধদেব বসু
সাড়া ৩·০০

বিধায়ক ভট্টাচার্য
অজানিতার চিঠি ৩·০০

ছোট গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫·০০

প্রতিভা বসু
প্রেমের গল্প ৪·০০

সজনীকান্ত দাস
স্বনির্বাচিত গল্প ৫·০০

চিত্তরঞ্জন দেব
তারাপীঠের একতারা ৩·৭৫

জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)
ভর্তৃহরির সংসার ৩·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
ভালবাসার ইতিকথা ২·৫০

মায়া বসু
চেনা অচেনা ৩·০০
(পরিবর্ধিত)

আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

পরিমল গোস্বামী
স্মৃতিচিত্রণ (২য় সং) ৭·০০

মৈত্রেয়ী দেবী
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (৪র্থ) ৭·৫০

পঁচিশজন লেখক-লেখিকা
বুদ্ধিতে যার ব্যথা চলে না
(৩য় সং) ৩·০০

প্রবন্ধ, রম্য রচনা, ভ্রমণ

বাণী রায়
মধুজীবনীর নূতন ব্যাখ্যা ৭·০৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
ভারতে জাতীয় আন্দোলন ১০·৭৫

মৈত্রেয়ী দেবী
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ ৭·৫০

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
অমৃতের উপাখ্যান ৩·৫০

বিদেশের বিশ্বাস
কাঞ্চনজঙ্ঘার পথে ২·৫০

শ্রীপান্থ
আজব নগরী (২য় সং) ৩·০০

শচীবিলাস রায়চৌধুরী
ভাকটিকিটের ছদ্মকথা ৬·০০

নাটক ও একাঙ্কিকা

উৎপল দত্ত
কেরানী কৌতুক ২·৫০

ধনঞ্জয় বৈরাগী
মার হবে না দেরী ২·৫০
এক পেয়ালা কফি ২·৫০
একমুঠো আকাশ ২·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
নতুন তারা ৩·২৫

কিশোরপাঠ্য

মণি গঙ্গোপাধ্যায়
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ২·৭৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্দীপন পাঠশালা ১·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ড্রাগনের নিঃশ্বাস ২·৫০
সামনে চড়াই ১·৫০

লীলা মজুমদার
বাঘের চোখ ২·৫০

অনুবাদ সাহিত্য

প্রতিপত্তি ও বন্ধুলাভ : (ডেল কার্নেগি) (২য় সং) ৪·৫০
(How to win friends & influence people)
দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন : (২য় সং) ৫·৫০
How to stop worrying & start living
উপন্যাস সঞ্চয়ন : স্টাইনবেক, স্টিফেন ক্রেন ও জেমস্ এম্ফে ২·৫০
গল্প সঞ্চয়ন : ও'হেনরি, অ্যালান পো ও নাথানিয়েল হথর্ন ২·০০
প্রবন্ধ সঞ্চয়ন : এমার্সন, ডেভিড থোরো ও ফস্টর ফ্রাঙ্কলিন ২·৫০
কিশোর-পাঠ্য সঞ্চয়ন : স্টার্লিং নর্থ, জনাথন স্পেরি ও মার্ক টোয়েন ২·০০

English Book On Tagore
The Great Wanderer—Maitrayee Devi 8·50

এ-যুগের বিস্ময় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

৮·৫০

'কল্পলোক' রবীন্দ্র সংখ্যার নমুনা কপির জন্য লিখুন :

২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

CENTRAL LIBRARY

বিস্মৃত বিপ্লবী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

১ই জুন, ১৮৬২—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্টীম শিপ ক্যানাডায় চড়ে চলেছেন য়ুরোপে। বন্দরে পড়ে রইলেন প্রিয়তমা স্ত্রী মাঁরিয়েৎ আর ছোটো ছেলেমেয়েরা। মাইকেল তাদের জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করেছেন, যেন তারা কষ্ট না পায়। সেদিন সই য়ুরোপযাত্রীর মন নিশ্চয়ই ঘরের কাজে পড়েছিল। সেই প্রলোভনকারে বাইরণের উক্তির প্রতিধ্বনি করে মাইকেল বলেছিলেন—'My Native land. Good night!' অশান্ত, রণক্লান্ত, বিদ্রোহী মধুসূদনের চোখে সেদিন নেমে এসেছিল শ্রাবণ। দেশের লোকের প্রতি বিশ্বাস করে মধুসূদন সেদিন বিদেশ যাত্রা করলেও তারা তাঁর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্তব্য করেনি, এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রী মাঁরিয়েৎকেও য়ুরোপে পাড়ি দিতে হয়। ইংলন্ডে খরচ বেশী, সেখান থেকে প্যারী, প্যারী থেকে ভার্সাই। অভাবের তাড়নায় স্ত্রী-পুত্রের আহার জোটে না, প্রতিবেশীরা গোপনে কখনো কিছু খাদ্যবস্তু বা পানীয় রেখে যায়, সেই ভয়ংকর মুহূর্তেরই সেইটুকুই সম্বল। সেদিন বাংলাদেশের একজন মানুষ মাইকেলকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন—

"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient Sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother. I was right; an hour afterwards, I received your letter and the 1500/- Rs. you have sent me." অবশ্য এমন এক সাহায্য ঈশ্বরচন্দ্রকে বার বার পাঠাতে হয়েছে।

এই পরিবারের পরিচয় [illegible] ভবানী মুখোপাধ্যায়ের [illegible] মাইকেলের [illegible] কালের রচনা। [illegible]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নীল পাহাড় অভ্র রোদ (যন্ত্রস্থ)
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ঘুমি ভূকার জল ৩·০০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিশি ভোর ৩·০০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাদান ৫·০০
ঐতিহাসিক
সংখিলন ২·৫০
মনোজ গুপ্তোপাধ্যায়
সূর্যিপথের যাত্রী ১·০০
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
গাইড টু স্টীম
লোকোমোটিভ ৫·০০
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়
আকাশ বদলী জাগে ৩·০০
ধরণীর ধূলিকণা ৩·৫০
পথের ধুলো ৪·০০ ॥ ধুলো-
রাঙা পথ ৩·৫০ ॥ ওপার-কন্যা
৩·০০ ॥ প্রজাপং কাঁধ ৩.০০
রাহু ও রবি ৩·৫০
বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

আগামী মাসে
প্রকাশিত হবে

...ব সংগ্রাম, বিপত্নীকত্বের সূচনা ...বিরোধ। ট্রাজেডির এই উপকরণের। ...ম, পরাজয়, অসহায় অবস্থা এবং ...ভনা যে বেদনাই-বিড়ম্বনা তা সবই ...ডি। ব্যাকরণসম্মত ট্রাজেডির সংজ্ঞা ...কিন্তু তাই বলে শুধু ক্লেদ ক্লেদ ...াই আবার বিয়োগান্ত ঘটনা নয়। যে ...া বিশেষ ধরণের বন্ধুণা ভোগের ফলে ...ত তার নাম ট্রাজেডি। কৃষ্ণকুমারী ভীষ্ম ...হর দুর্বিহতা, সীতা ও সমরুতীরা যে ...যে বধূ হয়ে এসেছেন সেই মহৎ ...। তাঁর জন্ম। কৃষ্ণকুমারী সুন্দরী, ...তরপুরের রাজা ভগৎ সিং ...তার রূপমুগ্ধ, মানসিংহ পাণিপ্রার্থী ...ুতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় কৃষ্ণকুমারী নাম ...য় উদয়পুর ধ্বংস—এর মধ্যে অ ...কোনো অধ্যবধা নেই। রাজা ভী ...সিংহের উভয় সংকট। তিনি কৃষ্ণকুমারীকে ...অগত্যা হত্যা করে সমস্যার সমাধা ...করবেন স্থির করলেন, তার কৃষ্ণকুমার ...শেষকালে বিষপানে আত্মহত্যা করেন ...মধুসূদন ইতিহাসকে কিঞ্চিৎ বিকৃত ক ...কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করেছেন অন্যভাবে

নাটক হিসাবে কৃষ্ণকুমারী ব্যর্থ

আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এই শুভদিনে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনাদের কাছে আমাদের বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির সফলতা কামনা করছি.....

নবকেতনের

হাম দোনো

ভূমিকায় :

দেবানন্দ (দ্বৈত চরিত্রে) • নন্দা ও সাধনা

পরিচালনা : অমরজিত

সংগীত : জয়দেব

চন্দ্র ফিল্মস্-এর

সোহাগ সিন্দুর

রূপায়ণে

বলরাজসাহানী • মালা সিন্‌হা

পরিচালনা : কৃষ্ণ ও পাল

সংগীত : চিত্র গুপ্ত

লাইট এণ্ড শেডের

সং যো গ

—: ভূমিকায় :—

অনীতা গুহ • প্রদীপকুমার • ওমপ্রকাশ

পরিচালনা : প্রমোদ চক্রবর্তী

সংগীত : মদনমোহন

—একমাত্র পরিবেশক—

কাপুরচাঁদ প্রাইভেট লিমিটেড্

৩৯, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

এক হিসাবে বলা যায় মধুসূদন নারীর মাধ্যমে বিয়োগান্ত নাটকের সূচনা করেছেন। উত্তরসূরীদের কাছে তিনি মূল্যবান। মধুসূদন একথা মানে যে ভুল করেছেন, তিনি যদি ভুল না করে একটা নতুন ধারা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন, আজ এতদিন পরে আমরা সেখান থেকে কতখানি এগিয়েছি? নাটকের অধিকাংশ প্রযোজক আমার অক্ষমতা রেখে বিগত বছরে কখানি সার্থক বিয়োগান্ত রচনা করেছি! এই প্রশ্নের বিচার সময় আজ এসেছে। বিয়োগান্তের [illegible] সম্পর্কিত কারণ, তাই মধুসূদন আজ [illegible] স্মরণীয়।

এই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল "মেঘনাদ বধ কাব্য"। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে মেঘনাদ বধ কাব্য সম্পর্কে বলেছেন :

"মেঘনাদ বধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের

মুক্তি প্রতীক্ষায়

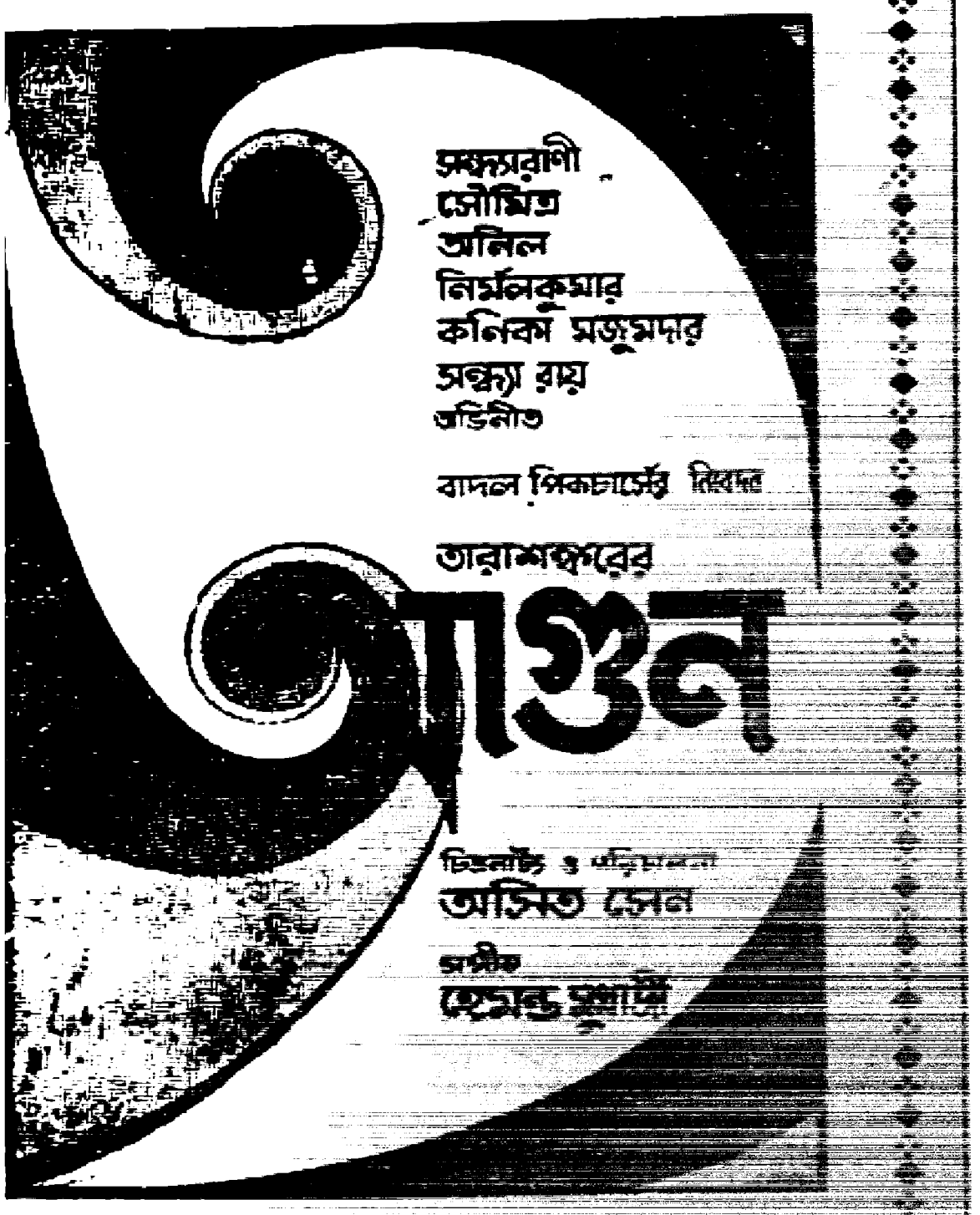

একমাত্র পরিবেশক :—

জি. আর পিকচার্স :—[illegible]

সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই :

সঙ্কলন :

সিন্ধুর স্বাদ (গল্প-সংগ্রহ) প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ৭.০০

রবীন্দ্র-চর্চা (প্রবন্ধ-সংগ্রহ) হরপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত ৫.০০

কবিতা ও কাব্যনাটিকা :

প্রথম নায়ক		যৌবনজ্বালা	
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১.৫০	অরুণেশ্বর সাগ্নিক	৩.০০
সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা	হরপ্রসাদ মিত্র	৩.০০	

গল্প-সংগ্রহ :

শুভক্ষণ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩.০০
পাহাড়ী ঢল	সমরেশ বসু	৩.০০
ছায়া-হরিণ	সন্তোষকুমার ঘোষ	৩.০০
শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি	বিমলেন্দু পালিত	২.০০

উপন্যাস :

দূরের আলপ্ত	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪.০০
মাহসিকা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩.০০
মায়ামারীচ	সুনীলকুমার ঘোষ	৩.৫০
রক্তের ঢেউ	সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩.০০
রায়মঙ্গল	শঙ্খপদ রাজগুরু	৩.০০
হেডমাস্টার (২য় সং)	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২.৫০
অচেনা	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	২.৫০

পরবর্তী বই : অনেক দিনের অনেক কথা সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত।
পত্রবিলাস নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ছায়ানট হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সুরভি প্রকাশনী : ১ কলেজ স্কো. কলকাতা ১

দুর্গোৎসব

দুর্গতিনাশিণী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, কাশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে। ভরা নদীর কলোচ্ছ্বাসে, বিহগ কুলের কাকলি কূজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমানন্দ মাতৃপূজায় বাঁধন লগ্নে বাঙালী পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে সংগ্রামে বিজয় ও লাভের প্রার্থনায় মুখর হবে।

দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।

অজস্র দুঃখসমস্যায় তীর্ণ তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

কে, সি, দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা

— আবিষ্কারক — রসগোল্লা —